বাংলা শব্দতত্ত্ব

প্রকাশকের নিবেদন

'শব্দতত্ত্ব' (প্রথম প্রকাশ : ১৩১৫) গ্রন্থের স্বতন্ত্র সংস্করণ 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামে ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে 'শব্দতত্ত্ব' সন্নিবেশকালে প্রথম সংস্করণের পূর্বে লিখিত অধিকাংশ শব্দতত্ত্ব-বিষয়ক রচনা সংকলিত হয়।

বর্তমান সংস্করণে বাংলা শব্দতত্ত্ব স্বতন্ত্র সংস্করণ এবং রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড -বহির্ভূত বহু রচনা সংকলিত হইয়াছে।

বৈশাখ ১৩৯১

বাংলা শব্দতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
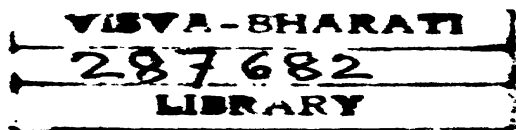
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ ॥ 'শব্দতত্ত্ব' নামে [১৯০৯ ॥ ১৩১৫]

সংস্করণ ॥ 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামে অগ্রহায়ণ ১৩৪২

রবীন্দ্র-রচনাবলী-সংস্করণ ॥ আশ্বিন ১৩৪৯

তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ ॥ বৈশাখ ১৩৯১

সংকলয়িতা

শ্রীপুলিনবিহারী সেন শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

সহকারী

শ্রীসুবিমল লাহিড়ী

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস। ৩০ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে

ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

এই গ্রন্থে বাংলা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যথার্থ বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা নয়। প্রাচীন প্রাকৃতের মতোই বাংলা প্রাকৃতের বৈচিত্র্য আছে। চাটগাঁ থেকে আরম্ভ করে বীরভূম পর্যন্ত এই প্রাকৃতের বিভিন্নতা সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু কোন্ প্রাকৃতের রূপ বাংলা সাহিত্যে সাধারণত স্বীকৃত হবে সেই প্রশ্ন ১৩২৩ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে 'সবুজ পত্রে' আলোচিত হয়। বস্তুত এই তর্ক সূচনা হবার বহু পূর্বেই সহজে তা স্বীকৃত হয়ে গেছে। বাংলা নাটকে পাত্রদের মুখে যে বাংলায় বাক্যালাপ বিনা বিতর্কে প্রচলিত হয়েছে তা পূর্ব উত্তর অথবা পশ্চিম প্রান্তের বাংলা নয়। এই গ্রন্থের আরম্ভে প্রয়োজন অনুভব করে উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করা হল।

[১৩৪২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিষয়সূচী

ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা

সংযোজন

পরিশিষ্ট

চিত্রসূচী

বাংলা শব্দতত্ত্ব

ভাষার কথা

পদ্মায় যখন পুল হয় নাই তখন এপারে ছিল চওড়া রেলপথ, ওপারে ছিল সরু। মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ ছিল বলিয়া রেলপথের এই দ্বিধা আমাদের সহিয়াছিল। এখন সেই বিচ্ছেদ মিটিয়া গেছে তবু ব্যবস্থার কার্পণ্যে যখন অর্ধেক রাত্রে জিনিসপত্র লইয়া গাড়ি বদল করিতে হয় তখন রেলের বিধাতাকে দোষ না দিয়া থাকিতে পারি না।

ও তো গেল মানুষ এবং মাল চলাচলের পথ, কিন্তু ভাব চলাচলের পথ হইল ভাষা। কিছুকাল হইতে বাংলাদেশে এই ভাষায় দুই বহরের পথ চলিত আছে। একটা মুখের বুলির পথ, আর-একটা পুঁথির বুলির পথ। দুই-একজন সাহসিক বলিতে শুরু করিয়াছেন যে, পথ এক মাপের হইলে সকল পক্ষেই সুবিধা। অথচ ইহাতে বিস্তর লোকের অমত। এমন-কি তাঁরা এতই বিচলিত যে, সাধু ভাষার পক্ষে তাঁরা যে ভাষা প্রয়োগ করিতেছেন তাহাতে বাংলা ভাষায় আর যা-ই হোক, সাধুতার চর্চা হইতেছে না।

এ তর্কে যদিও আমি যোগ দিই নাই তবু আমার নাম উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার যে কী মত তাহা আমি ছাড়া আমার দেশের পনেরো-আনা লোকেই একপ্রকার ঠিক করিয়া লইয়াছেন, এবং যাঁর যা মনে আছে বলিতে কসুর করেন নাই। ভাবিয়াছিলাম চারি দিকের তাপটা কমিলে ঠাণ্ডার সময় আমার কথাটা পাড়িয়া দেখিব। কিন্তু বুঝিয়াছি সে আমার জীবিত-কালের মধ্যে ঘটিবার আশা নাই। অতএব আর সময় নষ্ট করিব না।

ছোটোবেলা হইতেই সাহিত্য রচনায় লাগিয়াছি। বোধ করি সেই-জন্যই ভাষাটা কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোনো মত ছিল না। যে-বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন, পুঁথির ভাষাতেই পুঁথি লেখা চাই, এ কথায় সন্দেহ করিবার সাহস বা বুদ্ধি ছিল না। তাই, সাহিত্য-ভাষার পথটা এই সরু বহরের পথ, তাহা যে প্রাকৃত বাংলা ভাষার চওড়া বহরের পথ নয়, এই কথাটা বিনা দ্বিধায় মনের মধ্যে পাকা হইয়া গিয়াছিল।

একবার যেটা অভ্যাস হইয়া যায় সেটাতে আর নাড়া দিতে ইচ্ছা হয় না। কেননা স্বভাবের চেয়ে অভ্যাসের জোর বেশি। অভ্যাসের মেঠো পথ দিয়া

গাড়ির গোরু আপনিই চলে, গাড়োয়ান ঘুমাইয়া পড়িলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইহার চেয়ে প্রবল কারণ এই যে, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা অহংকারের যোগ আছে। যেটা বরাবর করিয়া আসিয়াছি সেটার যে অন্যথা হইতে পারে এমন কথা শুনিলে রাগ হয়। মতের অনৈক্যে রাগারাগি হইবার প্রধান কারণই এই অহংকার। মনে আছে বহুকাল পূর্বে যখন বলিয়াছিলাম বাঙালির শিক্ষা বাংলা ভাষার যোগেই হওয়া উচিত তখন বিস্তর শিক্ষিত বাঙালি আমার সঙ্গে যে কেবল মতে মেলেন নাই তা নয় তাঁরা রাগ করিয়াছিলেন। অথচ এ জাতীয় মতের অনৈক্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির মধ্যে পড়ে না। আসল কথা, যাঁরা ইংরাজি শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন, তাঁরা বাংলা শিখিয়া মানুষ হইবার প্রস্তাব শুনিলেই যে উদ্ধত হইয়া ওঠেন, মূলে তার অহংকার।

একদিন নিজের স্বভাবেই ইহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে কথাটা এইখানেই কবুল করি। পূর্বেই তো বলিয়াছি যে-ভাষা পুঁথিতে পড়িয়াছি সেই ভাষাতেই চিরদিন পুঁথি লিখিয়া হাত পাকাইলাম; এ লইয়া এপক্ষে বা ওপক্ষে কোনোপ্রকার মত গড়িয়া তুলিবার সময় পাই নাই। কিন্তু 'সবুজ পত্র'-সম্পাদকের বুদ্ধি নাকি তেমন করিয়া অভ্যাসের পাকে জড়ায় নাই এইজন্য তিনি ফাঁকায় থাকিয়া অনেক দিন হইতেই বাংলা সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে একটা মত খাড়া করিয়াছেন।

বহুকাল পূর্বে তাঁর এই মত যখন আমার কানে উঠিয়াছিল আমার একটুও ভালো লাগে নাই। এমন-কি রাগ করিয়াছিলাম। নূতন মতকে পুরাতন সংস্কার অহংকার বলিয়া তাড়া করিয়া আসে, কিন্তু অহংকার যে পুরাতন সংস্কারের পক্ষেই প্রবল এ কথা বুঝিতে সময় লাগে। অতএব, প্রাকৃত বাংলাকে পুঁথির পঙ্‌ক্তিতে তুলিয়া লইবার বিরুদ্ধে আজকের দিনে যে-সব যুক্তি শোনা যাইতেছে সেগুলো আমিও একদিন আবৃত্তি করিয়াছি।

এক জায়গায় আমার মন অপেক্ষাকৃত সংস্কার-মুক্ত। পদ্য রচনায় আমি প্রচলিত আইন-কানুন কোনোদিন মানি নাই। জানিতাম কবিতায় ভাষা ও ছন্দের একটা বাঁধন আছে বটে, কিন্তু সে বাঁধন নূপুরের মতো, তাহা বেড়ির মতো নয়। এইজন্য কবিতার বাহিরের শাসনকে উপেক্ষা করিতে কোনোদিন ভয় পাই নাই।

'ক্ষণিকা'য় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগাঁয়ের টাট্টু ঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্য-ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশি।

বলা বাহুল্য 'ক্ষণিকা'য় আমি কোনো পাকা মত খাড়া করিয়া লিখি নাই, লেখার পরেও একটা মত যে দৃঢ় করিয়া চলিতেছি তাহা বলিতে পারি না। আমার ভাষা রাজাসন এবং রাখালী, মথুরা এবং বৃন্দাবন, কোনোটার উপরেই আপন দাবি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই। কিন্তু কোন্ দিকে তার অভ্যাসের টান এবং কোন্ দিকে অনুরাগের, সে বিচার পরে হইবে এবং পরে করিবে।

এইখানে বলা আবশ্যক চিঠিপত্রে আমি চিরদিন কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছি। আমার সতেরো বছর বয়সে লিখিত 'য়ুরোপ যাত্রীর পত্রে' এই ভাষা প্রয়োগের প্রমাণ আছে। তা ছাড়া বক্তৃতাসভায় আমি চিরদিন প্রাকৃত বাংলা ব্যবহার করি, 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে তাহার উদাহরণ মিলিবে।

যাই হোক এ সম্বন্ধে আমার মনে যে তর্ক আছে সে এই— বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়া ছিল, সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়া যজ্ঞকর্তার ফরমাশে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।

যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়াপেটা ভাষা দিয়া তার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিয়মে তার বাঁধন আঁট হইয়া উঠিত। প্রাকৃত বাংলা বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রয়োজনমত সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত।

কিন্তু বাংলা গদ্য-সাহিত্য ঠিক তার উল্টা পথে চলিল। গোড়ায় দেখি তাহা সংস্কৃত ভাষা, কেবল তাহাকে বাংলার নামে চালাইবার জন্য কিছু সামান্য

পরিমাণে তাহাতে বাংলার খাদ মিশাল করা হইয়াছে। এ একরকম ঠকানো। বিদেশীর কাছে এ প্রতারণা সহজেই চলিয়াছিল।

যদি কেবল ইংরেজকে বাংলা শিখাইবার জন্যই বাংলা গদ্যের ব্যবহার হইত, তবে সেই মেকি-বাংলার ফাঁকি আজ পর্যন্ত ধরা পড়িত না। কিন্তু এই গদ্য যতই বাঙালির ব্যবহারে আসিয়াছে ততই তাহার রূপ পরিবর্তন হইয়াছে। এই পরিবর্তনের গতি কোন্ দিকে? প্রাকৃত বাংলার দিকে। আজ পর্যন্ত বাংলা গদ্য, সংস্কৃত ভাষার বাধা ভেদ করিয়া, নিজের যথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকাশ করিবার জন্য যুঝিয়া আসিতেছে।

অল্প মূলধনে ব্যাবসা আরম্ভ করিয়া ক্রমশ মুনফার সঙ্গে সঙ্গে মূলধনকে বাড়াইয়া তোলা, ইহাই ব্যাবসার স্বাভাবিক প্রণালী। কিন্তু বাংলা-গদ্যের ব্যাবসা মূলধন লইয়া শুরু হয় নাই, মস্ত একটা দেনা লইয়া তার শুরু। সেই দেনাটা খোলসা করিয়া দিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিবার জন্যই তার চেষ্টা।

আমাদের পুঁথির ভাষার সঙ্গে কথার ভাষার মিলন ঘটিতে এত বাধা কেন, তার কারণ আছে। যে গদ্যে বাঙালি কতাবার্তা কয় সে গদ্য বাঙালির মনো-বিকাশের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণত বাঙালি যে-বিষয় ও যে-ভাব লইয়া সর্বদা আলোচনা করিয়াছে বাংলার চলিত গদ্য সেই মাপেরই। জলের পরিমাণ যতটা, নদীপথের গভীরতা ও বিস্তার সেই অনুসারেই হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগীরথও আগে লম্বা-চওড়া পথ কাটিয়া তার পরে গঙ্গাকে নামাইয়া আনেন নাই।

বাঙালি যে ইতিপূর্বে কেবলি চাষবাস এবং ঘরকন্নার ভাবনা লইয়াই কাটাইয়াছে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু ইতিপূর্বে তার চেয়ে বড়ো কথা যাঁরা চিন্তা করিয়াছেন তাঁরা বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ। তাঁরা প্রধানত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল। তাঁদের শিক্ষা এবং ব্যাবসা, দুইয়েরই অবলম্বন ছিল সংস্কৃত পুঁথি। এইজন্য ঠিক বাংলা ভাষায় মনন করা বা মত প্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। তাই সেকালের গদ্য উচ্চ চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিতে পারে নাই।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও আমাদের দেশে ভাষা ও চিন্তার মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। যাঁরা ইংরেজিতে শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁদের পক্ষে ইংরেজিতেই চিন্তা করা সহজ; বিশেষত যে-সকল ভাব ও বিষয় ইংরেজি

হইতেই তাঁরা প্রথম লাভ করিয়াছেন সেগুলা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করা দুঃসাধ্য। কাজেই আমাদের ইংরেজি-শিক্ষা ও বাংলা ভাষা সদরে অন্দরে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিয়া আসিতেছে।

এমন সময় যাঁরা শিক্ষার সঙ্গে ভাষার মিল ঘটাইতে বসিলেন বাংলার চলিত গদ্য লইয়া কাজ চালানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হইল। শুধু যদি শব্দের অভাব হইত তবে ক্ষতি ছিল না কিন্তু সব চেয়ে বিপদ এই যে, নূতন শব্দ বানাইবার শক্তি প্রাকৃত বাংলার মধ্যে নাই। তার প্রধান কারণ বাংলায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের উপকরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত সংকীর্ণ। 'প্রার্থনা' সংস্কৃত শব্দ, তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ 'চাওয়া'। 'প্রার্থিত' 'প্রার্থনীয়' শব্দের ভাবটা যদি ওই খাঁটি বাংলায় ব্যবহার করিতে যাই তবে অন্ধকার দেখিতে হয়। আজ পর্যন্ত কোনো দুঃসাহসিক 'চায়িত' ও 'চাওনীয়' বাংলায় চালাইবার প্রস্তাব মাত্র করেন নাই। মাইকেল অনেক জায়গায় সংস্কৃত বিশেষ্যপদকে বাংলার ধাতুরূপের অধীন করিয়া নূতন ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলায় এ পর্যন্ত তাহা আপদ আকারেই রহিয়া গেছে, সম্পদরূপে গণ্য হয় নাই।

সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তার তদ্ধিত প্রত্যয় পর্যন্ত লইতে গেলে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও অনেকটা অংশ আপনি আসিয়া পড়ে। সুতরাং দুই নৌকায় পা দিবামাত্রই যে টানাটানি বাধিয়া যায় তাহা ভালো করিয়া সামলাইতে গেলে সাহিত্য-সার্কাসের মল্লগিরি করিতে হয়। তার পর হইতে এ তর্কের আর কিনারা পাওয়া যায় না যে, নিজের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বাধীন অধিকার কতদূর এবং তাহাতে সংস্কৃত শাসনের সীমা কোথায়। সংস্কৃত বৈয়াকরণের উপর যখন জরিপ জমাবন্দীর ভার পড়ে তখন একেবারে বাংলার বাস্তভিটার মাঝখানটাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিগাড়ি হয়, আবার অপর পক্ষের উপর যখন ভার পড়ে তখন তাঁরা বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ বিভাগে একেবারে দক্ষযজ্ঞ বাধাইয়া দেন।

কিন্তু মুশকিলের বিষয় এই যে, যে-ভাষায় মল্লবিদ্যার সাহায্য ছাড়া এক-পা চলিবার জো নাই সেখানে সাধারণের পক্ষে পদে পদে অগ্রসর হওয়ার চেয়ে পদে পদে পতনের সম্ভাবনাই বেশি। পথটাই যেখানে দুর্গম সেখানে হয় মানুষের চলিবার তাগিদ থাকে না, নয় চলিতে হইলে পথ অপথ দুটোকেই সুবিধা অনুসারে আশ্রয় করিতে হয়। ঘাটে মাল নামাইতে হইলে যে দেশে

মাশুলের দায়ে দেউলে হওয়ার কথা সে দেশে আঘাটায় মাল নামানোর অনুকূলে নিশ্চয়ই স্বয়ং বোপদেব চোখ টিপিয়া ইশারা করিয়া দিতেন। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়; বোপদেবের চেলারা যেখানে ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া আছেন সেখানে বাংলা ভাষায় বাংলা-সাহিত্যের ব্যাবসা চালানো দুঃসাধ্য হইল।

জাপানিদের ঠিক এই বিপদ। চীনা ভাষার শাসন জাপানি ভাষার উপর অত্যন্ত প্রবল। তার প্রধান কারণ প্রাকৃত জাপানি প্রাকৃত বাংলার মতো; নূতন প্রয়োজনের ফরমাশ জোগাইবার শক্তি তার নাই। সে শক্তি প্রাচীন চীনা ভাষার আছে। এই চীনা ভাষাকে কাঁধে লইয়া জাপানি ভাষাকে চলিতে হয়। কাউণ্ট ওকুমা আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে, এই বিষম পালোয়ানীর দায়ে জাপানি-সাহিত্যের বড়োই ক্ষতি করিতেছে। কারণ এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, যে-ভাষায় ভাবপ্রকাশ করাটাই একটা কুস্তিগিরি সেখানে ভাবটাকেই খাটো হইয়া থাকিতে হয়। যেখানে মাটি কড়া সেখানে ফসলের দুর্দিন। যেখানে শক্তির মিতব্যয়িতা, অসম্ভব শক্তির সদ্‌ব্যয়ও সেখানে অসম্ভব। যদি পণ্ডিতমশায়দের এই রায়ই পাকা হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় মহামহোপাধ্যায় না হইলে বাংলা ভাষায় কলম ধরা ধৃষ্টতা, তবে যাঁদের সাহস আছে ও মাতৃভাষার উপর দরদ আছে, প্রাকৃত বাংলার জয়পতাকা কাঁধে লইয়া তাঁদের বিদ্রোহে নামিতে হইবে।

ইহার পূর্বেও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতির মতো বই বিদ্রোহের শাঁখ বাজাইয়াছিল কিন্তু তখন সময় আসে নাই। এখনি যে আসিল এ কথা বলিবার হেতু কী? হেতু আছে। তাহা বলিবার চেষ্টা করি।

ইংরেজি হইতে আমরা যা লাভ করিয়াছি যখন আমাদের দেশে ইংরেজিতেই তার ব্যাবসা চলিতেছিল তখন দেশের ভাষার সঙ্গে দেশের শিক্ষার কোনো সামঞ্জস্য ঘটে নাই। রামমোহন রায় হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত ক্রমাগতই নূতন ভাব ও নূতন চিন্তা আমাদের ভাষার মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। এমন করিয়া আমাদের ভাষা চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা ঘরে ঘরে মুখে মুখে যে-সব শব্দ নিরাপদে ব্যবহার করি তাহা আর পঁচিশ বছর পূর্বে করিলে দুর্ঘটনা ঘটিত। এখন আমাদের ভাষা-বিচ্ছেদের উপর সাঁড়া ব্রিজ বাঁধা হইয়াছে। এখন আমরা মুখের কথাতেও নূতন পুরাতন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি আবার পুঁথির ভাষাতেও এমন শব্দ চলিতেছে পূর্বে

সাধু ভাষায় যাদের জল-চল ছিল না। সেইজন্তই পুঁথির ভাষায় ও মুখের ভাষায় সমান বহরের রেল পাতিবার যে-প্রস্তাব উঠিয়াছে, অভ্যাসের আরামে ও অহংকারে ঘা লাগিলেও সেটাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না।

আসল কথা, সংস্কৃত ভাষা যে অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে লইতে হইবে, যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। বাংলাকে সংস্কৃতের সন্তান বলিয়াই যদি মানিতে হয় তবে সেইসঙ্গে এ কথাও মানা চাই যে তার যোলো বছর পার হইয়াছে, এখন আর শাসন চলিবে না, এখন মিত্রতার দিন। কিন্তু যতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য সীমানা পাকা হইতে পারিবে না। ততদিন সংস্কৃত বৈয়াকরণের বর্গির দল আমাদের লেখকদের ত্রস্ত করিয়া রাখিবেন। প্রাকৃত বাংলার ঠাটে যখন লিখিব তখন স্বভাবতই সুসংগতির নিয়মে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব বাংলা ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া উৎপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বেড়ার ভিতরকার গাছ যেখানে একটু-আধটু ফাঁক পায় সেইখান দিয়াই আলোর দিকে ডালপালা মেলে, তেমনি করিয়াই বাংলার সাহিত্য-ভাষা সংস্কৃতের গরাদের ভিতর দিয়া, চল্‌তি ভাষার দিকে মাঝে মাঝে মুখ বাড়াইতে শুরু করিয়াছিল। তা লইয়া তাহাকে কম লোকনিন্দা সহিতে হয় নাই। এইজন্তই বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের দিনে তাঁকে কটুকথা অনেক সহিতে হইয়াছে। তাই মনে হয় আমাদের দেশে এই কটু কথার হাওয়াটাই বসন্তের দক্ষিণ হাওয়া। ইহা কুঞ্জবনকে নাড়া দিয়া তাড়া দিয়া অস্থির করিয়া দেয়। কিন্তু এই শাসনটা ফুলের কীর্তন পালার প্রথম খোলের চাঁটি।

পুঁথির বাংলার যে অংশটা লইয়া বিশেষভাবে তর্ক প্রবল, তাহা ক্রিয়ার রূপ। 'হইবে'র জায়গায় 'হবে', 'হইতেছে'র জায়গায় 'হচ্চে' ব্যবহার করিলে অনেকের মতে ভাষার শুচিতা নষ্ট হয়। চীনারা যখন টিকি কাটে নাই তখন টিকির খর্বতাকে তারা মানের খর্বতা বলিয়া মনে করিত। আজ যেই তাহাদের সকলের টিকি কাটা পড়িল অমনি তাহারা হাঁফ ছাড়িয়া বলিতেছে, আপদ গেছে। এক সময়ে ছাপার বহিতে 'হয়েন' লেখা চলিত, এখন 'হন' লিখিলে কেহ বিচলিত হন না। 'হইবা' 'করিবা'র আকার গেল, 'হইবেক' 'করিবেক'-এর ক খসিল, 'করহ' 'চলহ'র হ কোথায়? এখন 'নহে'র জায়গায় 'নয়'

লিখিলে বড়ো কেহ লক্ষ্যই করে না। এখন যেমন আমরা 'কেহ' লিখি, তেমনি এক সময়ে ছাপার বইয়েও 'তিনি'র বদলে 'তেঁহ' লিখিত। এক সময়ে 'আমারদিগের' শব্দটা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল, এখন 'আমাদের' লিখিতে কারো হাত কাঁপে না। আগে যেখানে লিখিতাম 'সেহ' এখন সেখানে লিখি 'সেও', অথচ পণ্ডিতের ভয়ে 'কেহ'কে 'কেও' অথবা 'কেউ' লিখিতে পারি না। ভবিষ্যৎবাচক 'করিহ' শব্দটাকে 'করিয়ো' লিখিতে সংকোচ করি না, কিন্তু তার বেশি আর একটু অগ্রসর হইতে সাহস হয় না।

এই তো আমরা পণ্ডিতের ভয়ে সতর্ক হইয়া চলি কিন্তু পণ্ডিত যখন পুঁথির বাংলা বানাইয়াছিলেন আমাদের কিছুমাত্র খাতির করেন নাই। বাংলা গদ্য-পুঁথিতে যখন তাঁরা 'যাইয়াছি' 'যাইল' কথা চালাইয়া দিলেন তখন তাঁরা ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করেন নাই যে, এই ক্রিয়াপদটি একেবারে বাংলাই নয়। যা ধাতু বাংলায় কেবলমাত্র বর্তমান কালেই চলে ; যথা, যাই, যাও, যায়। আর, 'যাইতে' শব্দের যোগে যে-সকল ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয় তাহাতেও চলে ; যেমন, 'যাচ্চি' 'যাচ্ছিল' ইত্যাদি। কিন্তু 'যেল' 'যেয়েছি' 'যেয়েছিলুম' পণ্ডিতদের ঘরেও চলে না। এ স্থলে আমরা বলি 'গেল' 'গিয়েছি' 'গিয়েছিলুম'। তার পরে পণ্ডিতেরা 'এবং' বলিয়া এক অদ্ভুত অব্যয় শব্দ বাংলার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন এখন তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলা দায়। অথচ সংস্কৃত বাক্যরীতির সঙ্গে এই শব্দ ব্যবহারের যে মিল আছে তাও তো দেখি না। বরঞ্চ সংস্কৃত 'অপর' শব্দের আত্মজ যে 'আর' শব্দ সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা শুদ্ধরীতিসংগত। বাংলায় 'ও' বলিয়া একটা অব্যয় শব্দ আছে তাহা সংস্কৃত অপি শব্দের বাংলা রূপ। ইহা ইংরেজি 'and' শব্দের প্রতিশব্দ নহে, too শব্দের প্রতিশব্দ। আমরা বলি আমিও যাব তুমিও যাবে— কিন্তু কখনো বলি না 'আমি ও তুমি যাব'। সংস্কৃতের ন্যায় বাংলাতেও আমরা সংযোজক শব্দ ব্যবহার না করিয়া দ্বন্দ্বসমাস ব্যবহার করি। আমরা বলি 'বিছানা বালিশ মশারি সঙ্গে নিয়ো'। যদি ভিন্ন শ্রেণীয় পদার্থের প্রসঙ্গ করিতে হয় তবে বলি 'বিছানা বালিশ মশারি আর বইয়ের বাক্সটা সঙ্গে নিয়ো'। এর মধ্যে 'এবং' কিংবা 'ও' কোথাও স্থান পায় না। কিন্তু পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার আইনকে আমল দেন নাই। আমি এই যে দৃষ্টান্তগুলি দেখাইতেছি তার মতলব এই যে, পণ্ডিতমশায় যদি সংস্কৃতরীতির

উপর ভর দিয়া বাংলারীতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তবে আমরাই বা কেন বাংলারীতির উপর ভর দিয়া যথাস্থানে সংস্কৃতরীতিকে লঙ্ঘন করিতে সংকোচ করি? 'মনোসাধে' আমাদের লজ্জা কিসের? 'সাবধানী' বলিয়া তখনি জিব কাটিতে যাই কেন? এবং 'আশ্চর্য হইলাম' বলিলে পণ্ডিতমশায় 'আশ্চর্যান্বিত হয়েন' কী কারণে?

আমি যে-কথাটা বলিতেছিলাম সে এই— যখন লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার অসামঞ্জস্য থাকে তখন স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই এই দুই ভাষার মধ্যে কেবলি সামঞ্জস্যের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইংরেজি-গদ্যসাহিত্যের প্রথম আরম্ভে অনেক দিন হইতেই এই চেষ্টা চলিতেছিল। আজ তার কথায় লেখায় সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই উভয়ে একটা সাম্যদশায় আসিয়াছে। আমাদের ভাষায় এই অসামঞ্জস্য প্রবল সুতরাং স্বভাব আপনি উভয়ের ভেদ ঘুচাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ আইনকর্তার প্রাদুর্ভাব হইল। তাঁরা বলিলেন লেখার ভাষা আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহার বেশি আর তার নড়িবার হুকুম নাই।

'সবুজ পত্র' সম্পাদক বলেন বেচারা পুঁথির ভাষার প্রাণ কাঁদিতেছে কথার ভাষার সঙ্গে মালা বদল করিবার জন্য। গুরুজন ইহার প্রতিবাদী। তিনি ঘটকালি করিয়া কৌলীন্যের নির্মম শাসন ভেদ করিবেন এবং শুভ বিবাহ ঘটাইয়া দিবেন— কারণ কথা আছে শুভস্য শীঘ্রং।

যাঁরা প্রতিবাদী তাঁরা এই বলিয়া তর্ক করেন যে, বাংলায় চলিত ভাষা নানা জিলায় নানা ছাঁচের, তবে কি বিদ্রোহীর দল একটা অরাজকতা ঘটাইবার চেষ্টায় আছে! ইহার উত্তর এই যে, যে যেমন খুশি আপন প্রাদেশিক ভাষায় পুঁথি লিখিবে, চলিত ভাষায় লিখিবার এমন অর্থ নয়। প্রথমত খুশিরও একটা কারণ থাকা চাই। কলিকাতার উপর রাগ করিয়া বীরভূমের লোক বীরভূমের প্রাদেশিক ভাষায় আপন বই লিখিবে এমন খুশিটাই তার স্বভাবত হইবে না। কোনো একজন পাগলের তা হইতেও পারে কিন্তু পনেরো-আনার তা হইবে না। দিকে দিকে বৃষ্টির বর্ষণ হয় কিন্তু জমির ঢাল অনুসারে একটা বিশেষ জায়গায় তার জলাশয় তৈরি হইয়া উঠে। ভাষারও সেই দশা। স্বাভাবিক কারণেই কলিকাতা অঞ্চলে একটা ভাষা জমিয়া উঠিয়াছে তাহা বাংলার সকল দেশের ভাষা। কলিকাতার একটা স্বকীয় অপভাষা আছে

যাহাতে 'গেন্থ' 'করন্থ' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় এবং 'ভেয়ের বে' (ভাইয়ের বিয়ে) 'চেলের দাম' (চালের দাম) প্রভৃতি অপভ্রংশ প্রচলিত আছে, এ সে ভাষাও নয়। যদি বলো— তবে এই ভাষাকে কে সুনির্দিষ্ট করিয়া দিবে? তবে তার উত্তর এই যে, যে-সকল লেখক এই ভাষা ব্যবহার করিবেন তাঁদের যদি প্রতিভা থাকে তবে তাঁরা তাঁদের সহজ শক্তি হইতেই বাংলার এই সর্বজনীন ভাষা বাহির করিবেন। দান্তে নিজের প্রতিভাবলে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন ইটালির কোন্ প্রাদেশিক ভাষা ইটালির সর্বদেশের সর্বকালের ভাষা। বাংলার কোন্ ভাষাটি সেইরূপ বাংলার বিশ্বভাষা কিছুকাল হইতে আপনিই তার প্রমাণ চলিতেছে। বঙ্কিমের কাল হইতে এ পর্যন্ত বাংলার গদ্য-সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষার প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে বলিয়া কথা উঠিয়াছে কিন্তু সে কোন্ প্রাদেশিক ভাষা? তাহা ঢাকা অঞ্চলের নহে। তাহা কোনো বিশেষ পশ্চিম বাংলা প্রদেশেরও নয়। তাহা বাংলার রাজধানীতে সকল প্রদেশের মথিত একটি ভাষা। সকল ভদ্র ইংরেজের এক ভাষা যেমন ইংলণ্ডের সকল প্রাদেশিক ভাষাকে ছাপাইয়া বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে, এ-ও সেইরূপ। এ ভাষা এখনো তেমন সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু সাহিত্যকে আশ্রয় করিলেই ইহার ব্যাপ্তির সীমা থাকিবে না। সমস্ত দেশের লোকের চিত্তের ঐক্যের পক্ষে কি ইহার কোনো প্রয়োজন নাই? শুধু কি পুঁথির ভাষার ঐক্যই একমাত্র ঐক্যবন্ধন? আর এ কথাও কি সত্য নয় যে, পুঁথির ভাষা আমাদের নিত্য ব্যবহারের ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তাহা কখনোই পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে পারে না? যখন বঙ্গবিভাগের বিভীষিকায় আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়াছিল তখন আমাদের ভয়ের একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে এটা রাজনৈতিক ভূগোলের ভাগ নয়, ভাষার ভাগকে আশ্রয় করিয়া বাংলার পূর্ব-পশ্চিমে একটা চিত্তের ভাগ হইবে। সমস্ত বাংলাদেশের একমাত্র রাজধানী থাকাতে সেইখানে সমস্ত বাংলাদেশের একটি সাধারণ ভাষা আপনি জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহা ফরমাশে গড়া কৃত্রিম ভাষা নহে, তাহা জীবনের সংঘাতে প্রাণলাভ করিয়া সেই প্রাণের নিয়মেই বাড়িতেছে। আমাদের পাকযন্ত্রে নানা খাদ্য আসিয়া রক্ত তৈরি হয়, তাহাকে বিশেষ করিয়া পাকযন্ত্রের রক্ত বলিয়া নিন্দা করা চলে না, তাহা সমস্ত দেহের রক্ত। রাজধানী জিনিসটা স্বভাবতই দেশের পাকযন্ত্র। এইখানে

নানা ভাব, নানা বাণী এবং নানা শক্তির পরিপাক ঘটিতে থাকে এবং এই উপায়ে সমস্ত দেশ প্রাণ পায় ও ঐক্য পায়। রাগ করিয়া এবং ঈর্ষা করিয়া যদি বলি প্রত্যেক প্রদেশ আপন স্বতন্ত্র পাকযন্ত্র বহন করুক তবে আমাদের হাত-পা বুক-পিঠ বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বলিতে পারে আমাদের নিজের নিজের একটা করিয়া পাকযন্ত্র চাই। কিন্তু যতই রাগ করি আর তর্ক করি, সত্যের কাছে হার মানিতেই হয় এবং সেইজন্যই সংস্কৃত বাংলা আপনার খোলস ভাঙিয়া যে-ছাঁদে ক্রমশ প্রাকৃত বাংলার রূপ ধরিয়া উঠিতেছে সে-ছাঁদ ঢাকা বা বীরভূমের নয়। তার কারণ নানা প্রদেশের বাঙালি শিখিতে, আয় করিতে, ব্যয় করিতে, আমোদ করিতে, কাজ করিতে অনেক কাল হইতে কলিকাতায় আসিয়া জমা হইতেছে। তাহাদের সকলের সম্মিলনে যে এক-ভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই উপায়ে, অন্য দেশে যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি এখানেও একটি বিশেষ ভাষা বাংলাদেশের সমস্ত ভদ্রঘরের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। ইহা কল্যাণের লক্ষণ। অবশ্য স্বভাবতই এই ভাষার ভূমিকা দক্ষিণ বাংলার ভাষায়। এইটুকু নম্রভাবে স্বীকার করিয়া না লওয়া সদ্‌-বিবেচনার কাজ নহে। ঢাকাতেই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চয়ই ঢাকার লোকভাষার উপর আমাদের সাধারণ ভাষার পত্তন হইত এবং তা লইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা যদি মুখ বাঁকা করিত তবে সে বক্রতা আপনিই সিধা হইয়া যাইত, মানভঞ্জনের জন্য অধিক সাধাসাধি করিতে হইত না।

এই যে বাংলাদেশের এক-ভাষা, আজকের দিনে যাহা অবাস্তব নহে, অথচ যাহাকে সাহিত্যে ব্যবহার করি না বলিয়া যাহার পরিচয় আমাদের কাছে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় নাই, যখনি শক্তিশালী সাহিত্যিকেরা এই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবেন তখনি ইহা পরিব্যক্ত হইয়া উঠিবে, সেটাতে কেবল ভাষার উন্নতি নয়, দেশের কল্যাণ।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটা যে তর্ক আছে সেটা একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা বাংলা-সাহিত্যে আজ যে-ভাষা ব্যবহার করিতেছি তার একটা বাঁধন পাকা হইয়া গেছে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই বাঁধনের প্রয়োজন আছে। নহিলে সাহিত্যে সংযম থাকে না। আবার শক্তি যাদের অল্প

অসংযম তাদেরই বেশি। অতএব আমাদের যে চল্‌তি ভাষাকে সাহিত্যে নূতন করিয়া চালাইবার কথা উঠিয়াছে, তাহার আদব-কায়দা এখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই। অতএব এ ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। বস্তুত বর্তমানে এই চল্‌তি ভাষার লেখা, পুঁথির ভাষার লেখার চেয়ে অনেক শক্ত। বিধাতার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য থাকিবেই, এইজন্য ভদ্রতা সকলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তাই অন্তত প্রথাগত ভদ্রতার বিধি যদি পাকা না হয় তবে সমাজ অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া ওঠে। 'সবুজ পত্র'-সম্পাদকের শাসনে আজকের দিনে বাংলাদেশের সকল লেখকই যদি চল্‌তি ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু করিয়া দেয় তবে সর্বপ্রথমে তাঁকেই কানে হাত দিয়া দেশছাড়া হইতে হইবে এ কথা আমি লিখিয়া দিতে পারি। অতএব সুখের বিষয় এই যে, এখনি এই দুর্যোগের সম্ভাবনা নাই। নূতনকে যারা বহন করিয়া আনে তারা যেমন বিধাতার সৈনিক, নূতনের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধরিয়া খাড়া হইয়া উঠে তারাও তেমনি বিধাতারই সৈন্য। কেননা প্রথমেই বিধানের সঙ্গে লড়াই করিয়া নূতনকে আপন রাজ্য গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু যতদিনে তার আপন বিধান পাকা না হইয়া উঠে ততদিনের অরাজকতা সামলাইবে কে?

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে সাহিত্যে আমরা যে-ভাষা ব্যবহার করি ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়। তার প্রধান কারণ সাহিত্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে এবং তাহা সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরস করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রধানত নিত্যতার ক্ষেত্র। অতএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে সাজাইতে এবং বাজাইতে হয়। এইজন্যই স্বভাবতই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ এবং বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আমার কথা এই, প্রতিদিনের যে-ভাষার খাদে আমাদের জীবনস্রোত বহিতে থাকে, সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে যত দূরে পড়ে ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে। চির-প্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইলে তাহাকে এক দিকে সাধারণ, আর-এক দিকে বিশিষ্ট হইতে হইবে। সাহিত্যের বিশিষ্টতা তার সাধারণতাকে যখন ছাড়িয়া চলে তখন তার বিলাসিতা তার শক্তি ক্ষয় করে। সকল দেশের সাহিত্যেরই

সেই বিপদ। সকল দেশেই বিশিষ্টতার বিলাসে ক্ষণে ক্ষণে সাহিত্য কৃত্রিমতার বন্ধ্যাদশায় গিয়া উত্তীর্ণ হয়। তখন তাহাকে আবার কুলরক্ষার লোভ ছাড়িয়া প্রাণরক্ষার দিকে ঝোঁক দিতে হয়। সেই প্রাণের খোরাক কোথায়? সাধারণের ভাষার মধ্যে, যেখানে বিশ্বের প্রাণ আপনাকে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রকাশ করিতেছে। ইংরেজি সাহিত্যিক ভাষা প্রথমে পণ্ডিতের ভাষা ল্যাটিন এবং রাজভাষা ফরাসির একটা কৌলীন্য খিচুড়ি ছিল, তার পরে কুল ছাড়িয়া যখন সে সাধারণের ঘরে আশ্রয় লইল তখনি সে ধ্রুব হইল। কিন্তু তার পরেও বারে বারে সে কৃত্রিমতার দিকে ঝুঁকিয়াছে। আবার তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাধারণের জাতে উঠিতে হইয়াছে। এমন-কি বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যেও সাধারণের পথে সাহিত্যের এই অভিসার দেখিতে পাই। বার্নার্ড্ শ, ওয়েল্‌স্, বেনেট্, চেস্টরটন্, বেলক প্রভৃতি আধুনিক লেখকগুলি হালকা চালের ভাষায় লিখিতেছেন।

আমাদের সাহিত্য যে-ভাষাবিশিষ্টতার দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে সেখান হইতে তাহাকে লোকালয়ের ভাষার মধ্যে নামাইয়া আনিবার জন্য 'সবুজ পত্র'-সম্পাদক কোমর বাঁধিয়াছেন। তাঁর মত এই যে, সাহিত্য পদার্থটি আকারে সাধারণ এবং প্রকারে বিশিষ্ট—এই হইলেই সত্য হয়। এ কথা মানি। কিন্তু হিন্দুস্থানীতে একটা কথা আছে 'পয়লা সামাল্‌না মুশকিল হ্যায়।' স্বয়ং বিধাতাও মানুষ গড়িবার গোড়ায় বানর গড়িয়াছেন, এখনো তাঁর সেই আদিম সৃষ্টির অভ্যাস লোকালয়ে সদাসর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতন
চৈত্র ১৩২৩

ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ মুখস্থ করিতে গিয়াই বাঙালি ছেলের প্রাণ বাহির হইয়া যায়। প্রথমত ইংরেজি অক্ষরের নাম একরকম, তাহার কাজ আর-এক রকম। অক্ষর দুটি যখন আলাদা হইয়া থাকে তখন তাহারা এ বি, কিন্তু একত্র হইলেই তাহারা অ্যাব্‌ হইয়া যাইবে, ইহা কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। এদিকে u-কে মুখে বলিব ইউ, কিন্তু up-এর মুখে যখন থাকেন তখন তিনি কোনো পুরুষে ইউ নন। ও পিসি এদিকে এসো, এই শব্দগুলো ইংরেজিতে লিখিতে হইলে উচিতমত লেখা উচিত— O pc adk so। পিসি যদি বলেন এসেচি, তবে লেখো She ; আর পিসি যদি বলেন এইচি, তবে আরো সংক্ষেপ— he। কিন্তু কোনো ইংরেজের পিসির সাধ্য নাই এরূপ বানান বুঝিয়া উঠে। আমাদের কখগঘ-র কোনো বালাই নাই ; তাহাদের কথায় নড়চড় হয় না।

এই তো গেল প্রথম নম্বর। তার পরে আবার এক অক্ষরের পাঁচ রকম উচ্চারণ। অনেক কষ্টে যখন বি এ=বে, সি এ=কে মুখস্থ হইয়াছে, তখন শুনা গেল, বি এ বি=ব্যাব্‌, সি এ বি=ক্যাব্‌। তাও যখন মুখস্থ হইল তখন শুনি বি এ আর=বার্‌, সি এ আর=কার্‌। তাও যদি বা আয়ত্ত হইল তখন শুনি, বি এ ডব্‌ল্‌-এল্‌=বল্‌, সি এ ডব্‌ল্‌-এল্‌=কল্‌। এই অকূল বানান-পাথারের মধ্যে গুরুমহাশয় যে আমাদের কর্ণ ধরিয়া চালনা করেন, তাঁহার কম্পাসই বা কোথায়, তাঁহার ধ্রুবতারাই বা কোথায়।

আবার এক-এক জায়গায় অক্ষর আছে অথচ তাহার উচ্চারণ নাই ; একটা কেন, এমন পাঁচটা অক্ষর সারি সারি বেকার দাঁড়াইয়া আছে, বাঙালির ছেলের মাথার পীড়া ও অম্লরোগ জন্মাইয়া দেওয়া ছাড়া তাহাদের আর-কোনো সাধু উদ্দেশ্যই দেখা যায় না। মাস্টারমশায় psalm শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিলে কিরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তাহা আজও কি ভুলিতে পারিয়াছি। পেয়ারার মধ্যে যেমন অনেকগুলো বীজ কেবলমাত্র খাদকের পেটকামড়ানির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিরাজ করে, তেমনি ইংরেজি শব্দের উদর পরিপূর্ণ করিয়া অনেকগুলি অক্ষর কেবল রোগের বীজস্বরূপে থাকে মাত্র। বাংলায় এ উপদ্রব নাই। কেবল একটিমাত্র শব্দের মধ্যে একটা দুষ্ট অক্ষর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে

প্রবেশ করিয়াছে, তীক্ষ্ণ সঙিন ঘাড়ে করিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখাইতেছে, সেটা আর কেহ নয়— গবর্ণমেণ্ট শব্দের মূর্ধন্য ণ। ওটা বিদেশের আমদানি নতুন আসিয়াছে, বেলা থাকিতে ওটাকে বিদায় করা ভালো।

ইংরেজের কামান আছে, বন্দুক আছে, কিন্তু ছাব্বিশটা অক্ষরই কী কম! ইহারা আমাদের ছেলেদের পাকযন্ত্রের মধ্যে গিয়া আক্রমণ করিতেছে। ইংরেজের প্রজা বশীভূত করিবার এমন উপায় অতি অল্পই আছে। বাল্যকাল হইতেই একে একে আমাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয়; আমাদের বাহুর বল, চোখের দৃষ্টি, উদরের পরিপাকশক্তি বিদায়গ্রহণ করে; তার পরে ম্যালেরিয়া-কম্পিত হাত হইতে অস্ত্র ছিনাইয়া লওয়াই বাহুল্য। আইন ইংরেজ-রাজ্যের সর্বত্র আছে (রক্ষা হউক আর না-ই হউক), কিন্তু ইংরেজের ফাস্টবুক-এ নাই। যখন বর্গির উপদ্রব ছিল তখন বর্গির ভয় দেখাইয়া ছেলেদের ঘুম পাড়াইত— কিন্তু ছেলেদের পক্ষে বর্গির অপেক্ষা ইংরেজি ছাব্বিশটা অক্ষর যে বেশি ভয়ানক, সে বিষয়ে কাহারো দ্বিমত হইতে পারে না। ঘুমপাড়ানী গান নিম্নলিখিত মতে বদল করিলে সংগত হয়; ইহাতে আজকালকার বাঙালির ছেলেও ঘুমাইবে, বর্গির ছেলেও ঘুমাইবে:

ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল
ফাস্টবুক এল দেশে—
বানান-ভুলে মাথা খেয়েছে
একজামিন দেবো কিসে।

পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল আমাদের বাংলা-অক্ষর উচ্চারণে কোনো গোলযোগ নাই। কেবল তিনটে স, দুটো ন ও দুটো জ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এই তিনটে স-এর হাত এড়াইবার জন্যই পরীক্ষার পূর্বে পণ্ডিতমশায় ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, "দেখো বাপু, 'সুশীতল সমীরণ' লিখতে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় তো লিখে দিয়ো 'ঠাণ্ডা হাওয়া'।" এ ছাড়া দুটো ব-এর মধ্যে একটা ব কোনো কাজে লাগে না। ঋ৯ঙঞ-গুলো কেবল সঙ সাজিয়া আছে। চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়। সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় দীর্ঘহ্রস্ব স্বর। কিন্তু বর্ণমালার মধ্যে যতই গোলযোগ থাক্-না কেন, আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোনো অনিয়ম নাই, এইরূপ আমার ধারণা ছিল।

ইংলণ্ডে থাকিতে আমার একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার সময় আমার চৈতন্য হইল, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সমূলক নয়।[১]

এ বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বাংলাদেশের নানা স্থানে নানা প্রকার উচ্চারণের ভঙ্গি আছে। কলিকাতা-অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার।

হরি শব্দে আমরা হ যেরূপ উচ্চারণ করি, হয় শব্দে হ সেরূপ উচ্চারণ করি না। দেখা শব্দের একার একরূপ এবং দেখি শব্দের একার আর-একরূপ। পবন শব্দে প অকারান্ত, ব ওকারান্ত, ন হসন্ত শব্দ। শ্বাস শব্দের শ্ব-র উচ্চারণ বিশুদ্ধ শ-এর মতো, কিন্তু বিশ্বাস শব্দের শ্ব-এর উচ্চারণ শ্‌শ-এর ন্যায়। 'ব্যয়' লিখি কিন্তু পড়ি— ব্যায়। অথচ অব্যয় শব্দে ব্য-এর উচ্চারণ ব্ব-এর মতো। আমরা লিখি গর্দভ, পড়ি— গর্দোব। লিখি 'সহ্য', পড়ি— সোজ্‌ঝো। এমন কত লিখিব।

আমরা বলি আমাদের তিনটে স-এর উচ্চারণের কোনো তফাত নাই, বাংলায় সকল স-ই তালব্য শ-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়; কিন্তু আমাদের যুক্ত-অক্ষর উচ্চারণে এ কথা খাটে না। তার সাক্ষ্য দেখো কষ্ট শব্দ এবং ব্যস্ত শব্দের দুই শ-এর উচ্চারণের প্রভেদ আছে। প্রথমটি তালব্য শ, দ্বিতীয়টি দন্ত্য স। 'আসতে হবে' এবং 'আশ্চর্য' এই উভয় পদে দন্ত্য স ও তালব্য শ-এর প্রভেদ রাখা হইয়াছে। জ-এর উচ্চারণ কোথাও বা ইংরেজি z-এর মতো হয়, যেমন লুচি ভাজতে হবে, এ স্থলে ভাজতে শব্দের জ ইংরেজি z-এর মতো।

সচরাচর আমাদের ভাষায় অন্তঃস্থ ব-এর আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু জিহ্বা অথবা আহ্বান শব্দে অন্তঃস্থ ব ব্যবহৃত হয়।

আমরা লিখি 'তাঁহারা' কিন্তু উচ্চারণ করি— তাহাঁরা অথবা তাঁহাঁরা। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

বাংলা ভাষায় এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল, তখন আমার জানিতে কৌতূহল হইল, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কি না। আমার কাছে তখন খান-দুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি উদাহরণ সঞ্চিত হইল, তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা

১ দ্রষ্টব্য জীবনস্মৃতি, 'লোকেন পালিত' অধ্যায়

করিতে লাগিলাম। এই-সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পুরিয়া গিয়াছিল। যখন দেশে আসিলাম তখন এই কাগজগুলি আমার সঙ্গে ছিল। একটি চামড়ার বাক্সে সেগুলি রাখিয়া আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলাম। দুই বৎসর হইল, একদিন সকালবেলায় ধুলা ঝাড়িয়া বাক্সটি খুলিলাম, ভিতরে চাহিয়া দেখি— গোটাদশেক হলদে রঙ-করা মস্ত-খোঁপাবিশিষ্ট মাটির পুতুল তাহাদের হস্তদ্বয়ের অসম্পূর্ণতা ও পদদ্বয়ের সম্পূর্ণ অভাব লইয়া অম্লান বদনে আমার বাক্সর মধ্যে অন্তঃপুর রচনা করিয়া বসিয়া আছে। আমার কাগজপত্র কোথায়। কোথাও নাই। একটি বালিকা আমার হিজিবিজি কাগজগুলি বিষম ঘৃণাভরে ফেলিয়া দিয়া বাক্সটির মধ্যে পরম সমাদরে তাহার পুতুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহাদের বিছানাপত্র, তাহাদের কাপড়চোপড়, তাহাদের ঘটিবাটি, তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামান্যতম উপকরণটুকু পর্যন্ত কিছুরই ত্রুটি দেখিলাম না, কেবল আমার কাগজগুলিই নাই। বুড়ার খেলা বুড়ার পুতুলের জায়গা ছেলের খেলা ছেলের পুতুল অধিকার করিয়া বসিল। প্রত্যেক বৈয়াকরণের ঘরে এমনই একটি করিয়া মেয়ে থাকে যদি, পৃথিবী হইতে সে যদি তদ্ধিত প্রত্যয় ঘুচাইয়া তাহার স্থানে এইরূপ ঘোরতর পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে পারে, তবে শিশুদের পক্ষে পৃথিবী অনেকটা নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।

কিছু কিছু মনে আছে, তাহা লিখিতেছি। অ কিংবা অকারান্ত বর্ণ উচ্চারণ-কালে মাঝে মাঝে ও কিংবা ওকারান্ত হইয়া যায়। যেমন :

অতি কল্‌ ঘড়ি কল্য মরু দক্ষ ইত্যাদি। এরূপ স্থানে অ যে ও হইয়া যায়, তাহাকে হ্রস্ব-ও বলিলেও হয়।

দেখা গিয়াছে অ কেবল স্থানবিশেষেই ও হইয়া যায়, সুতরাং ইহার একটা নিয়ম পাওয়া যায়।

১ম নিয়ম। ই (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) অথবা উ (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) কিংবা ইকারান্ত উকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ববর্তী অকারের উচ্চারণ 'ও' হইবে ; যথা, অগ্নি অগ্রিম কপি তরু অঙ্গুলি অধুনা হনু ইত্যাদি।

২য়। যফলা-বিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে 'অ' 'ও' হইয়া যাইবে। এ-নিয়ম প্রথম নিয়মের অন্তর্গত বলিলেও হয়, কারণ যফলা ই এবং অ-এর যোগ-মাত্র। উদাহরণ, গণ্য দস্ত্য লভ্য ইত্যাদি। 'দন্ত' এবং 'দন্ত্য ন' এই দুই শব্দের উচ্চারণের প্রভেদ লক্ষ করিয়া দেখো।

৩য়। ক্ষ পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হইয়া যায়; যথা, অক্ষয় কক্ষ পক্ষ লক্ষ ইত্যাদি। ক্ষ-র উচ্চারণ বোধ করি এককালে কতকটা ইকার-ঘেঁষা ছিল, তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। পূর্ববঙ্গের লোকেরা এই ক্ষ-র সঙ্গে যফলা যোগ করিয়া উচ্চারণ করেন, এমন-কি, ক্ষ-র পূর্বেও ঈষৎ ইকারের আভাস দেন। কলিকাতা অঞ্চলে 'লক্ষ টাকা' বলে, তাঁহারা বলেন 'লৈক্ষ্য টাকা'।

৪র্থ। ক্রিয়াপদে স্থলবিশেষে অকারের উচ্চারণ 'ও' হইয়া যায়; যেমন, হ'লে ক'রলে প'ল ম'ল ইত্যাদি। অর্থাৎ যদি কোনো স্থলে অ-এর পরবর্তী ই অপভ্রংশে লোপ হইয়া থাকে, তথাপিও পূর্ববর্তী অ-এর উচ্চারণ ও হইবে। হইলে-র অপভ্রংশ হ'লে, করিলে-র অপভ্রংশ ক'রলে, পড়িল—প'ল, মরিল—ম'ল। করিয়া-র অপভ্রংশ ক'রে, এইজন্য ক-এ ওকার যোগ হয়, কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া 'করে' অবিকৃত থাকে। কারণ করে শব্দের মধ্যে ই নাই এবং ছিল না।

৫ম। ঋফলা-বিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্বের অকার 'ও' হয়; যথা, কর্তৃক ভর্তৃ মসৃণ যকৃৎ বক্তৃতা ইত্যাদি। ইহার কারণ স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে, বঙ্গভাষায় ঋফলার উচ্চারণের সহিত ইকারের যোগ আছে।

৬ষ্ঠ। এবারে যে-নিয়মের উল্লেখ করিতেছি তাহা নিয়ম কি নিয়মের ব্যতিক্রম বুঝা যায় না। দ্ব্যক্ষর-বিশিষ্ট শব্দে দন্ত্য ন অথবা মূর্ধন্য ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অকার 'ও' হইয়া যায়; যথা, বন ধন জন মন মণ পণ ক্ষণ। ঘন শব্দের উচ্চারণের স্থিরতা নাই। কেহ বলেন 'ঘনো দুধ', কেহ বলেন 'ঘোনো দুধ'। কেবল গণ এবং রণ শব্দ এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না। তিন অথবা তাহার বেশি অক্ষরের শব্দে এই নিয়ম খাটে না; যেমন, কনক গণক সন্‌সন্‌ কন্‌কন্‌। তিন অক্ষরের অপভ্রংশে যেখানে দুই অক্ষর হইয়াছে সেখানেও এ-নিয়ম খাটে না; যেমন, কহেন শব্দের অপভ্রংশ ক'ন, হয়েন শব্দের অপভ্রংশ হ'ন ইত্যাদি। যাহা হউক ষষ্ঠ নিয়মটা তেমন পাকা নহে।

৭ম। ৪র্থ নিয়মে বলিয়াছি অপভ্রংশে ইকারের লোপ হইলেও পূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হইয়াছে। অপভ্রংশে উকারের লোপ হইলেও পূর্ববর্তী অ উচ্চারণস্থলে ও হইবে; যথা, হউন—হ'ন, রহুন—র'ন, কহুন—ক'ন ইত্যাদি।

৮ম। রফলা-বিশিষ্ট বর্ণের সহিত অ লিপ্ত থাকিলে তাহা 'ও' হইয়া যায়; যথা, শ্রবণ ভ্রম ভ্রমণ ব্রজ গ্রহ ত্রস্ত প্রমাণ প্রতাপ ইত্যাদি। কিন্তু র পরে থাকিলে অ-এর বিকার হয় না; যথা, ক্রয় ত্রয় শ্রয়।

দুয়েকটি ছাড়া যতগুলি নিয়ম উপরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝাইতেছে ই কিংবা উ-এর পূর্বে অ-এর উচ্চারণ 'ও' হইয়া যায়। এমন-কি, ইকার উকার অপভ্রংশে লোপ হইলেও এ-নিয়ম খাটে। এমন-কি, যফলা ও ঋফলায় ইকারের সংস্রব আছে বলিয়া তাহার পূর্বেও অ-এর বিকার হয়। ইকারের পক্ষে যেমন যফলা, উকারের পক্ষে তেমনই বফলা— উ-এ অ-এ মিলিয়া বফলা হয়; অতএব আমাদের নিয়মানুসারে বফলার পূর্বেও অকারের বিকার হওয়া উচিত। কিন্তু বফলার উদাহরণ অধিক সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু যে দুই-তিনটি মনে আসিতেছে তাহাতে আমাদের কথা খাটে; যথা, অন্বেষণ ধন্বন্তরি মন্বন্তর।

এইখানে গুটিকতক ব্যতিক্রমের কথা বলা আবশ্যক। ই উ যফলা ঋফলা ক্ষ পরে থাকিলেও অভাবার্থসূচক অ-এর বিকার হয় না; যথা, অকিঞ্চন অকুতোভয় অখ্যাতি অনৃত অক্ষয়।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি নিয়ম মানে না, অর্থাৎ ই উ যফলা ঋফলা ইত্যাদি পরে না থাকা সত্ত্বেও ইহাদের আদ্যক্ষরবর্তী অ 'ও' হইয়া যায়; মন্দ মন্ত্র মন্ত্রণা নথ মঙ্গল ব্রহ্ম।

আমি এই প্রবন্ধে কেবল আদ্যক্ষরবর্তী অকার উচ্চারণের নিয়ম লিখিলাম। মধ্যাক্ষর বা শেষাক্ষরের নিয়ম অবধারণের অবসর পাই নাই। মধ্যাক্ষরে যে প্রথম অক্ষরের নিয়ম খাটে না, তাহা একটা উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে। বল শব্দে ব-এর সহিত সংযুক্ত অকারের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু কেবল শব্দের ব-এ হ্রস্ব ওকার লাগে। ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের নিয়মও সময়াভাবে বাহির করিতে পারি নাই। সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া দেওয়াই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যদি কোনো অধ্যবসায়ী পাঠক রীতিমত অন্বেষণ করিয়া এই-সকল নিয়ম নির্ধারণ করিতে পারেন, তবে আমাদের বাংলা ব্যাকরণের একটি অভাব দূর হইয়া যায়।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।

বাংলা ব্যাকরণের অভাব আছে, ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

আশ্বিন ১২৯২

স্বরবর্ণ অ

বাংলা শব্দ উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পাওয়া যায়, পূর্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহারই অনুবৃত্তিক্রমে আরো কিছু বলিবার আছে, তাহা এই প্রবন্ধে অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি। কিয়ৎপরিমাণে পুনরুক্তি পাঠকদিগকে মার্জনা করিতে হইবে।

বাংলায় প্রধানত ই এবং উ এই দুই স্বরবর্ণের প্রভাবেই অন্য স্বরবর্ণের উচ্চারণ-বিকার ঘটিয়া থাকে।

গত এবং গতি এই দুই শব্দের উচ্চারণভেদ বিচার করিলে দেখা যাইবে, গত শব্দের গ-এ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই, কিন্তু ইকার পরে থাকাতে গতি শব্দের গ-এ ওকার সংযোগ হইয়াছে। কণা এবং কণিকা, ফণা এবং ফণী, স্থল এবং স্থলী তুলনা করিয়া দেখো।

উকার পরে থাকিলেও প্রথম অক্ষরবর্তী স্বরবর্ণের এইরূপ বিকার ঘটে। কল এবং কলু, সর এবং সরু, বট এবং বটু তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথার প্রমাণ হইবে।

পরবর্তী বর্ণে যফলা থাকিলে পূর্ববর্তী প্রথম অক্ষরের অকার পরিবর্তিত হয়। গণ এবং গণ্য, কল এবং কল্য, পথ এবং পথ্য তুলনা করিলে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। ফলত যফলা— ইকার এবং অকারের সংযোগমাত্র, অতএব ইহাকেও পূর্বনিয়মের অন্তর্গত করা যাইতে পারে।[১]

ঋফলা-বিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্বের অকার 'ও' হয়। এ সম্বন্ধে কর্তা এবং কর্তৃ, ভর্তা এবং ভর্তৃ, বক্তা এবং বক্তৃতা তুলনাস্থলে আনা যায়। কিন্তু বাংলায় ঋফলা উচ্চারণে ই-কার যোগ করা হয়, অতএব ইহাকেও পূর্বনিয়মের শাখাস্বরূপে গণ্য করিলে দোষ হয় না।[২]

১ যফলা যেমন ই এবং অ-র সংযোগ, বফলা তেমনই উ এবং অ-র সংযোগ, অতএব তৎসম্বন্ধেও বোধ করি পূর্বনিয়ম খাটে। কিন্তু বফলার উদাহরণ অধিক পাওয়া যায় না, যে দুয়েকটি মনে পড়িতেছে তাহাতে আমাদের কথা সপ্রমাণ হইতেছে; যথা, অন্বেষণ ধন্বন্তরি মন্বন্তর। কজ্জল সত্ত্ব প্রভৃতি শব্দে প্রথম অক্ষর এবং বফলার মধ্যে দুই অক্ষর পড়াতে ইহাকে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যায় না।

২ মহারাষ্ট্রীয়েরা ঋ উচ্চারণে উকারের আভাস দিয়া থাকেন। আমরা প্রকৃতি-কে কতকটা প্রক্রিতি বলি, তাঁহারা লঘু উকার যোগ করিয়া বলেন প্রক্রুতি।

অপভ্রংশে পরবর্তী ই অথবা উ লোপ হইলেও উক্ত নিয়ম বলবান থাকে; যেমন হইল শব্দের অপভ্রংশে হ'ল, হউন শব্দের অপভ্রংশে হ'ন (কিন্তু, হয়েন শব্দের অপভ্রংশ বিশুদ্ধ 'হ'ন' উচ্চারণ হয়)। খলিয়া শব্দের অপভ্রংশে খলে, টকুয়া শব্দের অপভ্রংশে ট'কো (অম্ল)।

ক্ষ-র পূর্বেও অ ও হইয়া যায়; যেমন, কক্ষ পক্ষ লক্ষ। ক্ষ-শব্দের উচ্চারণ বোধ করি এককালে ইকার-ঘেঁষা ছিল, তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। এখনো পূর্ববঙ্গের লোকেরা ক্ষ-র সঙ্গে যফলা যোগ করেন; এবং তাঁহাদের দেশের যফলা উচ্চারণের প্রচলিত প্রথানুসারে পূর্ববর্তী বর্ণে ঐকার যোগ করিয়া দেন; যেমন, তাঁহারা লক্ষ টাকা-কে বলেন—লৈক্ষ্য টাকা।

যাহা হউক, মোটের উপর এই নিয়মটিকে পাকা নিয়ম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যে দুই-একটা ব্যতিক্রম আছে, পূর্বে অন্যত্র তাহা প্রকাশিত হওয়াতে এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

দেখা যাইতেছে ও-স্বরবর্ণের প্রতি বাংলা উচ্চারণের কিছু বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রথমত, আমরা সংস্কৃত অ-র বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। আমাদের অ, সংস্কৃত অ এবং ও-র মধ্যবর্তী। তাহার পরে আবার সামান্য ছুতা পাইলেই আমাদের অ সম্পূর্ণ ও হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি স্বরবর্ণ আছে যাহাকে সন্ধিস্বর বলা যাইতে পারে; যেমন, অ এবং উ-র মধ্যপথে— ও, অ এবং ই-র সেতুস্বরূপ— এ; যখন এক পক্ষে ই অথবা এ এবং অপর পক্ষে আ, তখন অ্যা তাহাদের মধ্যে বিরোধভঞ্জন করে। বোধ হয় ভালো করিয়া সন্ধান করিলে দেখা যাইবে, বাঙালিরা উচ্চারণ কালে এই সহজ সন্ধিস্বরগুলির প্রতিই বিশেষ মমত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে।

আষাঢ় ১২৯৯

স্বরবর্ণ এ

বাংলায় 'এ' স্বরবর্ণ আদ্যক্ষরস্বরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহার দুই প্রকার উচ্চারণ দেখা যায়। একটি বিশুদ্ধ এ, আর-একটি অ্যা। এক এবং একুশ শব্দে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একারের বিকৃত উচ্চারণ বাংলায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়; কেবল এ সম্বন্ধে একটি পাকা নিয়ম খুব দৃঢ় করিয়া বলা যায়।— পরে ইকার অথবা উকার থাকিলে তৎপূর্ববর্তী একারের কখনোই বিকৃতি হয় না। জেঠা এবং জেঠী, বেটা এবং বেটী, একা এবং একটু— তুলনা করিয়া দেখিলে ইহার প্রমাণ হইবে। এ নিয়মের একটিও ব্যতিক্রম আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

কিন্তু একারের বিকার কোথায় হইবে তাহার একটা নিশ্চিত নিয়ম বাহির করা এমন সহজ নহে; অনেক স্থলে দেখা যায় অবিকল একইরূপ প্রয়োগে 'এ' কোথাও বা বিকৃত কোথাও বা অবিকৃত ভাবে আছে; যথা, তেলা (তৈলাক্ত) এবং বেলা (সময়)।

প্রথমে দেখা যাক, পরে অকারান্ত অথবা বিসর্গ শব্দ থাকিলে পূর্ববর্তী এ-কারের কিরূপ অবস্থা হয়।

অধিকাংশ স্থলেই কোনো পরিবর্তন হয় না; যথা, কেশ বেশ পেট হেঁট বেল তেল তেজ শেজ খেদ বেদ প্রেম হেম ইত্যাদি।

কিন্তু দন্ত্য ন-এর পূর্বে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়; যথা, ফেন (ভাতের) সেন (পদবী) কেন যেন হেন। মূর্ধন্য ণ-এর পূর্বেও সম্ভবত এই নিয়ম খাটে, কিন্তু প্রচলিত বাংলায় তাহার কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। একটা কেবল উল্লেখ করি, কেহ কেহ দিনক্ষণ-কে দিনখ্যান বলিয়া থাকেন। এইখানে পাঠকদিগকে বলিয়া রাখি, ন অক্ষর যে কেবল একারকে আক্রমণ করে তাহা নহে, অকারের প্রতিও তাহার বক্রদৃষ্টি আছে— বন মন ধন জন প্রভৃতি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, উক্ত শব্দগুলিতে আদ্যক্ষরযুক্ত অকারের বিকৃতি ঘটিয়াছে। বট মঠ জল প্রভৃতি শব্দের প্রথমাক্ষরের সহিত তুলনা করিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

আমার বিশ্বাস, পরবর্তী চ অক্ষরও এইরূপ বিকারজনক। কিন্তু কথা বড়ো বেশি পাওয়া যায় না। একটা কথা আছে— প্যাচ। কিন্তু সেটা যে পেঁচ-

শব্দ হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে, এমন অনুমান করিবার কোনো কারণ নাই। আর-একটা বলা যায়— ট্যাচ। 'ট্যাচ' করিয়া দেওয়া। এ শব্দ সম্বন্ধেও পূর্বকথা খাটে। অতএব এটাকে নিয়ম বলিয়া মানিতে পারি না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী পাঠকেরা কাল্পনিক শব্দবিন্যাস দ্বারা চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, চ-এর পূর্বে বিশুদ্ধ এ-কার উচ্চারণ জিহ্বার পক্ষে কেমন সহজ বোধ হয় না। এখানে বলা আবশ্যক, আমি দুই অক্ষরের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি।

পূর্বনিয়মের দুটো-একটা ব্যতিক্রম আছে। কোনো পাঠক যদি তাহার কারণ বাহির করিতে পারেন তো সুখী হইব। এদিকে 'ভেক' উচ্চারণে কোনো গোলযোগ নাই, অথচ 'এক' শব্দ উচ্চারণে 'এ'স্বর বিকৃত হইয়াছে। আর-একটা ব্যতিক্রম— লেজ (লাঙ্গুল)। তেজ শব্দের একার বিশুদ্ধ, লেজ শব্দের একার বিকৃত।

বাংলায় দুই শ্রেণীর শব্দদ্বিগুণীকরণ প্রথা প্রচলিত আছে :

১। বিশেষণ ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ ; যথা, বড়ো-বড়ো ছোটো-ছোটো বাঁকা-বাঁকা নেচে-নেচে গেয়ে-গেয়ে হেসে-হেসে ইত্যাদি।

২। শব্দানুকরণমূলক বর্ণনাসূচক ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা, প্যাটপ্যাট টাঁটাঁ খিট-খিট ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিগুণীকরণের স্থলে পাঠক কুত্রাপিও আদ্যক্ষরে একার সংযোগ দেখিতে পাইবেন না। গাঁগাঁ গোঁগোঁ চীঁচীঁ চ্যাঁচ্যাঁ টুকটুক পাইবেন, কিন্তু গেঁগেঁ চেঁচেঁ কোথাও নাই। কেবল নিতান্ত যেখানে শব্দের অবিকল অনুকরণ সেইখানেই দৈবাৎ একারের সংস্রব পাওয়া যায়, যথা, ঘেউঘেউ। এইরূপ স্থলে অ্যাকারের প্রাদুর্ভাবটাই কিছু বেশি ; যথা, ফ্যাঁসফ্যাঁস থ্যাকথ্যাক স্যাঁৎস্যাঁৎ ম্যাড়ম্যাড়।

এই শব্দগুলিকে বিশেষণে পরিণত করিলে দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমে অ্যাকারের পরিবর্তে একার সংযুক্ত হয় ; যথা, স্যাঁৎসেঁতে ম্যাড়মেড়ে। তাহার কারণ পূর্বেই আভাস দিয়াছি। স্যাঁৎসেঁতিয়া হইতে স্যাঁৎসেঁতে হইয়াছে। বলা হইয়াছে ইকারের পূর্বে 'এ' উচ্চারণ বলবান থাকে।

ক্রিয়াপদজাত বিশেষ্য শব্দের একারের উচ্চারণ সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম সন্ধান করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখো, খেলা এবং গেলা (গলাধঃকরণ); ইহাদের প্রথমাক্ষরবর্তী একারের উচ্চারণভেদ দেখা যায়। প্রথমটি খ্যালা, দ্বিতীয়টি গেলা।

আমি স্থির করিলাম— সংস্কৃত মূলশব্দের ইকারের অপভ্রংশ বাংলায় যেখানে 'এ' হয় সেখানে বিশুদ্ধ 'এ' উচ্চারণ থাকে। খেলন হইতে খেলা, কিন্তু গিলন হইতে গেলা— এইজন্য শেষোক্ত এ অবিকৃত আছে। ইহার পোষক আরো অনেকগুলি প্রমাণ পাওয়া গেল ; যেমন, মিলন হইতে মেলা (মিলিত হওয়া), মিশ্রণ হইতে মেশা, চিহ্ন হইতে চেনা ইত্যাদি।

ইহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখিলাম, বিক্রয় হইতে বেচা (ব্যাচা), সিঞ্চন হইতে সেঁচা (স্যাঁচা), চীৎকার হইতে চেঁচানো (চ্যাঁচানো)।

তখন আমার পূর্বসন্দেহ দৃঢ় হইল যে, চ অক্ষরের পূর্বে একার উচ্চারণের বিকার ঘটে। এইজন্যই চ-এর পূর্বে আমার এই শেষ নিয়মটি খাটিল না।

যাহা হউক, যদি এই শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে একটা সর্বব্যাপী নিয়ম করিতে হয় তবে এরূপ বলা যাইতে পারে— যে-সকল অসমাপিকা ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে ই সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপ ধারণকালে তাহাদের সেই ইকার একারে বিকৃত হইবে এবং অসমাপিকা-রূপে যে-সকল ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে 'এ' সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপে তাহাদের সেই একার অ্যাকারে পরিণত হইবে। যথা :

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে	বিশেষ্যরূপে
কিনিয়া	কেনা
বেচিয়া	ব্যাচা
মিলিয়া	মেলা
ঠেলিয়া	ঠ্যালা
লিখিয়া	লেখা
দেখিয়া	দ্যাখা
হেলিয়া	হ্যালা
গিলিয়া	গেলা

এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম পাওয়া যাইবে না।

মোটের উপর ইহা বলা যায় যে, এ হইতে একেবারে আ উচ্চারণে যাওয়া রসনার পক্ষে কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য, আ হইতে এ উচ্চারণে গড়াইয়া পড়া সহজ। এইজন্য আমাদের অঞ্চলে আ কারের পূর্ববর্তী একার প্রায়ই অ্যা নামক সন্ধিস্বরকে আপন আসন ছাড়িয়া দিয়া রসনার শ্রমলাঘব করে।

কার্তিক ১২৯৯

টা টো টে

একটা, দুটো, তিনটে। টা, টো, টে। একই বিভক্তির এরূপ তিন প্রকার ভেদ কেন হয়, এই প্রশ্ন সহজেই মনে উদয় হইয়া থাকে।

আমাদের বাংলা শব্দে যে-সকল উচ্চারণবৈষম্য আছে, মনোনিবেশ করিলে তাহার একটা-না-একটা নিয়ম পাওয়া যায়, এ কথা আমি পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি বাংলায় আগুক্ষরবর্তী অ স্বরবর্ণ কখনো কখনো বিকৃত হইয়া 'ও' হইয়া যায়; যেমন, কলু (কোলু), কলি (কোলি) ইত্যাদি; স্বরবর্ণ এ বিকৃত হইয়া অ্যা হইয়া যায়; যেমন, খেলা (খ্যালা), দেখা (দ্যাখা) ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন গুটিকতক নিয়মের অনুবর্তী।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি ই এবং উ স্বরবর্ণ বাংলার বহুসংখ্যক উচ্চারণ-বিকারের মূলীভূত কারণ; উপস্থিত প্রসঙ্গেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদাহরণ। 'সে' অথবা 'এ' শব্দের পরে টা বিভক্তি অবিকৃত থাকে; যেমন, সেটা এটা। কিন্তু 'সেই' অথবা 'এই' শব্দের পরে টা বিভক্তির বিকার জন্মে; যেমন, এইটে সেইটে।

অতএব দেখা গেল ইকারের পর টা টে হইয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র টা বিভক্তির মধ্যে এই নিয়মকে সীমাবদ্ধ করিলে সংগত হয় না। ইকারের পরবর্তী আকারমাত্রের প্রতিই এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য।

হইয়া—হয়ে　　হিসাব—হিসেব

লইয়া—লয়ে　　মাহিনা—মাইনে

পিঠা—পিঠে　　ভিক্ষা—ভিক্ষে

চিঁড়া—চিঁড়ে　　শিক্ষা—শিক্ষে

শিকা—শিকে　　নিন্দা—নিন্দে

বিলাত—বিলেত　　বিনা—বিনে

এমন-কি যেখানে অপভ্রংশে মূল শব্দের ইকার লুপ্ত হইয়া যায়, সেখানেও এ-নিয়ম খাটে। যেমন:

করিয়া—ক'রে

মরিচা—মর্চে

সরিষা—সর্ষে

আ এবং ই মিলিত হইয়া যুক্তস্বর 'ঐ' হয়। এজন্ত 'ঐ' স্বরের পরেও আ স্বরবর্ণ এ হইয়া যায়; যেমন:

কৈলাস—কৈলেস

তৈয়ার—তোয়ের

কেবল ইহাই নহে। যফলার সহিত সংযুক্ত আকারও একারে পরিণত হয়। কারণ, যফলা ই এবং অ-এর যুক্তস্বর; যথা:

অভ্যাস—অভ্যেস

কন্যা—কন্যে

বন্যা—বন্যে

হত্যা—হত্যে

আমরা অ স্বরবর্ণের সমালোচনাস্থলে লিখিয়াছিলাম ক্ষ-র পূর্ববর্তী অকার ও হইয়া যায়; যেমন, লক্ষ (লোক্ষ) পক্ষ (পোক্ষ) ইত্যাদি। যে-কারণবশত ক্ষ-র পূর্ববর্তী অ ওকারে পরিণত হয়, সেই কারণেই ক্ষ-সংযুক্ত আকার এ হইয়া যায়; যথা, রক্ষা—রক্ষে। বাংলায় ক্ষা-অন্ত শব্দের উদাহরণ অধিক না থাকাতে এই একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই নিরস্ত হইলাম।

যফলা এবং ক্ষ সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখি। যফলা ও ক্ষ-সংযুক্ত আকার একারে পরিণত হয় বটে কিন্তু আন্তক্ষরে এ নিয়ম খাটে না; যেমন, ত্যাগ ন্যায় ক্ষার ক্ষালন ইত্যাদি।

বাংলার অনেকগুলি আকারান্ত ক্রিয়াপদ কালক্রমে একারান্ত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বে ছিল, করিলা খাইলা করিতা খাইতা করিবা খাইবা; এখন হইয়াছে, করিলে খাইলে করিতে খাইতে করিবে খাইবে। পূর্ববর্তী ইকারের প্রভাবেই যে আ স্বরবর্ণের ক্রমশ এইরূপ দুর্গতি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্বে ই থাকিলে যেমন পরবর্তী আ 'এ' হইয়া যায় তেমনই পূর্বে উ থাকিলে পরবর্তী আ 'ও' হইয়া যায়, এইরূপ উদাহরণ বিস্তর আছে; যথা:

ফুটা—ফুটো

মুঠা—মুঠো

কুলা—কুলো

চুলা—চুলো

কুয়া—কুয়ো

চুমা—চুমো

ঔকারের পরেও এ-নিয়ম খাটে। কারণ ঔ— অ এবং উ-মিশ্রিত যুক্তস্বর; যথা :

নৌকা—নৌকো

কৌটা—কৌটো

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, বাংলার দুই-একটা উচ্চারণবিকার এমনই দৃঢ়মূল হইয়া গেছে যে, যেখানেই হউক তাহার অন্যথা দেখা যায় না; যেমন ইকার এবং উকারের পূর্ববর্তী অ-কে আমরা প্রায় সর্বত্রই 'ও' উচ্চারণ করি। সাধুভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থ পাঠকালেও আমরা কটি এবং কটু শব্দকে কোটি এবং কোটু উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু অদ্যকার প্রবন্ধে যে-সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তৎসম্বন্ধে এ-কথা খাটে না। আমরা প্রচলিত ভাষায় যদিও মুঠা-কে মুঠো বলি, তথাপি গ্রন্থে পড়িবার সময় মুঠা পড়িয়া থাকি; চলিত ভাষায় বলি নিন্দে, সাধু ভাষায় বলি নিন্দা। অতএব এই দুই প্রকারের উচ্চারণের মধ্যে একটা শ্রেণীভেদ আছে। পাঠকদিগকে তাহার কারণ আলোচনা করিতে সবিনয় অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

অগ্রহায়ণ ১২৯৯

সংস্কৃত ভাষার সাত বিভক্তি প্রাকৃতে অনেকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। প্রাকৃতে চতুর্থী বিভক্তি নাই বলিলেই হয় এবং ষষ্ঠীর দ্বারাই প্রথমা ব্যতীত অন্য সকল বিভক্তির কার্য সারিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আধুনিক ভারতবর্ষীয় আর্যভাষাগুলিতে প্রাকৃতের এই নিয়মের প্রভাব দেখা যায়।[১]

সংস্কৃত ষষ্ঠীর স্য বিভক্তির স্থানে প্রাকৃতে শ্‌শ হ হো হে হি বিভক্তি পাওয়া যায়। আধুনিক ভাষাগুলিতে এই বিভক্তির অনুসরণ করা যাক।

চহবানহ পাস	—চাঁদ :	চহবানের নিকট।
সংসারহি পারা	—কবীর :	সংসারের পার।
মুনিহিঁ দিখাঈ	—তুলসীদাস :	মুনিকে দেখাইলেন।
যুবরাজপদ রামহি দেহ	—তুলসীদাস :	যুবরাজপদ রামকে দেও।
কহ্যৌ সম খান্‌ততারহ	—চাঁদ :	তিনি খান্‌তাতারকে কহিলেন।
তত্তারহ উপরহ	—চাঁদ :	তাতারের উপরে।
আদিহিতে সব কথা সুনাঈ	—তুলসীদাস :	আদি হইতে তিনি সকল কথা শুনাইলেন।

উক্ত উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন প্রায় সকল বিভক্তির কাজ সারিতেছে।

বাংলায় কী হয় দেখা যাক। বাংলায় যে-সকল বিভক্তিতে 'এ' যোগ হয় তাহার ইতিহাস প্রাকৃত হি-র মধ্যে পাওয়া যায়। সংস্কৃত— গৃহস্য, অপভ্রংশ প্রাকৃত— ঘরহে, বাংলা— ঘরে। সংস্কৃত— তাম্রকস্য, অপভ্রংশ প্রাকৃত— তম্বঅহে, বাংলায়— তাঁবায় (তাঁবাএ)।

পরবর্তী হি যে অপভ্রংশে একার হইয়া যায় বাংলায় তাহার অন্য প্রমাণ আছে। বারবার শব্দটিকে জোর দিবার সময় আমরা 'বারে বারে' বলি; সংস্কৃত নিশ্চয়ার্থসূচক হি-যোগে ইহা নিষ্পন্ন; বারহি বারহি—বারই বারই—বারে বারে।

১ প্রাকৃতের পরবর্তী সমুদয় সংস্কৃতমূলক ভারতবর্ষীয় ভাষার উল্লেখস্থলে হ্যার্ন্‌লে 'গৌড়ীয় ভাষা' নাম ব্যবহার করিয়াছেন; আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিব।

একেবারে শব্দটিরও ওইরূপ ব্যুৎপত্তি। প্রাচীন বাংলায় কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি যোগ ছিল, তাহা বাংলা কাব্যপ্রয়োগ দেখিলেই বুঝা যায়:

লাজ কেন কর বধূজনে: কবিকঙ্কণ

করণ কারকেও 'এ' বিভক্তি চলে। যথা,

পূজিলেন ভূষণে চন্দনে।

ধনে ধান্তে পরিপূর্ণ।

তিলকে ললাট শোভিত।

বাংলায় সম্প্রদান কর্মের অনুরূপ। যথা,

দীনে কর দান।

গুরুজনে করো নতি।

অধিকরণের তো কথাই নাই।

যাহা হউক, সম্বন্ধের চিহ্ন লইয়া প্রায় সকল কারকের কাজ চলিয়া গেল কিন্তু স্বয়ং সম্বন্ধের বেলা কিছু গোল দেখা যায়।

বাংলায় সম্বন্ধে 'র' আসিল কোথা হইতে। পাঠকগণ বাংলা প্রাচীনকাব্যে দেখিয়া থাকিবেন, তাহার যাহার প্রভৃতি শব্দের স্থলে তাকর যাকর প্রভৃতি প্রয়োগ কোথাও দেখা যায়। এই কর শব্দের ক লোপ পাইয়া র অবশিষ্ট রহিয়াছে, এমন অনুমান সহজেই মনে উদয় হয়।

পশ্চিমি হিন্দির অধিকাংশ শাখায় ষষ্ঠীতে কো কা কে প্রভৃতি বিভক্তি যোগ হয়; যথা, ঘোড়েকা ঘোড়েকো ঘোড়েকৌ ঘোড়াকো।

বাংলার সহিত যাহাদের সাদৃশ্য আছে নিম্নে বিবৃত হইল; মৈথিলী—ঘোড়াকর ঘোড়াকের; মাগধী—ঘোড়াকের ঘোড়রাকর; মাড়োয়ারি—ঘোড়ারো; বাংলা— ঘোড়ার।

এই তালিকা আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় কর শব্দ কোনো ভাষা সমগ্র রাখিয়াছে, এবং কোনো ভাষায় উহার ক অংশ এবং কোনো ভাষায় উহার র অংশ রক্ষিত হইয়াছে।

প্রাকৃতে অনেক স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির পর এক অনাবশ্যক কেরক শব্দের যোগ দেখা যায়; যথা, কস্স কেরকং এদং পবহণং— কাহার এই গাড়ি, তুম্হহং কেরউং ধন— তোমার ধন, জস্সকেরে হুংকারউয়ে মুহহুঁ পড়ংতি তনাই— যাহার হুংকারে মুখ হইতে তৃণ পড়িয়া যায়। ইহার সহিত চাঁদ কবির:

ভীমহকরি সেন— ভীমের সৈন্য, তুলসীদাসের : জীবন্হকের কলেসা— জীবগণের ক্লেশ, তুলনা করিলে উভয়ের সাদৃশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না।

এই কেরক শব্দের সংস্কৃত—কৃতক, কৃত। তৎকৃত শব্দের অর্থ তাঁহার দ্বারা কৃত। এই কৃতবাচক সম্বন্ধ ক্রমে সর্বপ্রকার সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত উদাহরণেই প্রমাণ হইবে।

এইস্থলে বাংলা ষষ্ঠীর বহুবচন দের দিগের শব্দের উৎপত্তি আলোচনা করা যাইতে পারে। দীনেশবাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলোচ্য। এ স্থলে উদ্ধৃত করি :

বহুবচন বুঝাইতে পূর্বে শব্দের সঙ্গে শুধু সব সকল প্রভৃতি সংযুক্ত হইত ; যথা,

তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার।—চৈ. ভা

ক্রমে আদি সংযোগে বহুবচনের পদ সৃষ্টি হইতে লাগিল ; যথা নরোত্তম বিলাসে,

শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসাঘরে।
করিলেন নিযুক্ত শ্রীবাস আচার্যেরে॥
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লভীকান্ত তায়॥

এইরূপে, রামাদি জীবাদি হইতে ষষ্ঠীর র সংযোগে— রামদের জীবদের হইয়াছে স্পষ্টই দেখা যায়।

আদি শব্দের উত্তরে স্বার্থে ক যুক্ত হইয়া বৃক্ষাদিক জীবাদিক শব্দের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ফলত উদাহরণেও তাহাই পাওয়া যায় ; যথা নরোত্তমবিলাসে,

রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে।
কবিরাজ খ্যাতি তার হইল যেমনে॥

এই ক-এর গ-এ পরিণতিও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং বৃক্ষাদিগ (বৃক্ষদিগ), জীবাদিগ (জীবদিগ) শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এখন ষষ্ঠীর র সংযোগে দিগের এবং কর্মের ও সম্প্রদানের চিহ্নে পরিণত কে-র সংযোগে দিগকে পদ উৎপন্ন হইয়াছে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ের কথা নহে। কারণ, দীনেশবাবু কেবল অকারান্ত পদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইকার-উকারান্ত পদের সহিত আদি শব্দের যোগ তিনি প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। এবং রামাদিগ হইতে রামদিগ হওয়া যত সহজ, কপ্যাদিগ হইতে কপিদিগ এবং ধেন্বাদিগ হইতে ধেনুদিগ হওয়া তত সহজ নহে।

হিন্দিভাষার সহিত তুলনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সাধু হিন্দি—ঘোড়োঁকা, কনৌজি—ঘোড়নকো, ব্রজভাষা—ঘোড়োঁকৌ অথবা ঘোড়নিকৌ, মাড়োয়ারি—ঘোড়াঁরো, মেরারি—ঘোড়াঁকো, গঢ়রালি—ঘোড়োঁকো, অরধি—ঘোড়রনকর, রিরাই—ঘ়োঁড়নকর, ভোজপুরি—ঘোড়নকি, মাগধী—ঘোড়নকের, মৈথিলী—ঘোড়নিক ঘোড়নিকর।

উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যাইতেছে, কা কো কের কর প্রভৃতি ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্নের বহুবচন নাই। বহুবচনের চিহ্ন মূল শব্দের সহিত সানুনাসিক-রূপে যুক্ত।

অপভ্রংশ প্রাকৃতে ষষ্ঠীর বহুবচনে হং হুং হিং বিভক্তি হয়। সংস্কৃত নরাণাং কৃতকঃ শব্দ অপভ্রংশ প্রাকৃতে নরহং কেরও এবং হিন্দিতে নরোঁকো হয়। সংস্কৃত ষষ্ঠী বহুবচনের আনাং হিন্দিতে বিচিত্র সানুনাসিকে পরিণত হইয়াছে।

বাংলায় এ-নিয়মের ব্যত্যয় হইবার কারণ পাওয়া যায় না। আমাদের মতে সম্পূর্ণ ব্যত্যয় হয় নাই। নিম্নে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। হিন্দিতে কর্তৃকারকে একবচন বহুবচনের ভেদচিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষ-রূপে বহুবচন বুঝাইতে হইলে লোগ্‌ গণ প্রভৃতি শব্দ অনুযোজন করা হয়।

প্রাচীন বাংলারও এই দশা ছিল, পুরাতন কাব্যে তাহার প্রমাণ আছে; দেখা গিয়াছে, সব সকল প্রভৃতি শব্দের অনুযোজনদ্বারা বহুবচন নিষ্পন্ন হইত।

কিন্তু হিন্দিতে দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির চিহ্ন যোগের সময় শব্দের একবচন ও বহুবচন রূপ লক্ষিত হয়; যথা, ঘোড়েকো— একটি ঘোড়াকে, ঘোড়োঁকো— অনেক ঘোড়াকে। ঘোড়ে একবচনরূপ এবং ঘোড়োঁ বহু-বচনরূপ।

পূর্বে একস্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রাকৃত একবচন ষষ্ঠী বিভক্তিচিহ্ন হে হি স্থলে বাংলায় একার দেখা যায়; যথা অপভ্রংশ প্রাকৃত—ঘরহে, বাংলায় ঘরে।

হিন্দিতেও এইরূপ ঘটে। ঘোড়ে শব্দ তাহার দৃষ্টান্ত।

প্রাকৃতের প্রথা অনুসারে প্রথমে গৌড়ীয় ভাষার বিভক্তির মধ্যে ষষ্ঠী বিভক্তিচিহ্নই একমাত্র অবশিষ্ট ছিল ; অবশেষে ভাবপরিস্ফুটনের জন্য সেই ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত সংলগ্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কারকজ্ঞাপক শব্দযোজনা প্রবর্তিত হইল।

বাংলায় এই নিয়মের লক্ষণ একেবারে নাই তাহা নহে। 'হাতর' না বলিয়া বাংলায় হাতের বলে, 'ভাইর' না বলিয়া ভাইয়ের বলে, 'মুখতে' না বলিয়া মুখেতে এবং বিকল্পে পাতে এবং পায়েতে বলা হইয়া থাকে।

প্রথমে, হাতে ভাইয়ে মুখে পায়ে রূপ করিয়া তাহাতে র তে প্রভৃতি বিশেষ বিভক্তি যোগ হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই একার প্রাকৃত একবচন ষষ্ঠীবাচক হি হে-র অপভ্রংশ।

আমাদের বিশ্বাস বহুবচনেও বাংলা এক সময়ে হিন্দির অনুযায়ী ছিল এবং সংস্কৃত ষষ্ঠী বহুবচনের আনাং বিভক্তি যেখানে হিন্দিতে সংক্ষিপ্ত সানুনাসিকে পরিবর্তিত হইয়াছে, বাংলায় তাহা দ আকার ধারণ করিয়াছে এবং কৃত শব্দের অপভ্রংশ কের তাহার সহিত বাহুল্য প্রয়োগরূপে যুক্ত হইয়াছে।

তুলসীদাসে আছে, জীবন্নকের কলেসা, এই জীবন্নকের শব্দের রূপান্তর 'জীবদিগের' হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে।

ন হইতে দ হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত সকলেই অবগত আছেন, বানর হইতে বান্দর ও বাঁদর।

কর্মকারকে জীবন্নকে হইতে জীবদিগে শব্দের উদ্‌ভব হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের নূতন সৃষ্ট বাংলায় আমরা কর্মকারকে দিগকে লিখিয়া থাকি, কিন্তু কথিত ভাষায় মনোযোগ দিলে কর্মকারকে দিগে শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই শুনা যায়।

বোধ হয় সকলেই লক্ষ করিয়া থাকিবেন, সাধারণ লোকদের মধ্যে— আমাগের তোমাগের শব্দ প্রচলিত আছে। এরূপ প্রয়োগ বাংলার কোনো বিশেষ প্রদেশে বদ্ধ কি না বলিতে পারি না, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকদের মুখে বারংবার শুনা গিয়াছে, ইহা নিশ্চয়। আমাগের তোমাগের শব্দের মধ্যস্থলে দ আসিবার প্রয়োজন হয় নাই : কারণ, ম সানুনাসিক বর্ণ হওয়াতে পার্শ্ববর্তী সানুনাসিককে সহজে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। যাগের তাগের শব্দ ব্যবহার করিতে শুনা যায় নাই।

এই মতের বিরুদ্ধে সন্দেহের একটি কারণ বর্তমান আছে। আমরা সাধারণত, নিজদের লোকদের গাছদের না বলিয়া, নিজেদের লোকেদের গাছেদের বলিয়া থাকি। জীবহুকের—জীবহের—জীবন্দের—জীবদের, এরূপ রূপান্তরপর্যায়ে উক্ত একারের স্থান কোথাও দেখি না।

মেওয়ারি কাব্যে ষষ্ঠী বিভক্তির একটি প্রাচীন রূপ দেখা যায় হংদো। কাশ্মীরিতে ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচন হিংদ। জনহিংদ বলিতে লোকদিগের বুঝায়। বীম্‌স্ সাহেবের মতে এই হংদো ভূ ধাতুর ভবন্ত হইতে উৎপন্ন। যেমন কৃত একপ্রকারের সম্বন্ধ তেমনই ভূত আর-এক প্রকারের সম্বন্ধ।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, জন হিন্দকের জনহিঁন্দের শব্দের একপর্যায়গত শব্দ জনদিগের জনেদের, তাহা হইলে নিয়মে বাধে না। ঘরহিঁ স্থলে যদি 'ঘরে' হয় তবে জনহিঁ স্থলে 'জনে' হওয়া অসংগত নহে। বাংলার প্রতিবেশী আসামি ভাষায় হঁত শব্দ বহুবচনবাচক। মানুহহঁত অর্থে মানুষগণ বুঝায়। হঁত এবং হংদ শব্দের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হংদ সম্বন্ধবাচক বহুবচন, হঁত বহুবচন কিন্তু সম্বন্ধবাচক নহে।

পরন্তু সম্বন্ধ ও বহুবচনের মধ্যে নৈকট্য আছে। একের সহিত সম্বন্ধীয়গণই বহু। বাংলায় রামের শব্দ সম্বন্ধসূচক, রামেরা বহুবচনসূচক; রামেরা বলিতে রামের গণ, অর্থাৎ রাম-সম্বন্ধীয়গণ বুঝায়। নরা গজা প্রভৃতি শব্দে প্রাচীন বাংলায় বহুবচনে আকার প্রয়োগ দেখা যায়, রামের শব্দকে সেইরূপ আকারযোগে বহুবচন করিয়া লওয়া হইয়াছে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

নেপালি ভাষায় ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা যে-স্থলে দেবেরা বলি তাহারা দেবহেরু বলে। হে এবং রু উভয় শব্দই সম্বন্ধবাচক এবং সম্বন্ধের বিভক্তি দিয়াই বহুবচনরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

আসামি ভাষায় ইহঁতর শব্দের অর্থ ইহাদের তঁহঁতর তোমাদের। ইহঁত-কের ইহাদিগের তঁহত-কের তোমাদিগের, কানে বিসদৃশ বলিয়া ঠেকে না। কর্মকারকেও আসামি ইহঁতক বাংলা ইহাঁদিগের সহিত সাদৃশ্যবান।

এই হঁত শব্দ রাজপুত হংদো শব্দের ন্যায় ভবন্ত বা সন্ত শব্দানুসারী, তাহা মনে করিবার একটা কারণ আছে। আসামিতে হঁওতা শব্দের অর্থ হওয়া।

এ স্থলে এ-কথাও স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে, পশ্চিমি হিন্দির মধ্যে

রাজপুত ভাষাতেই সাধারণপ্রচলিত সম্বন্ধকারক বাংলার অনুরূপ; ঘোড়ার শব্দের মাড়োয়ারি ও মেবারি ঘোড়ারো, বহুবচনে ঘোড়াঁরো।

পাঞ্জাবি ভাষায় ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্ন দা, স্ত্রীলিঙ্গে দী। ঘোড়াদা—ঘোড়ার, যন্ত্রদীবাণী—যন্ত্রের বাণী। প্রাচীন পাঞ্জাবিতে ছিল ডা। আমাদের দিগের শব্দের দ-কে এই পাঞ্জাবি দ-এর সহিত এক করিয়া দেখা যাইতে পারে। ঘোড়াদা-কের—ঘোড়াদিগের।

বীম্‌স্‌ সাহেবের মতে পাঞ্জাবি এই দা শব্দ সংস্কৃত তন শব্দের অপভ্রংশ। তন শব্দের যোগে সংস্কৃত পুরাতন সনাতন প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি। প্রাকৃতেও ষষ্ঠী বিভক্তির পরে কের এবং তণ উভয়ের ব্যবহার আছে; হেমচন্দ্রে আছে, সম্বন্ধিনঃ কেরতণৌ। মেবারি তণো তণু এবং বহুবচনে তণাঁ ব্যবহার হইয়া থাকে। তণাঁ-র উত্তর কের শব্দ যোগ করিলে 'তণাকের' রূপে দিগের শব্দের মিল পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যে অধিকাংশ স্থলে সব শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন নিষ্পন্ন হইত। এখনো বাংলায় সব শব্দের যোগ চলিত আছে। কাব্যে তাহার দৃষ্টান্ত:

পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল।

কিন্তু কথিত ভাষায় উক্তপ্রকার কাব্যপ্রয়োগের সহিত নিয়মের প্রভেদ দেখা যায়। কাব্যে আমাসব, তোমাসব, পাখিসব প্রভৃতি কথায় দেখা যাইতেছে সব শব্দই বহুবচনের একমাত্র চিহ্ন, কিন্তু কথিত ভাষায় অন্য বহুবচনবিভক্তির পরে উহা বাহুল্যরূপে ব্যবহৃত হয়— আমরা সব, তোমরা সব, পাখিরা সব; যেন, আমরা তোমরা পাখিরা 'সব' শব্দের বিশেষণ।

ইহা হইতে আমাদের পূর্বের কথা প্রমাণ হয়, রা বিভক্তি বহুবচনবাচক বটে কিন্তু উহা মূলে সম্বন্ধবাচক। 'পাখিরা সব' অর্থ পাখিসম্বন্ধীয় সমষ্টি।

ইহা হইতে আর-একটা দেখা যায়, বিভক্তির বাহুল্যপ্রয়োগ আমাদের ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে। লোকেদের শব্দকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, প্রথমত লোকে শব্দের এ প্রাচীন ষষ্ঠীবাচক, তাহার পর দা শব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ষষ্ঠী বিভক্তি, তাহার পর কের শব্দ সম্বন্ধবাচক বাহুল্যপ্রয়োগ।

মৈথিলী ভাষায় সব শব্দ যোগে বহুবচন নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু তাহার প্রয়োগ আমাদের প্রাচীন কাব্যের ন্যায়। নেনাসভ অর্থে বালকেরা সব, নেনিসভ— বালিকারা সব; কিন্তু এ-সম্বন্ধে মৈথিলীর সহিত বাংলার তুলনা হয় না।

কারণ, মৈথিলীতে অন্য কোনো প্রকার বহুবচনবাচক বিভক্তি নাই। বাংলায় রা বিভক্তিযোগে বহুবচন সমস্ত গৌড়ীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র, কেবল নেপালি হেরু বিভক্তির সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু রা বিভক্তিযোগে বহুবচন কেবল সচেতন পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। আমরা বাংলায় ফলেরা পাতারা বলি না। এই কারণেই ফলেরা সব, পাতারা সব, এমন প্রয়োগ সম্ভবপর নহে।

মৈথিলী ভাষায় ফলসভ কথাসভ, এরূপ ব্যবহারের বাধা নাই। বাংলায় আমরা এরূপ স্থলে ফলগুলা সব, পাতাগুলা সব, বলিয়া থাকি।

সচেতন পদার্থ বুঝাইতে লোকগুলা সব, বানরগুলা সব বলিতেও দোষ নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে গুলা যোগে বাংলায় সচেতন অচেতন সর্বপ্রকার বহুবচনই সিদ্ধ হয়। এক্ষণে এই গুলা শব্দের উৎপত্তি অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

নেপালি বহুবচনবিভক্তি হেরু শব্দের উৎপত্তি প্রাকৃত ভাষার কেরউ হইতে। অম্হহং কেরউ—আমাদিগের। কেরউ—কেরু—হেরু।

বাংলা রা যেমন সম্বন্ধবাচক হইতে বহুবচনবাচকে পরিণত হইয়াছে, নেপালি হেরু শব্দেরও সেই গতি।

নেপালিতে কেরু শব্দের কে হে হইয়াছে, বাংলায় তাহা গে হইয়াছে, দিগের শব্দে তাহার প্রমাণ আছে।

কেরু হইতে গেরু, গেরু হইতে গেলু, গেলু হইতে গুলু, গুলু হইতে গুলো ও গুলা হওয়া অসম্ভব নহে। এরূপ স্বরবর্ণবিপর্যয়ের উদাহরণ অনেক আছে; বিন্দু হইতে বুঁদ তাহার একটি, মুদ্রিকা হইতে মাদুলি অন্যপ্রকারের (এই বুঁদ শব্দ হইতে বিন্দু-আকার মিষ্টান্ন বোঁদে শব্দের উদ্‌ভব)।

ঘোড়াকেরু নেপালিতে হইল ঘোড়াহেরু, বাংলায় হইল ঘোড়াগুলো।

গুলি ও গুলিন্ শব্দ গুলা-র স্ত্রীলিঙ্গ। ক্ষুদ্র জিনিস বুঝাইতে একসময়ে বঙ্গভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার হইত তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে; যথা, বড়া বড়ি, গোলা গুলি, খোঁটা খুঁটি, দড়া দড়ি, ঘড়া ঘটি, ছোরা ছুরি, জাঁতা জাঁতি, আংটা আংটি, শিকল শিকলি ইত্যাদি।

প্রাচীনকাব্যে দেখা যায়, সব অপেক্ষা গণ শব্দের প্রচলন অনেক বেশি। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণচণ্ডী দেখিলে তাহার প্রমাণ হইবে; অন্য বাংলা প্রাচীন-

কাব্য এক্ষণে লেখকের হস্তে বর্তমান নাই, এইজন্য তুলনা করিবার সুযোগ হইল না।

এই গণ শব্দ হইতে গুলা হওয়াও অসম্ভব নহে। কারণ, গণ শব্দের অপভ্রংশ প্রাকৃত গণ্। জানি না ধ্বনিবিকারের নিয়মে গণ্ হইতে গল্ ও গুলো হওয়া সুসাধ্য কি না।

কিন্তু কেরু হইতেই যে গুলো হইয়াছে লেখকের বিশ্বাসের ঝোঁকটা সেই দিকে। তাহার কারণ আছে; প্রথমত রা বিভক্তির সহিত তাহার যোগ পাওয়া যায়, দ্বিতীয়ত নেপালি হেরু শব্দের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে, তৃতীয়ত যাহার যুক্তিপরম্পরা অপেক্ষাকৃত দুরূহ এবং যাহা প্রথম শ্রুতিমাত্রই প্রত্যয় আকর্ষণ করে না উদ্‌ভাবকের কল্পনা তাহার প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়।

এইখানে বলা আবশ্যক, উড়িয়া ও আসামির সহিত যদিচ বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ নৈকট্য আছে তথাপি বহুবচন সম্বন্ধে বাংলার সহিত তাহার মিল পাওয়া যায় না।

উড়িয়া ভাষায় মানে শব্দ যোগে বহুবচন হয়। ঘর একবচন, ঘরমানে বহুবচন। বীম্‌স্ বলেন এই মানে শব্দ পরিমাণ হইতে উদ্ভূত; হ্যার্ন্‌লে বলেন মানব হইতে। প্রাচ্য হিন্দিতে মনুষ্যগণকে মনই বলে, মানে শব্দ তাহারই অনুরূপ।

হিন্দিতে কর্তৃকারক বহুবচন লোগ্ (লোক) শব্দযোগে সিদ্ধ হয়; ঘোড়ালোগ— ঘোড়াসকল। বাংলাতেও শ্রেণীবাচক বহুবচনে লোক শব্দ ব্যবহৃত হয়; যথা, পণ্ডিতলোক মূর্খলোক গরিবলোক ইত্যাদি।

আসামি ভাষায় বিলাক হঁত এবং বোর শব্দযোগে বহুবচন নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে হঁত শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিলাক এবং বোর শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় সুকঠিন।

যাহাই হউক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কর্তৃকারক এবং সম্বন্ধের বহুবচনে বাংলা প্রায় সমুদয় গৌড়ীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। কেবল রাজপুতানি এবং নেপালি হিন্দির সহিত তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মনোযোগপূর্বক অনুধাবন করিলে অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সহিত বাংলার এই-সকল বহুবচন রূপের যোগ পাওয়া যায়, এই প্রবন্ধে তাহারই অনুশীলন করা গেল।

সম্বন্ধের একবচনেও অপর গৌড়ীয় ভাষার সহিত বাংলার প্রভেদ আছে

তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, কেবল মাড়োয়ারি ও মেবারি রো বিভক্তি বাংলার র বিভক্তির সহিত সাদৃশ্যবান। এ-কথাও বলা আবশ্যক উড়িয়া ও আসামি ভাষার সহিতও এ-সম্বন্ধে বাংলার প্রভেদ নাই। অপরাপর গৌড়ীয় ভাষায় কা প্রভৃতি যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

কিন্তু একটি বিষয় বিশেষরূপ লক্ষ করিবার আছে।

উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষ সর্বনাম শব্দে কী একবচনে কী বহুবচনে প্রায় কোথাও ষষ্ঠীতে ককারের প্রয়োগ নাই, প্রায় সর্বত্রই রকার ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা, সাধুহিন্দি—একবচনে মেরা, বহুবচনে হমারা। কনৌজি—মেরো, হমারো। ব্রজভাষা—মেরৌ, হমারৌ। মাড়োয়ারি—মারো, ম্হারো। মেবারি—ম্হারো, হ্ঁারর্ঁারো। অরধি—মোর, হমার। রিরাই—ম্রার, হম্হার।

মধ্যম পুরুষেও—তেরা তুম্হরা তোর তুমার, ত্রার তুম্হার প্রভৃতি প্রচলিত।

কোনো কোনো ভাষায় বহুবচনে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যায়; যথা, নেপালি—হামেরুকো, ভোজপুরি—হমরণকে, মাগধী—হমরণীকে, মৈথিলী—হমরাসভকে।

অন্য গৌড়ীয় ভাষায় কেবল সর্বনামের ষষ্ঠী বিভক্তিতে যে রকার বর্তমান, বাংলায় তাহা সর্বনাম ও বিশেষ্যে সর্বত্রই বর্তমান। ইহা হইতে অনুমান করি, ককার অপেক্ষা রকার ষষ্ঠী বিভক্তির প্রাচীনতর রূপ।

এখানে আর-একটি লক্ষ করিবার বিষয় আছে। একবচনে যেখানে তেরা বহুবচনে সেখানে তুম্হরা, একবচনে ম্রার বহুবচনে হম্হার। নেপালি ভাষায় কর্তৃকারক বহুবচনে হেরু বিভক্তি পাওয়া যায়; এই হেরু হার এবং হরা সাদৃশ্যবান।

কিন্তু নেপালিতে হেরু নাকি কর্তৃকারক বহুবচনে ব্যবহার হয়, এইজন্য সম্বন্ধে রকারের পরে পুনশ্চ রকার-যোগ সম্ভব হয় নাই, কো শব্দযোগে ষষ্ঠী করিতে হইয়াছে। অথচ নেপালি একবচনে মেরো হইয়া থাকে।

মৈথিলী ষষ্ঠীর বহুবচনে হমরাসভকে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

পূর্বে বলিয়াছি বাংলায় কর্তৃকারক বহুবচনে সব শব্দের পূর্বে বহুবচনবাচক রা বিভক্তি বসে, যথা ছেলেরা সব; কিন্তু মৈথিলীতে শুদ্ধ নেনাসভ বলিতেই বালকেরা সব বুঝায়। পূর্বে এ-কথাও বলিয়াছি এ-সম্বন্ধে মৈথিলীর সহিত

বাংলার তুলনা হয় না, কারণ, মৈথিলীতে বাংলার ন্যায় কর্তৃকারক বহুবচনের কোনো বিশেষ বিভক্তি নাই।

কিন্তু দেখা যাইতেছে সর্বনাম উত্তম ও মধ্যম পুরুষে মৈথিলী কর্তৃকারক বহুবচনে হম্‌রাসভ তোহরাসভ ব্যবহার হয়, এবং অন্যান্য কারকেও হম্‌রাসভকে তোহরাসভকে প্রভৃতি প্রচলিত।

মৈথিলী সর্বনামশব্দে যে ব্যবহার, বাংলায় সর্বনাম ও বিশেষ্যে সর্বত্রই সেই ব্যবহার।

ইহা হইতে দুই প্রকার অনুমান সংগত হয়। হয়, এই হমরা এককালে বাংলা ও মৈথিলী উভয় ভাষায় বহুবচনরূপ ছিল, নয় এককালে যাহা কেবল সম্বন্ধের বিভক্তি ছিল বাংলায় তাহা ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া কর্তৃকারক বহুবচন ও মৈথিলী ভাষায় তাহা কেবল সর্বনাম শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তিতে দাঁড়াইয়াছে।

বলা বাহুল্য আমাদের এই আলোচনাগুলি সংশয়পরিশূন্য নহে। পাঠকগণ ইহাকে অনুসন্ধানের সোপানস্বরূপে গণ্য করিলে আমরা চরিতার্থ হইব।

দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, হ্যর্নলে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ সাহেবের হিন্দিব্যাকরণ, গ্রিয়র্সন সাহেবের মৈথিলী ব্যাকরণ, এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

সম্বন্ধে কার

সংস্কৃত কৃত এবং তাহার প্রাকৃত অপভ্রংশ কের শব্দ হইতে বাংলা ভাষায় সম্বন্ধে র বিভক্তির সৃষ্টি হইয়াছে, পূর্বে আমরা তাহাই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতে— তাহার যাহার অর্থে তাকর যাকর শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখানো হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে বর্তমানে অপ্রচলিত পুরাতন দৃষ্টান্তের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কারণ এখনো সম্বন্ধে বাংলায় কার শব্দপ্রয়োগ ব্যবহৃত হয়; যথা, এখনকার তখনকার ইত্যাদি।

কিন্তু এই কার শব্দের প্রয়োগ কেবল স্থলবিশেষেই বদ্ধ। কৃত শব্দের অপভ্রংশ কার কেনই বা কোনো কোনো স্থলে অবিকৃত রহিয়াছে এবং কেনই বা অন্যত্র কেবলমাত্র তাহার র অক্ষর অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভাষা ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট জীবের মতো কেন যে কী করে, তাহার সম্পূর্ণ কিনারা করা যায় না।

উচ্চারণের বিশেষ নিয়মঘটিত কারণে অনেক সময়ে বিভক্তির পরিবর্তন হইয়া থাকে; যথা, অধিকরণে মাটির বেলায় আমরা বলি মাটিতে, ঘোড়ার বেলায় বলি ঘোড়ায়। কিন্তু এ স্থলে সে কথা খাটে না। লিখন শব্দের বেলায় আমরা সম্বন্ধে বলি— লিখনের, কিন্তু এখন শব্দের বেলায় এখনের বলি না, বলি— এখনকার। অথচ লিখন এবং এখন শব্দে উচ্চারণনিয়মের কোনো প্রভেদ হইবার কথা নাই।

বাংলায় কোন্ কোন্ স্থলে সম্বন্ধে কার শব্দের প্রয়োগ হয় তাহার একটি তালিকা প্রকাশিত হইল।

এখনকার তখনকার যখনকার কখনকার।

এখানকার সেখানকার যেখানকার কোন্খানকার।

এ-বেলাকার ও-বেলাকার সে-বেলাকার।

এ-সময়কার ও-সময়কার সে-সময়কার।

সে-বছরকার ও-বছরকার এ-বছরকার।

যে-দিনকার সে-দিনকার ও-দিনকার এ-দিনকার।

এ-দিককার ও-দিককার সে-দিককার— দক্ষিণ দিককার, উত্তর দিককার,

সম্মুখ দিককার, পশ্চাৎ দিককার।

আজকেকার কালকেকার পরশুকার।

এপারকার ওপারকার উপরকার নিচেকার তলাকার কোথাকার।

দিনকার রাত্রিকার।

এ-ধারকার ও-ধারকার সামনেকার পিছনকার।

এ-হপ্তাকার ও-হপ্তাকার।

আগেকার পরেকার কবেকার।

একালকার সেকালকার।

প্রথমকার শেষেকার মাঝেকার।

ভিতরকার বাহিরকার।

আগাকার গোড়াকার।

সকালকার বিকালকার।

এই তালিকা হইতে দেখা যায় সময় এবং অবস্থান (position)-সূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের সহিত কার বিভক্তির যোগ।

কিন্তু ইহাও দেখা যাইতেছে, তাহারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। আমরা বলি— দিনের বেলা, দিনকার বেলা বলি না। অথচ সেদিনকার শব্দ প্রচলিত আছে। সময় শব্দের সম্বন্ধে সময়ের বলি, অথচ তৎপূর্বে এ সে প্রভৃতি সর্বনাম যোগ করিলে সম্বন্ধে কার বিভক্তি বিকল্পে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ইহাতে প্রমাণ হয়, সময় ও দেশ সম্বন্ধে যেখানে বিশেষ সীমা নির্দিষ্ট হয়, সেইখানেই কার শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে। সেদিনের কথা এবং সেদিনকার কথা— এ দুটা শব্দের একটি সূক্ষ্ম অর্থভেদ আছে। সেদিনের অর্থ অপেক্ষাকৃত অনির্দিষ্ট, সেদিনের কথা বলিতে অতীতকালের অনেক দিনের কথা বুঝাইতে পারে, কিন্তু সেদিনকার কথা বলিতে বিশেষ একটি দিনের কথা বুঝায়। যেখানে সেই বিশেষত্বের উপর বেশি জোর দিবার প্রয়োজন, কোনোমতে দেশ বা কালের একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিবার জো নাই, সেখানে শুদ্ধমাত্র এর বিভক্তি না দিয়া কার বিভক্তি হয়।

অতএব বিশেষার্থবোধক, সময় এবং অবস্থানসূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের উত্তরে সম্বন্ধে কার প্রত্যয় হয়।

ইহার দুটি অথবা তিনটি ব্যতিক্রম চোখে পড়িতেছে। একজনকার

দুইজনকার ইত্যাদি, ইহা মনুষ্যসংখ্যাবাচক, দেশকালবাচক নহে। মনুষ্যসমষ্টি-বাচক— সকলকার। এবং সত্যকার। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সকলকার হয় কিন্তু সমস্তকার হয় না (প্রাচীন বাংলায় সভাকার), সত্যকার হয় কিন্তু মিথ্যাকার হয় না। এবং মনুষ্যসংখ্যাবাচক একজন দুই জন ব্যতীত পশু বা জড়সংখ্যাবাচক একটা দুইটা-র সহিত কার শব্দের সম্পর্ক নাই।

অবস্থানবাচক যে-সকল শব্দে কার প্রত্যয় হয় তাহার অধিকাংশই বিশেষণ ; যথা, উপর নীচ সমুখ পিছন আগা গোড়া মধ্য ধার তল দক্ষিণ উত্তর ভিতর বাহির ইত্যাদি। বিশেষ্যের মধ্যে কেবল খান (স্থান) পার ও ধার শব্দ। এই তিনটি বিশেষ্যের বিশেষ ধর্ম এই যে, ইহাদের পূর্বে এ সে প্রভৃতি বিশেষার্থবোধক সর্বনাম-বিশেষণ যুক্ত না হইলে ইহাদের উত্তরে কার প্রত্যয় হয় না ; যথা, সেখানকার এপারকার ওধারকার। কিন্তু, ভিতরকার বাহিরকার প্রভৃতি শব্দে সে-কথা খাটে না।

সময়বাচক যে-সকল শব্দের উত্তর কার প্রত্যয় হয়, তাহার অধিকাংশই বিশেষ্য ; যথা, দিন রাত্রি ক্ষণ বেলা বার বছর হপ্তা ইত্যাদি। এইরূপ সময়বাচক বিশেষ্য শব্দের পূর্বে এ সে প্রভৃতি সর্বনাম-বিশেষণ না থাকিলে তদুত্তরে কার প্রয়োগ হয় না। শুদ্ধমাত্র— বারকার বেলাকার ক্ষণকার হয় না, এবেলাকার এখানকার এক্ষণকার এবারকার হয়। বিশেষণ শব্দে অন্যরূপ।

সময়বাচক বিশেষ্য শব্দ সম্বন্ধে অনেকগুলি ব্যতিক্রম দেখা যায়। মাস মুহূর্ত দণ্ড ঘণ্টা প্রভৃতি শব্দের সহিত কার শব্দের যোগ হয় না। ইহার কারণ নির্ধারণ সুকঠিন।

যাহা হউক দেশ সম্বন্ধে একটা মোটা নিয়ম পাওয়া যায়। দেশবাচক যে-সকল শব্দে সংস্কৃতে বর্তী শব্দ হইতে পারে, বাংলায় তাহার স্থানে কার ব্যবহার হয়। ঊর্ধ্ববর্তী নিম্নবর্তী সম্মুখবর্তী পশ্চাদ্বর্তী অগ্রবর্তী প্রভৃতি শব্দের স্থলে বাংলায় উপরকার নিচেকার সামনেকার পিছনকার আগাকার ইত্যাদি প্রচলিত। ঋজুবর্তী বক্রবর্তী লম্ববর্তী ইত্যাদি কথা সংস্কৃতে নাই, বাংলাতেও সোজাকার বাঁকাকার লম্বাকার হইতে পারে না।

শ্রাবণ ১৩০৫

বাংলা ভাষাতত্ত্ব যিনি আলোচনা করিতে চান, বীম্‌স্‌ সাহেবের তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং হ্যর্নলে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ তাঁহার পথ অনেকটা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে দুটো-একটা ভুল-ত্রুটি বা স্খলন বাহির করা গৌড়ী-ভাষীদের পক্ষে অসম্ভব না হইতে পারে কিন্তু যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি ও নম্রতার সহিত তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না।

সংসারে জড়পদার্থের রহস্য যথেষ্ট জটিল এবং দুর্গম, কিন্তু সজীব পদার্থের রহস্য একান্ত দুরূহ। ভাষা একটা প্রকাণ্ড সজীব পদার্থ। জীবনধর্মের নিগূঢ় নিয়মে তাহার বিচিত্র শাখাপ্রশাখা কত দিকে কতপ্রকার অভাবনীয় আকার ধারণ করিয়া ব্যাপ্ত হইতে থাকে তাহার অনুসরণ করিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন। বীম্‌স্‌ সাহেব, হ্যর্নলে সাহেব, হিন্দি ব্যাকরণকার কেলগ সাহেব, মৈথিলী ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিয়র্সন সাহেব বিদেশী হইয়া ভারতবর্ষ-প্রচলিত আর্য ভাষার পথলুপ্ত অপরিচিত জটিল মহারণ্যতলে প্রবেশপূর্বক অশ্রান্ত পরিশ্রম এবং প্রতিভার বলে যে-সকল প্রচ্ছন্ন তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা লাভ করিয়া এবং বিশেষত তাঁহাদের আশ্চর্য অধ্যবসায় ও সন্ধানপরতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের স্বদেশী ভাষার সহিত সম্পর্কশূন্য স্বদেশহিতৈষী-আখ্যাধারীদের লজ্জা ও বিনতি অনুভব করা উচিত।

প্রাকৃত ভাষার সহিত বাংলার জন্মগত যোগ আছে সে-সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্রবাবু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল এবং ডাক্তার হ্যর্নলের সহিত একমত।

হ্যর্নলে সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে কথিত প্রাকৃত ভাষা দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। শৌরসেনী ও মাগধী। মহারাষ্ট্রী লিখিত ভাষা ছিল মাত্র এবং প্রাকৃত ভাষা ভারতবর্ষীয় অনার্যদের মুখে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া যে-ভাষায় পরিণত হইয়াছিল তাহার নাম ছিল পৈশাচী।

প্রাচীন ব্যাকরণকারগণ যে-সকল ভাষাকে অপভ্রংশ ভাষা বলিতেন তাহাদের নাম এই: আভীরী (সিন্ধি, মাড়োয়ারি), আবন্তী (পূর্ব-রাজপুতানি), গৌর্জরী (গুজরাটি), বাহ্লিকা (পঞ্জাবি), শৌরসেনী (পাশ্চাত্য হিন্দি), মাগধী অথবা প্রাচ্যা (প্রাচ্য হিন্দি), ওড্রী (উড়িয়া),

গৌড়ী (বাংলা), দাক্ষিণাত্যা অথবা বৈদর্ভিকা (মারাঠি) এবং নৈপ্পলী (নেপালি ?)।

উক্ত অপভ্রংশ তালিকার মধ্যে শৌরসেনী ও মাগধী নাম আছে কিন্তু মহারাষ্ট্রী নাম ব্যবহৃত হয় নাই। মহারাষ্ট্রী যে ভারতবর্ষীয় কোনো দেশ-বিশেষের কথিত ভাষা ছিল না তাহা হ্যর্নলে সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিশেষত আধুনিক মহারাষ্ট্রদেশ-প্রচলিত ভাষার অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্য হিন্দি ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য আছে। প্রাকৃত নাটকে দেখা যায় শৌরসেনী গদ্যাংশে এবং মহারাষ্ট্রী পদ্যাংশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা হইতেও কতকটা প্রমাণ হয় মহারাষ্ট্রী সাহিত্য-ভাষা ছিল, কথায়-বার্তায় তাহার ব্যবহার ছিল না।

কিন্তু, আমাদের মতে, ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, মহারাষ্ট্রী কোনো কালেই কথিত ভাষা ছিল না এবং তাহা সাহিত্যকারদের রচিত কৃত্রিম ভাষা। সর্বদা ব্যবহারের ঘর্ষণে চলিত কথায় ভাষার প্রাচীন রূপ ক্রমশ পরিবর্তিত হইতে থাকে, কিন্তু কাব্যে তাহা বহুকাল স্থায়িত্ব লাভ করে। বাহিরের বিচিত্র সংস্রবে পুরুষসমাজে যেমন ভাষা এবং প্রথার যতটা দ্রুত রূপান্তর ঘটে অন্তঃপুরের স্ত্রীসমাজে সেরূপ ঘটে না— কাব্যেও সেইরূপ। আমাদের বাংলা কাব্যের ভাষায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

বাংলা কাব্যে "ছিল" শব্দের স্থলে "আছিল", প্রথম পুরুষ "করিল" শব্দের স্থলে "করিলা", "তোমাদিগকে" স্থলে "তোমা সবে" প্রভৃতি যে-সকল রূপান্তর প্রচলিত আছে তাহাই যে কথিত বাংলার প্রাচীন রূপ ইহা প্রমাণ করা শক্ত নহে। এই দৃষ্টান্ত হইতেই সহজে অনুমান করা যায় যে, প্রাকৃত সাহিত্যে মহারাষ্ট্রী নামক পদ্য ভাষা শৌরসেনী-অপভ্রংশ অপেক্ষা প্রাচীন আদর্শমূলক হওয়া অসম্ভব নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শৌরসেনী-অপভ্রংশ প্রাকৃত-সাহিত্যের গদ্য ভাষা। সাহিত্য-প্রচলিত গদ্য ভাষার সহিত কথিত ভাষার সর্বাংশে ঐক্য থাকে না তাহাও বাংলা ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায়। একটা ভাষা যখন বহুবিস্তৃত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তখন তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেই— কিন্তু লিখিবার ভাষা নিয়মে এবং স্থায়ী আকারে বদ্ধ হইয়া দেশান্তর ও কালান্তরের বিকৃতি অনেকটা প্রত্যাখ্যানপূর্বক নানাস্থানীয় পণ্ডিতসাধারণের

ব্যবহারযোগ্য ও বোধগম্য হইয়া থাকে, এবং তাহাই স্বভাবত ভদ্রসমাজের আদর্শ ভাষারূপে পরিণত হয়। চট্টগ্রাম হইতে ভাগলপুর এবং আসামের সীমান্ত হইতে বঙ্গসাগরের তীর পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিচিত্ররূপ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু সাহিত্য-ভাষায় স্বতই একটি স্থির আদর্শ রক্ষিত হইয়া থাকে। সুন্দররূপে, সুশৃঙ্খলরূপে, সংহতরূপে, গভীররূপে ও সূক্ষ্মরূপে ভাবপ্রকাশের অনুরোধে এ ভাষা যে কতক পরিমাণে কৃত্রিম হইয়া উঠে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু এই সাহিত্যগত ভাষাকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক অপভাষার মূল আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে এইরূপ এক দিকে মাগধী ও অন্য দিকে শৌরসেনী মহারাষ্ট্রী এই দুই মূল প্রাকৃত ছিল। অদ্য ভারতবর্ষে যত আর্য ভাষা আছে তাহা এই দুই প্রাকৃতের শাখাপ্রশাখা।

এই দুই প্রাকৃতের মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। এমন-কি হার্নলে সাহেবের মতে এক সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। তাহা পশ্চিম হইতে ক্রমে পূর্বাভিমুখে পরিব্যাপ্ত হয়। শৌরসেনী আর একটি দ্বিতীয় ভাষাপ্রবাহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পশ্চিমদেশ অধিকার করে। হার্নলে সাহেব অনুমান করেন, ভারতবর্ষে পরে পরে দুইবার আর্য ঔপনিবেশিকগণ প্রবেশ করে। তাহাদের উভয়ের ভাষায় মূলগত ঐক্য থাকিলেও কতকটা প্রভেদ ছিল।

প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণ নিম্নলিখিত ভাষাগুলিকে মাগধী প্রাকৃতের শাখারূপে বর্ণনা করিয়াছেন— মাগধী, অর্ধমাগধী, দাক্ষিণাত্যা, উৎকলী এবং শাবরী। বেহার এবং বাংলার ভাষাকে মাগধীরূপে গণ্য করা যায়। মাগধীর সহিত শৌরসেনী বা মহারাষ্ট্রী মিশ্রিত হইয়া অর্ধমাগধীরূপ ধারণ করিয়াছে— ইহা যে মগধের পশ্চিমের ভাষা অর্থাৎ ভোজপুরী তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদর্ভ অর্থাৎ বেরার ও তাহার নিকটবর্তী প্রদেশের ভাষা দাক্ষিণাত্যা নামে অভিহিত। অতএব ইহাই বর্তমান মরাঠীস্থানীয়। উৎকলী উড়িয়ার ভাষা, এবং এক দিকে দাক্ষিণাত্যা ও অন্য দিকে মাগধী ও উৎকলীর মাঝখানে শাবরী।

দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য হিন্দি, মৈথিলী, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রী এবং আসামি এইগুলিই বাংলার স্বজাতীয় ভাষা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কাফিরিস্থানের কাফিরি ভাষা এবং আফগানিস্থানের পুশতু মাগধী প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত, এবং

সে হিসাবে বাংলার কুটুম্বশ্রেণীর। শৌরসেনী প্রাকৃত মাঝে পড়িয়া মাগধী প্রাকৃতের বিস্তারকে খণ্ডীকৃত করিয়া দিয়াছে।

এক্ষণে বাংলার ভাষাতত্ত্ব প্রকৃতরূপে নিরূপণ করিতে হইলে প্রাকৃত, পালি, প্রাচ্য হিন্দি, মৈথিলী, আসামি, উড়িয়া এবং মহারাষ্ট্রী ব্যাকরণ পর্যালোচনা ও তুলনা করিতে হয়।

কথাটা শুনিতে কঠিন, কিন্তু বাংলার ভাষাতত্ত্ব নির্ণয় জীবনের একটা প্রধান আলোচ্যবিষয়রূপে গণ্য করিয়া লইলে এবং প্রত্যহ অন্তত দুই-এক ঘণ্টা নিয়মিত কাজ করিয়া গেলে এ কার্য একজনের পক্ষে অসাধ্য হয় না। বিশেষত উক্ত ভাষাকয়টির তুলনামূলক এবং স্বতন্ত্র ব্যাকরণ অনেকগুলিই পাওয়া যায়। এবং এইরূপ সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের গুটিকতক দৃষ্টান্ত না থাকিলে আমাদের বঙ্গসাহিত্য যথোচিত গৌরব লাভ করিতে পারিবে না।

বাংলার ভাষাতত্ত্ব-সন্ধানের একটি ব্যাঘাত, প্রাচীন পুঁথির দুষ্প্রাপ্যতা। কবিকঙ্কণচণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলি জনসাধারণের সমাদৃত হওয়াতে কালে কালে অল্পে অল্পে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন আদর্শ পুঁথি কোনো এক পুস্তকালয়ে যথাসম্ভব সংগৃহীত থাকিলে অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে সুবিধার বিষয় হয়। সাহিত্য-পরিষদের অধিকারে এইরূপ একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইতে পারিবে ইহাই আমরা আশা করি।…

বৈশাখ ১৩০৫

ভাষাবিচ্ছেদ

ইংরেজের রাজচক্রবর্তীত্বে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি পূর্বাপেক্ষা অনেকটা নিকটবর্তী হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। প্রথমত, এক রাজার শাসনপ্রণালীর বন্ধন তো আছেই, তাহার পরে পথের সুগমতা এবং বাণিজ্য ব্যাবসা ও চাকরির টানে পরস্পরের সহিত নিয়ত সম্মিলন ঘটিতেছেই।

ইহার একটা অনিবার্য ফল এই ছিল যে, যে-সকল প্রতিবেশী জাতির মধ্যে প্রভেদ সামান্য তাহারা ক্রমশ এক হইয়া যাইতে পারিত। অন্তত ভাষা সম্বন্ধে তাহার উপক্রম দেখা গিয়াছিল।

উড়িষ্যা এবং আসামে বাংলাশিক্ষা যেরূপ সবেগে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বাধা না পাইলে বাংলার এই দুই উপরিভাগ ভাষার সামান্য অন্তরালটুকু ভাঙিয়া দিয়া একদিন একগৃহবর্তী হইতে পারিত।

সামান্য অন্তরাল এইজন্য বলিতেছি যে, বাংলা ভাষার সহিত আসামি ও উড়িয়্যার যে-প্রভেদ সে-প্রভেদসূত্রে পরস্পর ভিন্ন হইবার কোনো কারণ দেখা যায় না। উক্ত দুই ভাষা চট্টগ্রামের ভাষা অপেক্ষা বাংলা হইতে স্বতন্ত্র নহে। বীরভূমের কথিত ভাষার সহিত ঢাকার কথিত ভাষার যে-প্রভেদ বাংলার সহিত আসামির প্রভেদ তাহা অপেক্ষা খুব বেশি নহে।

অবশ্য, উপভাষা আপন জন্মস্থান হইতে একেবারে লুপ্ত হয় না। তাহা পূর্বপুরুষের রসনা হইতে উত্তরপুরুষের রসনায় সংক্রামিত হইয়া চলে। কিন্তু লিখন ভাষা যত বৃহৎ পরিধির মধ্যে ব্যাপ্ত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

বৃটিশ দ্বীপে স্কটল্যাণ্ড, অয়র্ল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের স্থানীয় ভাষা ইংরেজি সাধু ভাষা হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে ইংরেজির উপভাষাও বলা যায় না। উক্ত ভাষাসকলের প্রাচীন সাহিত্যও স্বল্পবিস্তৃত নহে। কিন্তু ইংরেজের বল জয়ী হওয়ায় প্রবল ইংরেজি ভাষাই বৃটিশ দ্বীপের সাধু ভাষারূপে গণ্য হইয়াছে। এই ভাষার ঐক্যে বৃটিশজাতি যে উন্নতি ও বললাভ করিয়াছে, ভাষা পৃথক থাকিলে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইত না।

ভারতবর্ষেও যে যে সমশ্রেণীয় ভাষার একীভবন স্বাভাবিক অথবা স্বল্পচেষ্টাসাধ্য, সেগুলিকে এক হইতে দিলে আমাদের ব্যাপক ও স্থায়ী উন্নতির পথ প্রসর হইত।

কিন্তু, যদিচ একীকরণ ইংরেজরাজত্বের স্বাভাবিক গতি, তথাপি দুর্ভাগ্যক্রমে ভেদনীতি ইংরেজের রাজকৌশল। সেই নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আমাদের ভাষার ব্যবধানকে পূর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও দৃঢ় করিবার চেষ্টায় আছেন[১]। তাঁহারা বাংলাকে আসাম ও উড়িষ্যা হইতে যথাসম্ভব নির্বাসিত করিয়া স্থানীয় ভাষাগুলিকে কৃত্রিম উত্তেজনায় পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত।

স্থানীয় চাকরি পাওয়া সম্বন্ধে রাজপুরুষেরা বাঙালির বিরুদ্ধে যে-গণ্ডি টানিয়া দিয়াছেন এবং সেই সূত্রে বেহারি প্রভৃতি বঙ্গশাখীদের সহিত বাঙালির যে-একটি ঈর্ষার সম্বন্ধ দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা আমরা স্বল্প অশুভেরই কারণ মনে করি ; কিন্তু ভাষার ঐক্য যাহা নিত্য, যাহা সুগভীর, যাহা আমাদের এই বিচ্ছিন্ন দেশের একমাত্র মুক্তির কারণ, তাহাকে আপন রাজশক্তির দ্বারা পরাহত করিয়া ইংরেজ আমাদের নিরুপায় দেশকে চিরদিনের মতো ভাঙিয়া রাখিতেছেন।

ইংরেজি ভাষা কোনো উপায়েই আমাদের দেশের সাধারণ ভাষা হইতে পারে না। কারণ, তাহা অত্যন্ত উৎকট বিদেশী। এবং যে-সকল ভাষার ভিত্তি বহুসহস্র বৎসরের প্রাচীন ও মহৎ সংস্কৃত বাণীর মধ্যে নিহিত, এবং যে-সকল ভাষা বহুসহস্র বৎসরের পুরাতন কাব্য দর্শন সমাজরীতি ও ধর্মনীতি হইতে বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া নরনারীর হৃদয়কে বিবিধরূপে সজল সফল শস্যশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কখনোই মরিবার নহে।

কিন্তু সেই সংস্কৃতমূলক ভাষা রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানা প্রকার বাধায় শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্থানে স্বতন্ত্ররূপে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের মধ্যে শক্তিপরীক্ষা ও যোগ্যতমের জয়চেষ্টার অবসর হয় নাই।

এক্ষণে সেই অবসরের সূত্রপাত হইয়াছিল। এবং আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি ভাষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যদি প্রাকৃতিক নির্বাচনের স্বাধীন হস্ত থাকে তবে বাংলা ভাষার পরাভবের কোনো আশঙ্কা নাই।

প্রথমত, বাঙালিভাষীর জনসংখ্যা ভারতবর্ষের অপরভাষীর তুলনায় অধিক।

---

১ অন্যসূত্রে ভারতবর্ষে ভাষাবিচ্ছেদ-সৃষ্টির প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন ১৩০৯) ; দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে উদ্‌ধৃত ঐ প্রবন্ধের বর্জিতাংশ।

প্রায় পাঁচ কোটি লোক বাংলা বলে।

কিন্তু আপন সাহিত্যের মধ্যে বাংলা যে-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে তাহাতেই তাহার অমরতা সূচনা করে।

এক্ষণে ভারতবর্ষে বাংলা ছাড়া বোধ হয় এমন কোনো ভাষাই নাই, যে-ভাষার আধুনিক সাহিত্যে ইংরেজিশিক্ষিত এবং ইংরেজি-অনভিজ্ঞ উভয় সম্প্রদায়েরই সজাগ ঔৎসুক্য। অন্যত্র শিক্ষিত ব্যক্তিরা জনসাধারণকে শিক্ষাদানের জন্যই দেশীয় ভাষা প্রধানত অবলম্বনীয় জ্ঞান করেন— কিন্তু তাঁহাদের মনের শ্রেষ্ঠভাব ও নূতন উদ্‌ভাবন-সকলকে তাঁহারা ইংরেজি ভাষায় রক্ষা করিতে ব্যগ্র।

বাংলাদেশে ইংরেজিতে প্রবন্ধরচনার প্রয়াস প্রায় তিরোধান করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ যে-সকল ছাত্রের রচনা করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, বাংলাসাহিত্য অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে, আমাদের সাহিত্য এমন একটি সবেগতা, এমন একটি প্রবলতা লাভ করিয়াছে। চতুর্দিকে জীবনদান এবং জীবনগ্রহণ করিবার শক্তি ইহার জন্মিয়াছে। ইহার দেশপরিধি যত বাড়িবে ইহার জীবনীশক্তিও তত বিপুলতর হইয়া উঠিবে। এবং বেগবান বৃহৎ নদী যেমন যে-দেশ দিয়া যায় সে-দেশ স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে বাণিজ্যে ও ধনে-ধান্যে ধন্য হইয়া উঠে, তেমনই ভারতবর্ষে যতদূর পর্যন্ত বাংলা ভাষার ব্যাপ্তি হইবে ততদূর পর্যন্ত একটা মানসিক জীবনের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া দুই উপকূলকে নিত্য নব নব ভাবসম্পদে ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলিবে।

সেইজন্য বলিতেছিলাম, আসাম ও উড়িষ্যায় বাংলা যদি লিখন-পঠনের ভাষা হয় তবে তাহা যেমন বাংলাসাহিত্যের পক্ষে শুভজনক হইবে তেমনই সেই দেশের পক্ষেও।

কিন্তু ইংরেজের কৃত্রিম উৎসাহে বাংলার এই দুই উপকণ্ঠবিভাগের একদল শিক্ষিত যুবক বাংলাপ্রচলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা তুলিয়া স্থানীয় ভাষার জয়-কীর্তন করিতেছেন।

এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, দেশীয় ভাষা আমাদের রাজভাষা নহে, সে-ভাষার সাহায্যে বিদ্যালয়ের উপাধি বা মোটা বেতন লাভের আশা নাই। অতএব দেশীয় সাহিত্যের একমাত্র ভরসা তাহার প্রজাসংখ্যা, তাহার

লেখক ও পাঠক-সাধারণের ব্যাপ্তি। খণ্ড বিচ্ছিন্ন দেশে কখনোই মহৎ সাহিত্য জন্মিতে পারে না। তাহা সংকীর্ণ গ্রাম্য প্রাদেশিক আকার ধারণ করে। তাহা ঘোরো এবং আটপৌরে হইয়া উঠে, তাহা মানব-রাজদরবারের উপযুক্ত নয়।

আসামি এবং উড়িয়া যদি বাংলার সগোত্র ভাষা না হইত তবে আমাদের এত কথা বলিবার কোনো অধিকার থাকিত না। বিশেষত শব্দভাণ্ডারের দৈন্যবশত সাধুসাহিত্যে লেখকগণ প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য, অতএব সাহিত্যগ্রাহ্য ভাষায় অনৈক্য আরো সামান্য। লেখক কটকে বাসকালে উড়িয়া বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাহার সহিত সাধুবাংলার প্রভেদ তর্জনীর সহিত মধ্যম অঙ্গুলির অপেক্ষা অধিক নহে।

একটি উড়িয়া ভাষায় লিখিত ক্ষুদ্র কাহিনী এখানে উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম। কোনো বাঙালিকে ইহার অর্থ বলিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না।

> কেতে বেলে এক হরিণ পীড়িত হেবারু তাহার আত্মীয় ও পরিবারীয় পশুগণ তাকু দেখিবা নিমন্তে আসি চারিদিগরে শুষ্ক ও সরস যেতে তৃণ পল্লবিথিলা, তাহা সবু খায়ি পকাইলা। হরিণর পীড়ার শান্ত হেলা-উত্তারু সে কিচ্ছি আহার করিবা নিমন্তে ইচ্ছা কলা। মাত্র কিছিহিঁ খাদ্য পাইলা নাহিঁ, তহিঁরে ক্ষুধারে তাহার প্রাণ বিয়োগ হেলা। ইহার তাৎপর্য এহি— অবিবেচক বন্ধু থিবাঠারু বরং বন্ধু ন থিবা ভল।

ইংরেজ লেখকগণ বাংলার এই-সকল উপভাষাগুলিকে স্বতন্ত্র ভাষারূপে প্রমাণ করিবার জন্য যে-সকল যুক্তি প্রয়োগ করেন তাহা যে কতদূর অসংগত ডাক্তার ব্রাউন-প্রণীত আসামি ব্যাকরণ আলোচনা করিলে তাহা দেখা যায়।

তিনি উচ্চারণপ্রভেদের যে-যুক্তি দিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিলে পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলাকে পৃথক ভাষায় ভাগ করিতে হয়। আসামিরা চ-কে দন্ত্য স (ইংরেজি s) জ-কে দন্ত্য জ (ইংরেজি z)-রূপে উচ্চারণ করে, পূর্ববাংলাতেও সেই নিয়ম। তাহারা শ-কে হ বলে, পূর্ববঙ্গেও তাই। তাহারা বাক্য-কে 'বাইক্য', মান্য-কে 'মাইন্য' বলে, এ সম্বন্ধেও পূর্ববঙ্গের সহিত তাহার প্রভেদ দেখি না।

ব্রাউন বলিয়াছেন, উচ্চারণের প্রতি লক্ষ করিয়া দেখিলে আসামির সহিত হিন্দুস্থানির ঐক্য পাওয়া যায় এবং সংস্কৃতমূলক শব্দের আসামি উচ্চারণ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়, আসামি বাংলা হইতে জাত হয় নাই।

অথচ আশ্চর্য এই যে, মূর্ধন্য ষ আসামি ভাষায় খ-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়, ইহা ছাড়া আসামির সহিত হিন্দুস্থানির আর-কোনো সাদৃশ্য নাই এবং তাহার সমস্ত সাদৃশ্যই বাংলার সহিত।

অকারের বিশুদ্ধ উচ্চারণই হিন্দুস্থানির প্রধান বিশেষত্ব, হিন্দুস্থানিতে বট শব্দ ইংরেজি but শব্দের অনুরূপ, বাংলায় তাহা ইংরেজি bought শব্দের ন্যায়। পাশ্চাত্ত্য ও দাক্ষিণাত্য গৌড়ীয় উচ্চারণের সহিত প্রাচ্য গৌড়ীয়ের এই সর্বপ্রধান প্রভেদ। আসামি ভাষা এ-সম্বন্ধে বাংলার মতো। ঐকারের উচ্চারণেও তাহা দেখা যায়। বাংলা 'ঐ' ইংরেজি stoic শব্দের oi, হিন্দি 'ঐ' ইংরেজি style শব্দের y। ঔ শব্দও তদ্রূপ।

বাংলায় অকার উচ্চারণ স্থানবিশেষে; যথা, ইকার উকারের পূর্বে হ্রস্ব ওকারে পরিণত হয়। কল, কলি ও কলু শব্দের উচ্চারণভেদ আলোচনা করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। আসামি ভাষার উচ্চারণে বাংলার এই বিশেষত্ব আছে।

আসামিতে ইকারের পূর্বে ওকার প্রায় উকারে পরিণত হয়; যথা, 'বোলে' ক্রিয়া (বাংলা, বলে) বিভক্তিপরিবর্তনে 'বুলিছে' হয়। বাংলাতেও, খোলে খুলিছে, দোলে দুলিছে। বোল বুলি, খোল খুলি, ঝোলা ঝুলি, গোলা গুলি, ইত্যাদি।

যুক্ত অক্ষরের উচ্চারণেও প্রভেদ দেখি না, আসামিরাও স্মরণ-কে স্বরণ, স্বরূপ-কে সরূপ, পক্ষী-কে পক্‌খী বলে।

অন্তঃস্থ ব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বাংলাতেও এই উচ্চারণ আছে, কিন্তু বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব-এ অক্ষরের ভেদ নাই, আসামিতে সেই ভেদচিহ্ন আছে। তাহা বলিয়া এ কথা কেহ মনে করিবেন না, মহারাষ্ট্রীদের ন্যায় আসামিরা সংস্কৃত শব্দে অন্তঃস্থ ও বর্গীয় ব-এর প্রভেদ রক্ষা করিয়া থাকে। আমরা যেখানে 'পাওয়া' লিখি আসামিরা সেখানে 'পবা' লেখে। আমাদের ওয়া এবং তাহাদের বা উচ্চারণে একই, লেখায় ভিন্ন।

যাহাই হউক, যে-ভাষা ভ্রাতাদের মধ্যে অবাধ ভাবপ্রবাহ সঞ্চারের জন্য হওয়া উচিত, তাহাকেই প্রাদেশিক অভিমান ও বৈদেশিক উত্তেজনায় পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীরস্বরূপে দৃঢ় ও উচ্চ করিয়া তুলিবার যে-চেষ্টা তাহাকে স্বদেশহিতৈষিতার লক্ষণ বলা যায় না এবং তাহা সর্বতোভাবে অশুভকর।

শ্রাবণ ১৩০৫

বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে ভুল করা মানবধর্ম, বিশেষত বাঙালির পক্ষে ইংরেজি ভাষায় ভুল করা। সেই প্রবাদের বাকি অংশে বলে, মার্জনা করা দেবধর্ম। কিন্তু বাঙালির ইংরেজি-ভুলে ইংরেজরা সাধারণত দেবত্ব প্রকাশ করেন না।

আমাদের ইস্কুলে-শেখা ইংরেজিতে ভুল হইবার প্রধান কারণ এই যে, সে-বিদ্যা পুঁথিগত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজি ভাষার ঠিক মর্মগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এইজন্য অনেক খাঁটি ইংরেজের ন্যায় তাঁহারা হয়তো ব্যাকরণে ভুল করিতেও পারেন, কিন্তু ভাষার প্রাণগত মর্মগত ভুল করা তাঁহাদের পক্ষে বিরল। এ দেশে থাকিয়া যাঁহারা ইংরেজি শেখেন, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যাকরণকে বাঁচাইয়াও ভাষাকে বধ করিতে ছাড়েন না। ইংরেজগণ তাহাতে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করেন।

সেইজন্য আমাদেরও বড়ো ইচ্ছা করে, যে-সকল ইংরেজ এ দেশে সুদীর্ঘকাল বাস করিয়া, দেশীভাষা শিক্ষার বিশেষ চেষ্টা করিয়া ও সুযোগ পাইয়াও সে-ভাষা সম্বন্ধে ভুল করেন তাঁহাদের প্রতি হাস্যরস বর্ষণ করিয়া পাল্‌টা জবাবে গায়ের ঝাল মিটাই।

সন্ধান করিলে এ-সম্বন্ধে দুই-একটা বড়ো বড়ো দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। বাবু-ইংরেজির আদর্শ প্রায় অশিক্ষিত দরিদ্র উমেদারদিগের দরখাস্ত হইতে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সহিত বাংলার ভূতপূর্ব সিবিলিয়ান জন্‌ বীম্‌স্‌ সাহেবের তুলনা হয় না। বীম্‌স্‌ সাহেব চেষ্টা করিয়া বাংলা শিখিয়াছেন; বাংলাদেশেই তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ়বয়স যাপন করিয়াছেন; বহু বৎসর ধরিয়া বাঙালি সাক্ষীর জবানবন্দী ও বাঙালি মোক্তারের আবেদন শুনিয়াছেন এবং বাঙালি সাহিত্যেরও রীতিমত চর্চা করিয়াছেন, এরূপ শুনা যায়।

কেবল তাহাই নয়, বীম্‌স্‌ সাহেব বাংলা ভাষার এক ব্যাকরণও রচনা করিয়াছেন। বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ রচনা স্পর্ধার বিষয়; পেটের দায়ে দরখাস্ত রচনার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। অতএব সেই ব্যাকরণে যদি পদে পদে এমন সকল ভুল দেখা যায়, যাহা বাঙালি মাত্রেরই কাছে অত্যন্ত অসংগত ঠেকে, তবে সেই সাহেবি অজ্ঞতাকে পরিহাস করিবার

প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

কিন্তু যখন দেখি আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই, তখন প্রলোভন সংবরণ করিয়া লইতে হয়। আমরা কেন বাংলা ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখি, আমাদের কোনো শিক্ষিত লোককেও বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া যায় কেন, এ-সব কথা ভাবিয়া দেখিলে নিজের উপর ধিক্কার এবং সাহেবের উপর শ্রদ্ধা জন্মে।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এই ভ্রমসংকুল ব্যাকরণটি লিখিতে গিয়াও বিদেশীকে প্রচুর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শুদ্ধমাত্র জ্ঞানানুরাগ দ্বারা চালিত হইয়া তিনি এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জ্ঞানানুরাগ ও দেশানুরাগ এই দুটোতে মিলিয়াও আমাদের দেশের কোনো লোককে এ কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই। অথচ আমাদের পক্ষে এই অনুষ্ঠানের পথ বিদেশীর অপেক্ষা অনেক সুগম।

বীম্‌স্‌ সাহেব তাঁহার ব্যাকরণে যে-সমস্ত ভুল করিয়াছেন, সেইগুলি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও মাতৃভাষা সম্বন্ধে আমাদের অনেক শিক্ষালাভ হইতে পারে। অতিপরিচয়-বশত ভাষার যে-সমস্ত রহস্য সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রশ্নমাত্র উত্থাপিত হয় না, সেইগুলি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং বিদেশীর মধ্যস্থতায় স্বভাষার সহিত যেন নবতর এবং দৃঢ়তর পরিচয় স্থাপিত হয়।

এই ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ে বাংলা ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ইংরেজি মুদ্রিত সাহিত্যে অনেক স্থলে বানানের সহিত উচ্চারণের সংগতি নাই। ইংরেজ লেখে একরূপ, পড়ে অন্যরূপ। বাংলাতেও অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে বানানের সহিত উচ্চারণের পার্থক্য আছে, তাহা সহসা আমাদের মনে উদয় হয় না।

ব্যয় শব্দের ব্য, অব্যয় শব্দের ব্য এবং ব্যতীত শব্দের ব্য উচ্চারণে প্রভেদ আছে; লেখা এবং খেলা শব্দের এ-কারের উচ্চারণ ভিন্নরূপ। সস্তা শব্দের দুই দন্ত্য স-এর উচ্চারণ এক নহে। শব্দ শব্দের শ-অক্ষরবর্তী অকার এবং দ-অক্ষরবর্তী অকারে প্রভেদ আছে। এমন বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

এই উচ্চারণবিকারগুলি অনেক স্থলেই নিয়মবদ্ধ, তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

বীম্‌স্‌ বলিতেছেন, বাংলা স্বরবর্ণ অ কোথাও বা ইংরেজি not rock প্রভৃতি শব্দের স্বরের মতো, কোথাও বা bone শব্দের স্বরের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

স্থানভেদে অ স্বরের এইরূপ বিভিন্নতা বীম্‌স্‌ সাহেবের স্বদেশীয়গণ ধরিতে না পারিয়া বাংলা উচ্চারণকে অদ্ভুত করিয়া তোলেন। বাঙালি গরু-কে গোরু উচ্চারণ করেন, ইংরেজ তাহাকে যথাপঠিত উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি কোনো বাংলা ব্যাকরণে এই সাধারণ নিয়ম লিখিত থাকিত যে, ইকার, উকার, ক্ষ এবং ণ ও ন-র পূর্বে প্রায় সর্বত্রই অকারের উচ্চারণ ওকারবৎ হইয়া যায়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ-প্রচলিত উচ্চারণের আদর্শ তাঁহাদের পক্ষে সুগম হইতে পারিত।

কিন্তু এই-সকল নিয়মের মধ্যে অনেক সূক্ষ্মতা আছে। আমরা বন মন ক্ষণ প্রভৃতি শব্দকে বোন মোন খোন রূপে উচ্চারণ করি, কিন্তু তিন অক্ষরের শব্দের বেলায় তাহার বিপর্যয় দেখা যায়; তনয় জনম ক্ষণেক প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।

আশা করি, বাংলার এই-সকল উচ্চারণের বৈচিত্র্য ও তাহার নিয়মনির্ণয়কে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তুচ্ছজ্ঞান করিবেন না।

বীম্‌স্‌ সাহেব লিখিতেছেন, সিলেব্‌লের (syllable) শেষে অ স্বরের লোপ হইয়া হসন্ত হয়। কলসী ও ঘটকী শব্দ তিনি তাহার উদাহরণস্বরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন।

লিখিত এবং কথিত বাংলার ব্যাকরণে প্রভেদ আছে। বীম্‌সের ব্যাকরণে কোথাও বা লিখিত বাংলার কোথাও বা কথিত বাংলার নিয়ম নির্দিষ্ট হওয়ায় অনেক স্থলে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সাধু ভাষায় লিখিত সাহিত্যে আমরা ঘটকী শব্দের ট হইতে অকার লোপ করি না। অপর পক্ষে বীম্‌স্‌ সাহেব যে-নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কী কথিত কী লিখিত কোনো বাংলাতেই সর্বত্র খাটে না; জনরব বনবাস বলবান পরচর্চা প্রভৃতি শব্দ তাহার উদাহরণ। এ স্থলে প্রথম সিলেব্‌ল-এ সংযুক্ত অকারের লোপ হয় নাই; অথচ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, জন বন বল এবং পর শব্দের শেষ অকার লুপ্ত হইয়া থাকে।

কলস দুই সিলেব্‌লে গঠিত, কল্‌+অস্‌, কিন্তু প্রথম সিলেব্‌লের পরবর্তী অকারের লোপ হয় নাই। ঘটক শব্দের দুই সিলেব্‌ল্‌, ঘট্‌+অক্‌, এখানেও অকার উচ্চারিত হয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে চিন্তা করিয়া দেখা যায়, বীম্‌স্‌ সাহেবের নিয়মকে আর-একটু সংকীর্ণ করিয়া আনিলেই তাহার সার্থকতা পাওয়া যাইতে পারে।

আঁচল এবং আঁচ্‌লা, আপন এবং আপ্‌নি, চামচ এবং চাম্‌চে, আঁচড় এবং আঁচ্‌ড়ানো, ঢোলক এবং ঢল্‌কো, পরশ এবং পর্‌শু, দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরবর্তী সিলেব্‌ল্‌ স্বরান্ত হইলে পূর্ব সিলেব্‌লের অকার লোপ পায়, পরন্তু হসন্তের পূর্ববর্তী অকার কিছুতেই লোপ পায় না।

কিন্তু পূর্বোদ্‌ধৃত বনবাস জনরব বলবান প্রভৃতি শব্দে এ-নিয়ম খাটে নাই। তাহাতে অকার ও আকারের পূর্ববর্তী অ লোপ পায় নাই।

অথচ, পর্‌কলা আল্‌পনা অব্‌সর (লিখিত ভাষায় নহে) প্রভৃতি প্রচলিত কথায় বীম্‌সের নিয়ম খাটে। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে-সকল সংস্কৃত শব্দ ভাষায় নূতন প্রবেশ করিয়াছে এবং জনসাধারণের দ্বারা সর্বদা ব্যবহৃত হয় না, তাহাতে সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়ম এখনো রক্ষিত হয়। কিন্তু 'পাঠ্‌শালা' প্রভৃতি সংস্কৃত কথা যাহা চাষাভুষারাও নিয়ত ব্যবহার করে, তাহাতে বাংলা ভাষার নিয়ম সংস্কৃত নিয়মকে পরাস্ত করিয়াছে।

বীম্‌স্‌ লিখিয়াছেন, বিশেষণ শব্দে সিলেব্‌লের অন্তর্বর্তী অকারের লোপ হয় না ; যথা, ভাল ছোট বড়।

রামমোহন রায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যে গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে তিনিও লেখেন :

> গৌড়ীয় ভাষায় অকারান্ত বিশেষণ শব্দ অকারান্ত উচ্চারণ হয়, যেমন ছোট খাট ; এতদ্‌ভিন্ন তাবৎ অকারান্ত শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়, যেমন ঘট্‌ পট্‌ রাম্‌ রাম্‌দাস্‌ উত্তম্‌ সুন্দর্‌ ইত্যাদি।

রামমোহন রায়ের উদ্‌ধৃত দৃষ্টান্ত তাঁহার নিয়মকে অপ্রমাণ করিতেছে তাহা তিনি লক্ষ করেন নাই। উত্তম ও সুন্দর শব্দ বিশেষণ শব্দ। যদি কেহ বলেন উহা সংস্কৃত শব্দ, খাঁটি বাংলা শব্দেও ব্যতিক্রম মিলিবে ; যথা, নরম গরম।

তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, খাঁটি বাংলায় দুই অক্ষরের অধিকাংশ বিশেষণ শব্দ হলন্ত নহে।

প্রথমেই মনে হয়, বিশেষণ শব্দ বিশেষরূপে অকারান্ত উচ্চারিত হইবে, এ নিয়মের কোনো সার্থকতা নাই। অতএব, ছোট বড় ভাল প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ যে সাধারণ বাংলা শব্দের ন্যায় হসন্ত হয় নাই, তাহার কারণটা ওই শব্দগুলির মূল সংস্কৃত শব্দে পাওয়া যাইবে। 'ভালো' শব্দ ভদ্র শব্দজ, 'বড়ো' বৃদ্ধ হইতে উৎপন্ন, 'ছোটো' ক্ষুদ্র শব্দের অপভ্রংশ। মূল শব্দগুলির শেষবর্ণ যুক্ত,—যুক্তবর্ণের অপভ্রংশে হসন্ত বর্ণ না হওয়ারই সম্ভাবনা।

কিন্তু এ নিয়ম খাটে না। নৃত্য-র অপভ্রংশ নাচ, পঙ্ক—পাঁক, অঙ্ক—আঁক, রঙ্গ—রাং, ভট্ট—ভাট, হস্ত—হাত, পঞ্চ—পাঁচ ইত্যাদি।

অতএব নিশ্চয়ই বিশেষণের কিছু বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব আরো চোখে পড়ে যখন দেখা যায়, বাংলার অধিকাংশ দুই-অক্ষরের বিশেষণ, যাহা সংস্কৃত মূল শব্দ অনুসারে অকারান্ত হওয়া উচিত ছিল, তাহা আকারান্ত হইয়াছে।

যথা : সহজ—সোজা, মহৎ—মোটা, রুগ্ন—রোগা, ভগ্ন—ভাঙা, শ্বেত—শাদা, অভিষিক্ত—ভিজা, খঞ্জ—খোঁড়া, কাণ—কাণা, লম্ব—লম্বা, সুগন্ধ—সোঁধা, বক্র—বাঁকা, তিক্ত—তিতা, মিষ্ট—মিঠা, নগ্ন—নাগা, তির্যক্—টেড়া, কঠিন—কড়া।

দ্রষ্টব্য এই যে, 'কর্ণ' হইতে বিশেষ্য শব্দ কান হইয়াছে, অথচ কান শব্দ হইতে বিশেষণ শব্দ কানা হইল। বিশেষ্য শব্দ হইল ফাঁক, বিশেষণ হইল ফাঁকা ; বাঁক শব্দ বিশেষ্য, বাঁকা শব্দ বিশেষণ।

সংস্কৃত ভাষায় ক্ত প্রত্যয়যোগে যে-সকল বিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয়, বাংলায় তাহা প্রায়ই আকারান্ত বিশেষণ পদে পরিণত হয় ; ছিন্নবস্ত্র বাংলায়—ছেঁড়া বস্ত্র, ধূলিলিপ্ত শব্দ বাংলায়—ধুলোলেপা, কর্ণকর্তিত—কানকাটা ইত্যাদি।

বিশেষ্য শব্দ চন্দ্র হইতে চাঁদ, বন্ধ হইতে বাঁধ, কিন্তু বিশেষণ শব্দ মন্দ হইতে হইল— মাদা। এক শব্দকে বিশেষরূপে বিশেষণে পরিণত করিলে 'একা' হয়।

এইরূপ বাংলা দুই-অক্ষরের বিশেষণ অধিকাংশই আকারান্ত। যেগুলি অকারান্ত, হিন্দিতে সেগুলিও আকারান্ত ; যথা, ছোটা বড়া ভালা।

ইহার একটা কারণ আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি। স্বর্গগত উমেশচন্দ্র বটব্যালের রচনা হইতে দীনেশবাবু তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে নিম্নলিখিত ছত্রকয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

তাম্রশাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে ক-এর ব্যবহার কিছু বেশি। দূত স্থানে দূতক, হট্ট স্থানে হট্টিকা, বাট স্থানে বাটক, লিখিত স্থানে লিখিতক, এরূপ শব্দপ্রয়োগ কেবল উদ্ধৃত অংশমধ্যেই দেখা যায়,···সমুদায় শাসনে আরো অনেক দেখা যাইবে।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন :

এই ক (যথা, বৃক্ষক চারুদত্তক পুত্রক) প্রাকৃতে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। গাথা ভাষায় এই ক-এর প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা অধিক ; যথা, ললিতবিস্তরের একবিংশাধ্যায়ে :

স্থবসন্তকে ঋতুবরে আগতকে
রতিমো প্রিয়া ফুল্লিতপাদপকে।
তবরূপ স্বরূপ সুশোভনকো
বশবর্তিসুলক্ষণবিচিত্রতকো॥
বয়ং জাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ
সুখকারণ দেব নরাণবসম্ভতিকাঃ।
উত্থি লঘু পরিভুঞ্জ সুযৌবনকং
দুর্লভ বোধি নিবর্তয় মানসকম্॥

দীনেশবাবু প্রাচীন বাংলায় এই ক প্রত্যয়ের বাহুল্য প্রমাণ করিয়াছেন।

এই ক-এর অপভ্রংশে আকার হয় ; যেমন ঘোটক হইতে ঘোড়া, ক্ষুদ্রক হইতে ছোঁড়া, তিলক হইতে টিকা, মধুক হইতে মহুয়া, নাবিক হইতে নাইয়া, মস্তক হইতে মাথা, পিষ্টক হইতে পিঠা, শীষক হইতে শীষা, একক হইতে একা, চতুষ্ক হইতে চৌকা, ফলক হইতে ফলা, হীরক হইতে হীরা। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, লোহক হইতে লোহা, স্বর্ণক হইতে সোনা, কাংস্যক হইতে কাঁসা, তাম্রক হইতে তামা হইয়াছে।

আমরা কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাসূচকভাবে রাম-কে রামা, শ্যাম-কে শ্যামা, মধু-কে মোধো (অর্থাৎ মধুয়া), হরি-কে হরে (অর্থাৎ হরিয়া) বলিয়া থাকি ; তাহারও উৎপত্তি এইরূপে। অর্থাৎ, রামক শ্যামক মধুক হরিক শব্দ ইহার মূল। সংস্কৃতে যে হ্রস্ব-অর্থে ক প্রত্যয় হয়, বাংলায় উক্ত দৃষ্টান্তগুলি তাহার নিদর্শন।

দুই এক স্থলে মূল শব্দের ক প্রায় অবিকৃত আছে : যথা, হালকা, ইহা লঘুক শব্দজ। লহুক হইতে হলুক ও হলুক হইতে হালকা।

এই ক প্রত্যয় বিশেষণেই অধিক, এবং দুই-অক্ষরের ছোটো ছোটো কথাতেই ইহার প্রয়োগসম্ভাবনা বেশি। কারণ, বড়ো কথাকে ক সংযোগে বৃহত্তর করিলে তাহা ব্যবহারের পক্ষে কঠিন হয়। এইজন্যই বাংলা দুই-অক্ষরের বিশেষণ যাহা অকারান্ত হওয়া উচিত ছিল তাহা অধিকাংশই আকারান্ত। যে-সকল বিশেষণ শব্দ দুই-অক্ষরকে অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের ঈষৎ ভিন্নরূপ বিকৃতি হইয়াছে; যথা, পাঠকক হইতে পড়ুয়া ও তাহা হইতে পোড়ো, পতিতক হইতে পড়ুয়া ও পোড়ো, মধ্যমক—মেঝুয়া মেঝো, উচ্ছিষ্টক—এঁঠুয়া এঁঠো, জলীয়ক—জলুয়া জোলো, কাষ্ঠিয়ক—কাঠুয়া কেঠো ইত্যাদি। অনুরূপ দুই-একটি বিশেষ্য পদ যাহা মনে পড়িল তাহা লিখি। কিঞ্চিলিক শব্দ হইতে কেঁচুয়া ও কেঁচো হইয়াছে। স্বল্পাক্ষরক পেচক শব্দ হইতে পেঁচা ও বহ্বক্ষরক কিঞ্চিলিক হইতে কেঁচো শব্দের উৎপত্তি তুলনা করা যাইতে পারে। দীপরক্ষক শব্দ হইতে দেরখুয়া ও দেরখো আর-একটি দৃষ্টান্ত।

বাংলা বিশেষণ সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয় অনেক আছে, এ স্থলে তাহার বিস্তারিত অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

বীম্‌স্‌ সাহেব বাংলা উচ্চারণের একটি নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি বলেন চলিত কথায় আ স্বরের পর ঈ স্বর থাকিলে সাধারণত উভয়ে সংকুচিত হইয়া এ হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপে দিয়াছেন, খাইতে—খেতে, পাইতে—পেতে। এইসঙ্গে বলিয়াছেন, in less common words অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দে এইরূপ সংকোচ ঘটে না; যথা, গাইতে হইতে গেতে হয় না।

গাইতে শব্দ খাইতে ও পাইতে শব্দ হইতে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত বলিয়া কেন গণ্য হইবে বুঝা যায় না। তাহার অপরাধের মধ্যে সে একটি নিয়ম-বিশেষের মধ্যে ধরা দেয় না। কিন্তু তাহার সমান অপরাধী আরো মিলিবে। বাংলায় এই-জাতীয় ক্রিয়াপদ যে-কয়টি আছে, সবগুলি একত্র করা যাক; খাইতে গাইতে চাইতে ছাইতে ধাইতে নাইতে পাইতে বাইতে ও যাইতে। এই নয়টির মধ্যে কেবল খাইতে পাইতে ও যাইতে, এই তিনটি শব্দ বীম্‌স্‌ সাহেবের নিয়ম পালন করে, বাকি ছয়টি অন্য নিয়মে চলে।

এই ছয়টির মধ্যে চারিটি শব্দের মাঝখানে একটা হ লুপ্ত হইয়াছে দেখা যায়; যথা, গাহিতে চাহিতে নাহিতে ও বাহিতে (বহন করিতে)।

হ আশ্রয় করিয়া যে ইকারগুলি আছে তাহার বল অধিক দেখা যাইতেছে। ইহার অনুকূল অপর দৃষ্টান্ত আছে। করিতে চলিতে প্রভৃতি শব্দে ইকার লোপ হইয়া করতে চলতে হয়; হইতে শব্দের ইকার লোপ হইয়া 'হতে' এবং লইতে শব্দের ইকার স্থানভ্রষ্ট হইয়া 'নিতে' হয়। কিন্তু, বহিতে সহিতে কহিতে শব্দের ইকার বইতে সইতে কইতে শব্দের মধ্যে টিঁকিয়া যায়। অথচ সমস্ত বর্ণমালায় হ ব্যতীত আর-কোনো অক্ষরের এরূপ ক্ষমতা নাই।

লইতে শব্দ লভিতে শব্দ হইতে উৎপন্ন; ভ হ-এ পরিণত হইয়া 'লহিতে' হয়। তদুৎপন্ন নিতে শব্দে ইকার যদিচ স্থানচ্যুত হইয়াছে তথাপি হ-এর জোরে টিঁকিয়া গেছে।

বীম্‌স্ তাঁহার উল্লিখিত নিয়মে একটা কথা বলেন নাই। তাঁহার নিয়ম দুই-অক্ষরের কথায় খাটে না। হাতি শব্দে কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু হাতিয়ার শব্দের বিকারে হেতের হয়। আসি শব্দ ঠিক থাকে; 'আসিয়া' হয়—আস্যা, পরে হয়—এসে। খাই শব্দে পরিবর্তন হয় না; খাইয়া হয়—খ্যায়া, পরে হয়—খেয়ে। এইরূপে হাঁড়িশাল হইতে হয়—হেঁশেল।

এ স্থলে এই নিয়মের চূড়ান্ত পর্যালোচনা হইল না; আমরা কেবল পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম।

'এ' স্বরবর্ণ কোথাও বা ইংরেজি came শব্দস্থিত a স্বরের মতো, কোথাও বা lack শব্দের a-র মতো উচ্চারিত হয়, বীম্‌স্ তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন। 'এ' স্বরের উচ্চারণবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমরা সাধনা পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। বীম্‌স্ সাহেব লিখিয়াছেন, যাওয়া-সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ গেল শব্দের উচ্চারণ গ্যাল হইয়াছে, গিলিবার সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ গেল শব্দের উচ্চারণে বিশুদ্ধ একার রক্ষিত হইয়াছে। তিনি বলেন অভ্যাস ব্যতীত ইহার নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই। কিন্তু এই ক্রিয়াপদগুলি সম্বন্ধে একটি সহজ নিয়ম আছে।

যে-সকল ক্রিয়াপদের আরম্ভ-শব্দে ইকার আছে, যথা, গিল মিল ইত্যাদি, তাহারা ইকারের পরিবর্তে একার গ্রহণ করিলে একারের উচ্চারণ বিশুদ্ধ থাকে; যথা, গিলন হইতে গেলা, মিলন হইতে মেলা (মেলন শব্দ হইতে যে মেলা-র উৎপত্তি তাহার উচ্চারণ ম্যালা), লিখন হইতে লেখা, শিক্ষণ হইতে শেখা ইত্যাদি। অন্য সর্বত্রই একারের উচ্চারণ অ্যা হইয়া যায়; যথা, খেলন—খেলা, ঠেলন—ঠেলা, দেখন—দেখা ইত্যাদি। অর্থাৎ গোড়ায় যেখানে

ই থাকে সেটা হয় এ, গোড়ায় যেখানে এ থাকে সেটা হয় অ্যা। গোড়ায় কোথায় এ আছে এবং কোথায় ই আছে, তাহা ইতে প্রত্যয়ের দ্বারা ধরা পড়ে; যথা, গিলিতে মিলিতে লিখিতে শিখিতে মিটিতে পিটিতে; অন্যত্র, খেলিতে ঠেলিতে দেখিতে ঠেকিতে বেঁকিতে মেলিতে হেলিতে ইত্যাদি।

বীম্‌স্‌ লিখিয়াছেন, ও এবং য় পরে পরে আসিলে তাহার উচ্চারণ প্রায় ইংরেজি w-র মতো হয়; যথা, ওয়াশিল তল্‌ওয়ার ওয়ার্ড রেলওয়ে ইত্যাদি। একটা জায়গায় ইহার ব্যতিক্রম আছে, তাহা লক্ষ না করিয়া সাহেব একটি অদ্ভুত বানান করিয়াছেন; তিনি ইংরেজি will শব্দকে উয়িল অথবা উইল না লিখিয়া ওয়িল লিখিয়াছেন। ওয় সর্বত্রই ইংরেজি w-র পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে, কেবল এই 'ও' ইকারের পূর্বে উ না হইয়া যায় না। ব-এর সহিত যফলা যোগে দুই-তিন রকম উচ্চারণ হয় তাহা বীম্‌স্‌ সাহেব ধরিয়াছেন, কিন্তু দৃষ্টান্তে অদ্ভুত ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ব্যবহার-এর উচ্চারণ বেভার, ব্যক্তি-র উচ্চারণ বিক্তি, এবং ব্যতীত শব্দের উচ্চারণ বিতীত।

তাহা ছাড়া, কেবল ব-এর সঙ্গে যফলা যোগেই যে উচ্চারণবৈচিত্র্য ঘটে তাহা নহে, সকল বর্ণ সম্বন্ধেই এইরূপ। ব্যবহার শব্দের ব্য এবং ত্যক্ত শব্দের ত্য উভয়েই যফলার স্থলে যফলা-আকার উচ্চারণ হয়। ইকারের পূর্বে যফলার উচ্চারণ এ হইয়া যায়, ব্যক্তি এবং ব্যতীত তাহার দৃষ্টান্ত। নব্য ভব্য প্রভৃতি মধ্য বা শেষাক্ষরবর্তী যফলা আশ্রয়বর্ণকে দ্বিগুণিত করে মাত্র। ইকারের পূর্বে যফলা যেমন একার হইয়া যায়, তেমনই ক্ষ-ও একার গ্রহণ করে; যেমন ক্ষতি শব্দকে কথিত ভাষায় খেতি উচ্চারণ করে। ইহার প্রধান কারণ, ক্ষ অক্ষরের উচ্চারণে আমরা সাধারণত যফলা যোগ করিয়া লই। এইজন্য ক্ষমা শব্দের ইতর উচ্চারণ খ্যামা।

আমরা বীম্‌স্‌ সাহেবের ব্যাকরণধৃত উচ্চারণ-পর্যায় অনুসরণ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে দুই-চারিটা কথা সংক্ষেপে বলিলাম। এ কথা নিশ্চিত যে, বাংলার উচ্চারণতত্ত্ব ও বর্ণবিকারের নিয়ম বাঙালির দ্বারা যথোচিত আলোচিত হয় নাই।

পৌষ ১৩০৫

উপসর্গ-সমালোচনা

মাছের ক্ষুদ্র পাখনাকে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহাদেরই চালনা দ্বারা মাছ দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে বিশেষ গতি লাভ করে। কেবল তাই নয়, প্রাণীতত্ত্ববিৎদের চোখে তাহা খর্বাকৃতি হাত-পায়েরই সামিল। তেমনই য়ুরোপীয় আর্য ভাষার prefix ও ভারতীয় আর্য ভাষার উপসর্গগুলি সাধারণত আমাদের চোখ এড়াইয়া যায় বলিয়া শব্দ ও ধাতুর অঙ্গে তাহাদের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে আমাদের হৃদয়ংগম হয় না। এবং তাহারা যে সম্ভবত আর্য ভাষার প্রথম বয়সে স্বাধীন শব্দরূপে ছিল এবং কালক্রমে খর্বতা প্রাপ্ত হইয়া পরাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ সংশয় আমাদের মনে স্থান পায় না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা ও পঞ্চম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'উপসর্গের অর্থবিচার' নামক প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ের প্রতি নূতন করিয়া আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। লেখক আমাদের মান্য গুরুজন সে একটা কারণ বটে, কিন্তু গুরুতর কারণ এই যে, তাঁহার প্রবন্ধে যে অসামান্য গবেষণা ও প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আমাদের মতো অধিকাংশ পাঠকের মনে সম্ভ্রম উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু ইতিমধ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চম ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় 'উপসর্গের অর্থ বিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা' আখ্যা দিয়া এক রচনা বাহির করিয়াছেন। সেই রচনায় তিনি প্রবন্ধলেখকের মতের কেবলই প্রতিবাদ করিয়াছেন, সমালোচিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধের কোথাও সমর্থনযোগ্য শ্রদ্ধেয় কোনো কথা আছে এমন আভাসমাত্র দেন নাই।

এ-সম্বন্ধে পাঠকদিগকে একটিমাত্র পরামর্শ দিয়া আমরা সংক্ষেপে কর্তব্য-সাধন করিতে পারি, সে আর কিছুই নহে, তাঁহারা একবার সমালোচিত প্রবন্ধ ও তাহার সমালোচনা একত্র করিয়া পাঠ করুন, তাহা হইলে উভয় প্রবন্ধের ওজনের প্রভূত প্রভেদ বুঝিতে তাঁহাদের ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইবে না। কিন্তু নিশ্চয় জানি অনেক পাঠকই শ্রমস্বীকারপূর্বক আমাদের এ পরামর্শ গ্রহণ

করিবেন না, সুতরাং নানা কারণে সংকোচসত্ত্বেও উপসর্গঘটিত আলোচনা সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন উপসর্গের অর্থবিচার সম্বন্ধে তিনি একটি পথ নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। এবং সে-পথ তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত কোনো গোপন পথ নহে, তাহা বিজ্ঞানসম্মত রাজপথ। তিনি দৃষ্টান্তপরম্পরা হইতে সিদ্ধান্তে নীত হইয়া উপসর্গগুলির অর্থ-উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। সেই চেষ্টার ফল সর্বত্র না-ও যদি হয়, তথাপি সেই প্রণালী একমাত্র সমীচীন প্রণালী।

প্রাচীন শব্দশাস্ত্রে এই প্রকার প্রণালী অবলম্বনে উপসর্গের অর্থনির্ণয় হইয়াছিল বলিয়া জানি না। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন, "আমাদের দেশীয় প্রাচীনতম শব্দাচার্যদিগের মতে উপসর্গগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একই উপসর্গের ধাতুভেদে প্রয়োগভেদে নানা অর্থ লক্ষিত হয়। ওই-সকল প্রয়োগের অর্থ অনুগত (generalize) করিয়া তাঁহারা এক-একটি উপসর্গের কতকগুলি করিয়া অর্থ স্থির করিয়াছেন।" কথা এই যে, তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ না থাকায় তাঁহাদের কথা আমরা মানিয়া লইতে পারি, পরখ করিয়া লইতে পারি না। এ সম্বন্ধে দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। মেদিনী-কোষকার অপ উপসর্গের নিম্নলিখিত অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন—অপকৃষ্টার্থঃ; বর্জনার্থঃ, বিয়োগঃ, বিপর্যয়ঃ; বিকৃতিঃ, চৌর্যং, নির্দেশঃ, হর্ষঃ। আমাদের মনে প্রথমে এই সংশয় উপস্থিত হয় যে, যে-অর্থ ক্রিয়ার বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত হইতে না পারে, তাহা উপসর্গ সম্বন্ধে প্রযুজ্য কিরূপে হয়। অপ উপসর্গের চৌর্য অর্থ সহজেই সংগত বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য অপচয় বা অপহরণ শব্দে চৌর্য অর্থ প্রকাশ করে, অপ উপসর্গের অপকৃষ্টার্থই তাহার কারণ। হরণ শব্দের অর্থ স্থানান্তর করণ, চয়ন শব্দে গ্রহণ বুঝায়; অপ উপসর্গযোগে তাহাতে দূষিত ভাবের সংস্রব. হইয়া চৌর্য অর্থ নিষ্পন্ন হয়। য়ুরোপীয় ভাষায় abduction শব্দের অর্থ অপহরণ— ducere ধাতুর অর্থ নয়ন, তাহার সহিত ab (অপ) উপসর্গ যুক্ত হইয়া নীচার্থে চৌর্য বুঝাইতেছে। অপ উপসর্গের হর্ষ অর্থ সম্বন্ধেও আমাদের ওইরূপ সন্দেহ আছে। কিন্তু প্রাচীন শব্দাচার্য কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া এই-সকল অর্থে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না; সুতরাং হয় তাঁহার কথা তর্কের অতীত বলিয়া মানিয়া

লইতে হয়, নয়তো বিতর্কের মধ্যেই থাকিতে হয়। দুর্গাদাস সং উপসর্গের নানা অর্থের মধ্যে 'ঔচিত্য' অর্থ নিদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য সমুচিত শব্দের দ্বারা ঔচিত্য ব্যক্ত হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহাতে সং উপসর্গের ঔচিত্য অর্থ সূচনা করে না। সংগতি, সমীচীনতা, সমীক্ষকারিতা, সমঞ্জস প্রভৃতি শব্দের অভ্যন্তরে ইঙ্গিতে যে ঔচিত্যের ভাব আছে, সং উপসর্গই তাহার মুখ্য ও মূল কারণ নহে। এরূপ বিচার করিতে গেলে উপসর্গের অর্থের অন্ত পাওয়া যায় না; তাহা হইলে বলা যাইতে পারে সং উপসর্গের অর্থ সম্মান এবং প্রমাণস্বরূপ— সম্মান, সমাদর, সম্ভ্রম, সমভ্যর্থন প্রভৃতি উদাহরণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। দুর্গাদাস সং উপসর্গের অর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সম্ প্রকর্ষাশ্লেষনৈরন্তর্যৌচিত্যাভি মুখ্যেষু; এই আভিমুখ্য অর্থ স্পষ্টতই সং উপসর্গের বিশেষ অর্থ নহে— কারণ, সং উপসর্গের যে আশ্লেষ অর্থ দেওয়া হইয়াছে আভিমুখ্য তাহার একটি অংশ, বৈমুখ্যও তাহার মধ্যে আসিতে পারে। সমাবেশ, সমাগম, সংকুলতা বলিলে যে আশ্লেষ বা একত্র হওন বুঝায় তাহার মধ্যে— আভিমুখ্য, বৈমুখ্য, উন্মুখতা অধোমুখতা, সমস্তই থাকিতে পারে; এ স্থলে বিশেষভাবে আভিমুখ্যের উল্লেখ করাতে অন্যগুলিকে নিরাকৃত করা হইয়াছে। যে-জনতায় নানা লোক নানা দিকে মুখ করিয়া আছে, এমন-কি কেহ কাহারো অভিমুখে নাই তাহাকেও জনসমাগম বলা যায়; কারণ, সং উপসর্গের মূল অর্থ আশ্লেষ, তাহার মধ্যে আভিমুখ্য থাকিলেও চলে না-থাকিলেও চলে। ইহাও দেখা যাইতেছে, উপসর্গ সম্বন্ধে প্রাচীন শব্দাচার্যদিগের অর্থতালিকায় পরস্পরের মধ্যে অনেক কমবেশি আছে। মেদিনী-কোষকার সং উপসর্গের যে 'শোভনার্থ' উল্লেখ করিয়াছেন দুর্গাদাসের টীকায় তাহা নাই; দুর্গাদাসের ঔচিত্য আভিমুখ্য অর্থ মেদিনী-কোষে দেখা যায় না। এই-সকল শব্দাচার্যের অগাধ পাণ্ডিত্য ও কুশাগ্রবুদ্ধিতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর দ্বারা পরীক্ষা করা কর্তব্য, এ-সম্বন্ধেও সংশয় করা উচিত নহে।

প্রাচীন শব্দাচার্যগণ সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, 'তাঁহারা কিন্তু প্রবন্ধকারের ন্যায় এক-একটি উপসর্গের সর্বত্রই একরূপ অর্থ হইবে, ইহা স্বীকার করেন না।' প্রবন্ধকারও কোথাও তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি উপসর্গগুলির মূল অর্থ সন্ধান করিয়াছেন এবং সেই এক অর্থ হইতে নানা

অর্থের পরিণাম কিরূপে হইতে পারে, তাহাও আলোচনা করিয়াছেন। য়ুরোপীয় e (ই) উপসর্গের একটা অর্থ অভাব, আর-এক অর্থ বহির্গমতা; educate শব্দের উৎপত্তিমূলক অর্থ বহির্নয়ন, edit শব্দের অর্থ বাহিরে দান, edentate শব্দের অর্থ দন্তহীন; কেহ যদি দেখাইয়া দেন যে, e উপসর্গের মূল অর্থ বহির্গমতা এবং তাহা হইতেই অভাব অর্থের উৎপত্তি, অর্থাৎ যাহা বাহির হইয়া যায় তাহা থাকে না, তবে তিনি e উপসর্গের বহু অর্থ স্বীকার করেন না এ কথা বলা অসংগত। অন্তর শব্দের এক অর্থ ভিতর, আর-এক অর্থ ফাঁক; যদি বলা যায় যে, ওই ভিতর অর্থ হইতেই ফাঁক অর্থের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ দুই সীমার ভিতরের স্থানকেই ফাঁক বলা যাইতে পারে, তবে তদ্দ্বারা অন্তর শব্দের দুই অর্থ অস্বীকার করা হয় না। পরন্তু তাহার মূল অর্থ যে দুই নহে, এক, এই কথাই বলা হইয়া থাকে; এবং মূল অর্থের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখিলে সাধারণত শব্দের প্রয়োগ এবং তাহার রূপান্তরকরণ যথামত হইতে পারে, এ কথাও অসংগত নহে। বস্তুত গুঁড়ি একটা হয় এবং ডাল অনেকগুলি হইয়া থাকে, ভাষাতত্ত্বের পদে পদে এ-নিয়মের পরিচয় পাওয়া যায়। একই ধাতু হইতে ঘৃণা, ঘৃত, ঘর্ম প্রভৃতি স্বতন্ত্রার্থক শব্দের উৎপত্তি হইলেও মূল ধাতুর অর্থভেদ কল্পনা করা সংগত নহে। বরঞ্চ এক ধাতুমূলক নানা শব্দের মধ্যে যে-অংশে কোনো একটা ঐক্য পাওয়া যায়, সেইখানেই ধাতুর মূল অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তেমনই এক উপসর্গের নানা অর্থভেদের মধ্যে যদি কোনো ঐক্য আবিষ্কার করা যায়, তবে সেই ঐক্যের মধ্যে যে সেই উপসর্গের আদি অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথা স্বভাবত মনে উদয় হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে ব্যাপ্তিসাধন প্রণালী দ্বারা (Generalization) উপসর্গের বিচিত্র ভিন্ন অর্থের মধ্য হইতে আশ্চর্য নৈপুণ্যসহকারে এক মূল অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে এই প্রথম চেষ্টা। সুতরাং সে-চেষ্টার ফল নানা স্থানে অসম্পূর্ণ থাকাই সম্ভব এবং পরবর্তী আলোচকগণ নব নব দৃষ্টান্ত ও তুলনার সহায়তায় উক্ত প্রবন্ধের সংশোধন ও পরিপোষণ করিয়া চলিবেন আশা করা যায়। বস্তুত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত আর্য ভাষার তুলনা করিয়া না দেখিলে উপসর্গের অর্থবিচার কখনোই সম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং উহার মধ্যে অনেক অংশ কাল্পনিক থাকিয়া যাইতে পারে; সেইরূপ তুলনামূলক সমালোচনাই এরূপ

প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট সমালোচনা। প্রাচীন শব্দাচার্য এইরূপ মত দিয়াছেন, এ কথা বলিয়া সমালোচনা করা চলে না।

প্রবন্ধকার মহাশয় প্রশ্বাস নিশ্বাস, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, প্রবাস নিবাস, প্রবেশ নিবেশ, প্রক্ষেপ নিক্ষেপ, প্রকৃষ্ট নিকৃষ্ট প্রভৃতি দৃষ্টান্তযোগে প্র এবং নি উপসর্গের মূল অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলেন প্র উপসর্গের লক্ষ সম্মুখের দিকে বাহিরের দিকে, নি উপসর্গের লক্ষ ভিতরের দিকে।

ইহাদের সমশ্রেণীয় য়ুরোপীয় উপসর্গও তাঁহার মত সমর্থন করিতেছে। projection, injection ; progress, ingress ; induction, production ; install, forestall ; জর্মান ভাষায় einfuhren— to introduce, vorfuhren—to produce। এরূপ দৃষ্টান্তের শেষ নাই।

প্র, নি, ; pro, in এবং vor, ein এক পর্যায়ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সমালোচক মহাশয় এক 'নিশ্বাস' শব্দ লইয়া প্রবন্ধকারের মত এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নিশ্বাস শব্দ প্রশ্বাস শব্দের বৈপরীত্যবাচক নহে। তিনি প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, নিশ্বাস অর্থে অন্তর্গামী শ্বাস বুঝায় না, তাহা বহির্গামী শ্বাস। সেইসঙ্গে বলিয়াছেন, "নিশ্বাস এই শব্দটি কোনো কোনো স্থলে 'নিঃশ্বাস' এইরূপ বিসর্গমধ্যও লিখিত হয়, কিন্তু উভয় শব্দেরই অর্থ এক।"

স যখন কোনো ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্বে যুক্ত হইয়া থাকে তখন তৎপূর্বে বিসর্গ লিখিলেও চলে, না লিখিলেও চলে ; যথা, নিস্পন্দ, নিস্পৃহ, প্রাতস্নান। কিন্তু তাই বলিয়া নি উপসর্গ ও নিঃ উপসর্গ এক নহে, এমন-কি তাহাদের বিপরীত অর্থ। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রমাণসহ তাহার বিচার করিয়াছেন। নি উপসর্গের গতি ভিতরের দিকে, নিঃ উপসর্গের গতি বাহিরের দিকে। নিবাস এবং নির্বাসন তাহার একটা দৃষ্টান্ত। নিঃ উপসর্গের না-অর্থ গৌণ, তাহার মুখ্যভাব বহির্গামিতা। নির্গত শব্দের অর্থ না-গত নহে, তাহার অর্থ বাহিরে গত। নিঃসৃত, বহিঃসৃত। নিষ্ক্রমণ, বহিষ্ক্রমণ। নির্ঘোষ, বহির্ব্যাপ্ত শব্দ। নির্ঝর, বহিরুদ্‌গত ঝরনা। নির্মোক, খোলস যাহা বাহিরে ত্যক্ত হয়। নিরতিশয় অর্থে, যে অতিশয় বাহিরে চলিয়া যাইতেছে অর্থাৎ আপনাকেও যেন অতিক্রম করিতেছে। য়ুরোপীয় e এবং ex উপসর্গে দেখা যায় তাহাদের মূল বহির্গমন অর্থ হইতে অভাব অর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। নিঃ উপসর্গেও

তাহাই দেখা যায়। শব্দকল্পদ্রুম, শব্দস্তোমমহানিধি প্রভৃতি সংস্কৃত অভিধানে দেখা যায় অভাবার্থক নিঃ উপসর্গকে নির্গত শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; যথা নিরর্গল— নির্গতমর্গলং যস্মাৎ, নিরর্থক— নির্গতোঽর্থো যস্মাৎ ইত্যাদি। অ এবং অন্ প্রয়োগের দ্বারা বিশুদ্ধ অভাব বুঝায়, কিন্তু নিঃ প্রয়োগে ভাব হইতে বহিশ্চ্যুতি বুঝায়। জর্মান ভাষায় ইহার স্বজাতীয় উপসর্গ— hin। নিঃ উপসর্গের বিসর্গ স্থানচ্যুতিবশত হি রূপে ন-এর পূর্বে বসিয়াছে— অথবা মূল আর্য ভাষায় যে-ধাতু ছিল তাহাতে হি পূর্বে ছিল, সংস্কৃতে তাহা বিসর্গরূপে পরে বসিয়াছে। Hin উপসর্গেরও বহির্গমতা এবং অভাব অর্থ দেখা যায়। জর্মান অভিধান hin উপসর্গের অর্থ সম্বন্ধে বলে, motion or direction from the speaker, gone, lost। সংস্কৃতে যেমন নি ভিতর এবং নিঃ বাহির বুঝায়, জর্মান ভাষায় সেইরূপ ein ভিতর এবং hin বাহির বুঝায়। Einfahren অর্থ ভিতরে আনা, hinfahren শব্দের অর্থ বাহিরে লইয়া যাওয়া। লাটিন in উপসর্গে নি এবং নিঃ, ein এবং hin একত্রে সংগত হইয়াছে। innate অর্থ অন্তরে জাত, infinite অর্থ যাহা সীমার অতীত।

যাহাই হউক, প্র উপসর্গের মূল অর্থ বাহিরে, অগ্রভাগে ; নি উপসর্গের অর্থ ভিতরে এবং নিঃ উপসর্গের অর্থ ভিতর হইতে বাহিরে। অতএব নিঃ উপসর্গযোগে যে-শ্বাসের অর্থ বহির্গামী শ্বাস হইবে, নি উপসর্গযোগে তাহাই অন্তর্গমনশীল শ্বাস বুঝাইবে। অথচ ঘটনাক্রমে শ্বাস শব্দের পূর্বে নিঃ উপসর্গের বিসর্গ লোপপ্রবণ হইয়া পড়ে। অতএব এ স্থলে বানানের উপর নির্ভর করা যায় না। ফলত সংস্কৃত ভাষায় বাহ্যবায়ুগ্রহণ অর্থে সাধারণত উপসর্গহীন শ্বাস শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং নিশ্বাস ও প্রশ্বাস উভয় শব্দই অন্তর্বায়ুর নিঃসারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

দেখা গেল, 'উপসর্গের অর্থবিচার' প্রবন্ধে প্র এবং নি উপসর্গের যে-অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে, নিশ্বাস শব্দের আলোচনায় তাহার কোনো পরিবর্তন ঘটিতেছে না।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শব্দ লইয়া সমালোচক মহাশয় বিস্তর সূক্ষ্ম তর্ক করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার বিস্তারিত অবতারণ ও আলোচনা বিরক্তিজনক ও নিষ্ফল হইবে বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। পাণ্ডিত্য অনেক সময় দুর্গম পথ সৃষ্টি করে এবং সত্য সরল পথ অবলম্বন করিয়া চলে। এ কথা অত্যন্ত সহজ

যে, প্রবৃত্তি প্রবর্তনের দিক, অর্থাৎ মনের চেষ্টা তদ্দ্বারা বাহিরের দিকে ধাবিত হয়; নিবৃত্তি নিবর্তনের দিক, অর্থাৎ মনের চেষ্টা তদ্দ্বারা ভিতরের দিকে ফিরিয়া আসে।

সমালোচক মহাশয় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির এই সহজ উপপত্তি পরিত্যাগপূর্বক বিশেষ জেদ করিয়া কষ্টকল্পনার পথে গিয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রবৃত্তি কি, না প্রকৃষ্টাবৃত্তি অর্থাৎ ভালো করিয়া থাকা, এবং ক্রিয়ার অবস্থা (কুর্বদবস্থা) (sate of action) কোনো বস্তুর স্থিতির বা সত্তার প্রকৃষ্ট অবস্থা বলিয়া প্রকৃষ্ট বৃত্তি শব্দে ক্রিয়ারম্ভ বুঝাইতে পারে।" ক্রিয়ার অবস্থাই যে ভালোরূপ থাকার অবস্থা এ কথা স্বীকার করা কঠিন। নিবৃত্তি শব্দের যে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন তাহাও সংগত হয় নাই। তিনি বলেন, "নিতরাং বর্ততে ইতি নিবৃত্তি অর্থাৎ নিতরাং সম্পূর্ণভাবে বেষ্টাদিশূন্য হইয়া স্থিতি বা থাকা অর্থাৎ চেষ্টাবিরাম।"

সমালোচক মহাশয় প্রতিবাদ করিয়া উত্তেজনায় নিজেকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রকৃষ্টাবৃত্তি অর্থাৎ কুর্বদবস্থায় লইয়া গেছেন— এ সম্বন্ধে আর-একটু নিতরাং বর্তন করিতেও পারিতেন; কারণ প্রাচীন শব্দাচার্যগণও নি উপসর্গের অন্তর্ভাব স্বীকার করিয়াছেন, যথা মেদিনী-কোষে নি অর্থে "মোক্ষঃ, অন্তর্ভাবঃ, বন্ধনম্" ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। কিন্তু পাছে সেই অর্থ স্বীকার করিলে কোনো অংশে প্রবন্ধকারের সহিত ঐক্য সংঘটন হয়, এইজন্য যত্নপূর্বক তাহা পরিহার করিয়াছেন; ইহা নিশ্চয় একটা প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রকৃষ্টাবৃত্তির কার্য।

নি উপসর্গ অর্থে নিতরাং কেন হইল। বস্তুত নি, প্র, পরি, উৎ প্রভৃতি অনেক উপসর্গেরই আধিক্য অর্থ দেখা যায়। ইহার কারণ, আধিক্যের নানা দিক আছে। কোনোটা বা বাহিরে বহুদূর যায়, কোনোটা ভিতরে, কোনোটা পার্শ্বে, কোনোটা উপরে। অত্যন্ত পাণ্ডিত্যকে এমনভাবে দেখা যাইতে পারে যে, তাহা পণ্ডিতমহাশয়ের মনের খুব ভিতরে তলাইয়া গিয়াছে, অথবা তাহা সকল পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের অগ্রে অর্থাৎ সম্মুখে চলিয়া গিয়াছে, অথবা তাহা রাশীকৃত হইয়া পর্বতের ন্যায় উপরে চড়িয়া গিয়াছে, অথবা তাহা নানা বিষয়কে অবলম্বন করিয়া চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কালক্রমে এই-সকল সূক্ষ্ম প্রভেদ ঘুচিয়া গিয়া সর্বপ্রকার আধিক্যকেই উক্ত যে-কোনো উপসর্গ দ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে ব্যক্ত করা প্রচলিত হইয়াছে। যদিচ উৎ উপসর্গের ঊর্ধ্বগামিতার ভাব সুস্পষ্ট, এবং উৎপত্তি অনুসারে 'উদার' শব্দে বিশেষরূপে

উচ্চতা ও উন্নতভাবই প্রকাশ করে, তথাপি জয়দেব রাধিকার পদপল্লবকে উদার বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তাহার একান্ত গৌরব সূচনা করিয়াছেন মাত্র। অতএব নানা উপসর্গে যে একই ভূশার্থ পাওয়া যায় তদ্দ্বারা সেই উপসর্গগুলির ভিন্ন ভিন্ন নানা মূল অর্থেরই সমর্থন করে। অনেক স্থলেই শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের সময় উক্ত উপসর্গগুলির মূল অর্থ অথবা ভূশার্থ দু-ই ব্যবহার করা যাইতে পারে। যথা, নিগূঢ় অর্থে অত্যন্ত গূঢ় অথবা ভিতরের দিকে গূঢ় দু-ই বলা যায়, intense অত্যন্তরূপে টানা অথবা ভিতরের দিকে টানা, উন্মত্ত অত্যন্ত মত্ত অথবা ঊর্ধ্বদিকে মত্ত অর্থাৎ মত্ততা ছাপাইয়া উঠিতেছে, concentrate অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত অথবা এরূপ স্থলে কেহ যদি বলেন, অত্যন্ত একত্রে কেন্দ্রীভূত। অর্থের বিকল্পে অন্য অর্থ আমি স্বীকার করিব না, তবে তাঁহার সহিত বৃথা বিতণ্ডা করিতে ক্ষান্ত থাকিব। সমালোচক মহাশয় ইহাও আলোচনা করিয়া দেখিবেন, প্রতি অনু আং প্রভৃতি উপসর্গে নিতরাং প্রকৃষ্ট সম্যক্ প্রভৃতি ভূশার্থ বুঝায় না, তাহার মুখ্য কারণ ওই-সকল উপসর্গে দূরত্ব বুঝাইতে পারে না।

যাহা হউক, সংস্কৃত ভাষার উপসর্গের সহিত য়ুরোপীয় আর্য ভাষার উপসর্গ-গুলির যে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে এবং উভয়ের উৎপত্তিস্থল যে একই সমালোচক মহাশয় বোধ করি তাহা অস্বীকার করেন না। সংস্কৃত উপসর্গগুলির প্রচলিত নানা অর্থের মধ্যে যে-অর্থ ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় উভয় ভাষাতেই বিদ্যমান, তাহাকেই মূল অর্থ বলিয়া অনুমান করা অন্যায় নহে।

এইরূপ আর্যভাষার নানা শাখার আলোচনা করিয়া উপসর্গের মূলে উপনীত হইতে যে-পাণ্ডিত্য অবকাশ এবং প্রামাণিক গ্রন্থাদির সহায়তা আবশ্যক, আমার তাহা কিছুই নাই। যাঁহাদের সেই ক্ষমতা ও সুযোগ আছে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ ছাড়া আমার দ্বারা আর-কিছুই সম্ভবে না। স্বল্প প্রমাণ ও বহুল অনুমান আশ্রয় করিয়া কয়েকটি কথা বলিব, তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও তদ্দ্বারা যোগ্যতর লোকের মনে উদ্যম সঞ্চার করিয়া দিতে পারে, এই আশা করিয়া লিখিতে স্পর্ধিত হইতেছি।

প্র উপসর্গের অর্থ একটা কিছু হইতে বহির্ভাগে অগ্রগামিতা। য়ুরোপীয় উপসর্গ হইতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় আইসা এবং পইসা নামক দুইটি ক্রিয়া আছে, তাহা আবিশ্ এবং প্রবিশ্ ধাতুমূলক,

—তন্মধ্যে পইসা ধাতু পশিল প্রভৃতি শব্দে বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে ও কাব্যে স্থান পাইয়াছে এবং আইসা ধাতু এখনো আপন অধিকার বজায় রাখিয়াছে। আইসা এবং পইসা এই দুটি ধাতুতে আ এবং প্র উপসর্গের অর্থভেদ স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা কেবল দিক্‌ভেদ, পইসা বক্তার দিক হইতে অগ্রভাগে এবং আইসা বক্তার দিকের সান্নিধ্যে আগমন সূচনা করে। য়ুরোপীয় আর্য ভাষার pro উপসর্গের মুখ্য অর্থ বহির্দিকে অগ্রগামিতা এ কথা সর্ববাদিসম্মত; অতএব এই অর্থে যে মূল প্রাচীন অর্থ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এ কথা স্বীকার্য যে, সূর্যের বর্ণরশ্মির ন্যায় প্র উপসর্গ য়ুরোপীয় ভাষায় নানা উপসর্গে বিভক্ত হইয়াছে। Pro, pre, per তাহার উদাহরণ। প্রো সম্মুখ-গামিতা, প্রি পূর্বগামিতা এবং পর্ পারগামিতা অর্থাৎ দূরগামিতা প্রকাশ করে। কাল হিসাবে অগ্রবর্তিতা বক্তার মনের গতি অনুসারে পশ্চাৎকালেও খাটে সম্মুখকালেও খাটে, এই কারণে 'প্রাচীন' শব্দে 'প্র' উপসর্গ অসংগত হয় না। পুরঃ এবং পুরা শব্দে ইহার অনুরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। উভয় শব্দের একই উৎপত্তি হইলেও পুরঃ শব্দ দেশ হিসাবে নিকটবর্তী সম্মুখস্থ দেশ এবং পুরা শব্দ কাল হিসাবে দূরবর্তী অতীত কালকে বুঝায়। পূর্ব শব্দেরও প্রয়োগ এইরূপ। পূর্বস্থিত পদার্থ সম্মুখে বর্তমান, কিন্তু পূর্বকাল অতীতকাল। অতএব প্রাচীন শব্দাচার্যগণ যে প্র উপসর্গের 'প্রাথম্যং' এবং 'আরম্ভঃ' অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অগ্রগামিতা অর্থেরই রূপভেদ মাত্র। লাটিন ভাষায় তাহাই প্রো এবং প্রি দুই উপসর্গে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রীক প্রো উপসর্গে প্রাথম্য অর্থও সূচিত হয়, যথা prologue; অপর পক্ষে সম্মুখগমতাও ব্যক্ত করে, যথা proboskis, শুণ্ড— উহার উপপত্তিমূলক অর্থ প্রভক্ষক, যাহা সম্মুখ হইতে খায়। লাটিন পর্ উপসর্গের অর্থ through, অর্থাৎ একপ্রান্ত হইতে পর-প্রান্তের অভিমুখতা, পারগামিতা। তাহা হইতে স্বভাবতই 'সর্বতোভাব' অর্থও ব্যক্ত হয়। দুর্গাদাসধৃত পুরুষোত্তমের মতে প্র উপসর্গের সর্বতোভাব অর্থও স্বীকৃত হইয়াছে।

পরি এবং পরা উপসর্গও এই প্র উপসর্গের সহোদর। প্র উপসর্গ বিশেষরূপে বহির্ব্যঞ্জক। Fro, from, fore, forth প্রভৃতি ইংরেজী অব্যয় শব্দগুলি এই অর্থ সমর্থন করে। পরি এবং পরা উপসর্গেও সেই বাহিরের ভাব, পরভাব, অনাত্মভাব বুঝায়। গ্রীক উপসর্গ peri এবং para, পরি এবং পরা উপসর্গের স্বশ্রেণীয়।

গ্রীক ভাষায় পরি উপসর্গে নিকট এবং চতুর্দিক দু-ই বুঝায়। উক্ত উপসর্গ perigee perihelion শব্দে নৈকট্য অর্থে এবং periphery periphrasis শব্দে পরিবেষ্টন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রীক para উপসর্গেরও একাধিক অর্থ আছে। দূরার্থ, যথা paragoge (addition of a letter or syllable to the end of a word : from para, beyond and ago, to lead), paralogism (reasoning beside or from the point : from para, beyond and logismoss, discourse)। Para উপসর্গের আর-একটি অর্থ পাশাপাশি, কিন্তু সে-পাশাপাশি নিকট অর্থে নহে, সংলগ্ন অর্থে নহে, তাহাতে মুখ্যরূপে বিচ্ছেদভাবই প্রকাশ করে। Parallel অর্থে যাহারা পাশাপাশি চলিয়াছে কিন্তু ঘেঁষাঘেঁষি নহে ; এমন-কি, মিলন হইলেই 'প্যারালাল'ত্ব ব্যর্থ হইয়া যায়। Paraphrase অর্থে বুঝায় মূল বাক্যের পাশাপাশি এমন বাক্য-প্রয়োগ যাহারা একভাবাত্মক অথচ এক নহে। Peri উপসর্গে যেমন অবিচ্ছেদ বহির্বেষ্টন বুঝায়, para উপসর্গেও সেইরূপে বাহিরে স্থিতি বুঝায় কিন্তু তাহাতে মধ্যে বিচ্ছেদের অপেক্ষা রাখে।

প্রতি উপসর্গও প্র উপসর্গের একটি শাখা। প্রতি উপসর্গ প্র উপসর্গের সাধারণ অর্থকে একটি বিশেষ অর্থে সংকীর্ণ করিয়া লইয়াছে। ইহাতেও প্র উপসর্গের বাহিরের দিকে অগ্রসর হওয়া বুঝায়, কিন্তু সম্মুখভাগে একটি বিশেষ বাধা লক্ষ্যের অপেক্ষা রাখে। গ্রীক pros এবং প্রাচীন গ্রীক proti উপসর্গ সংস্কৃত প্রতি উপসর্গের একজাতীয়। লাটিন উপসর্গ por (portend) এবং প্রাচীন লাটিন উপসর্গের port-ও এই শ্রেণীভুক্ত।

নি, in, ein এক পর্যায়গত উপসর্গ। নি এবং in উপসর্গে অন্তর্ভাব এবং কখনো কখনো অভাব বুঝায়। যাহা ভিতরে চলিয়া যায়, অন্তর্হিত হয়, তাহা আর দেখা যায় না। বস্তুত, নি অন্ত অন্তর, এগুলি একজাতীয়। নি নির্ অন্ত অন্তর, in en (গ্রীক) anti ante ein hin ent, নি ও নিঃ অব্যয় ও উপসর্গগুলিকে এক গণ্ডীর মধ্যে ধরা যায়। ইহা দেখা গিয়াছে যে সংস্কৃত ভাষায় নি উপসর্গে যে ইকার পরে বসিয়াছে অধিকাংশ য়ুরোপীয় আর্য ভাষাতেই তাহা পূর্বে বসিয়াছে। অ্যাংলো-স্যাক্সন ডাচ জর্মান গথ ওয়েলস আইরিশ ও লাটিন ভাষায় in, গ্রীক ভাষায় en, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ভাষায় ন-বর্জিত শুদ্ধমাত্র i দেখা যায়। মূল আর্য ভাষার অ স্বরবর্ণ সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ অধিকাংশ স্থলে

বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হইয়াছে, য়ুরোপীয় আর্য ভাষায় তাহা হয় নাই, শব্দশাস্ত্রে এই কথা বলে। অধ্যাপক উইল্‌কিন্‌স্‌ 'গ্রীকভাষা' প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

But while Graeco-Italic consonants are on the whole the same as those of the primitive tongue, there is a highly important and significant change in the vowel-system. The original a, retained for the most part in Sanskrit and modified in Zend only under conditions which make it plain that this is not a phenomenon of very ancient date there, has in Europe undergone a change in two directions.

সেই দ্বিবিধ পরিবর্তন এই যে, অ কোথাও e, i এবং কোথাও o, u আকার ধারণ করিয়াছে।

ইহা হইতে এ কথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, মূল আর্য ভাষায় যাহা অন্‌ ছিল, য়ুরোপীয় আর্য ভাষায় তাহা ইন্‌ ও এন্‌ হইয়াছে। লাটিন ইন্‌ উপসর্গের উত্তর তর প্রত্যয় করিয়া inter intra intro প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। সংস্কৃত অন্তর শব্দের সহিত তার সারূপ্য সহজেই হৃদয়ংগম হয়।

এইরূপে অন্‌ শব্দকেই অন্ত ও অন্তর শব্দের মূল বলিয়া ধরিলে, অভাবাত্মক অ অন ন নি, an (Greek) in un শব্দগুলির সহিত তাহার যোগ পাওয়া যায়। অন্ত অর্থে শেষ ; যেখানে গিয়া কোনো জিনিস 'না' হইয়া যায় সেইখানেই তাহার অন্ত। অন্তর অর্থে যেখানে দূর সেখানে অন্তভাবেরই আধিক্য প্রকাশ করে। অন্তর অর্থে যেখানে ভিতর, সেখানেও একজাতীয় শেষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গম্যতার অন্ত বুঝাইয়া থাকে। জর্মান ভাষায় unter, ইংরেজি ভাষায় under যদিও অন্তর শব্দের একজাতীয়, তথাপি তাহাতে ভিতর না বুঝাইয়া নিম্ন বুঝায় —যাহা আর-কিছুর নীচে চাপা পড়ে তাহা প্রত্যক্ষগোচরতার অন্তে গমন করে। লাটিন উপসর্গ ante দেশ বা কালের পূর্বপ্রান্ত নির্দেশ করে। সংস্কৃত ভাষায় অন্তর বলিতে ভিতর এবং অন্তর বলিতে বাহির (তদন্তর, অর্থে তাহার পরে অর্থাৎ তাহার বাহিরে), অন্তর বলিতে দূর বুঝায়— শেষের ভাব, প্রান্তের ভাব এই-সকল অর্থের মূল।

অতএব নি ও নির্‌ উপসর্গ এবং তাহার স্বজাতীয় য়ুরোপীয় উপসর্গগুলিতে অন্তের ভাব, অন্তর্ভাব, এবং অন্তর্ধানের ভাব কিরূপে ব্যক্ত হইতেছে তাহা বুঝা

কঠিন নহে। এবং মূল অন্ শব্দ হইতে কিরূপে ন নি নিঃ, in hin en ein প্রভৃতি নানা রূপের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহাও লক্ষ্য করিলে দেখা যায়।

সংস্কৃত অনু এবং গ্রীক ana, যাহার মুখ্য অর্থ কাহারো পশ্চাদ্‌বর্তিতা এবং গৌণ অর্থ তুল্যতা এবং পৌনঃপুন্য, পূর্বোক্ত অন্ ধাতুর সহিত তাহারও সম্বন্ধ আছে বলিয়া গণ্য করি।

লাটিন de dis এবং সংস্কৃত বি উপসর্গ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় শব্দশাস্ত্রে যে-মত প্রচলিত আছে তাহা শ্রদ্ধেয়। দ্বি (অর্থাৎ দুই) শব্দ সংকুচিত হইয়া দি এবং ভারতে বি রূপে অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহার ভাবই এই— খণ্ডিত হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সেইসঙ্গে নষ্ট হওয়া। Joint বা যোগ দুইখানা হইয়া গেলেই disjointed বা বিযুক্ত হইতে হয়। এই খণ্ডীভবনের ভাব হইতেই de এবং বি উপসর্গে deformity বিকৃতির ভাব আসিয়াছে এবং সাধারণ হইতে খণ্ডীকৃত হইবার ভাব হইতেই বি এবং de উপসর্গের 'বিশেষত্ব' অর্থ উদ্‌ভাবিত হইয়াছে।

আ অভি অপি অপ অব অধি এবং অতি উপসর্গগুলিকে এক পঙ্‌ক্তিতে স্থাপন করা যায়। আ উপসর্গের অর্থ নিকটলগ্নতা; ইংরেজি উপসর্গ a (aback, asleep), জর্মান an (ankommen অর্থাৎ আগমন), লাটিন ad, ইংরেজি অব্যয় শব্দ at সংস্কৃত আ উপসর্গের প্রতিরূপ। এই নৈকট্য অর্থ সংস্কৃত ভাষায় স্থিতি এবং গতি অনুসারে আ এবং অভি এই দুই উপসর্গে বিভক্ত হইয়াছে। যাহা নৈকট্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আ এবং যাহা নৈকট্যের চেষ্টা করিতেছে তাহা অভি উপসর্গের দ্বারা ব্যক্ত হয়। অভ্যাগত শব্দে এই দুই ভাব একত্রেই সূচিত হয়; অভি উপসর্গের দ্বারা দূর হইতে নিকটে আসিবার চেষ্টা এবং আ উপসর্গের দ্বারা সেই চেষ্টার সফলতা, উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে। যে-লোক বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে নিকটে আসিয়াছে সে-ই অভ্যাগত। কিন্তু ইহার স্বজাতীয় য়ুরোপীয় উপসর্গগুলিতে স্থানভেদে এই দুই অর্থই ব্যক্ত হয়। A an ad, সংস্কৃত আ এবং অভি উভয় উপসর্গেরই স্থান অধিকার করিয়াছে। Adjacent adjective adjunct শব্দগুলিকে আসন্ন আক্ষিপ্ত আবদ্ধ শব্দ দ্বারা অনুবাদ করিলে মূল শব্দের তাৎপর্য যথাযথ ব্যক্ত করে। কিন্তু adduce address advent শব্দ অভিনয়ন অভিদেশ (অভিনির্দেশ)

এবং অভিবর্তন শব্দ দ্বারা অনুবাদযোগ্য। সংস্কৃত অধি উপসর্গও এই ad উপসর্গের সহিত জড়িত।

অপ উপসর্গ আ এবং অভির বিপরীত। লাটিন ab, গ্রীক apo, জর্মান ab এবং ইংরেজি off ইহার স্বজাতীয়। ইহার অর্থ from, নিকট হইতে দূরে। এই দূরীকরণতা হইতে জুগ্‌ভাব অর্থাৎ ঘৃণাব্যঞ্জকতাও অপ উপসর্গের একটি অর্থ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। ইংরেজি ভাষাতেও abject abduction aberration abhor শব্দ আলোচনা করিলে এই অর্থ পাওয়া যায়।

লাটিন sub, গ্রীক hupo যে উপ উপসর্গের স্বজাতীয় ইহা সকলেই জানেন। অব শব্দের নিম্নগতার উপ শব্দের নিম্নবর্তিতার কিঞ্চিৎ অর্থভেদ আছে। উপ উপসর্গে উচ্চ এবং নীচের মধ্যে একটি যোগ রাখিয়া দেয়, অব উপসর্গে সেই সম্বন্ধটি নাই। কূল ও শাখার তুলনায় উপকূল উপশাখা যদিচ নিম্নশ্রেণীয়, তথাপি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। নিম্নে বসা মাত্রকেই উপাসনা বলে না, পরন্তু আর-কাহারো সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার নিম্নে নিজেকে আসীন করাই উপাসনা শব্দের উপপত্তিমূলক ভাবার্থ।

Hyper, hupar up super উপসর্গগুলির সহিত সংস্কৃত উৎ উপসর্গের সম্পর্ক শ্রুতিমাত্র হৃদয়ংগম হয় না। কিন্তু উৎ হইতে উপ্, উধ হইতে উভ শব্দের উদ্‌ভব শব্দশাস্ত্রমতে সংগত। প্রাচীন বাংলায় উভমুখ, উভকর, উভরায় শব্দ তাহার প্রমাণ। পালিতেও ঊর্ধ্বম্ অব্যয়শব্দ উব্‌ভম হইয়াছে। উৎছলিত হওয়াকে বাংলায় উপছিয়া পড়া কহে। উৎপাটিত করাকে উপড়াইয়া ফেলা বলে।

সম উপসর্গ যে গ্রীক syn এবং লাটিন con উপসর্গের একজাতীয় এবং একত্রীভবনের ভাবই তাহার মূল অর্থ, এ সম্বন্ধেও আমরা প্রতিবাদের আশঙ্কা করি না। খণ্ডিত হওয়ায় ভাব হইতে বি উপসর্গে যেরূপ বিকৃতি অর্থ আসিয়াছে, একত্রিত হওয়ার ভাব হইতে সং উপসর্গে ঠিক তাহার উল্‌টা অর্থ প্রকাশ করে। ফলত সং এবং বি পরস্পর বৈপরীত্যবাচক উপসর্গ। সং এক এবং বি দুই। চেম্বার্সের অভিধানে syn উপসর্গ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে— The root originally signifying one is seen in L. simmul, together simple। শব্দের উৎপত্তিনির্ণয়ে লিখিত হইয়াছে— Simplus, sim once, plico to fold। বিখ্যাত ঋক্ মন্ত্রে সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং শ্লোকে

স্পষ্টতই সং শব্দের একত্ব অর্থ প্রকাশ পায়; শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব প্রাচীন আর্য ভাষায় সং শব্দের কোনো মূল ধাতুর অর্থ যে এক ছিল, সে অনুমান অন্যায় নহে।

যাহা হউক অভিধানে উপসর্গগুলির যে-সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে তাহারা মিথ্যা না হইলেও, তাহারা যে মূল অর্থ নহে এবং বিচিত্র আর্য ভাষার তুলনা করিয়া যে মূল অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা করা যাইতে পারে, ইহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধে বহুল পরিমাণে তুলনামূলক আলোচনা উত্থাপন করিয়াছি। ফলত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ অবহেলাসহকারে 'উপসর্গের অর্থবিচার' প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছেন তাহা সর্বপ্রকারে অনুপযুক্ত হইয়াছে।

বৈশাখ ১৩০৬

ব্রুগ্‌মান তাঁহার ইণ্ডোজর্মানীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণে লিখিতেছেন, একই শব্দকে দুই বা ততোধিকবার বহুলীকরণ দ্বারা, পুনর্বৃত্তি (repetition); দীর্ঘকালবর্তিতা, ব্যাপকতা অথবা প্রগাঢ়তা ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। ইণ্ডো-জর্মানীয় ভাষার অভিব্যক্তিদশায় পদে পদে এইরূপ শব্দদ্বৈতের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইণ্ডোজর্মান ভাষায় অনেক দ্বিগুণিত শব্দ কালক্রমে সংযুক্ত হইয়া এক হইয়া গেছে; সংস্কৃত ভাষায় তাহার দৃষ্টান্ত, মর্মর গর্গর (ঘড়া, জলশব্দের অনুকরণে), গদ্‌গদ বর্বর (অস্পষ্টভাষী) কঙ্কণ। দ্বিগুণিত শব্দের এক অংশ ক্রমে বিকৃত হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে; যথা কর্কশ কঙ্কর ঝঞ্ঝা বম্ভর (ভ্রমর) চঞ্চল।

অসংযুক্তভাবে দ্বিগুণীকরণের দৃষ্টান্ত সংস্কৃতে যথেষ্ট আছে: যথা, কালে কালে, জন্মজন্মনি, নব নব, উত্তরোত্তর, পুনঃ পুনঃ, পীত্বা পীত্বা, যথা যথা, যদ্‌যৎ, অহরহঃ, প্রিয়ঃ প্রিয়ঃ, সুখসুখেন, পুঞ্জপুঞ্জেন।

এই দৃষ্টান্তগুলিতে হয় পুনরাবৃত্তি, নয় প্রগাঢ়তার ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশি, অন্য আর্য ভাষায় তত নহে। বাংলা শব্দদ্বৈতের বিধিও বিচিত্র; অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত ভাষায় তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।

দৃষ্টান্তগুলি একত্র করা যাক। মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, পরে পরে, পায় পায়, পথে পথে, ঘরে ঘরে, হাড়ে হাড়ে, কথায় কথায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায়— এগুলি পুনরাবৃত্তিবাচক।

বুকে বুকে, মুখে মুখে, চোখে চোখে, কাঠে কাঠে, পাথরে পাথরে, মানুষে মানুষে— এগুলি পরস্পর-সংযোগবাচক।

সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, মনে মনে, তলে তলে, পেটে পেটে, ভিতরে ভিতরে, বাইরে বাইরে, উপরে উপরে— এগুলি নিয়তবর্তিতাবাচক, অর্থাৎ এগুলিতে সর্বদা লাগিয়া থাকার ভাব ব্যক্ত করে।

চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে, চলিয়া চলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া— এগুলি দীর্ঘকালীনতাবাচক।

অন্ত অন্ত, অনেক অনেক, নূতন নূতন, ঘন ঘন, টুকরা টুকরা— এগুলি বিভক্ত বহুলভাবাচক। নূতন নূতন কাপড়, বলিলে প্রত্যেক নূতন কাপড়কে পৃথক করিয়া দেখা হয়। অনেক অনেক লোক, বলিলে লোকগুলিকে অংশে অংশে ভাগ করা হয়, কিন্তু শুদ্ধ 'অনেক লোক' বলিলে নিরবচ্ছিন্ন বহু লোক বোঝায়।

লাল লাল, কালো কালো, লম্বা লম্বা, মোটা মোটা, রকম রকম— এগুলিও পূর্বোক্ত শ্রেণীর। লাল লাল ফুল, বলিলে ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি লাল ফুল বোঝায়।

যাকে যাকে, যেমন যেমন, যেখানে যেখানে, যখন যখন, যত যত, যে যে, যারা যারা— এগুলিও পূর্বোক্তরূপ।

আশায় আশায়, ভয়ে ভয়ে— এ দুইটিও ওই প্রকার। আশায় আশায় আছি, অর্থাৎ প্রত্যেক বার আশা হইতেছে ; ভয়ে ভয়ে আছি, অর্থাৎ বারংবার ভয় হইতেছে। অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পৃথক পৃথক রূপে আশা বা ভয় উদ্রেক করিতেছে।

মুঠো মুঠো, ঝুড়ি ঝুড়ি, বস্তা বস্তা— এগুলিও পূর্বানুরূপ।

টাটকা টাটকা, গরম গরম, ঠিক ঠিক— এগুলি প্রকর্ষবাচক।

টাটকা টাটকা বলিলে টাটকা শব্দকে বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

চার চার, তিন তিন— এগুলিও পূর্ববৎ। চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির, অর্থাৎ নিতান্তই চারটে পেয়াদা বটে।[১]

১ এই প্রসঙ্গে ১৩০৮ আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা'র একটি অংশ উদ্‌ধৃত হইল—

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বঙ্গদর্শনসম্পাদক 'শব্দদ্বৈত' নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ফাল্গুন মাসের প্রদীপে তাহার একটি সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী সেই সমালোচনা অবলম্বন করিয়া উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মূল প্রবন্ধলেখকের নিকট এই আলোচনা অত্যন্ত হৃদ্য। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া বলিতে গেলে সংক্ষিপ্ত সমালোচনার সীমা লঙ্ঘন করিবে। কেবল একটা উদাহরণ লইয়া আমাদের বক্তব্যের আভাসমাত্র দিব।— আমরা বলিয়াছিলাম, 'চার চার' 'তিন তিন' প্রকর্ষবাচক। অর্থাৎ যখন বলি 'চার চার

গলায় গলায় (আহার), কানে কানে (কথা)— ইহাও পূর্বশ্রেণীর ; অর্থাৎ অত্যন্তই গলা পর্যন্ত পূর্ণ, নিতান্তই কানের নিকটে গিয়া কথা। হাতে হাতে (ফল, বা ধরা পড়া), বোধ করি স্বতন্ত্রজাতীয়। বোধ করি তাহার অর্থ এই যে, যেমনি হাত দিয়া কাজ করা অমনি সেই হাতেই ফল প্রাপ্ত হওয়া, যে-হাতে চুরি করা সেই হাতেই ধৃত হওয়া।

নিজে নিজে, আপনি আপনি, তখনই তখনই— পূর্বানুরূপ। অর্থাৎ বিশেষ-রূপে নিজেই, আপনিই আর কেহই নহে, বিলম্বমাত্র না করিয়া তৎক্ষণাৎ। সকাল সকাল শব্দও বোধ করি এই-জাতীয়, অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে দ্রুতরূপে সকাল।

জল্ জল্, চুর্ চুর্, ঘুর ঘুর, টল্ টল্, নড়্ নড়্— এগুলি জলন চূর্ণন ঘূর্ণন টলন নর্তন শব্দজাত ; এগুলিতেও প্রকর্ষভাব ব্যক্ত হইতেছে।

বাংলা অনেকগুলি শব্দদ্বৈতে দ্বিধা ঈষদূনতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতার ভাব ব্যক্ত করে ; যথা, যাব যাব, উঠি উঠি ; মেঘ মেঘ, জর জর, শীত শীত, মর্ মর্, পড়ো পড়ো, ভরা ভরা, ফাঁকা ফাঁকা, ভিজে ভিজে, ভাসা ভাসা, কাঁদো কাঁদো, হাসি হাসি।

মানে মানে, ভাগ্যে ভাগ্যে শব্দের মধ্যেও এই ঈষদূনতার ভাব আছে। মানে মানে পলায়ন, অর্থে— মান প্রায় যায় যায় করিয়া পলায়ন। ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পাওয়া অর্থাৎ যেটুকু ভাগ্যসূত্রে রক্ষা পাওয়া গেছে তাহা অতি ক্ষীণ।

ঘোড়া ঘোড়া (খেলা), চোর চোর (খেলা) এই-জাতীয় অর্থাৎ সত্যকার ঘোড়া নহে, তাহারি নকল করিয়া খেলা।

পেয়াদা আসিয়া হাজির' তখন একেবারে চার পেয়াদা আসার বাহুল্যজনিত বিস্ময় প্রকাশ করি। প্রদীপের সমালোচক মহাশয় বলেন, এই স্থলের দ্বিত্ব বিভক্ত-বহুলতা-জ্ঞাপক। অর্থাৎ যখন বলা হয়, 'তাহাদিগকে ধরিবার জন্ত চার চার জন পেয়াদা আসিয়া হাজির', তখন সমালোচক মহাশয়ের মতে তাহাদের প্রত্যেকের জন্ত চার চার পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত ইহাই বুঝায়। আমরা এ কথায় সায় দিতে পারিলাম না। বিহারীবাবুও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন, একজনের জন্তও 'চার চার পেয়াদা' বাংলাভাষা অনুসারে আসিতে পারে। বিহারীবাবু বলেন, দৃষ্টান্ত অনুসারে দুই অর্থই সংগত হয়। অর্থাৎ প্রকর্ষ এবং বিভক্ত-বহুলতা, দু-ই বুঝাইতে পারে। তাহা ঠিক নহে— প্রকর্ষই বুঝায়, সেই প্রকর্ষ একজনের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে, সুতরাং উভয়বিধ প্রয়োগের মধ্যে প্রকর্ষ ভাবই সাধারণ।

এইরূপ ঈষদূনত্বসূচক অসম্পূর্ণতাবাচক শব্দদ্বৈত বোধ করি অন্য আর্য ভাষায় দেখা যায় না। ফরাসি ভাষায় একপ্রকার শব্দব্যবহার আছে যাহার সহিত ইহার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে।

ফরাসি চলিত ভাষায় কোনো জিনিসকে আদরের ভাবে বা কাহাকেও খর্ব করিয়া লইতে হইলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে; যথা, me-mere মে-মেয়ার্, অর্থাৎ ক্ষুদ্র মাতা; মেয়ার্ অর্থে মা, মে-মেয়ার্ অর্থে ছোট্ট মা, আদরের মা, যেন অসম্পূর্ণ মা। bete বেট্ শব্দের অর্থ জন্তু, be-bete বে-বেট্ শব্দের অর্থ ছোট্ট পশু, আদরের পশুটি; অর্থাৎ দেখা যাইতেছে এই দ্বিগুণীকরণে প্রকর্ষ না বুঝাইয়া খর্বতা বুঝাইতেছে।

আর-একপ্রকার বিকৃত শব্দদ্বৈত বাংলায় এবং বোধ করি ভারতীয় অন্য অনেক আর্য ভাষায় চলিত আছে, তাহা অনির্দিষ্ট-প্রভৃতি-বাচক; যেমন, জল-টল পয়সা-টয়সা। জল-টল বলিলে জলের সঙ্গে সঙ্গে আরো যে-কটা আনুষঙ্গিক জিনিস শ্রোতার মনে উদয় হইতে পারে তাহা সংক্ষেপে সারিয়া লওয়া যায়।

বোঁচকা-বুঁচকি দড়া-দড়ি গোলা-গুলি কাটি-কুটি গুঁড়া-গাঁড়া কাপড়-চোপড়— এগুলিও প্রভৃতিবাচক বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত শ্রেণীর অপেক্ষা নির্দিষ্টতর। বোঁচকা-বুঁচকি বলিলে ছোটো বড়ো মাঝারি একজাতীয় নানা প্রকার বোঁচকা বোঝায়, অন্য-জাতীয় কিছু বোঝায় না।

মহারাষ্ট্রি হিন্দি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য আর্যভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষার সহিত তৎতৎ ভাষার শব্দদ্বৈতবিধির তুলনা করিলে একান্ত বাধিত হইব।

১৩০৭

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

বাংলা ভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ একশ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই। অথচ সে-সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে। প্রথমে তাহার একটি তালিকা দিতেছি ; পরে তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব। তালিকাটি যে সম্পূর্ণ হইয়াছে এরূপ আশা করিতে পারি না।

আইঢাই আঁকুবাঁকু আনচান আমতা-আমতা।

ইলিবিলি।

উসখুস।

কচ কচাৎ কচকচ কচাকচ কচর-কচর কচমচ কচর-মচর কট কটাৎ কটাস কটকট কটাকট কটমট কটর-মটর কড়কড় কড়াৎ কড়মড় কড়র-মড়র কনকন কপ কপাৎ কপকপ কপাকপ করকর কলকল কসকস কিচকিচ কিচমিচ কিচির-মিচির কিটকিট কিড়মিড় কিরকির কিলকিল কিলবিল কুচ কুচকুচ কুট কুটকুট কুটুর-কুটুর কুটুস কুপ কুপকুপ কুপকাপ কুলকুল কুরকুর কুঁইকুঁই কেঁইমেই কেঁউমেউ ক্যাঁ ক্যাঁক্যাঁ কোঁকোঁ কোঁৎকোঁৎ ক্যাঁচ ক্যাঁচক্যাঁচ ক্যাঁচর-ক্যাঁচর ক্যাঁটক্যাঁট। কচকচে কটমট্টে কড়কড়ে কনকনে করকরে কিটকিটে (তেল কিটকিটে) কিরকিরে কিলবিলে কুচকুচে কুটকুটে ক্যাটকেঁটে॥

খক খকখক খচখচ খচাখচ খচমচ খট খটখট খটাখট খটাস খটাৎ খটরখটর খটমট খটর-মটর খড়খড় খড়মড় খন খনখন খপ খপাৎ খপাস খরখর খলখল খসখস খাঁ-খাঁ খিক খিকখিক খিটখিট খিটমিট খিটিমিটি খিলখিল খিসখিস খুক খুকখুক খুটখুট খুটুর-খুটুর খুটুস-খুটুস খুটখাট খুঁৎখুঁৎ খুঁৎমুৎ খুরখুর খুসখুস খেঁইখেঁই খ্যাঁক খ্যাঁকখ্যাঁক খ্যাঁচখ্যাঁচ খ্যাঁচাখেঁচি খ্যাঁৎখ্যাঁৎ খ্যানখ্যান। খটখটে খড়খড়ে খরখরে খসখসে খিটমিটে খিটখিটে খুঁৎখুঁতে খুঁৎমুতে খুসখুসে (কাশি) খ্যানখেনে॥

গজগজ গজর-গজর গট গটগট গড়গড় গদগদ গনগন গপগপ গবগব গবাগব গমগম গরগর গলগল গসগস গাঁগাঁ গাঁইগুঁই গাঁকগাঁক গিজগিজ গিসগিস গুটগুট গুড়গুড় গুনগুন গুপগুপ গুবগাব গুম গুমগুম গুরগুর গেঁইগেঁই গোঁগোঁ

গোঁৎগোঁৎ। গনগনে (আগুন) গমগমে গুড়গুড়ে ॥

ঘটঘট ঘটর-ঘটর ঘড়ঘড় ঘসঘস ঘিনঘিন ঘিসঘিস ঘুটঘুট ঘুটমুট ঘুরঘুর ঘুসঘুস ঘেউঘেউ ঘোঁৎঘোঁৎ ঘেঁচ ঘেঁচঘেঁচ ঘ্যাঁচর-ঘ্যাঁচর ঘ্যানঘ্যান ঘ্যানর-ঘ্যানর। ঘুরঘুরে ঘুসঘুসে (জ্বর) ঘ্যানঘেনে ॥

চকচক চকর-চকর (পশুর জলপান-শব্দ) চকমক চট চটাস চটচট চটাচট চটপট চটাপট চচ্চড় চড়াৎ চড়াস চড়াচ্চড় চন চনচন চপচপ চপাচপ চিঁচিঁ চিকচিক চিকমিক চিটচিট চিচ্চিড় চিড়িক চিড়িক-চিড়িক চিড়বিড় চিন চিনচিন চুকচুক চুকুর-চুকুর চুচ্চুর চেঁইভেঁই চেঁইমেই চোঁ চোঁচোঁ চোঁভোঁ চোঁচাঁ চ্যাঁচ্যাঁ চ্যাভ্যাঁ। চকচকে চটচটে চটপটে চনচনে চিকচিকে চিটচিটে চিনচিনে চুকচুকে চুচ্চুরে ॥

ছটফট ছপছপ ছপাছপ ছপাৎ ছপাস ছমছম ছলছল ছোঁ ছোঁছোঁ ছ্যাঁক ছ্যাঁকছ্যাঁক। ছটফটে ছলছলে ছলোছলো ছ্যাঁকছেঁকে ছিপছিপে ॥

জরজর জ্যাবজ্যাব জ্যালজ্যাল। জবজবে জিরজিরে জ্যালজেলে জিলজিলে ॥

ঝকঝক ঝকমক ঝটপট ঝড়াৎ ঝন ঝনঝন ঝপ ঝপঝপ ঝপাঝপ ঝমঝম ঝমাৎ ঝমাস ঝমর-ঝমর ঝমাজ্‌ঝম ঝরঝর ঝাঁ ঝাঁ-ঝাঁ ঝিকঝিক ঝিকমিক ঝিকিমিকি ঝিনঝিন ঝিরঝির ঝুনঝুন ঝুপঝুপ ঝুমঝুম। ঝকঝকে ঝরঝরে ঝিকঝিকে ॥

টক টকটক টকাটক টংটং টন টনটন টপ টপটপ টপাটপ টলটল টলমল টসটস টিকটিক টিকিস-টিকিস টিংটিং টিপটিপ টিমটিম টুকটুক টুকুস-টুকুস টুংটুং টুংটাং টুনটুন টুপ টুপটুপ টুপুস-টুপুস টুপটাপ টুসটুস টোটো ট্যাঁট্যাঁ ট্যাঁসট্যাঁস ট্যাঁণ্ডস-ট্যাঁণ্ডস। টকটকে টনটনে টলটলে টসটসে টিংটিঙে টিপটিপে টিমটিমে টুকটুকে টুপটুপে টুসটুসে ট্যাসটেসে ॥

ঠক ঠকঠক ঠকর-ঠকর ঠংঠং ঠনঠন ঠুক ঠুকঠুক ঠুকুর-ঠুকুর ঠকাঠক ঠকাৎ ঠকাস ঠুকুস-ঠুকুস ঠুকঠাক ঠুংঠুং ঠুনঠুন ঠ্যাংঠ্যাং ঠ্যাসঠ্যাস। ঠনঠনে ঠ্যাংঠেঙে ॥

ডগডগে (লাল) ডিগডিগে।

ঢক ঢকঢক ঢকাঢক ঢকাস ঢকাৎ ঢবঢব ঢলঢল ঢুকঢুক ঢুলঢুল ঢ্যাবঢ্যাব। ঢকঢকে ঢলঢলে ঢুলঢুলে ঢুলুঢুলু ঢ্যাবঢেবে ॥

তকতক তড়তড় তড়াত্তড় তড়াক তড়াক-তড়াক তরতর তলতল তুলতুল

তিড়িং তিড়িং-তিড়িং তড়াং তড়াং-তড়াং। তকতকে তলতলে তুলতুলে॥

থকথক থপ থপাৎ থপাস থপথপ থমথম থরথর থলথল থসথস থৈ-থৈ; থকথকে থপথপে থমথমে থলথলে থসথসে থুড়থুড়ে থ্যাসথেসে॥

দগদগ দপদপ দবদব দমদম দমাদ্দম দরদর দড়াদ্দড় দড়াম দাউদাউ দুদ্দুড় দুদ্দাড় দুপদুপ দুপদাপ দুমদুম দুমদাম। দগদগে (রক্তবর্ণ বা অগ্নি)॥

ধক্ ধকধক ধড়ধড় ধড়াস ধড়াস-ধড়াস ধড়াদ্ধড় ধড়ফড় ধড়মড় ধপ ধপধপ ধপাধপ ধমাস ধবধব ধম ধমধম ধমাদ্ধম ধস ধসধস ধাঁ ধাঁ-ধাঁ ধিকি ধিকিধিকি ধিনধিন ধুকধুক ধুম ধুমধুম ধুমধাম ধুমাধুম ধুপধাপ ধু-ধু ধেইধেই। ধড়ফড়ে ধপধপে ধবধবে ধসধসে॥

নড়নড় নড়বড় নড়র-বড়র নিশপিশ নিড়বিড়। নরম্ভে নড়বড়ে নিশপিশে নিড়বিড়ে॥

পট পটপট পটাপট পটাৎ পটাস পটাস-পটাস পচপচ পড়পড় (ছেঁড়া) প্‌ড়াস প্‌ড়াৎ প্‌ড়াং প্‌ড়াংপ্‌ড়াং প্‌ড়িংপ্‌ড়িং পিটপিট পিলপিল পিঁপিঁ পুট পুটপুট পোঁপোঁ প্যাকপ্যাক প্যাচপ্যাচ প্যানপ্যান প্যাটপ্যাট পটাং পটাংপটাং। পিটপিটে পুসপুসে প্যাচপেঁচে প্যানপেনে॥

ফটফট ফটাফট ফড়ফড় ফড়র-ফড়র ফটাৎ ফটাস ফড়াৎ ফড়াস ফনফন ফরফর ফস ফসফস ফসাফস ফিক ফিকফিক ফিটফাট ফিনফিন ফুটফুট ফুটফাট ফুরফুর ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ ফুস ফুসফুস ফুসফাস ফোঁফাঁ ফোঁফোঁ ফোঁৎফোঁৎ ফোঁচফোঁচ ফোঁস ফোঁসফোঁস ফ্যাফ্যা ফ্যাকফ্যাক ফ্যাঁচ ফ্যাঁচফ্যাঁচ ফ্যাঁচর-ফ্যাঁচর ফ্যাটফ্যাট ফ্যালফ্যাল। ফুরফুরে ফিনফিনে ফুটফুটে ফ্যাটফেটে ফ্যালফেলে॥

বকবক বকর-বকর বজর-বজর বনবন বড়বড় বড়র-বড়র বিজবিজ বিজির-বিজির বিড়বিড় বিড়ির-বিড়ির বুগবুগ বোঁ বোঁ-বোঁ ব্যাজব্যাজ॥

ভকভক ভড়ভড় ভনভন ভুকভুক ভুটভাট ভুরভুর ভুড়ুক-ভুড়ুক ভোঁ ভোঁ-ভোঁ ভ্যাঁ ভ্যাঁ-ভ্যাঁ, ভ্যানভ্যান। ভ্যানভেনে॥

মচ মচমচ মট মটমট মড়মড় মড়াৎ মসমস মিটমিট মিটিমিটি মিনমিন মুচ মুচমুচ ম্যাড়ম্যাড় ম্যাজম্যাজ। মড়মড়ে মিটমিটে মিনমিনে মিসমিসে মুচমুচে ম্যাড়মেড়ে ম্যাজমেজে॥

রী-রী রিমঝিম রিনিঝিনি রুনুঝুনু রৈরৈ। রগরগে॥

লকলক লটপট লিকলিক। লকলকে লিকলিকে লিংলিঙে ॥

সট সটসট সনসন সড়সড় সপসপ সপাসপ সরসর সিরসির সাঁ সাঁ-সাঁ সাঁইসাঁই সুট সুটসুট সুড়সুড় সুড়ুৎ সোঁ-সোঁ স্যাঁৎস্যাঁৎ। স্যাঁৎসেঁতে ॥

হট হটহট হটর-হটর হড়হড় হড়াৎ হড়বড় হড়র-হড়র হনহন হলহল হড়র-বড়র হাউমাউ হা-হা হাউহাউ হাঁ-হাঁ হাঁসফাঁস হিহি হিড়হিড় হু-হু হুটহাট হুড়হুড় হুড়মুড় হুড়ুৎ হুপহাপ হুস হুসহুস হুসহাস হো হো, হোহো হ্যাঁহ্যাঁ (কুকুর) হ্যাটহ্যাট হ্যাংহ্যাং হাপুস-হুপুস হাপুড়-হুপুড় হুড়োমুড়ি ॥

ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনির বর্ণনা ইংরেজি ভাষাতেও আছে; যথা, bang thud ding-dong hiss ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা ভাষার সহিত তুলনায় তাহা যৎসামান্য। পূর্বোদ্ধৃত তালিকা দেখিলে তাহা প্রমাণ হইবে।

কিন্তু বাংলা ভাষার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে, তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

যে-সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নহে, আমরা তাহাকেও ধ্বনিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকি।

এরূপ ভিন্নজাতীয় অনুভূতি সম্বন্ধে ভাষাবিপর্যয়ের উদাহরণ কেবল বাংলায় নহে, সর্বত্রই পাওয়া যায়। 'মিষ্ট' বিশেষণ শব্দ গোড়ায় স্বাদ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া ক্রমে মিষ্ট মুখ, মিষ্ট কথা, মিষ্ট গন্ধ প্রভৃতি নানা স্বতন্ত্র-জাতীয় ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইংরেজিতে loud শব্দ ধ্বনির বিশেষণ হইলেও বর্ণের বিশেষণরূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা loud colour। কিন্তু এরূপ উদাহরণ বিশ্লেষণ করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে, এই শব্দগুলির আদিম ব্যবহার যতই সংকীর্ণ থাক্‌, ক্রমেই তাহার অর্থের ব্যাপ্তি হইয়াছে। মিষ্ট শব্দ মুখ্যত স্বাদকে বুঝাইলেও এক্ষণে তাহার গৌণ অর্থ মনোহর দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু আমাদের তালিকাধৃত শব্দগুলি সে-শ্রেণীর নহে। তাহাদিগকে অর্থবদ্ধ শব্দ বলা অপেক্ষা ধ্বনি বলাই উচিত। সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল আনুযাত্রিক থাকে, তাহারা রীতিমত সৈন্য নহে অথচ সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, ইহারাও বাংলা ভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম করিয়া থাকে, অথচ রীতিমত শব্দশ্রেণীতে ভরতি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা অত্যন্ত

কাজের অথচ অখ্যাত অবজ্ঞাত। ইহারা না থাকিলে বাংলা ভাষায় বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।

পূর্বেই আভাস দিয়াছি, বাংলা ভাষায় সকলপ্রকার ইন্দ্রিয়বোধই অধিকাংশ স্থলে শ্রুতিগম্য ধ্বনির আকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

গতির দ্রুততা প্রধানত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়; কিন্তু আমরা বলি ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া, বোঁ করিয়া অথবা ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। তীর প্রভৃতি দ্রুতগামী পদার্থ বাতাসে উক্তরূপ ধ্বনি করে, সেই ধ্বনি আশ্রয় করিয়া বাংলা ভাষা চকিতের মধ্যে তীরের উপমা মনে আনয়ন করে। তীরবেগে চলিয়া গেল, বলিলে প্রথমে অর্থবোধ ও পরে কল্পনা উদ্রেক হইতে সময় লাগে; সাঁ শব্দের অর্থের বালাই নাই, সেইজন্য কল্পনাকে সে অব্যবহিতভাবে ঠেলা দিয়া চেতাইয়া তোলে।

ইহার আর-এক সুবিধা এই যে ধ্বনিবৈচিত্র্য এত সহজে এত বর্ণনা-বৈচিত্র্যের অবতারণা করিতে পারে যে, তাহা অর্থবদ্ধ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। সাঁ করিয়া গেল, এবং গটগট করিয়া গেল, উভয়েই দ্রুতগতি প্রকাশ করিতেছে; অথচ উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা অন্য উপায়ে প্রকাশ করিতে গেলে হতাশ হইতে হয়।

এক কাটা সম্বন্ধে কত বিচিত্র বর্ণনা আছে। কচ করিয়া, কচাৎ করিয়া, কচকচ করিয়া কাটা; কচাকচ কাটিয়া যাওয়া; কুচ করিয়া, কট করিয়া, কটাৎ করিয়া, কটাস করিয়া, কঁ্যাচ করিয়া, ঘঁ্যাচ ঘ্যাচ করিয়া, ঝড়াৎ করিয়া, এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে কাটা সম্বন্ধে যতপ্রকার বিচিত্র ভাবের উদ্রেক করে, তাহার সূক্ষ্ম প্রভেদ ভাষান্তরে বিদেশীর নিকট ব্যক্ত করা অসম্ভব।

ইংরেজিতে গমনক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন ছবির জন্য বিচিত্র শব্দ আছে— creep crawl sweep totter waddle ইত্যাদি। বাংলায় আভিধানিক শব্দে চলার বিচিত্র ছবি পাওয়া যায় না; ছবি খুঁজিতে হইলে আমাদের অভিধানতিরস্কৃত শব্দগুলি ঘাঁটিয়া দেখিতে হয়। থটথট করিয়া, ঘটঘট করিয়া, খুটখুট করিয়া, থুরথুর করিয়া, খুটুস খুটুস করিয়া গুটগুট করিয়া, ঘটর ঘটর করিয়া, ট্যাঙস ট্যাঙস করিয়া, থপ থপ করিয়া, থপাস থপাস করিয়া, ধড়্ফড় করিয়া, ধাঁ ধাঁ করিয়া, সন সন করিয়া, সুড় সুড় করিয়া, সুট সুট করিয়া, সুড়ুৎ করিয়া, হন হন করিয়া, হুড়মুড় করিয়া— চলার এত বিচিত্র অথচ

সুস্পষ্ট ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে।

চলা কাটা প্রভৃতি ক্রিয়ার সহিত ধ্বনির সম্বন্ধ থাকা আশ্চর্য নহে; কারণ গতি হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যে-সকল ছবি ধ্বনির সহিত দূরসম্পর্কবিশিষ্ট, তাহাও বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দে ব্যক্ত হয়; যেমন পাতলা জিনিসকে ফিনফিন ফুরফুর ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। পাতলা ফিনফিন করছে, বলিলে এ কথা কেহ বোঝে না যে, পাতলা বস্তু বাস্তবিক কোনো শব্দ করিতেছে, অথচ তদ্দ্বারা তনু পদার্থের তনুত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ছিপছিপে কথাটাও ওইরূপ; সরু বেতই বাতাসে আহত হইয়া ছিপছিপ শব্দ করে, মোটা লাঠি করে না, এইজন্য ছিপছিপে লোক বস্তুত কোনো শব্দ না করিলেও ছিপছিপে শব্দ দ্বারা তাহার দেহের বিরলতা সহজেই মনে আসে। লকলকে লিকলিকে লিংলিঙে শব্দও এই শ্রেণীর।

কিন্তু ধ্বনির সহিত যে-সকল ভাবের দূর সম্বন্ধও নাই, তাহাও বাংলায় ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত হয়। যেমন কনকনে শীত; কনকন ধ্বনির সহিত শীতের কোনো সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শীতে শরীরে যে বেদনা বোধ হয়, আমাদের কল্পনার কোনো অদ্ভুত বিশেষত্ববশত আমরা তাহাকে কনকন ধ্বনির সহিত তুলনা করি; অর্থাৎ আমরা মনে করি, সেই বেদনা যদি শ্রুতিগম্য হইত তবে তাহা কনকন শব্দরূপে প্রকাশ পাইত।

আমরা শরীরের প্রায় সর্বপ্রকার বেদনাকেই বিশেষ বিশেষ ধ্বনির ভাষায় ব্যক্ত করি; যথা, কটকট কনকন করকর (চোখের বালি) কুটকুট গা-ঘ্যানঘ্যান (বা গা-ঘিনঘিন) গা-চচ্চড় চিনচিন গা-ছমছম ঝিনঝিন দবদব ধকধক বুক-ঢুব্দুড় ম্যাজম্যাজ সুড়সুড় সড়সড় রীরী। ইংরেজিতে এইরূপ শারীরিক বেদনা-সকলকে— throbbing gnawing boring crawling cutting tearing bursting প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হয়। আমরাও ছিঁড়ে পড়া, ফেটে যাওয়া, কামড়ানো প্রভৃতি বিশেষণ আবশ্যকমত ব্যবহার করি, কিন্তু উল্লিখিত ধ্বন্যাত্মক শব্দে তাহা যে ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহা আর কিছুতে হইবার জো নাই। ওই-সকল ধ্বনির সহিত ওই সকল বেদনার সম্বন্ধ যে কাল্পনিক, এক্ষণে আমাদের পক্ষে তাহা মনে করাই কঠিন। বাস্তবিক অনুভূতি সম্বন্ধে কিরূপ বিসদৃশ উপমা আমাদের মনে উদিত হয়, গা মাটি মাটি করা, বাক্যটি তাহার উদাহরণস্থল। মাটির সহিত শারীরিক অবস্থাবিশেষের যে

কী তুলনা হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না, অথচ, গা মাটি মাটি করা, কথাটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাববহ।

সর্বপ্রকার শূন্যতা, স্তব্ধতা, এমন-কি নিঃশব্দতাকেও আমরা ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করি। আমাদের ভাষায় শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করে, মধ্যাহ্ন রৌদ্রের স্তব্ধতা ঝাঁ ঝাঁ করে, শূন্য মাঠ ধূ ধূ করে, বৃহৎ জলাশয় থৈ থৈ করে, পোড়োবাড়ি হাঁ হাঁ করে, শূন্য হৃদয় হু হু করে, কোথাও কেহ না থাকিলে ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে —এই-সকল নিঃশব্দতার ধ্বনি অন্যভাষীদের নিকট কিরূপ জানি না, আমাদের কাছে নিরতিশয় স্পষ্ট ভাববহ : ইংরেজি ভাষার desolate প্রভৃতি অর্থাত্মক শব্দ, অন্তত আমাদের নিকট এত সুস্পষ্ট নহে।

বর্ণকে ধ্বনিরূপে বর্ণনা করা, সেও আশ্চর্য। টকটকে টুকটুকে ডগডগে দগদগে রগরগে লাল ; ফুটফুটে ফ্যাটফেটে ফ্যাকফেকে ধবধবে সাদা ; মিসমিসে কুচকুচে কালো।

টকটক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থের শব্দ। যে-লাল অত্যন্ত কড়া লাল সে যখন চক্ষুতে আঘাত করে, তখন সেই আঘাতক্রিয়ার সহিত টকটক শব্দ আমাদের মনে উহ্য থাকিয়া যায়। কবির কর্ণে যেমন 'silent spheres' অর্থাৎ নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের একটি সংগীত উহ্যভাবে ধ্বনিত হইতে থাকে, এও সেইরূপ। ঘোর লাল আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে যে-আঘাত করে, তাহার যদি কোনো শব্দ থাকিত, তবে তাহা আমাদের মতে টকটক শব্দ। আবার সেই রক্তবর্ণ যখন মৃদুতর হইয়া আঘাত করে, তখন তাহার টকটক শব্দ টুকটুক শব্দে পরিণত হয়।

কিন্তু ধবধব শব্দ সম্ভবত গোড়ায় ধবল শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সংসর্গবশত নিজের অর্থসম্পত্তি হারাইয়া ধ্বনির দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। জলজল শব্দ তাহার অন্যতর উদাহরণ ; জলন শব্দ তাহার পিতৃপুরুষ হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে কুলত্যাগী, সেই কারণে আমরা কোনো জিনিসকে 'জলজল হইতেছে' বলি না— 'জলজল করিতেছে' বলি— এই করিতেছে ক্রিয়ার পূর্বে ধ্বনি শব্দ উহ্য। বাংলা ভাষায় এইরূপ প্রয়োগই প্রসিদ্ধ। নদী কুলকুল করে, জুতা মচমচ করে, মাছি ভনভন করে, এরূপ স্থলে শব্দ করে বলা বাহুল্য ; সাদা ধবধব করে বলিলেও বুঝায়, শ্বেতপদার্থ আমাদের কল্পনাকর্ণে একপ্রকার অশাব্দিত শব্দ করে। কোনো বর্ণ যখন তাহার উজ্জ্বলতা পরিত্যাগ করে, তখন

বলি ম্যাড়ম্যাড় করিতেছে। কেন বলি তাহার কৈফিয়ত দেওয়া আমার কর্ম নহে, কিন্তু যেখানে ম্যাড়মেড়ে বলা আবশ্যক— সেখানে মলিন ম্লান প্রভৃতি আর-কিছু বলিয়া কুলায় না।

চিকচিক গোড়ায় চিক্কণ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না, সে-প্রসঙ্গ এ স্থলে আমি অনাবশ্যক বোধ করি। চকচক চিকচিক ঝিকঝিক এক্ষণে বিশুদ্ধ ধ্বনিমাত্র। চিকচিকে পদার্থের চঞ্চল জ্যোতি আমাদের চক্ষে একপ্রকার অশব্দ ধ্বনি করিতে থাকে, তাহাকে আমরা চিকচিক বলি; আবার সেই চিক্কণতা যদি তৈলাভিষিক্ত হয় তবে তাহা নীরবে চুকচুক শব্দ করে, আমরা বলি তেল-চুকচুকে। চিক্কণ পদার্থ যদি চঞ্চল হয়, যদি গতিবশত তাহার জ্যোতি একবার এক দিকে হইতে একবার অন্য দিক হইতে আঘাত করে, তখন সেই জ্যোতি চিকচিক ঝিকঝিক বা ঝলঝল না করিয়া চিকমিক ঝিকমিক ঝলমল করিতে থাকে, অর্থাৎ তখন সে একটা শব্দ না করিয়া দুইটা শব্দ করে। কটমট করিয়া চাহিলে সেই দৃষ্টি যেন এক দিক হইতে কট এবং আর-এক দিক হইতে মট করিয়া আসিয়া মারিতে থাকে, এবং ধ্বনির বৈচিত্র্য দ্বারা কাঠিন্যের ঐক্য যেন আরো পরিস্ফুট হয়।

অবস্থাবিশেষে শব্দের হ্রস্বদীর্ঘতা আছে; ধপ করিয়া যে লোক পড়ে, তাহা অপেক্ষা স্থূলকায় লোক ধপাস করিয়া পড়ে। পাতলা জিনিস কচ করিয়া কাটা যায়, কিন্তু মোটা জিনিস কচাৎ করিয়া কাটে।

আলোচ্য বিষয় আরো অনেক আছে। দেখা আবশ্যক এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির সীমা কোথায়, অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিশেষজাতীয় ছবি ও ভাব প্রকাশের জন্য ইহারা নিযুক্ত। প্রথমত ইহাদিগকে স্থাবর এবং জঙ্গমে একটা মোটা বিভাগ করা যায়, অর্থাৎ স্থিতিবাচক এবং গতিবাচক শব্দগুলিকে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইবে স্থিতিবাচক শব্দ অতি অল্প। কেবল শূন্যতাপ্রকাশক শব্দগুলিকে ওই দলে ধরা যাইতে পারে; যথা, মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, অথবা রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এই ধূ ধূ এবং ঝাঁ ঝাঁ ভাবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম স্পন্দনের ভাব আছে বলিয়াই তাহারা এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের দলে মিশিতে পারিয়াছে। আমাদের এই শব্দগুলি সচলধর্মী। চকচকে জিনিস স্থির থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জ্যোতি চঞ্চল। যাহা পরিষ্কার তকতক করে, তাহার আভাও স্থির নহে। বর্ণ জলজলে হউক বা ম্যাড়মেড়ে

হউক, তাহার আভা আছে।

বাংলা ভাষায় স্থিরত্ব বর্ণনার উপাদান কী, তাহা আলোচনা করিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

গট হইয়া বসা, গুম হইয়া থাকা, ভোঁ হইয়া থাকা, বুঁদ্ হইয়া যাওয়া। গট গুম এবং ভোঁ ধ্বন্যাত্মক বটে, কিন্তু আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইহার মধ্যেও গুম-ভাবে একটি আবদ্ধ আবেগ আছে; যেন গতি স্তব্ধ হইয়া আছে, এবং ভোঁ-ভাবের মধ্যেও একটি আবেগের বিহ্বলতা প্রকাশ পায়। ইহারা একান্ত স্থিতিবোধক নহে, স্থিতির মধ্যে গতির আভাসবোধক। যাহাই হউক এরূপ উদাহরণ আরো যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা অত্যল্প।

স্থিতিবাচক শব্দ অধিকাংশই অর্থাত্মক। স্থিতি বুঝিতে মনের সত্বরতা আবশ্যক হয় না। স্থিতির গুরুত্ব বিস্তার এবং স্থায়িত্ব, সময় লইয়া ওজন করিয়া পরিমাপ করিয়া বুঝিলে ক্ষতি নাই। অর্থাত্মক শব্দে সেই পরিমাপ কার্যের সাহায্য করে। কিন্তু গতিবোধ এবং বেদনাবোধ স্থিতিবোধ অপেক্ষা অধিকতর অনির্বচনীয়। তাহা বুঝিতে হইলে বর্ণনা ছাড়িয়া সংকেতের সাহায্য লইতে হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি সংকেত।

গদ্য ও পদ্যের প্রভেদও এই কারণমূলক। গদ্য জ্ঞান লইয়া এবং পদ্য অনুভাব লইয়া। বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্থের সাহায্যে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু অনুভাব কেবল-মাত্র অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হয় না, তাহার জন্য ছন্দের ধ্বনি চাই; সেই ধ্বনি অনির্বচনীয়কে সংকেতে প্রকাশ করে।

আমাদের বর্ণনায় যে অংশ অপেক্ষাকৃত অনির্বচনীয়তর, সেইগুলিকে ব্যক্ত করিবার জন্য বাংলা ভাষায় এই-সকল অভিধানের আশ্রয়চ্যুত অব্যক্ত ধ্বনি কাজ করে। যাহা চঞ্চল, যাহার বিশেষত্ব অতি সূক্ষ্ম, যাহার অনুভূতি সহজে সুস্পষ্ট হইবার নহে, তাহাদের জন্য এই ধ্বনিগুলি সংকেতের কাজ করিতেছে।

আমার তালিকা অকারাদি বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সময়াভাববশত সেই সহজ পথ লইয়াছি। উচিত ছিল চলন কর্তন পতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে শব্দগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা। তাহা হইলে সহজে বুঝা যাইত, কোন্ কোন্ শ্রেণীর বর্ণনায় এই শব্দগুলি ব্যবহার হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ধ্বনির ঐক্য আছে কী না। ঐক্য থাকাই সম্ভব। ছেদনবোধক শব্দগুলি চকারান্ত অথবা টকারান্ত; কচ এবং কট— তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদন কচ, এবং গুরু

অস্ত্রে কট। এই পর্যায়ের সকল শব্দই ক-বর্গের মধ্যে সমাপ্ত; ক্যাঁচ খ্যাঁচ গ্যাঁচ ঘ্যাঁচ।

পাঠকগণ চেষ্টা করিয়া এইরূপ পর্যায়বিভাগে সহায়তা করিবেন এই আশা করি।

জ্যাবড়া থ্যাবড়া অ্যাবড়া-খ্যাবড়া হিজিবিজি হাবজা-গোবজা হোমরা-চোমরা হেজিপেঁজি ঝাপসা ভাপসা ঝুপসি ড্যাপসা হোঁৎকা গোমসা ধুমসো ঘুপসি, মটকা মারা, গুঁড়ি মারা, উঁকি মারা, টেবো, ট্যাবলা, ভেবড়ে যাওয়া, মুষড়ে যাওয়া প্রভৃতি বর্ণনামূলক খাটি বাংলা শব্দের শ্রেণীবদ্ধ তালিকাসংকলনে পাঠকদিগকে অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

১৩০৭

বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত

প্রবন্ধ-আরম্ভে বলা আবশ্যক যে-সকল বাংলা শব্দ লইয়া আলোচনা করিব, তাহার বানান কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে লিখিত হইবে। বর্তমানকালে কলিকাতা ছাড়া বাংলাদেশের অপরাপর বিভাগের উচ্চারণকে প্রাদেশিক বলিয়া গণ্য করাই সংগত।

আজ পর্যন্ত বাংলা অভিধান বাহির হয় নাই; সুতরাং বাংলা শব্দের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে নিজের অসহায় স্মৃতিশক্তির আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু স্মৃতির উপর নির্ভর করিবার দোষ এই যে, স্মৃতি অনেক সময় অযাচিত অনুগ্রহ করে, কিন্তু প্রার্থীর প্রতি বিমুখ হইয়া দাঁড়ায়। সেই কারণে প্রবন্ধে পদে পদে অসম্পূর্ণতা থাকিবে। আমি কেবল বিষয়টার সূত্রপাত করিবার ভার লইলাম, তাহা সম্পূর্ণ করিবার ভার সুধী-সাধারণের উপর।

আমার পক্ষে সংকোচের আর-একটি গুরুতর কারণ আছে। আমি বৈয়াকরণ নহি। অনুরাগবশত বাংলা শব্দ লইয়া অনেক দিন ধরিয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছি; কখনো কখনো বাংলার দুটা-একটা ভাবাতত্ত্ব মাথায় আসিয়াছে; কিন্তু ব্যাকরণব্যবসায়ী নহি বলিয়া সেগুলিকে যথাযোগ্য পরিভাষার সাহায্যে সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হই নাই। এ প্রবন্ধে পাঠকেরা আনাড়ির পরিচয় পাইবেন, কিন্তু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ত্রুটি দেখিতে পাইবেন না। অতএব শ্রমের দ্বারা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, পণ্ডিতগণের বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা তাহা সংশোধিত হইবে আশা করিয়াই সাহিত্য-পরিষদে এই বাংলা ভাষাতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা বাংলা ব্যাকরণে প্রয়োগ করা কিরূপ বিপজ্জনক তাহা মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] সুতরাং জ্ঞাতসারে পাপ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। নূতন পরিভাষা নির্মাণের ক্ষমতা নাই, অথচ না করিলেও লেখা অসম্ভব।

এইখানে একটা পরিভাষার কথা বলি। সংস্কৃত ব্যাকরণে যাহাকে ণিজন্ত ধাতু বলে বাংলায় তাহাকে ণিজন্ত বলিতে গেলে অসংগত হয়; কারণ সংস্কৃত

১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "বাংলা ব্যাকরণ", সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৮, প্রথম সংখ্যা।

ভাষায় ণিচ্‌ প্রত্যয় দ্বারা ণিজন্ত ধাতু সিদ্ধ হয়, বাংলায় ণিচ্‌ প্রত্যয়ের কোনো অর্থ নাই। অতএব অন্য ভাষার আকারগত পরিভাষা অবলম্বন না করিয়া প্রকারগত পরিভাষা রচনা করিতে হয়।

ণিজন্তের প্রকৃতি কী। তাহাতে ব্যবহিত ও অব্যবহিত দুইটি কর্তা থাকে। ফল পাড়িলাম; পতন-ব্যাপারের অব্যবহিত কর্তা ফল, কিন্তু তাহার হেতু-কর্তা আমি: কারয়তি যঃ স হেতুঃ— যে করায় সে-ই হেতু, সে-ই ণিজন্ত ধাতুর প্রথম কর্তা, এবং যাহার উপর সেই কার্যের ফল হয় সে-ই ণিজন্ত ধাতুর দ্বিতীয় কর্তা। হেতু-র একটি প্রতিশব্দ নিমিত্ত, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি বর্তমান প্রবন্ধে ণিজন্ত ধাতুকে নৈমিত্তিক ধাতু নাম দিলাম।

বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়। তাহার মধ্যে কোন্‌গুলি প্রকৃত বাংলা ও কোন্‌গুলি সংস্কৃত তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেই যে তাহাদের সংস্কৃত বলিতে হইবে, এ কথা মানি না। সংস্কৃত ইন্‌ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে, সেইজন্য তাহা সংস্কৃত পূর্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। দাগি (দাগযুক্ত) শব্দ কোনো অবস্থাতেই দাগিন হয় না। বাংলা অন্ত প্রত্যয় সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন, কিন্তু তাহা শতৃ প্রত্যয়ের অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া একবচনে জিয়স্ত ফুটন্ত ইত্যাদি রূপ ধারণ করিতে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না।

বাংলায় সংস্কৃতেতর শব্দেও যে-সকল প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়, আমরা তাহাকে বাংলাপ্রত্যয় বলিয়া গণ্য করিব। ত প্রত্যয় যোগে সংস্কৃত রঞ্জিত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু বাংলায় ত প্রত্যয়ের ব্যবহার নাই, সেইজন্য আমরা রঙিত বলি না। সজ্জিত হয়, সাজিত হয় না; অতএব ত প্রত্যয় বাংলা-প্রত্যয় নহে।

হিন্দি পার্সি প্রভৃতি হইতে বাংলায় যে-সকল প্রত্যয়ের আমদানি হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও আমার ওই একই বক্তব্য। সই প্রত্যয় সম্ভবত হিন্দি বা পার্সি; কিন্তু বাংলা শব্দের সহিত তাহা মিশ্রিত হইয়া ট্যাকসই প্রমাণসই মানানসই প্রভৃতি শব্দ সৃজন করিয়াছে। ওয়ান প্রত্যয় সেরূপ নহে। গাড়োয়ান দারোয়ান পালোয়ান শব্দ আমরা হিন্দি হইতে বাংলায় পাইয়াছি, প্রত্যয়টি পাই নাই।

অর্থাৎ যে-সকল প্রত্যয় সংস্কৃত অথবা বিদেশীয় শব্দসহযোগে বাংলায়

আসিয়াছে, বাংলার সহিত কোনোপ্রকার আদানপ্রদান করিতেছে না, তাহাকে আমরা বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়রূপে স্বীকার করিতে পারি না।

যে-সকল কৃৎ-তদ্ধিতের সাহায্যে বাংলা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সৃষ্টি হয়, বর্তমান প্রবন্ধে কেবল তাহারই উল্লেখ থাকিবে। ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

এই প্রবন্ধে বিশেষ্য বিশেষণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি, ক্রিয়াবাচক ও পদার্থবাচক। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য যথা, চলা বলা সাঁৎরানো বাঁচানো ইত্যাদি। পদার্থবাচক যথা, হাতি ঘোড়া জিনিসপত্র ঢেঁকি কুলা ইত্যাদি। গুণবাচক প্রভৃতি বিশেষ্য বিশেষণের প্রয়োজন হয় নাই।

অ প্রত্যয়

এই প্রত্যয়যোগে একশ্রেণীর বিশেষণ শব্দের সৃষ্টি হয়; যথা, কট্‌মট্‌ শব্দের উত্তর অ প্রত্যয় হইয়া কটমট (কটমট ভাষা, কটমট দৃষ্টি), টল্‌মল্‌ হইতে টলমল।[১]

আসন্নপ্রবণতা বুঝাইবার জন্য শব্দদ্বৈত-যোগে যে-বিশেষণ হয় তাহাতে এই অ প্রত্যয়ের হাত আছে; যথা, পড়্‌ ধাতু হইতে পড়-পড়, পাক্‌ ধাতু হইতে পাক-পাক, মর্‌ ধাতু হইতে মর-মর, কাঁদ্‌ ধাতু হইতে কাঁদ-কাঁদ। অন্য অর্থে হয় না; যথা, কাটাকাটা (কথা), পাকাপাকা ছাড়াছাড়া ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। মনে পড়িতেছে, রামমোহন রায় তাঁহার বাংলা ব্যাকরণে লিখিয়াছেন, বাংলায় বিশেষণ পদ হলন্ত হয় না। কথাটা সম্পূর্ণ প্রামাণিক নহে, কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, খাস বাংলার অধিকাংশ দুই অক্ষরের বিশেষণ হলন্ত নহে। বাংলা-উচ্চারণের সাধারণ নিয়মমতে 'ভাল' শব্দ ভাল্‌ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা

১ দ্রষ্টব্য এই যে, ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈতে সর্বত্র এ নিয়ম খাটে না; যথা, আমরা টকটক লাল বা খটখট রৌদ্র বা টনটন ব্যথা বলি না, সে-স্থলে টক্‌টকে টন্‌টনে বলিয়া থাকি। কট্‌মট্‌ টল্‌মল্‌ ঝল্‌মল্‌, শব্দ হইতে বিকল্পে— কটমট কট্‌মটে, টলমল টল্‌মলে, ঝলমল ঝল্‌মলে হইয়া থাকে।

অকারান্ত উচ্চারণ করি।[১] বস্তুত বাংলায় অকারান্ত বিশেষ্য শব্দ অতি অল্পই দেখা যায়, অধিকাংশই বিশেষণ; যথা, বড় ছোট মাঝ (মাঝো মেঝো) ভাল কাল খাট (ক্ষুদ্র) জড় (পুঞ্জীকৃত) ইত্যাদি।

বাকি অনেকগুলা বিশেষণই আকারান্ত; যথা, কাঁচা পাকা বাঁকা তেড়া সোজা সিধা সাদা মোটা মুলা বোবা কাল্লা ন্যাড়া কানা তিতা মিঠা উঁচা বোকা ইত্যাদি।

আ প্রত্যয়

পূর্বোক্ত আকারান্ত বিশেষণগুলিকে আ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন বলিয়া অনুমান করিতেছি। সংস্কৃত শব্দ কাণ, বাংলায় বিশেষণ হইবার সময় কানা হইল, মৃত হইতে মড়া হইল, মহৎ হইতে মোটা হইল, সিত হইতে সাদা হইল। এই আকারগুলি উচ্চারণের নিয়মে আপনি আসে নাই। বিশেষণে হলন্ত প্রয়োগ বর্জন করিবার একটা চেষ্টা বাংলায় আছে বলিয়াই যেখানে সহজে অন্য কোনো স্বরবর্ণ জোটাইতে পারে নাই, সেই-সকল স্থলে আ প্রত্যয় যোগ করিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার 'স্বার্থে ক' বাংলায় আ প্রত্যয়ের আকার ধারণ করিয়াছে। ঘোটক ঘোড়া, মস্তক মাথা, পিষ্টক পিঠা, কণ্টক কাঁটা, চিপিটক চিঁড়া, গোপালক গোয়ালা, কুল্যক কুলা।

বাংলায় অনেক শব্দ আছে যাহা কখনো বা স্বার্থে আ প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছে, কখনো করে নাই; যেমন তক্ত তক্তা, বাঘ বাঘা, পাট পাটা, ল্যাজ ল্যাজা, চোঙ চোঙা, চাঁদ চাঁদা, পাত পাতা, ভাই ভাইয়া (ভায়া,) বাপ বাপা, থাল থালা, কালো কালা, তল তলা, ছাগল ছাগ্‌লা, বাদল বাদ্‌লা, পাগল পাগ্‌লা, বামন বাম্‌না, বেল (ফুল) বেলা, ইলিশ ইল্‌শা (ইল্‌শে)।

এই আ প্রত্যয়যোগে অনেক স্থলে অবজ্ঞা বা অতিপরিচয় জ্ঞাপন করে, বিশেষত মানুষের নাম সম্বন্ধে; যথা, রাম রামা, শাম শামা, হরি হরে (হরিয়া), মধু মোধো (মধুয়া), ফটিক ফট্‌কে (ফট্‌কিয়া)।

দ্রষ্টব্য এই যে, সকল নামে আ প্রত্যয় হয় না; যাদবকে যাদ্‌বা, মাধবকে

---

১ বাংলা অ অনেক স্থলেই হ্রস্ব ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। আমরা লিখি যত, উচ্চারণ করি যতো; লিখি বড়, উচ্চারণ করি বড়ো। উড়িয়ার বড় বাঙালির বড়-র সহিত তুলনা করিলে দুই অকারের প্রভেদ বুঝা যাইবে।

মাধ্‌ বা বলে না। শ্রীশ, প্রিয়, পন্নান প্রভৃতিও এইরূপ। বাংলা নামের বিকার সম্বন্ধে কোনো পাঠক আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়া দিলে আনন্দিত হইব।

স্বার্থে আ প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া গেছে, তাহাতে অর্থের পরিবর্তন হয় না। আবার, আ প্রত্যয়ে অর্থের কিছু পরিবর্তন ঘটে এমন উদাহরণও আছে; যেমন, হাত হইতে হাতা (রন্ধনের হাতা, জামার হাতা, অর্থাৎ হাতের মতো পদার্থ), ঠ্যাঙ হইতে ঠ্যাঙা (ঠ্যাঙের ন্যায় পদার্থ), ভাত হইতে ভাতা (খোরাকি), বাস হইতে বাসা, ধোব হইতে ধোবা, চাষ হইতে চাষা।

ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের সৃষ্টি হয়; বাঁধ্‌ ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া বাঁধা, ঝর্‌ ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া ঝরা। ইহারা বিশেষ্য বিশেষণ উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। বিশেষণ যেমন বাঁধা হাত; বিশেষ্য যেমন, হাত বাঁধা।

দ্রষ্টব্য এই যে, কেবল একমাত্রিক অর্থাৎ monosyllabic ধাতুর উত্তর এইরূপ আ প্রত্যয় হইয়া দুই অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সৃষ্টি করে, যেমন ধর্‌ মার্‌ চল্‌ বল্‌ হইতে ধরা মারা চলা বলা। বহুমাত্রিক ধাতু বা ক্রিয়াবাচক শব্দের উত্তর আ সংযোগ হয় না; যেমন, আঁচড় হইতে আঁচ্‌ড়া, আছাড় হইতে আছ্‌ড়া হয় না।

কিন্তু শুদ্ধমাত্র বিশেষণরূপে হইতে পারে; যেমন, থ্যাংলা মাংস, কোঁকড়া চুল, বাঘ-আঁচ্‌ড়া গাছ, নেই-আঁকৃড়া লোক (ন্যায়-আঁকড়া অর্থাৎ নৈয়ায়িক তার্কিক)।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া গেল। আ প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন পদার্থবাচক ও গুণবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত দুই-একটি মনে পড়িতেছে; তাওয়া (যাহাতে রুটিতে তা দেওয়া যায়), দাওয়া (দাবি, অর্থাৎ দাও বলিবার অধিকার), আছ্‌ড়া (আঁটি হইতে ধান আছড়াইয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে)।

বিশিষ্ট অর্থে আ প্রত্যয় হইয়া থাকে; যথা, তেলবিশিষ্ট তেলা, বেতাল-বিশিষ্ট বেতালা, বেসুরবিশিষ্ট বেসুরা, জলময় জলা, নুনবিশিষ্ট নোনা (লবণাক্ত), আলোকিত আলা, রোগযুক্ত রোগা, মলযুক্ত ময়লা, চালযুক্ত চালা (ঘর), মাটি-যুক্ত মাটিয়া (মেটে), বালিযুক্ত বালিয়া (বেলে), দাড়িযুক্ত দাড়িয়া (দেড়ে)।

বৃহৎ অর্থে আ প্রত্যয়; যথা, হাঁড়া (ক্ষুদ্র হাঁড়ি); নোড়া (লোষ্ট্র হইতে; ক্ষুদ্র, নুড়ি)।

আন্ প্রত্যয়

আন্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত: যোগান্ চাপান্ চালান্ জানান্ হেলান্ ঠেসান্ মানান্।

এগুলি ছাড়া একপ্রকার বিশেষ পদবিন্যাসে এই আন্ প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। ঠকা হইতে ঠকান্ শব্দ বাংলায় সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু আমরা বলি, ভারি ঠকান্ ঠকেছি, অথবা, কী ঠকান্‌টাই ঠকিয়েছে। সেইরূপ কী পিটান্‌টাই পিটিয়েছে, কী চলান্‌টাই চলিয়েছে, এরূপ বিস্ময়সূচক পদ-বিন্যাসের বাহিরে পিটান্ চলান্ ব্যবহার হয় না।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। পদার্থবাচকের দৃষ্টান্তও আছে; যথা, বানান্ উঠান্ উনান্ উজান্ (উর্ধ্ব—উঝ+আন্) ঢালান্ (জলের) মাচান্ (মঞ্চ)।

আন্+অ প্রত্যয়

আন্ প্রত্যয়ের উত্তর পুনশ্চ অ প্রত্যয় করিয়া বাংলায় অনেকগুলি ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য বিশেষণের সৃষ্টি হয়।

পূর্বে দেখানো গিয়াছে, একমাত্রিক ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া ক্রিয়া-বাচক দুই অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সিদ্ধ হয়; যেমন, ধরা মারা ইত্যাদি।

বহুমাত্রিকে আ প্রত্যয় না হইয়া আন্ ও তদুত্তরে অ প্রত্যয় হয়; যেমন, চুল্‌কান (উচ্চারণ চুল্‌কানো) কাম্‌ড়ান (কামড়ানো) ছটফটান (ছট্‌ফটানো) ইত্যাদি।

কিন্তু সাধারণত নৈমিত্তিক ক্রিয়াপদকেই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণে পরিণত করিতে আন্+অ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; যেমন, করা শব্দ হইতে নৈমিত্তিক অর্থে করান, বলা হইতে বলান।

ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রমও দেখা যায়; যেমন পড়া হইতে নৈমিত্তিক পাড়া, চলা হইতে চালা, গলা হইতে গালা, নড়া হইতে নাড়া, জ্বলা হইতে জ্বালা, মরা হইতে মারা, বহা হইতে বাহা, জরা হইতে জারা।

কিন্তু পড়া হইতে পড়ান, নড়া হইতে নড়ান, চলা হইতে চলান, ইহাও

হয়। এমন-কি, নৈমিত্তিক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ চালা নাড়া পাড়া প্রভৃতির উত্তর পুনশ্চ আন্+অ যোগ করিয়া, চালান পাড়ান নাড়ান হইয়া থাকে

কিন্তু তাকান গড়ান (বিছানায়) আঁচান প্রভৃতি অনৈমিত্তিক শব্দ সম্বন্ধে কী বুঝিতে হইবে। তাকা গড়া আঁচা, হইল না কেন।

তাহার কারণ, এইগুলির মূল ধাতু একমাত্রিক নহে। দেখ্, একমাত্রিক ধাতু, তাহা হইতে 'দেখা' হইয়াছে ; কিন্তু তাকান শব্দের মূল ধাতুটি তাক্ নহে, তাহা তাকা, সেইজন্যই উক্ত ধাতুকে বিশেষ্য করিতে আন্+অ প্রত্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। নামধাতুগুলিও আন্+অ প্রত্যয়ের অপেক্ষা রাখে ; যেমন, লাথ্ হইতে লাথান, পিঠ্ হইতে পিঠান (পিটোনো), হাত হইতে হাতান।

মূল ধাতু বহুমাত্রিক কি না, তাহার পরীক্ষার অন্য উপায় আছে। অনুজ্ঞায় আমরা দেখ্ ধাতুর উত্তর 'ও' প্রত্যয় করিয়া বলি, দেখো, কিন্তু তাকো বলি না ; তাকা ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া বলি তাকাও। গঠন করো, বলিতে হইলে গড়্ ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া বলি গড়ো, কিন্তু শয়ন করো, বুঝাইতে হইলে গড়া ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া বলি গড়াও।

আমাদের বহুমাত্রিক ক্রিয়াবাচক শব্দগুলি আকারান্ত, সেইজন্য পুনশ্চ তাহার উত্তর আ প্রত্যয় না হইয়া আন্+অ প্রত্যয় হয়। মূল শব্দটি আট্‌কা বা চম্‌কা না হইলে অনুজ্ঞায় আট্‌কাও হইত না, চম্‌কাও হইত না। হিন্দিতে পাক্‌ড়্ শব্দের উত্তর ও প্রত্যয় হইয়া পাকড়ো হয় ; সেই শব্দই বাংলায় পাক্‌ড়া রূপ ধরিয়া পাকড়াও হইয়া দাঁড়ায়।

অন্ প্রত্যয়

দৃষ্টান্ত : মাতন্ চলন্ কাঁদন্ গড়ন্ (গঠনক্রিয়া) ইত্যাদি। ইহারা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ।

অন্ প্রত্যয়সিদ্ধ পদার্থবাচক শব্দের উদাহরণও মনে পড়ে ; যেমন, ঝাড়ন্ বেলুন্ (রুটি বেলিবার) মাজন্ গড়ন্ (শরীরের) ফোড়ন্ ঝোঁটন (ঝুঁটি হইতে) পাঁচন্।

অন্+আ প্রত্যয়

অন্ প্রত্যয়ের উত্তর পুনশ্চ আ প্রত্যয় করিয়া কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সৃষ্টি হইয়াছে ; ইহারা বিকল্পে বিশেষ্যও হয় ; যেমন, পাওন্ হইতে

পাওনা, দেওন্ হইতে দেনা, ফেলন্ হইতে ফেল্‌না, মাগন্ হইতে মাগ্‌না, শুকন্ হইতে শুক্‌না।

পদার্থবাচক বিশেষ্যেরও দৃষ্টান্ত আছে; যেমন, বাট্‌না কুট্‌না ওড়্‌না ঝর্‌না খেলনা বিছানা বাজ্‌না ঢাক্‌না।

ই প্রত্যয়

ধর্ম ও ব্যবসায় অর্থে: গোলাপি বেগুনি চালাকি চাকরি চুরি ডাক্তারি মোক্তারি ব্যারিস্টারি মাস্টারি; খাড়াই (খাড়া পদার্থের ধর্ম) লম্বাই চৌড়াই ঠাণ্ডাই আড়ি (আড় অর্থাৎ বক্র হইবার ভাব)।

অনুকরণ অর্থে: সাহেবি নবাবি।

দক্ষ অর্থে: হিসাবদক্ষ হিসাবি, আলাপদক্ষ আলাপি, ধ্রুপদদক্ষ ধ্রুপদি।

বিশিষ্ট অর্থে: দামবিশিষ্ট দামি, দাগবিশিষ্ট দাগি, রাগবিশিষ্ট রাগি, ভার-বিশিষ্ট ভারি।

ক্ষুদ্র অর্থে: হাঁড়ি পুঁটুলি কাঠি (ইহাদের বৃহৎ—হাঁড়া পোঁটলা কাঠ)।

দেশীয় অর্থে: মারাঠি গুজরাটি আসামি পাটনাই বস্‌রাই।

স্বার্থে: হাস হাসি, ফাঁস ফাঁসি, লাথ লাথি, পাড় (পুকুরের) পাড়ি, কড়া কড়াই (কটাহ)।

দিননির্দেশ অর্থে: পাঁচই ছউই সাতই আটই নওই দশই, এইরূপে আঠারই পর্যন্ত।

আ+ই প্রত্যয়

ক্রিয়াবাচক: বাছাই যাচাই দলাই-মলাই (ঘোড়াকে) খোদাই ঢালাই ধোলাই ঢোলাই বাঁধাই পালটাই।

পদার্থবাচক: মরাই (ধানের) বালাই (বালকের অকল্যাণ) মিঠাই।

মনুষ্যের নাম: বলাই কানাই নিতাই জগাই মাধাই।

ধর্ম: বড়াই (বড়ত্ব) বামনাই পোষ্টাই (পুষ্টের ধর্ম)।

ই+আ প্রত্যয়

জাল শব্দ ই প্রত্যয়যোগে জালি, স্বার্থে আ— জালিয়া (জেলে)। এইরূপ, কোঁদলিয়া (কুঁদুলে) জঙ্গলিয়া (জঙ্গুলে) গোবরিয়া (গুবরে), স্যাঁৎস্যাঁতিয়া (স্যাঁৎসেঁতে) ইত্যাদি।

উ প্রত্যয়

চালু (চলনশীল) ঢালু (ঢাল-বিশিষ্ট) নিচু (নিম্নগামী) কলু (ঘানিকল-বিশিষ্ট), গাড়ু (গাগর শব্দ হইতে গাগরু) আগুপিছু (অগ্রবর্তী-পশ্চাদ্‌বর্তী)।

মানুষের নাম : যাদব হইতে যাদু, কালা হইতে কালু, শিব হইতে শিবু, পাঁচকড়ি হইতে পাঁচু।

উ+আ প্রত্যয়

বিশিষ্ট অর্থে, যথা : জলবিশিষ্ট জলুয়া (জোলো), পাঁকুয়া (পেঁকো) ঝাঁকুয়া (ঝেঁকো) বাতুয়া (বেতো) পড়ুয়া (পোড়ো)।

সম্বন্ধ অর্থে : মাছুয়া (মেছো) বুনুয়া (বুনো) ঘরুয়া (ঘোরো) মাঠুয়া (মেঠো)।

নির্মিত অর্থে : কাঠুয়া (কেঠো) ধানুয়া (ধেনো)

আ+ও প্রত্যয়

ঘেরাও চড়াও উধাও ফেলাও (ফলাও)।

ও+আ প্রত্যয়

বাঁচোয়া ঘরোয়া চড়োয়া ধরোয়া আগোয়া।

অন্+ই প্রত্যয়

মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে, অন্ প্রত্যয়ের উত্তর আ প্রত্যয় কেবল একমাত্রিক ধাতুতেই প্রয়োগ হইয়া থাকে ; যেমন, ধর্ হইতে ধর্‌না (ধন্না), কাঁদ্ হইতে কাঁদ্‌না (কান্না)। কিন্তু বহুমাত্রিক শব্দের উত্তর এরূপ হয় না। আমরা কামড়ানা কটকটানা বলি না, তাহার স্থলে কামড়ানি কটকটানি বলিয়া থাকি ; অর্থাৎ অন্ প্রত্যয়ের উত্তর আ প্রত্যয় না করিয়া ই প্রত্যয় করিয়া থাকি।

অন্ প্রত্যয়ের উত্তর ই প্রত্যয় একমাত্রিকেও হয় ; যথা মাতনি (মাতুনি) বাঁধনি (বাঁধুনি) জলনি (জলুনি) কাঁপনি (কাঁপুনি) দাপনি (দাপুনি) আঁটনি (আঁটুনি)।

মূল ধাতুটি হলন্ত কিংবা আকারান্ত, তাহা এই অন্+ই প্রত্যয়ের সাহায্যে জানা যাইতে পারে। তাকনি না হইয়া তাকানি হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে মূল ধাতুটি তাকা। এইরূপ, আছড়া চট্‌কা কাম্‌ড়া ইত্যাদি।

অন্+ই প্রত্যয়সিদ্ধ অধিকাংশ ক্রিয়াবাচক শব্দই অপ্রিয়ভাব ব্যক্ত করে ;

যথা, বকুনি ধমকানি চমকানি হাঁপানি শাসানি টাঁটানি নাকানি-চোবানি কাঁছুনি জলুনি কাঁপুনি ফোঁস্‌লানি কোঁপানি গোঙানি ঘ্যাঙানি খ্যাচ্‌কানি কোঁচ্‌কানি (ভুরু) বাঁকানি (মুখ) খিঁচুনি (দাঁত) খ্যাকানি ঘস্‌ড়ানি ঘুরুনি (চোখ) চাপুনি চেঁচানি ভ্যাঙানি (মুখ) রগড়ানি রাঙানি (চোখ) লাফানি ঝাঁপানি।

ব্যতিক্রম : বাঁধুনি (কথার) শুনানি তুলুনি বুনুনি (কাপড় বা ধান) বাছনি (বাছাই)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের মধ্যে যেগুলি অসুখব্যঞ্জক তাহার উত্তরেই অন্‌+ই প্রত্যয় হয় ; যথা, দব্‌দবানি ঝন্‌ঝনানি কন্‌কনানি টন্‌টনানি ছট্‌ফটানি কুট্‌কুটুনি ইত্যাদি।

অন্‌+ই প্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলার কয়েকটি পদার্থবাচক বিশেষ্যপদ সিদ্ধ হয় ; দৃষ্টান্ত, ছাঁকনি নিড়নি চালুনি বিননি (চুলের) চাট্‌নি ছাউনি নিছনি তলানি (তরলপদার্থের তলায় যাহা জমে)।

ব্যক্তি ও বস্তুর বিশেষণ : রাঁধুনি (ব্রাহ্মণ) ঘুম-পাড়ানি পাট-পচানি ইত্যাদি।

না প্রত্যয়

না প্রত্যয়যোগে বর্ণের বিশেষ পরিবর্তন হয় না ; পাখা পাখনা, জাব (গোরুর) জাবনা, ফাতা (ছিপের) ফাৎনা, ছোট ছোটনা (ধান)।

আনা প্রত্যয়

বাবুয়ানা সাহেবিয়ানা নবাবিয়ানা মুনশীয়ানা। ই প্রত্যয় করিয়া হিঁদুয়ানি।

ল্‌ প্রত্যয়

কাঁকুড়োল (কাঁকুড় হইতে) হাবল খাবল পাগল পাকল (পাক অর্থাৎ ঘূর্ণাবিশিষ্ট) হাতল মাতল (মত্ত হইতে মাতা)।

র্‌ প্রত্যয়

বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর এই র্‌ প্রত্যয়ে অবিরামতা বুঝায় ; যথা, গজ্‌গজ্‌ হইতে গজর্‌ গজর্‌, বক্‌বক্‌ হইতে বকর্‌ বকর্‌, নড়্‌বড়্‌ হইতে নড়র্‌ বড়র্‌, কট্‌মট্‌ হইতে কটর্‌ মটর্‌, ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ হইতে ঘ্যানর্‌ ঘ্যানর্‌, কুট্‌কুট্‌ হইতে কুটুর্‌ কুটুর্‌।

আল্ প্রত্যয়

ময়াল্ কাঙাল্ (কাঙ্‌কাল্) আঁঠিয়াল্ আড়াল মিশাল।

ল্+আ

মেঘলা বাদলা পাতলা শামলা আধলা ছ্যাৎলা একলা দোকলা চাকলা।

ল্+ই+আ

দীঘলিয়া (দীঘ্‌লে) আগলিয়া (আগ্‌লে) পাছলিয়া (পাছ্‌লে) ছুটলিয়া (ছুট্‌লে)।

আড়্

জোগাড় লাগাড় (নাগাড়) সাবাড় লেজুড় খেলোয়াড় উজাড়।

আড়্+ই+আ

বাসাড়িয়া (বাসাড়ে) জোগাড়িয়া (জোগাড়ে) মজাড়িয়া (মজাড়ে) হাতাড়িয়া (হাতুড়ে, যে হাতড়াইয়া বেড়ায়) কাঠুরে হাটুরে ঘেসুড়ে কাঁসুড়ে চাষাড়ে।

রা ও ড়া

টুকরা চাপড়া ঝাঁকড়া পেটরা চামড়া ছোকরা গাঁঠরা কোঁপরা ছিবড়া থাবড়া বাগড়া থাগড়া।

বহু অর্থে : রাজারাজড়া গাছগাছড়া কাঠকাঠরা।

আরি

জুয়ারি কাঁসারি চুনারি পূজারি ভিখারি।

আরু

সজারু (শল্যবিশিষ্ট জন্তু) লাকারু (কোনো কোনো প্রদেশে খরগোশকে বলে) দাবাড়ু (দাবা খেলায় মত্ত)।

ক্

মড়ক চড়ক মোড়ক বৈঠক চটক ঝলক চমক আটক।

আক্ উক্ ইক্

এই-সকল প্রত্যয়যোগে যে ক্রিয়ার বিশেষণগুলি হয় তাহাতে দ্রুতবেগ বুঝায় ; যথা, ফুড়ুক্ তিড়িক্ তড়াক্ চিড়িক্ ঝিলিক্ ইত্যাদি।

ক্+আ

মটকা বোঁচ্‌কা হাল্‌কা বোঁটকা হোঁৎকা উচক্কা। ক্ষুদ্রার্থে ই প্রত্যয়

করিয়া মট্‌কি, বুঁচকি ইত্যাদি হয়।

ক্+ই+আ

ভট্‌কিয়া (ভট্‌কে) পুঁট্‌কিয়া (পুঁট্‌কে) পুঁচকিয়া (পুঁচ্‌কে) ফচ্‌কিয়া (ফচ্‌কে) ছোট্‌কিয়া (ছুট্‌কে)।

উক্

মিথ্যুক লাজুক মিশুক।

গির্+ই

গির্ প্রত্যয়টি বাংলায় চলে নাই। তাগাদ্‌গির প্রভৃতি শব্দগুলি বিদেশী। কিন্তু এই গির্ প্রত্যয়ের সহিত ই প্রত্যয় মিশিয়া গিরি প্রত্যয় বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে।

ব্যবসায় অর্থে ই প্রত্যয় সর্বত্র হয় না। কামারের ব্যবসায়কে কেহ কামারি বলে না, বলে কামারগিরি। এই গির্+ই যোগে অধিকাংশ ব্যবসায় ব্যক্ত হয়; অ্যাটর্নিগিরি স্যাকরাগিরি মুচিগিরি মুটেগিরি।

অনুকরণ অর্থে: বাবুগিরি নবাবগিরি।

দার্

দোকানদার চৌকিদার রওদার বুটিদার জেল্লাদার যাচনদার চড়নদার ইত্যাদি।

ইহার সহিত ই প্রত্যয় যুক্ত হইয়া দোকানদারি ইত্যাদি বৃত্তিবাচক বিশেষ্যের সৃষ্টি হয়।

দান্

বাতিদান পিকদান শামাদান আতরদান। স্বার্থে ই প্রত্যয়যোগে বাতিদানি পিকদানি আতরদানি হইয়া থাকে।

সই

হাতসই মাপসই প্রমাণসই মানানসই ট্যাঁকসই।

পনা

বুড়াপনা ন্যাকাপনা ছিব্‌লেপনা গিন্নিপনা।

ওলা বা ওয়ালা

কাপড়ওয়ালা ছাতাওয়ালা ইত্যাদি।

তর

এমনতর যেমনতর কেমনতর।

অৎ

মানৎ বসৎ ঘুরৎ ফেরৎ গলৎ (গলদ)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর অৎ প্রত্যয়ে দ্রুতবেগ বুঝায় : সড়াৎ ফুড়ৎ পটাৎ খটাৎ।

অৎ+আ

ধর্‌তা ফের্‌তা পড়্‌তা জান্‌তা (সবজান্তা)।

তা

বিশিষ্ট অর্থে, যথা : পান্‌তা নোন্‌তা তল্‌তা (তরল্‌তা, তরল বাঁশ)। আওতা নাম্‌তা শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝা যায় না।

অৎ+ই

ফির্‌তি চল্‌তি উঠ্‌তি বাড়্‌তি পড়্‌তি চুক্‌তি ঘাঁট্‌তি গুন্‌তি।

অৎ+আ+ই

খোল্‌তাই ধর্‌তাই।

অন্ত

জিয়ন্ত ফুটন্ত চলন্ত।

মন্ত

লক্ষীমন্ত বুদ্ধিমন্ত আক্কেলমন্ত।

অন্‌দা (?)

বাসন্দা (অধিবাসী) মাকন্দা (গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন)। বলা উচিত এ-প্রত্যয়টির প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই।

ট্

চাপট্ (চৌচাপট্) সাপট্ ঝাপট্ দাপট্।

ট্+ই

চিম্‌টি।

ট্ট

ভরট্ট (নদীভরট্ট, খালভরট্ট জমি)।

আ+ট্

জমাট্ ভরাট্ ঘেরাট্।

টা

চ্যাপ্‌টা ল্যাঙ্‌টা ঝাপ্‌টা ল্যাপ্‌টা চিম্‌টা শুক্‌টা।

আট্+ই+আ

রোগাটিয়া (রোগাটে) বোকাটিয়া (বোকাটে) তামাটিয়া (তামাটে) ঘোলাটিয়া (ঘোলাটে) ভাড়াটিয়া (ভাড়াটে) বামন্‌টিয়া (বেঁটে)।

অং আং ইং

ভড়ং ভুজং-ভাজাং চোং (নল) খোলাং (খোলাং কুচি) তিড়িং। বড়াং, কোনো কোনো জেলায় অহংকার অর্থে বড়াই না বলিয়া বড়াং বলে।

অঙ্গ আঙ্গ অঙ্গিয়া

সুড়ঙ্গ সুড়ঙ্গি সুড়ুঙ্গে কুলঙ্গি ধিঙ্গি ধেড়েঙ্গে বিরিঙ্গি (বৃহৎ পরিবারকে কোনো কোনো প্রদেশে 'বিরিঙ্গি গুষ্টি' বলে)।

চ চা চি

আল্‌গচ (আলগা ভাব) ল্যাংচা (খোঁড়ার ভাব) ভ্যাংচা (ব্যঙ্গের ভাব) ভাংচি খিম্‌চি ঘামাচি ত্যাড়্‌চা (তির্যক ভাব)। আধার অর্থে : ধুনচি ধুপচি খুঞ্চি চিলিম্‌চি খাতাঞ্চি মশাল্‌চি।

ক্ষুদ্র অর্থে : ব্যাঙাচি নলচি (হুঁকার) কঞ্চি কুচি ; মোচা (কলার মোচা, মুকুলচা হইতে মোচা) ; মোচার ক্ষুদ্র মুচি।

অস্

খোলস্ মুখস্ তাড়স্ চ্যাপস্।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর অস্ প্রত্যয়ে স্থূলতা ও ভার বুঝায়— ধপ্ হইতে ধপাস্ ; ব্যাপ্তি বুঝায়, যথা, ধড়াস্ করিয়া পড়া— অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ স্থান লইয়া পড়া ; খট্ এবং খটাস্, পট্ এবং পটাস্ শব্দের সূক্ষ্ম অর্থভেদ নির্দেশ করিতে গেলে পাঠকদের সহিত তুমুল তর্ক উপস্থিত হইবে আশঙ্কা করি।

সা

চোপ্‌সা গোম্‌সা ঝাপ্‌সা ভাপ্‌সা চিম্‌সা পান্‌সা ফেন্‌সা একসা খোলসা মাকড়্‌সা কাল্‌সা।

সা+ইয়া

ক্যাকাসিয়া (ক্যাকাসে), লাল্‌চে সম্ভবত লাল্‌সে কথার বিকার, কাল্‌সিটে— কাল্+সা+ইয়া+টা=কাল্‌সিয়াটা কাল্‌সিটে।

আম

অনুকরণ অর্থে: বুড়ামো ছেলেমো পাগ্‌লামো জ্যাঠামো বাঁদরামো।

ভাব অর্থে: মাৎলামো ঢিলেমো আল্‌সেমো।

আম+ই

বুড়ামি মাৎলামি ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গে ই

ছুঁড়ি ছুক্‌রি বেটি খুড়ি মাসি পিসি দিদি পাঁঠি ভেড়ি বুড়ি বাম্‌নি।

স্ত্রীলিঙ্গে নি

কলুনি তেলিনি গয়লানি বাঘিনি মালিনি ধোবানি নাপ্‌তিনি কামার্‌নি চামার্‌নি পুরুত্‌নি মেত্‌রানি তাঁতনি ঠাকুরানি চাকরানি উড়েনি কায়েত্‌নি খোট্টানি মুসলমান্‌নি জেলেনি।

বাংলা কৃৎ তদ্ধিত আমার যতগুলি মনে পড়িল লিখিলাম। নিঃসন্দেহই অনেকগুলি বাদ পড়িয়াছে; সেগুলি পূরণের জন্য পাঠকদের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা প্রাদেশিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত যত সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, ততই কাজে লাগিবে।

প্রত্যয়গুলির উৎপত্তি নির্ণয় করাও বাকি রহিল। এ-সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার হ্যর্নলে-রচিত Comparative Grammar of the Gaudian Languages পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন।

প্রত্যেক প্রত্যয়জাত শব্দের তালিকা সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। ইহা নিশ্চয়ই পাঠকেরা লক্ষ করিয়াছেন, প্রত্যয়গুলির মধ্যে পক্ষপাতের ভাব দেখা যায়; তাহারা কেন যে কয়টিমাত্র শব্দকে বাছিয়া লয়, বাকি সমস্তকেই বর্জন করে, তাহা বুঝা কঠিন। তালিকা সম্পূর্ণ হইলে তাহার নিয়ম আবিষ্কারের আশা করা যাইতে পারে। মন্ত প্রত্যয় কেনই বা আক্কেল শব্দকে আশ্রয় করিয়া আক্কেলমন্ত হইবে, অথচ চালাকি শব্দের সহযোগে চালাকিমন্ত হইতে পারিল না,

তাহা কে বলিবে। নি যোগে বহুতর বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে— কামারনি খোট্টানি ইত্যাদি। কিন্তু বত্তিনি (বৈদ্য-স্ত্রী) কেহ তো বলে না; উড়েনি বলে, কিন্তু পঞ্জাবিনি বা শিখিনি বা মগিনি বলে না। বাঘিনি হয়, কিন্তু উটিনি হয় না, কুকুরনি বেড়ালনি হয় না। প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ অনেক স্থলে হয়ই না, সেই কারণে মাদি কুকুর বলিতে হয়। পাঁঠার স্ত্রীলিঙ্গে পাঁঠি হয়, মোষের স্ত্রীলিঙ্গে মোষি হয় না। এ-সমস্ত অনুধাবন করিবার যোগ্য।

কোন্ প্রত্যয়যোগে শব্দের কী প্রকার রূপান্তর হয় তাহাও নিয়মবদ্ধ করিয়া লেখা আবশ্যক। নিতান্তই সময়াভাব-বশত আমি সে কাজে হাত দিতে পারি নাই। নোড়া শব্দের উত্তর ই প্রত্যয় করিলে হয় নুড়ি; দাড়ি শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় দেড়ে; টোল শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে টুলো; মধু শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় মোধো; লুন্ শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় লোনা; জল্ শব্দের উত্তর অন্+ই প্রত্যয় করিলে হয় জলুনি, কোঁদল শব্দের উত্তর ই+আ প্রত্যয় করিলে হয় কুঁদুলে।

কতকগুলি প্রত্যয় আমি আনুমানিক ভাবে দিয়াছি। সেগুলিকে প্রত্যয় বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু শব্দ হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের প্রত্যয়রূপ প্রমাণ করিতে পারি নাই। যেমন, অং প্রত্যয়; ভুজং ভড়ং প্রভৃতি শব্দের অং বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহা বাংলায় চলিত নাই। ভড়্ শব্দ নাই বটে, কিন্তু ভড়্কা আছে, ভড়ং এবং ভড়কের অর্থসাদৃশ্য আছে। তাই মনে হয়, ভড়্ বলিয়া একটা আদিশব্দ ছিল, তাহার উত্তরে অক্ করিয়া ভড়ক্ ও অং করিয়া ভড়ং হইয়াছে। বড়াং শব্দে এই মত সমর্থন করিবে। আমার কাল্না-প্রদেশীয় বন্ধুগণ বলেন, তাঁহারা বড়াই শব্দের স্থলে বড়াং সর্বদাই ব্যবহার করেন; তাহাতে বুঝা যায় বড়ো শব্দের উত্তর যেমন আ+ই প্রত্যয় করিয়া বড়াই হইয়াছে, তেমনই আং প্রত্যয় করিয়া বড়াং হইয়াছে—মূল শব্দটি বড়ো, প্রত্যয় দুইটি আই ও আং।

প্রত্যয়গুলি কী ভাবে লিখিত হওয়া উচিত, তাহাও বিচারের দ্বারা ক্রমশ স্থির হইতে পারিবে। যাহাকে অস্ প্রত্যয় বলিয়াছি, তাহা অস্ অথবা অ-বর্জিত, সা প্রত্যয়টি স+আ অথবা সা, এ-সমস্ত নির্ণয় করিবার ভার ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতদের উপর নিক্ষেপ করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

১৩০৮

তর্কের বিষয়টা কী, অধিকাংশ সময়ে তাহা বুঝিবার পূর্বেই তর্ক বাধিয়া যায়। সেটা যতই কম বোঝা যায়, তর্কের বেগ ততই প্রবল হয়; অবশেষে খুনাখুনি রক্তপাতের পর হঠাৎ বাহির হইয়া পড়ে, দুই পক্ষের মধ্যে মতের বিশেষ অনৈক্য নাই। অতএব ঝগড়াটা কোন্‌খানে, সেইটে আবিষ্কার করা একটা মস্ত কাজ।

আমি কতকগুলা বাংলা প্রত্যয় ও তাহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা বিচারের জন্য 'পরিষৎ'-সভার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম।[১] আমার সে-লেখাটা এখনো পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির হয় নাই, সুতরাং আমার তরফের বক্তব্য পাঠকের সম্মুখে অনুপস্থিত। শুনিয়াছি, কোন্‌ সুযোগে তাহার প্রুফটি সংগ্রহ করিয়া লইয়া কোন্‌ কাগজে তাহার প্রতিবাদ বাহির হইয়া গেছে।[২] আমার সাক্ষী হাজির নাই, এই অবকাশে বাদের পূর্বেই প্রতিবাদকে পাঠকসভায় উপস্থিত করিয়া একতরফা মীমাংসার চেষ্টা করাকে ঠিক ধর্মযুদ্ধ বলে না।

এখন সে লইয়া আক্ষেপ করা বৃথা।

বাংলায় জল হইতে জোলো, মদ হইতে মোদো, পানি হইতে পান্‌তা, নুন হইতে নোন্‌তা, বাঁদর হইতে বাঁদ্‌রাম, জ্যাঠা হইতে জ্যাঠাম প্রভৃতি চলিত কথাগুলি হইতে উয়া, তা, আম প্রভৃতি প্রত্যয় সংকলন করিয়া ভাবী ব্যাকরণকারের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ তাঁহারাই করিবেন, আমার কেবল মজুরিই সার। সেই মজুরির জন্য যে অল্প একটুখানি বেতন আমার পাওনা আছে বলিয়া আমি সাধারণের কাছে মনে মনে দাবি করিয়াছিলাম, তাহা নামঞ্জুর হইয়া গেলেও বিশেষ ক্ষতিবোধ করিতাম না। সম্প্রতি দাঁড়াইয়াছে এই যে, ভিক্ষায় কাজ নাই, এখন কুত্তা বুলাইয়া লইলে বাঁচি।

এখন আমার নামে উলটা অভিযোগ আসিয়াছে যে, আমি এই চলিত

১ দ্রষ্টব্য "বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত" প্রবন্ধ

২ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, "নূতন বাংলা ব্যাকরণ", ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৮

কথাগুলা ও তাহার প্রত্যয় সংগ্রহে সহায়তা করিয়া বাংলা ভাষাটাকেই মাটি করিবার চেষ্টায় আছি।

যে-কথাগুলা লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে বাংলার রাখা বা বাংলা হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া আমার বা আর-কাহারো সাধ্যই নহে। তাহারা আছে, এবং কাহারো কথায় তাহারা নিজের স্থান ছাড়িবে না। জগতে যে-কোনো জিনিসই আছে, তাহা ছোটো হউক আর বড়ো হউক, কুৎসিত হউক আর সুশ্রী হউক, প্রাদেশিক হউক আর নাগরিক হউক, তাহার তত্ত্বনির্ণয় বিজ্ঞানের কাজ। শরীরতত্ত্ব কেবল উত্তমাঙ্গেরই বিচার করে এমন নহে, পদাঙ্গুলিকেও অবজ্ঞা করে না। বিজ্ঞানের ঘৃণা নাই, পক্ষপাত নাই।

কিন্তু এই বাংলা চলিত কথাগুলি এবং সংস্কৃত-ব্যাকরণনিরপেক্ষ বিশেষ নিয়মগুলির উল্লেখমাত্র করিলেই বাংলা ভাষা নষ্ট হইয়া যাইবে, এমন ধারণা কেন হয়। হিন্দুঘরে গ্রাম্য আত্মীয়ের, দরিদ্র আত্মীয়েরও তো প্রবেশনিষেধ নাই। যদি কেহ নিষেধ করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়তো জবাব দেয়, উহারা আত্মীয় বটে কিন্তু কুলত্যাগ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে।

বাংলায় যাহা-কিছু সংস্কৃতের নিয়ম মানে না, তাহাকে এক দল লোক কুলত্যাগী বলিয়া ত্যাগ করিতে চান। এবং সংস্কৃতের নিয়মকে বাংলায় সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাদের চেষ্টা। তাঁহাদের বিশ্বাস, স্বরচিত ব্যাকরণে তাঁহারা সংস্কৃত-নিয়মকে জাহির করিলে এবং বাংলা-নিয়মের উল্লেখ না করিলেই, বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহারা মনে করেন, 'পাগলামি' এবং 'সাহেবিয়ানা' কথা যে বাংলায় আছে, ও 'আমি' এবং 'আনা' -নামক সংস্কৃতেতর প্রত্যয়-দ্বারা তাহারা সিদ্ধ, এ কথা না তুলিলেই আপদ চুকিয়া যায়—এবং যখন প্রয়োজন হয়, তখন 'উন্মত্ততা' ও 'ইংরাজানুকৃতিশীলত্ব' কথা ব্যবহার করিলেই গ্রাম্য কথা দুটার অস্তিত্বই ঢাকিয়া রাখা যাইবে।

বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বাংলার কারক-বিভক্তিকে সংস্কৃত কারক-বিভক্তির সঙ্গে অন্তত সংখ্যাতেও সমান বলিতে চান।

সংস্কৃত ভাষায় সম্প্রদানকারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই

তাহার প্রমাণ। বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদানকারক জবর্‌দস্তি করিয়া চালাইতে হয়, তবে এ কথাই বা কেন না বলা যায় যে, বাংলায় দ্বিবচন আছে। যদি 'ধোপাকে কাপড় দিলাম' কর্ম এবং 'গরিবকে কাপড় দিলাম' সম্প্রদান হয়, তবে একবচনে 'বালক', দ্বিবচনে 'বালকেরা' ও বহুবচনেও 'বালকেরা' না হইবে কেন। তবে বাংলাক্রিয়াপদেই বা একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন ছাড়া যায় কী জন্য। তবে ছেলেদের মুখস্থ করাইতে হয়— একবচন 'হইল', দ্বিবচন 'হইল', বহুবচন 'হইল'; একবচন 'দিয়াছে', দ্বিবচন 'দিয়াছে', বহুবচন 'দিয়াছে' ইত্যাদি। 'তাহাকে দিলাম' যদি সম্প্রদান-কারকের কোঠায় পড়ে, তবে 'তাহাকে মারিলাম' সন্তাড়ন-কারক; 'ছেলেকে কোলে লইলাম' সংলালন-কারক; 'সন্দেশ খাইলাম' সম্ভোজন-কারক; 'মাথা নাড়িলাম' সঞ্চালন-কারক এবং এক বাংলা কর্ম-কারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সঙের সৃষ্টি হইতে পারে।

সংস্কৃত ও বাংলায় কেবল যে কারক-বিভক্তির সংখ্যায় মিল নাই, তাহা নহে। তাহার চেয়ে গুরুতর অনৈক্য আছে। সংস্কৃত ভাষায় কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদের জটিলতা বিস্তর; এইজন্য আধুনিক গৌড়ীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত কর্মবাচ্য অবলম্বন করিয়াই প্রধানত উদ্‌ভূত। 'করিল' ক্রিয়াপদ 'কৃত' হইতে, 'করিব করিবে' 'কর্তব্য' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে হওয়া সম্ভবপর নহে; হ্যর্নলে-সাহেব তাঁহার তুলনামূলক গৌড়ীয় ব্যাকরণে ইহার প্রভূত প্রমাণ দিয়াছেন। এই কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বাংলায় কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার হইতে থাকায় সংস্কৃত ব্যাকরণ আর তাহাকে বাগ মানাইতে পারে না। সংস্কৃত তৃতীয়া বিভক্তি 'এন' বাংলায় 'এ' হইয়াছে; যেমন, বাঁশে মাথা ফাটিয়াছে, চোখে দেখিতে পাই না ইত্যাদি। বাঘে খাইল, কথাটার ঠিক সংস্কৃত তর্জমা ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ। কিন্তু খাদিত শব্দ বাংলায় খাইল আকার ধারণ করিয়া কর্তৃবাচ্যের কাজ করিতে লাগিল; সুতরাং বাঘ যাহাকে খাইল, সে বেচারা আর কর্তৃকারকের রূপ ধরিতে পারে না। এইজন্য, ব্যাঘ্রেণ রামঃ খাদিতঃ, বাংলায় হইল বাঘে রামকে খাইল; বাঘে শব্দে করণকারকের এ-কার বিভক্তি থাকা সত্ত্বেও রাম শব্দে কর্মকারকের কে বিভক্তি লাগিল। এ খিচুড়ি সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনো পর্যায়েই পড়ে না। পণ্ডিতমশায় বলিতে পারেন,

হ্যর্নলে সাহেব-টাহেব আমি মানি না, বাংলায় এ-কার বিভক্তি কর্তৃকারকের বিভক্তি। আচ্ছা দেখা যাক, তেমন করিয়া মেলানো যায় কি না। ধনে শ্যামকে বশ করা গেছে, ইহার সংস্কৃত অনুবাদ ধনেন শ্যামো বশীকৃতঃ। কিন্তু বাংলাবাক্যটির কর্তা কে। 'ধনে' যদি কর্তা হইত, তবে 'করা গেছে' ক্রিয়া 'করিয়াছে' রূপ ধরিত। 'তাঁহাকে [শ্যামকে]' শব্দ কর্তা নহে, 'কে' বিভক্তিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কর্তা উহ্য আছে বলা যায় না; কারণ 'করা গেছে' ক্রিয়া কর্তা মানে না, আমরা করা গেছে, তাঁহারা করা গেছে, হয় না। অথচ ভাবার্থ দেখিতে গেলে, 'বশ করা গেছে' ক্রিয়ার কর্তা উহ্যভাবে 'আমরা'। করা গেছে, খাওয়া গেছে, হওয়া গেছে, সর্বত্রই উত্তম পুরুষ। কিন্তু এই 'আমরা' কথাটাকে স্পষ্টভাবে ব্যবহার করিবার জো নাই; আমরা আয়োজন করা গেছে, বলিতেই পারি না। এইরূপ কর্তৃহীন কবন্ধবাক্য সংস্কৃত ভাষায় হয় না বলিয়া কি পণ্ডিতমশায় বাংলা হইতে ইহাদিগকে নির্বাসিত করিয়া দিবেন। তাহা হইলে ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড় হইবে। তাঁহাকে নাচিতে হইবে, কথাটার সংস্কৃত কী। তাং নর্তিতুং ভবিষ্যতি, নহে। যদি বলি, 'নাচিতে হইবে' এক কথা, তবু 'তাং নর্তব্যম্' হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে, সংস্কৃতে যেখানে 'তয়া নর্তব্যম্' বাংলায় সেখানে 'তাহাকে নাচিতে হইবে'। ইহা বাংলা ব্যাকরণ না সংস্কৃত ব্যাকরণ? আমার করা চাই— এই 'চাই' ক্রিয়াটা কী। ইহার আকার দেখিয়া ইহাকে উত্তমপুরুষ বোধ হয়, কিন্তু সংস্কৃতে ইহাকে 'মম করণং যাচে' বলা চলে না। বাংলাতেও 'আমি আমার করা চাই' এমন কথনো বলি না। বস্তুত 'আমার করা চাই' যখন বলি, তখন অধিকাংশ সময়েই সেটা আমি চাই না, পেয়াদায় চায়। অতএব এই 'চাই' ক্রিয়াটা সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন্ জিনিসটার কোন্ সম্বন্ধী। আমাকে তোমার পড়াতে হবে, এখানে 'তোমার' সর্বনামটি সংস্কৃত কোন্ নিয়মমতে সম্বন্ধপদ হয়। এই বাক্যের অনুবাদ ত্বং মাং পাঠয়িতুম অর্হসি; এখানে ত্বং কর্তৃকারক ও প্রথমা এবং অর্হসি মধ্যমপুরুষ — কিন্তু বাংলায় 'তোমার' সম্বন্ধপদ এবং 'হবে' প্রথমপুরুষ। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে এ-সকল বাক্য সাধা অসাধ্য, বাংলা ভাষার নিয়মে এগুলিকে পরিত্যাগ করা ততোধিক অসাধ্য। পণ্ডিতমশায় কোন্ পথে যাইবেন। 'আমাকে তোমার পড়াতে হবে' বাক্যটির প্রত্যেক শব্দই সংস্কৃতমূলক, অথচ ইহার প্রত্যেক শব্দটিতেই সংস্কৃত নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে।

অপর পক্ষে বলিতে পারেন, যেখানে সংস্কৃতে-বাংলায় যথার্থ প্রভেদ ঘটিয়াছে, সেখানে প্রভেদ মানিতে রাজি আছি ; কিন্তু যেখানে প্রভেদ নাই, সেখানে তো ঐক্য স্বীকার করিতে হয়। যেমন সংস্কৃত ভাষায় ইন্ প্রত্যয়যোগে 'বাস' হইতে 'বাসী' হয়, তেমনই সেই সংস্কৃত 'ইন্' প্রত্যয়ের যোগেই বাংলা দাগ হইতে দাগী হয়— বাংলা প্রত্যয়টাকে কেহ যদি ই প্রত্যয় নাম দেয় তবে সে অন্যায় করে।

আমরা বলিয়াছিলাম বটে যে, চাষি, দামি, দাগি, দোকানি প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয়যোগে নহে, বাংলা ই প্রত্যয়যোগে হইয়াছে। কেন বলিয়াছিলাম বলি।

জিজ্ঞাস্য এই যে, বাসী শব্দ যে প্রত্যয়যোগে ঈ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে ঈ প্রত্যয় না বলিয়া ইন্ প্রত্যয় কেন বলা হইয়াছে। ইন্ প্রত্যয়ের ন্-টা মাঝে মাঝে 'বাসিন্' 'বাসিনী' রূপে বাহির হইয়া পড়ে বলিয়াই তো! যদি কোথাও কোনো অবস্থাতেই সে ন্ না দেখা যায় তবু কি ইহাকে ইন্ প্রত্যয় বলি। ব্যাঙাচির লেজ ছিল বটে, কিন্তু সে লেজটা খসিয়া গেলেও কি ব্যাঙকে লেজবিশিষ্ট বলিতে হইবে। কিন্তু পণ্ডিতমশায় বলেন, সংস্কৃত মানী শব্দও তো বাংলায় 'মানিন্' হয় না। আমাদের বক্তব্য এই যে, কেহ যদি সেইভাবে কোথাও ব্যবহার করেন, তাঁহাকে কেহ একঘরে করিবে না ; অন্তত মানী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'মানিনী' হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীবিদ্যালয়ের মসীচিহ্নিত বালিকাকে যদি 'দাগিনী' বলা যায়, তবে ছাত্রীও হাঁ করিয়া থাকিবে, তাহার পণ্ডিতও টাকে হাত বুলাইবেন।

তখন বৈয়াকরণ পণ্ডিতমশায় উলটিয়া বলিবেন, দাগ কথাটা যে বাংলা কথা, ওটা তো সংস্কৃত নয়, সেইজন্য স্ত্রীলিঙ্গে তাহার ব্যবহার হয় না। ঠিক কথা, যেমন বাংলায় বিশেষণ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গরূপ পরিত্যাগ করিয়াছে, তেমনই বাংলায় ইন্ প্রত্যয় তাহার ন্ বর্জন করিয়া ই প্রত্যয় হইয়াছে।

ভালো, একটি সংস্কৃত কথাই বাহির করা যাক। ভার শব্দ সংস্কৃত। তবু আমাদের মতে 'ভারি' কথায় বাংলা ই প্রত্যয় হইয়াছে, সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় হয় নাই। তাহার প্রমাণ এই যে 'ভারিণী নৌকা' লিখিতে পণ্ডিতমশায়ের কলমও দ্বিধা করিবে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, মানী কথাটা প্রত্যয় সমেত সংস্কৃত ভাষা হইতে পাইয়াছি, ভারি কথাটা পাই নাই ; আমাদের

প্রয়োজনমত আমরা উহাকে বাংলা প্রত্যয়ের ছাঁচে ঢালিয়া তৈরি করিয়া লইয়াছি। মাস্টার কথা আমরা ইংরেজি হইতে পাইয়াছি, কিন্তু মাস্টারি (মাস্টার-বৃত্তি) কথায় আমরা বাংলা ই প্রত্যয় যোগ করিয়াছি; এই ই ইংরেজি mastery শব্দের y নহে। সংস্কৃত ছাঁদে বাংলা লিখিবার সময় কেহ যদি 'ভো স্বদেশিন্' লেখেন, তাঁহাকে অনেক পণ্ডিত সমালোচক প্রশংসা করিবেন, কিন্তু কেহ যদি 'ভো বিলাতিন্' লিখিয়া রচনার গাম্ভীর্য-সঞ্চার করিতে চান, তবে ঘরে-পরে সকলেই হাসিয়া উঠিবে। কেহ বলিতে পারেন 'বিলাতি' সংস্কৃত ই প্রত্যয়, ইন্ প্রত্যয় নহে। আচ্ছা, দোকান যাহার আছে সেই 'দোকানি'কে সম্ভাষণ-কালে 'দোকানিন্' এবং তাহার স্ত্রীকে 'দোকানিনী' বলা যায় কি।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দিই। বাংলায় 'রাগ' শব্দের অর্থ ক্রোধ; সেই 'রাগ' শব্দের উত্তর ই প্রত্যয়ে 'রাগি' হয়। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর কাল হইতে আজ পর্যন্ত পণ্ডিত অপণ্ডিত কেহই রুষ্টা স্ত্রীলোককে "রাগিণী" বলিয়া সম্ভাষণ করেন নাই।

গোবিন্দদাস রাধিকার বর্ণনাস্থলে লিখিয়াছেন:

নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে!

গোবিন্দদাস মহাশয়ের বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, রাধিকার রাগ সর্বদা পঞ্চমেই চড়িয়া আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সংগীতের 'রাগিণী' কথাটা সংস্কৃত প্রত্যয়ের দ্বারা তৈরি। 'অনুরাগী' কথাটাও সেইরূপ।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, সে যেমনই হউক, এ-সমস্তই সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার হইতে উৎপন্ন; আমিও সে কথা স্বীকার করি। প্রমাণ হইয়াছে, একই মূল হইতে 'হংস' এবং ইংরেজি 'গ্যাণ্ডার' শব্দ উৎপন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া 'গ্যাণ্ডার' সংস্কৃত 'হংস' শব্দের ব্যাকরণগত নিয়ম মানে না, এবং তাহার স্ত্রীলিঙ্গে 'গ্যাণ্ডারী' না হইয়া 'গূস্' হয়। ইহাও প্রমাণ হইয়াছে, একই আর্যপিতামহ হইতে বপ্, বার্হ্ক্ প্রভৃতি য়ুরোপীয় শাব্দিক ও বাঙালি ব্যাকরণজ্ঞ পণ্ডিত জন্মিয়াছেন, কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা ব্যাকরণকে যে-বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপকভাবে দেখেন, আমাদের পণ্ডিতরা তাহা দেখেন না; অতএব উৎপত্তি এক হইলেও ব্যুৎপত্তি ভিন্ন প্রকারের হওয়া অসম্ভব নহে। ইন্ প্রত্যয় হইতে বাংলা ই প্রত্যয়

উৎপন্ন হইয়াছে বটে, তবু তাহা ইন্ প্রত্যয়ের সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলে না ; এইজন্য এই দুটিকে ভিন্ন কোঠায় না ফেলিলে কাজ চালাইবার অসুবিধা হয়। লাঙলের ফলার লোহা হইতে ছুঁচ তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই ছুঁচ দিয়া মাটি চষিবার চেষ্টা করা পাণ্ডিত্য নহে।

বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার সুবিধামত বানাইয়া লয়। সেই ছাঁচটাই তাহার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়। উর্দু ভাষায় পারসি আরবি কথা ঢের আছে, কিন্তু সে কেবল আপনার ছাঁচেই চতুর ভাষাতত্ত্ববিদের কাছে হিন্দির বৈমাত্র সহোদর বলিয়া ধরা পড়িয়া গেছে। আমাদের বাঙালি কেহ যদি মাথায় হ্যাট, পায়ে বুট, গলায় কলার এবং সর্বাঙ্গে বিলাতি পোশাক পরেন, তবু তাঁহার রঙে এবং দেহের ছাঁচে কুল-লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ। বাংলায় সংস্কৃত শব্দ কটা আছে, তাহার তালিকা করিয়া বাংলাকে চেনা যায় না, কিন্তু কোন্ বিশেষ ছাঁচে পড়িয়া সে বিশেষরূপে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আমদানিকে কী ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ। সুতরাং ভাষার এই আসল ছাঁচটি বাহির করিতে গেলে, এখনকার ঘরগড়া কেতাবি ভাষার বাহিরে গিয়া চলিত কথার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। সে-সব কথা গ্রাম্য হইতে পারে, ছাপাখানার কালীর ছাপে বঞ্চিত হইতে পারে, সাধুভাষায় ব্যবহারের অযোগ্য হইতে পারে, তবু ব্যাকরণকারের ব্যাবসা রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে গতিবিধি রাখিতে হয়।

ইন্ প্রত্যয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, স্ত্রীলিঙ্গে ইনি ও ঈ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে 'ইনি' 'ই' পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচ মানে না। সে বাঙালি হইয়া আর-এক পদার্থ হইয়া গেছে। তাহার চেহারাও বদল হইয়াছে। রয়ের পরে সে আর মূর্ধন্য ণ গ্রহণ করে না (কলমের মুখে করিতে পারে কিন্তু জিহ্বাগ্রে করে না)— সংস্কৃত বিধানমতে সে কোথাও স্ত্রীলিঙ্গে আকার মানে না, এজন্য সে অধীনাকে অধীনি বলে। সে যদি নিজেকে সংস্কৃত বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যাকুল হইত, তবে 'পাঁঠা' হইতে 'পাঁঠি' হইত না, 'বাঘ' হইতে 'বাঘিনী' হইত না। কলু হইতে কলুনি,

ঘোড়া হইতে ঘুড়ি, গুরুৎ হইতে গুরুৎনি নিষ্পন্ন করিতে হইলে, মুগ্ধবোধের সূত্র টুকরা টুকরা এবং বিদ্যাবাগীশের টীকা আগুন হইয়া উঠিত।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, ছি ছি ও কথাগুলা অকিঞ্চিৎকর, উহাদের সম্বন্ধে কোনো বাক্যব্যয় না করাই উচিত। তাহার উত্তর এই যে, কমলি নেই ছোড়তা। পণ্ডিতমশায়ও ঘরের মধ্যে কলুর স্ত্রীকে 'কলী' অথবা 'তৈলযন্ত্র-পরিচালিকা' বলেন না, সে স্থলে আমরা কোন্ ছার। মাকে মা বলিয়া স্বীকার না করিয়া প্রপিতামহীকেই মা বলিতে যাওয়া দোষের হয়। সেইরূপ বাংলাকে বাংলা না বলিয়া কেবলমাত্র সংস্কৃতকেই যদি বাংলা বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাতে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় থাকে না।

পণ্ডিত বলেন, বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে তুমি ঈ ছাড়িয়া হ্রস্ব ই ধরিলে যে? আমি বলিব ছাড়িলাম আর কই। একতলাতেই যাহার বাস তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, নীচে নামিলে যে, সে বলিবে, নামিলাম আর কই— নীচেই তো আছি। ঘোটকীর দীর্ঘ ঈ-তে দাবি আছে; সে ব্যাকরণের প্রাচীন সনন্দ দেখাইতে পারে— কিন্তু ঘুড়ির তাহা নাই। প্রাচীনভাষা তাহাকে এ অধিকার দেয় নাই। কারণ, তখন তাহার জন্ম হয় নাই; তাহার পরে জন্মাবধি সে তাহার ইকারের পৈতৃক দীর্ঘতা খোয়াইয়া বসিয়াছে। টিপু-সুলতানের কোনো বংশধর যদি নিজেকে মৈশুরের রাজা বলেন, তবে তাঁহার পারিষদরা তাহাতে সায় দিতে পারে, কিন্তু রাজত্ব মিলিবে না। হ্রস্ব ই-কে জোর করিয়া দীর্ঘ লিখিতে পার, কিন্তু দীর্ঘত্ব মিলিবে না। যেখানে খাস্ বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সেখানে হ্রস্ব ইকারের অধিকার, সুতরাং দীর্ঘ ঈ র সেখান হইতে ভাসুরের মতো দূরে চলিয়া যাওয়াই কর্তব্য।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, বানানের মধ্যে পূর্ব ইতিহাসের চিহ্ন বজায় রাখা উচিত। দেখা যাক, মেছুনি কথাটার মধ্যে পূর্ব ইতিহাস কতটা বজায় আছে। ৎ, স, এবং যফলা কোথায় গেল? ম-এ একার কোন্ প্রাচীন ব্যবহারের চিহ্ন। ন-টা কোথাকার কে। ওটা কি মৎস্যজীবিনীর ন। তবে জীবিটা গেল কোথায়। এমন আরো অনেক প্রশ্ন হইতে পারে। সদুত্তর এই যে, ৎ এবং স বাংলায় ছ হইয়া গেছে— এই ছ-ই ৎ এবং স -এর ঐতিহাসিক চিহ্ন, এই চিহ্ন বাংলা 'বাছা' শব্দের মধ্যেও আছে। পরিবর্তনপরম্পরায় যফলা

লোপ পাইয়া পূর্ববর্ণের অকারকে আকার করিয়াছে, যেমন লুপ্ত যফলা অদ্যকে আজ, কল্যকে কাল করিয়াছে— অতএব এই আকারই লুপ্ত যফলার ঐতিহাসিক চিহ্ন। ইহারা পূর্ব ইতিহাসেরও চিহ্ন, এখনকার ইতিহাসেরও চিহ্ন। মাছ শব্দের উত্তর বাংলা প্রত্যয় উয়া যোগ হইয়া 'মাছুয়া' হয়, মাছুয়া শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহার 'মেছো'; মেছো শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নি প্রত্যয় হইয়াছে। এই নি প্রত্যয়ের হ্রস্ব ই প্রাচীন দীর্ঘ ঈকারের ঐতিহাসিক অবশেষ। আমরা যদি বাংলার অনুরোধে মৎস্যকে কাটিয়া কুটিয়া মাছ করিয়া লইতে পারি এবং তাহাতে যদি ইতিহাসের জাতি নষ্ট না হইয়া থাকে, তবে বাংলা উচ্চারণের সত্যরক্ষা করিতে দীর্ঘ ঈ-র স্থলে হ্রস্ব ই বসাইলেও ইতিহাসের ব্যাঘাত হইবে না। মুখে যাহাই করি, লেখাতেই যদি প্রাচীন ইতিহাস রক্ষা করা বিধি হয়, তবে 'মৎস্য' লিখিয়া 'মাছ' পড়িলে ক্ষতি নাই। পণ্ডিত বলিবেন, আমরা সংস্কৃত শব্দেও তিন স, দুই ন, য ও হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরকে লিখি শুদ্ধ, কিন্তু পড়ি অশুদ্ধ, অতএব ঠিক সেই পরিমাণ উচ্চারণের সহিত বানানের অনৈক্য বাংলাতেও চালানো যাইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, অনেক বাঙালি ইংরেজি w বর্ণের উচ্চারণ করেন না— তাঁহারা লেখেন wood, কিন্তু উচ্চারণ করেন ood; কিন্তু তাই বলিয়া নিজের উচ্চারণদোষের অনুরূপ বানান করিবার অধিকার তাঁহার নাই; ইহা তাঁহার নিজস্ব নহে; ইহার বানানে হস্তক্ষেপ করিলে অর্থবোধই হইবে না। কিন্তু, আলমারি শব্দ 'আলমাইরা' হইতে উৎপন্ন হইলেও, উহা জন্মান্তরগ্রহণকালে বাঙালি হইয়া গেছে; সুতরাং বাংলা আলমারি-কে 'আলমাইরা' লিখিলে চলিবে না। সহস্র পারসি কথা বিকৃত হইয়া বাংলা হইয়া গেছে, এখন তাহাদের আর জাতে তোলা চলে না; আমরা লোকসান-কে 'নুকসান্' লিখিলে ভুল হইবে, এমন-কি, লুকসান-ও লিখিতে পারি না। কিন্তু যে পারসি শব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, অথচ আমাদের রসনার অভ্যাসবশত যাহার উচ্চারণের কিছু ব্যতিক্রম হয়, তাহার বানান বিশুদ্ধ আদর্শের অনুরূপ লেখা উচিত। অনেক হিন্দুস্থানি নাইয়ের নীচে ধুতি পরে; আমরা তাহাদের প্রথা জানি, সুতরাং আশ্চর্য হই না; কিন্তু সে যদি নাইয়ের নীচে প্যাণ্টলুন্ পরে, তবে তাহাকে বন্ধুভাবে নিষেধ করিয়া দিতে হয়। নিজের জিনিস নিজের নিয়মেই ব্যবহার করিতে হয়, পরের জিনিসে নিজের নিয়ম খাটাইতে গেলেই গোল বাধিয়া যায়। যে

সংস্কৃত শব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, তাহা সংস্কৃতেই আছে, যাহা বাংলা হইয়া গেছে, তাহা বাংলাই হইয়াছে— এই সহজ কথাটা মনে রাখা শক্ত নহে।

কিন্তু কেতাবের বাংলায় প্রতিদিন ইহার ব্যতিক্রম হইতেছে। আমরা জড়-এর জ এবং যখন-এর য একই রকম উচ্চারণ করি, আলাদারকম লিখি। উপায় নাই। শিশু বাংলাগদ্যের ধাত্রী ছিলেন যাঁহারা, তাঁহারা এই কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছেন। সাবেক কালে যখন শব্দটাকে বর্গ্য জ দিয়া লেখা চলিত— ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা সংস্কৃতের যৎ শব্দের অনুরোধে বর্গ্য জ-কে অন্তস্থ য করিয়া লইলেন, অথচ ক্ষণ শব্দের মূর্ধন্য ণ-কে বাংলায় দন্ত্য ন-ই রাখিয়া দিলেন। তাহাতে, এই যখন শব্দটা একাঙ্গীভূত হরগৌরীর মতো হইল ; তাহার—

আধভালে শুদ্ধ অন্তস্থ সাজে
আধভালে বঙ্গ বর্গীয় রাজে।

সৌভাগ্যক্রমে আধুনিক পণ্ডিতরা খাঁটি বাংলা শব্দকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের রচনাপঙ্‌ক্তির মধ্যে পারতপক্ষে স্থান দেন নাই— কেবল যে-সকল ক্রিয়া ও অব্যয় পদ নহিলে নয়, সেইগুলাকে সংস্কৃত বানানের দ্বারা যথাসাধ্য শোধন করিয়া লইয়া তবে তাঁহাদের লেখার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়াছেন। এইজন্য অধিকাংশ খাস বাংলা কথা সম্বন্ধে এখনো আমাদের অভ্যাস খারাপ হয় নাই ; সেগুলার খাঁটি বাংলা বানান চালাইবার সময় এখনো আছে।

আমরা এ কথা বলিয়া থাকি, সংস্কৃত ব্যাকরণে যাহাকে ণিজন্ত বলে, বাংলায় তাহাকে ণিজন্ত বলা যায় না। ইহাতে যিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের অপমান বোধ করেন, তিনি বলেন, কেন ণিজন্ত বলিব না, অবশ্য বলিব। কবিবর নবীন সেন মহাশয়ের দুইটি লাইন মনে পড়ে—

কেন গাহিব না, অবশ্য গাহিব,
গাহে না কি কেহ সুস্বর বিহনে ?

ণিজন্ত শব্দ সম্বন্ধেও পণ্ডিতমহাশয়ের সেইরূপ অটল জেদ, তিনি বলেন, ণিজন্ত—

কেন বলিব না, অবশ্য বলিব।
বলে না কি কেহ কারণ বিহনে ?

আমরা ব্যাকরণে পণ্ডিত নই, তবু আমরা যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে ণিচ্‌ একটা সংকেত মাত্র— যেখানে সে সংকেত খাটে না, সেখানে তাহার

কোনোই অর্থ নাই। ণিচ্-এর সংকেত বাংলায় খাটে না, তবু পণ্ডিতমশায় যদি ওই কথাটাকে বাংলায় চালাইতে চান, তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সংস্কৃত নৌকা দাঁড়ে চলে, অতএব বাংলা ফসলের খেতে লাঙল চলিবে কেন, নিশ্চয়ই দাঁড় চলিবে। কিন্তু দাঁড় জিনিস অত্যন্ত দামি উৎকৃষ্ট জিনিস হইলেও তবু চলিবে না। শ্রু ধাতু যে-নিয়মে 'শ্রাবি' হয়, সেই নিয়মে শুন্ ধাতুর 'শু' 'শৌ' হইয়া ও পরে ইকারযোগে 'শৌনিতেছে' হইত। হয়তো খুব ভালোই হইত, কিন্তু হয় না যে সে আমার বা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের দোষ নহে। সংস্কৃতে পঠ্ ধাতুর উত্তরে ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া পাঠন হয়, বাংলায় সেই অর্থে পড়্ ধাতু হইতে 'পড়ান' হয় 'পাড়ন' হয় না। অতএব যেখানে তাহার সংকেতই কেহ মানিবে না, সেখানে অস্থানে অকারণে বৃদ্ধ ণিচ্ সিগ্‌নালার তাহার প্রাচীন পতাকা তুলিয়া কেন বসিয়া থাকিবে, সে নাই-ও। তাহার স্থলে আর-একটি যে-সংকেত বসিয়া আছে, সে হয়তো তাহারই শ্রীমান পৌত্র, আমাদের ভক্তিভাজন ণিচ্ নহে; কৌলিক সাদৃশ্য তো কিছু থাকিবেই, কিন্তু ব্যবহারের ব্যতিক্রমেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। তবু যদি বাংলায় সেই ণিচ্ প্রত্যয়ই আছে বলিতে হয়, তবে ধ্রুপদের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য কাওয়ালিকে চৌতাল নাম দিলেও দোষ হয় না। প্রতিবাদে লিখিত হইয়াছে :

> যে-সকল শব্দ লইয়া অভিনব ব্যাকরণ নির্মাণের চেষ্টা হইতেছে উহা একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ঐ-সকল শব্দের বহুল প্রয়োগে ভাষার গুরুত্ব ও মাধুর্য কতদূর রক্ষিত হইবে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

বাংলা বলিয়া একটা ভাষা আছে, তাহার গুরুত্ব মাধুর্য ওজন করা ব্যাকরণকারের কাজ নহে। সেই ভাষার নিয়ম বাহির করিয়া লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার কাজ। সে-ভাষা যে ইচ্ছা ব্যবহার করুক বা না-করুক, তিনি উদাসীন। কাহারো প্রতি তাঁহার কোনো আদেশ নাই, অনুশাসন নাই। জীবতত্ত্ববিৎ কুকুরের বিষয়ও লেখেন, শেয়ালের বিষয়ও লেখেন। কোনো পণ্ডিত যদি তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে আসেন যে, তুমি যে শিয়ালের কথাটা এত আনুপূর্বিক লিখিতে বসিয়াছ, শেষকালে যদি লোকে শেয়াল পুষিতে আরম্ভ করে! তবে জীবতত্ত্ববিদ্ তাহার কোনো উত্তর না দিয়া তাঁহার শেয়াল-সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটা শেষ করিতেই প্রবৃত্ত হন। বঙ্গদর্শন-সম্পাদক যদি

তাঁহার কাগজে মাছের তেলের উপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন, তবে আশা করি কোনো পণ্ডিত তাঁহাকে এ অপবাদ দিবেন না যে, তিনি মাছের তেল মাথায় মাখিবার জন্য পাঠকদিগকে অন্যায় উত্তেজিত করিতেছেন।

প্রতিবাদ-লেখক মহাশয় হাস্যরসের অবতারণা করিয়া লিখিয়াছেন :

> যদি কেহ লেখেন 'যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলিলেন— প্রিয়ে তুমি যে-কথা বলিতেছ তাহার বিস্‌মোল্লায়ই গলদ' তাহা হইলে প্রয়োগটি কি অতি-শোভন হইবে?

প্রয়োগের শোভনতাবিচার ব্যাকরণের কাজ নহে, অলংকারশাস্ত্রের কাজ —ইহা পণ্ডিতমহাশয় জানেন না, এ কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের সাহস হয় না। উল্লিখিত প্রয়োগে ব্যাকরণের কোনো ভুলই নাই, অলংকারের দোষ আছে 'বিস্‌মোল্লায় গলদ' কথাটা এমন জায়গাতেও বসিতে পারে যেখানে অলংকারের দোষ না হইয়া গুণ হইবে। অতএব পণ্ডিতমহাশয়ের রসিকতা এখানে বাজে খরচ হইল। যাঁহারা প্রাকৃত বাংলার ব্যাকরণ লিখিতেছেন, তাঁহারা এই হাস্যবাণে বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবেন না। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত-মহাশয় এ কথাও মনে রাখিবেন যে, চলিত ভাষা অস্থানে বসাইলেই যে কেবল ভাষার প্রয়োগদোষ হয়, তাহা নহে; বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ বিশুদ্ধ সংস্কৃতনিয়মে বাংলায় বসাইলেও অলংকারদোষ ঘটিতে পারে। কেহ যদি বলেন, আপনার সুন্দরী বক্তৃতা শুনিয়া অদ্যকার সভা আপ্যায়িতা হইয়াছে, তবে তাহাতে স্বর্গীয় বোপদেবের কোনো আপত্তি থাকিবার কথা নাই, কিন্তু শ্রোতারা গাম্ভীর্যরক্ষা না করিতেও পারেন।

খাঁটি বাংলা কথাগুলির নিয়ম অত্যন্ত পাকা; উট কথাটাকে কোনোমতেই স্ত্রীলিঙ্গে 'উটী' করা যাইবে না, অথবা দাগ শব্দের উত্তর কোনোমতেই ইত প্রত্যয় করিয়া 'দাগিত' হইবে না, ইহাতে সংস্কৃতব্যাকরণ যতই চক্ষু রক্তবর্ণ করুন। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের বেলায় আমাদের স্বাধীনতা অনেকটা বেশি। আমরা ইচ্ছা করিলে 'এই মেয়েটি বড়ো সুন্দরী' বলিতে পারি, আবার 'এই মেয়েটি বড়ো সুন্দর' ইহাও বলা চলে। আমাদের পণ্ডিতমশায় এক জায়গায় লিখিয়াছেন, 'বিদ্যা যশের হেতুরূপে প্রতীয়মান হয়।' প্রতীয়মান কথাটা তিনি বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু যদি সংস্কৃতনিয়মে 'প্রতীয়মানা' লিখিতেন তাহাও চলিত। আর-এক জায়গায় লিখিয়াছেন, 'বিভীষিকাময়ী

ছায়াটাকে বঙ্গভাষার অধিকার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিতে পারেন'— ছায়া শব্দের এক বিশেষণ 'বিভীষিকাময়ী' সংস্কৃত বিধানে হইল, অন্য বিশেষণ 'নিষ্কাশিত' বাংলানিয়মেই হইল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় সুবিধামত কখনো নিজের নিয়মে চলে, কখনো বাংলানিয়মে চলে। কিন্তু খাঁটি বাংলা কথার সে-স্বাধীনতা নাই— 'কথাটা উপযুক্তা হইয়াছে' এমন প্রয়োগ চলিতেও পারে, কিন্তু 'কথাটা ঠিক হইয়াছে' না বলিয়া যদি 'ঠিকা হইয়াছে' বলি, তবে তাহা সহ্য করা অন্যায় হইবে। অতএব বাংলা রচনায় সংস্কৃত শব্দ কোথায় বাংলানিয়মে, কোথায় সংস্কৃতনিয়মে চলিবে তাহা ব্যাকরণকার বাঁধিয়া দিবেন না, তাহা অলংকারশাস্ত্রের আলোচ্য। কিন্তু বাংলা শব্দ ভাষার ভূষণ নহে, ভাষার অঙ্গ— সুতরাং তাহাকে বোপদেবের সূত্রে মোচড় দিলে চলিবে না, তাহাতে সমস্ত ভাষার গায়ে ব্যথা লাগিবে। এইজন্যই, 'ভ্রাতৃবধূ একাকী আছেন' অথবা 'একাকিনী আছেন' দুইই বলিতে পারি— কিন্তু 'আমার ভাজ একলা আছেন' না বলিয়া 'এক্‌লানী আছেন' এমন প্রয়োগ প্রাণান্ত সংকটে পড়িলেও করা যায় না। অতএব, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ কিরূপ নিয়মে ব্যবহার করা যাইবে, তাহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে যত ইচ্ছা লড়াই করুন, বাংলা-বৈয়াকরণের সে যুদ্ধে রক্তপাত করিবার অবকাশ নাই।

আমার প্রবন্ধে আমি ইংরেজি monosyllabic অর্থে 'একমাত্রিক' কথা ব্যবহার করিয়াছিলাম, এবং 'দেখ্‌, মার্‌' প্রভৃতি ধাতুকে একমাত্রিক বলিয়া-ছিলাম, ইহাতে প্রতিবাদী মহাশয় অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন:

> ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে হ্রস্বস্বরের একমাত্রা, দীর্ঘস্বরের দুইমাত্রা, প্লুতস্বরের তিনমাত্রা ও ব্যঞ্জনবর্ণের অর্ধমাত্রা গণনা করা হয়।

অতএব তাঁহার মতে দেখ্‌ ধাতু আড়াইমাত্রিক। এই যুক্তি অনুসারে 'একমাত্রিক' শব্দটাকে তিনি বিদেশী বলিয়া গণ্য করেন।

ইহাকেই বলে বিস্‌মোল্লায় গলদ। মাত্রা ইংরেজিই কী বাংলাই কী আর সংস্কৃতই কী। যদিচ প্রাচীন ভারতবর্ষ আধুনিক ভারতের চেয়ে অনেক বিষয়ে অনেক বড়ো ছিল, তবু 'এক' তখনো 'এক'ই ছিল এবং দুই ছিল 'দুই'। পণ্ডিতমশায় যদি যথেষ্ট পরিমাণে ভাবিয়া দেখেন, তবে হয়তো বুঝিতে পারিবেন, গণিতশাস্ত্রের এক ইংলণ্ডেও এক, বাংলাদেশেও এক এবং ভীষ্ম-দ্রোণ-

ভীমার্জুনের নিকটও তাহা একই ছিল। তবে আমরা যেখানে এক ব্যবহার করি অন্যত্র সেখানে দুই ব্যবহার করিতে পারে। যেমন, আমরা এক হাতে খাই, ইংরেজ দুই হাতে খায়, লঙ্কেশ্বর রাবণ হয়তো দশ হাতে খাইতেন; আমরা কেবল আমাদেরই খাওয়ার নিয়মকে স্মরণ করিয়া ওই-সকল 'বাহুহাস্তিক' খাওয়াকে 'ঐকহাস্তিক' বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি না। সংস্কৃত ভাষায় যে-শব্দ আড়াইমাত্রা কাল ধরিয়া উচ্চারিত হইত, বাংলায় সেটা যদি একমাত্রা কাল লইয়া উচ্চারিত হয় তবুও তাহাকে আড়াইমাত্রিক বলিবই— সংস্কৃত ব্যাকরণের খাতিরে বুদ্ধির প্রতি এতটা জুলুম সহ্য হয় না। পণ্ডিতমহাশয়কে যদি নামতা পড়িতে হয়, তবে সাতসাত্তে উনপঞ্চাশ কথাটা তিনি কতক্ষণ ধরিয়া উচ্চারণ করেন। বাংলা ব্যবহারে ইহার মাত্রা ছয়— সংস্কৃতমতে যোলো। তিনি যদি পাণিনির প্রতি সম্মান রাখিবার জন্য যোলো মাত্রায় সা-ত-সা-ত্তে-উ-ন-প-ঞ্চা-শ উচ্চারণ করিতেন, তবে তাঁহার অপেক্ষা নির্বোধ ছেলে দ্রুত আওড়াইয়া দিয়া ক্লাসে তাঁহার উপরে উঠিয়া যাইত। সংস্কৃত ব্যাকরণকেই যদি মানিতে হয়, তবে কেবল মাত্রায় কেন, উচ্চারণেও মানিতে হয়। পণ্ডিতমহাশয়ের যদি লক্ষ্মীনারান বলিয়া চাকর থাকে এবং তিনি অষ্টাধ্যায়ীর মতে দীর্ঘ-হ্রস্ব-প্লুত স্বরের মাত্রা ও কণ্ঠ-তালব্য-মূর্ধন্যের নিয়ম রাখিয়া 'লক্‌ষ্মীনারায়ড়' বলিয়া ডাক পাড়েন তবে একা লক্ষ্মীনারান কেন, রাস্তার লোক সুদ্ধ আসিয়া হাজির হয়। কাজেই বাংলা 'ক্ষ' সংস্কৃত ক্ষ নহে এবং বাংলার মাত্রা সংস্কৃতের মাত্রা নহে, এ কথা বাংলা ব্যাকরণকার প্রচার করা কর্তব্য বোধ করেন। এইজন্য স্বয়ং মাতা সরস্বতীও যখন বাংলা বলেন, বাঙালির ছেলেরা তাহা নিজের মাতৃভাষা বলিয়া চিনিতে পারে— তবে তাঁহারই বরপুত্র হইয়া পণ্ডিতমহাশয় বাংলা ভাষায় বাংলানিয়মের প্রতি এত অসহিষ্ণু কেন। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি আর-কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করিবেন না, কেবল 'একমাত্রিক শব্দের দেশীয় ব্যাকরণ ও অভিধানানুযায়ী অর্থ গ্রহণ' করিবেন। তাই করুন, আমরা বাধা দিব না। কিন্তু ইহা দেখা যাইতেছে, অর্থ জিনিসটাকে গ্রহণ করিব বলিলেই করা যায় না। অভিধান-ব্যাকরণ অর্থের লোহার সিন্দুক— তাহারা অর্থ দিতে পারে না, বহন করিতে পারে মাত্র। চাবি লাগাইয়া সেই অর্থ লইতে হয়।

প্রতিবাদী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে প্রশ্ন করিয়াছেন :

> রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন 'খ্যাঁলো মাংস'— এই খ্যাঁলোটা কী।

অবশেষে শ্রান্ত, বিমর্ষ, হতাশ হইয়া লিখিতেছেন :

> অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই বলিতে পারিলেন না। কলিকাতার অধিবাসী অথচ যাঁহাদের গৃহে সাহিত্যচর্চাও আছে এবং নির্বিশেষে মৎস্যমাংসের গতিবিধিও আছে এমন ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসু হইয়াছি, তাহাতেও কোনো ফল হয় নাই।

পণ্ডিতমহাশয়ের যে এত প্রচুর শ্রম ও দুঃখের কারণ হইয়াছি, ইহাতে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। আমার প্রবন্ধ বহন করিয়া আজ পর্যন্ত পরিষৎ-পত্রিকা বাহির হয় নাই, এবং পণ্ডিতমহাশয় আমার পাঠ শুনিয়াই প্রতিবাদ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ কথা স্বীকারই করিয়াছেন। অতএব, যখন আমি 'খ্যাঁংলা' বলিয়াছিলাম, তখন যদি বক্তার দুরদৃষ্টক্রমে শ্রোতা খ্যাঁলো-ই শুনিয়া থাকেন, তবে সেজন্য বক্তা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, দুষ্কৃতিকারীকে তৎক্ষণাৎ শাসন না করিয়া যে-সকল নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ লোক কলিকাতায় বাস করেন অথচ সাহিত্যচর্চা করেন এবং মৎস্য-মাংস খাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে খামকা জবাবদিহিতে ফেলিলেন কেন। প্রতিবাদী মহাশয় যদি কোনো সুযোগে পরিষৎ-পত্রিকার প্রুফ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে এই ভুল দেখিয়া থাকেন তবে সেজন্যও আমাকে ক্ষমা করিবেন। ছাপার ভুলে যদি দণ্ডিত হইতে হয়, তবে দণ্ডশালায় পণ্ডিতমহাশয়েরও সঙ্গ লাভ হইতে বঞ্চিত হইব না।

এরূপ ছোটো ছোটো ভুল খুঁটিয়া মূল প্রবন্ধের বিচার সংগত নহে। খ্যাঁলো শব্দটা রাখিলে বা বাদ দিলে আসল কথাটার কিছুই আসে যায় না। বাংলা আল্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তস্থলে ভ্রমক্রমে যদি, 'বাচাল' সংস্কৃত কথাটা বসিয়া থাকে তবে সেটাকে অনায়াসে উৎপাটন করিয়া ফেলা যায়, তাহাতে বিবেচ্য বিষয়ের মূলে আঘাত করে না। 'ছাগল' যদি সংস্কৃত শব্দ হয়, তবে তাহাকে বাংলা ল প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তগণ্ডি হইতে বিনা ক্লেশে মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, খাঁটি বাংলা দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। ধানের খেতের মধ্যে যদি দুটো-একটা গত বৎসরের যবের শীষ উঠিয়া থাকে, তাহাকে রাখ বা ফেলিয়া দাও, বিশেষ আসে যায় না, তাই বলিয়াই ধানের খেতকে যবের খেত বলা চলে না।

মোট কথাটার এবং আসল কথাটার উপর দৃষ্টি না রাখিয়া অনুবীক্ষণ হাতে ছোটো ছোটো খুঁত ধরিবার চেষ্টায় বেড়াইলে খুঁত সর্বত্রই পাওয়া যায়। যে-গাছ হইতে ফল পাড়া যাইতে পারে, সে-গাছ হইতে কীটও পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই কীটের দ্বারা গাছের বিচার করা যায় না।

একটি গল্প মনে পড়িল। কোনো রাজপুত গোঁফে চাড়া দিয়া রাস্তায় চলিয়াছিল। একজন পাঠান আসিয়া বলিল, লড়াই করো। রাজপুত বলিল, খামকা লড়াই করিতে আসিলে, ঘরে কি স্ত্রী-পুত্র নাই। পাঠান বলিল, আছে বটে, আচ্ছা তাহাদের একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিগে। বলিয়া বাড়ি গিয়া সব কটাকে কাটিয়াকুটিয়া নিঃশেষ করিয়া আসিল। পাঠান দ্বিতীয়বার লড়াইয়ের প্রস্তাব করিতেই রাজপুত জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ভাই, তুমি যে লড়াই করিতে বলিতেছ, আমার অপরাধটা কী। পাঠান বলিল, তুমি যে আমার সামনে গোঁফ তুলিয়া আছ, সেই অপরাধ। রাজপুত তৎক্ষণাৎ গোঁফ নামাইয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা ভাই, গোঁফ নামাইয়া দিতেছি।

প্রতিবাদী মহাশয়ের কাছে আমারও প্রশ্ন এই যে, ওই 'ছাগল' 'বাচাল' 'থ্যাঁলো' এবং 'নৈমিত্তিক' শব্দ কয়েকটি লইয়াই কি আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাদ। আচ্ছা আমি গোঁফ নামাইয়া লইতেছি— ও শব্দ কয়টা একেবারেই ত্যাগ করিলাম। তাহাতে মূল প্রবন্ধের কোনোই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। ইহাতে বিবাদ মিটিবে কি। প্রতিবাদী বলিবেন, অকিঞ্চিৎকর কথাগুলো বাংলায় ঢোকাইয়া তুমি ভাষাটাকে মাটি করিবার চেষ্টায় আছ। আমার বিনীত উত্তর এই যে, ওই কথাগুলো আমার এবং তাঁহার বহু-পূর্ব পিতামহ-পিতামহীরা প্রচলিত করিয়া গেছেন, আমি তাহাদের রাখিবারই বা কে, মারিবারই বা কে।

প্রতিবাদী মহাশয়ের হুকুম হইতে পারে, আচ্ছা বেশ, ভাষায় আছে থাক্, তুমি ওগুলার নিয়ম আলোচনা করিয়ো না। কিন্তু এ হুকুম চলিবে না। গোঁফের এই ডগাটুকু নামাইতে পারিব না।

যে-কথাগুলি লইয়া আজ এত তর্ক উঠিল তাহা এতই সোজা যে, পাঠক ও শ্রোতাদের এবং 'সাহিত্য-পরিষৎ-সভা'র সম্মানের প্রতি লক্ষ করিয়া চুপ করিয়া থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শেক্সপীয়ার যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষেই খাটে। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য একা আসে

না, দলবল সঙ্গে করিয়াই আসে। প্রতিবাদী মহাশয়ও একা নহেন, তাঁহার দলবল আছে। তিনি শাসাইয়াছেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বি. এ., এম. এ. উপাধিধারী' এবং 'বর্তমান সময়ে যে সকল লেখক ও লেখিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন' তাঁহারা এবং 'ইংলণ্ডপ্রত্যাগত অনেক কৃতবিদ্য' তাঁহার দলে আছেন। ইহাতে অকস্মাৎ বাংলা ভাষার এত হিতৈষী অভিভাবকের ভিড় দেখিয়া এতকালের উপেক্ষিতা মাতৃভাষার জন্য আশাও জন্মে অথচ নিজের অসহায়তায় হৃৎকম্পও উপস্থিত হয়। সেই কারণে পণ্ডিতমহাশয়ের দল ভাঙাইয়া লইবার জন্যই আমার আজিকার এই চেষ্টা। তাঁহাদিগকে আমি আশ্বাস দিতেছি, এ দলে আসিয়াও তাঁহারা 'ভাষার বিশুদ্ধি ও মাধুর্য রক্ষায়' মনোযোগ করিলে আমরা কেহ বাধা দিব না, চাই কী, আমরাও শিক্ষা লাভ করিতে পারিব।

কেবল তাঁহাদিগকে এই অত্যন্ত সহজ কথাটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলা ভাষা বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে। ইহাতে তাঁহাদের কৃতবিদ্যতা ও ইংলণ্ডপ্রত্যাগমনের গৌরব ক্ষুণ্ন হইবে না, অথচ আমিও যথেষ্ট সম্মানিত ও সহায়বান হইব।

পৌষ ১৩০৮

ভাষার ইঙ্গিত

বাংলা ব্যাকরণের কোনো কথা তুলিতে গেলে গোড়াতেই দুই-একটা বিষয়ে বোঝাপড়া স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। বাংলা ভাষা হইতে তাহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত অংশকে কোনোমতেই ত্যাগ করা চলে না, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মানুষকে তাহার বেশভূষা বাদ দিয়া আমরা ভদ্রসমাজে দেখিতে ইচ্ছা করি না। বেশভূষা না হইলে তাহার কাজই চলে না, সে নিষ্ফল হয়; কী আত্মীয়সভায় কী রাজসভায় কী পথে মানুষকে যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিতেই হয়।

কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষ বরঞ্চ দেহত্যাগ করিতে রাজি হইবে তবু বস্ত্র ত্যাগ করিতে রাজি হইবে না, তবু বস্ত্র তাহার অঙ্গ নহে এবং তাহার বস্ত্রতত্ত্ব ও অঙ্গতত্ত্ব একই তত্ত্বের অন্তর্গত নহে।

সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আবরণ, তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের বাহ্য উপায়।

অতএব, মানুষের বস্ত্রবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান যেমন একই কথা নহে তেমনই বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ বাংলার ব্যাকরণ এক নহে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই সামান্য কথাটাও প্রকাশ করিতে প্রচুর পরিমাণে বীররসের প্রয়োজন হয়।

বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্তিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাম দিয়া মহম্মদ ঘোরী বাবর হুমায়ুনের ইতিহাস পড়ি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে; তেমনই আমরা বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধ মাত্র থাকে। এরূপ বেনামিতে বিদ্যালাভ ভালো কি মন্দ তাহা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বলিতে সাহস করি না, কিন্তু ইহা যে বেনামি তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কেবল দেখিয়াছি শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ভাষার বাংলা ও সংস্কৃত দুই অংশকেই খাতির দেখাইবার

চেষ্টা করিয়াছেন ; ইহাতে তিনি পণ্ডিতসমাজে সুস্থ শরীরে শান্তি রক্ষা করিয়া আছেন কি না সে সংবাদ পাই নাই।

এই যে-বাংলায় আমরা কথাবার্তা কহিয়া থাকি, ইহাকে বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রাকৃত বাংলা নাম দেওয়া যাইতে পারে। যে-বাংলা ঘরে ঘরে মুখে মুখে দিনে দিনে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, বাংলার সমস্ত প্রদেশেই সেই ভাষার অনেকটা ঐক্য থাকিলেও সাম্য নাই। থাকিতেও পারে না। সকল দেশেরই কথিত ভাষায় প্রাদেশিক ব্যবহারের ভেদ আছে।

সেই ভেদগুলি ঠিক হইয়া গেলে ঐক্যগুলি কি বাহির করা সহজ হইয়া পড়ে। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ যদি লিখিত হয়, তবে বাংলা ভাষা বাঙালির কাছে ভালো করিয়া পরিচিত হইতে পারে। তাহা হইলে বাংলা ভাষার কারক ক্রিয়া ও অব্যয় প্রভৃতির উৎপত্তি ও পরিণতির নিয়ম অনেকটা সহজে ধরা পড়ে।

কিন্তু তাহার পূর্বে উপকরণ সংগ্রহ করা চাই। নানা দিক হইতে সাহায্য পাইলে তবেই ক্রমে ভাবী ব্যাকরণকারের পথ সুগম হইয়া উঠিবে।

ভাষার অমুক ব্যবহার বাংলার পশ্চিমে আছে পূর্বে নাই বা পূর্বে আছে পশ্চিমে নাই, এরূপ একটা ঝগড়া যেন না ওঠে। এই সংগ্রহে বাংলার সকল প্রদেশকেই আহ্বান করা যাইতেছে। পূর্বেই আভাস দিয়াছি, ঐক্য নির্ণয় করিয়া বাংলা ভাষার নিত্য প্রকৃতিটি বাহির করিতে হইলে প্রথমে তাহার ভিন্নতা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে।

আমরা কেবলমাত্র ভাষার দ্বারা ভাব প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না ; আমাদের কথার সঙ্গে সঙ্গে সুর থাকে, হাতমুখের ভঙ্গী থাকে, এমনই করিয়া কাজ চালাইতে হয়। কতকটা অর্থ এবং কতকটা ইঙ্গিতের উপরে আমরা নির্ভর করি।

আবার আমাদের ভাষারও মধ্যে সুর এবং ইশারা স্থানলাভ করিয়াছে। অর্থবিশিষ্ট শব্দের সাহায্যে যে-সকল কথা বুঝিতে দেরি হয় বা বুঝা যায় না, তাহাদের জন্য ভাষা বহুতর ইঙ্গিত-বাক্যের আশ্রয় লইয়াছে। এই ইঙ্গিত-বাক্যগুলি অভিধান-ব্যাকরণের বাহিরে বাস করে, কিন্তু কাজের বেলা ইহাদিগকে নহিলে চলে না।

বাংলা ভাষায় এই ইঙ্গিত-বাক্যের ব্যবহার যত বেশি, এমন আর-কোনো

ভাষায় আছে বলিয়া আমরা জানি না।

যে-সকল শব্দ ধ্বনিব্যঞ্জক, কোনো অর্থসূচক ধাতু হইতে যাহাদের উৎপত্তি নহে, তাহাদিগকে ধ্বন্যাত্মক নাম দেওয়া গেছে; যেমন, ধাঁ সাঁ চট্‌ খট্‌ ইত্যাদি।

এইরূপ ধ্বনির অনুকরণমূলক শব্দ অন্য ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাংলার বিশেষত্ব এই যে, এগুলি সকল সময় বাস্তবধ্বনির অনুকরণ নহে, অনেক সময়ে ধ্বনির কল্পনামাত্র। মাথা দব্‌দব্‌ করিতেছে, টন্‌টন্‌ করিতেছে, কন্‌কন্‌ করিতেছে প্রভৃতি শব্দে বেদনাবোধকে কাল্পনিক ধ্বনির ভাষায় তর্জমা করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, শূন্য ঘর গম্‌গম্‌ করিতেছে, ভয়ে গা ছম্‌ছম্‌ করিতেছে, এগুলিকে অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বিস্তারিত করিয়া বলিতে হয় এবং বিস্তারিত করিয়া বলিলেও ইহার অনির্বচনীয়তাটুকু হৃদয়ের মধ্যে তেমন অনুভবগম্য হয় না; এরূপ স্থলে এই প্রকার অব্যক্ত অস্ফুট ভাষাই ভাবব্যক্ত করিবার পক্ষে বেশি উপযোগী। একটা জিনিসকে লাল বলিলে তাহার বস্তুগুণসম্বন্ধে কেবলমাত্র একটা খবর দেওয়া হয়, কিন্তু, লাল টুক্‌টুক্‌ করিতেছে বলিলে সেই লাল রঙ আমাদের অনুভূতির মধ্যে কেমন করিয়া উঠিয়াছে, তাহাই একটা অর্থহীন কাল্পনিক ধ্বনির সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করা যায়। ইহা ইঙ্গিত, ইহা বোবার ভাষা।

বাংলা ভাষায় এইরূপ অনির্বচনীয়তাকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টায় এই প্রকারের অব্যক্ত ধ্বনিমূলকশব্দ প্রচুররূপে ব্যবহার করা হয়।

ভালো করিয়া ছবি আঁকিতে গেলে শুধু গোটাকতক মোটা রঙ লইয়া বসিলে চলে না, নানা রকমের মিশ্র রঙ, সূক্ষ্ম রঙের দরকার হয়। বর্ণনার ভাষাতেও সেইরূপ বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। শরীরের গতি সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় কত কথা আছে ভাবিয়া দেখিবেন, walk run hobble waggle wade creep crawl ইত্যাদি; বাংলা লিখিত ভাষায় কেবল দ্রুতগতি ও মন্দগতি দ্বারা এই-সমস্ত অবস্থা ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু কথিত ভাষা লিখিত ভাষার মতো বাবু নহে, তাহাকে যেমন করিয়া হউক প্রতিদিনের নানান কাজ চালাইতে হয়; যতক্ষণ বোপদেব পাণিনি অমরকোষ ও শব্দকল্পদ্রুম আসিয়া তাহাকে পাশ ফিরাইয়া না দেন ততক্ষণ কাত হইয়া

পড়িয়া থাকিলে তাহার চলে না; তাই সে নিজের বর্ণনার ভাষা নিজে বানাইয়া লইয়াছে, তাই তাহাকে কখনো সাঁ করিয়া, কখনো গট্‌গট্‌ করিয়া কখনো খুটুস্ খুটুস্ করিয়া, কখনো নড়বড় করিতে করিতে, কখনো সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া, কখনো থপ্‌ থপ্‌ এবং কখনো থপাস্ থপাস্ করিয়া চলিতে হয়। ইংরেজি ভাষা laugh, smile, grin, simper, chukle করিয়া নানাবিধ আনন্দ কৌতুক ও বিদ্রূপ প্রকাশ করে; বাংলা ভাষা খলখল করিয়া, খিলখিল করিয়া, হোহো করিয়া, হিহি করিয়া, ফিক্ ফিক্ করিয়া, ফিক্ করিয়া এবং মুচ্‌কিয়া হাসে। মুচকে হাসির জন্ত বাংলা অমরকোষের কাছে ঋণী নহে। মচ্‌কান শব্দের অর্থ বাঁকানো, বাঁকাইতে গেলে যে মচ্‌ করিয়া ধ্বনি হয় সেই ধ্বনি হইতে এই কথার উৎপত্তি। উহাতে হাসিকে ওষ্ঠাধরের মধ্যে চাপিয়া মচকাইয়া রাখিলে তাহা মুচকে হাসিরূপে একটু বাঁকাভাবে বিরাজ করে।

বাংলা ভাষার এই শব্দগুলি প্রায়ই জোড়াশব্দ। এগুলি জোড়াশব্দ হইবার কারণ আছে। জোড়াশব্দে একটা কালব্যাপকত্বের ভাব আছে। ধূধূ করিতেছে ধবধব করিতেছে, বলিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা ক্রিয়ার ব্যাপকত্ব বোঝায়। যেখানে ক্ষণিকতা বোঝায় সেখানে জোড়া কথার চল নাই; যেমন, ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া ইত্যাদি।

যখন ধাঁ ধাঁ, সাঁ সাঁ, বলা যায় তখন ক্রিয়ার পুনরাবর্তন বুঝায়।

'এ' প্রত্যয় যোগ করিয়া এই-জাতীয় শব্দগুলি হইতে বিশেষণ তৈরি হইয়া থাকে; যেমন, ধব্‌ধবে টক্‌টকে ইত্যাদি।

টকটক ঠকঠক প্রভৃতি কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের মাঝখানে আকার যোগ করিয়া উহারই মধ্যে একটুখানি অর্থের বিশেষত্ব ঘটানো হইয়া থাকে; যেমন, কচাকচ কটাকট কড়াকড় কপাকপ খচাখচ খটাখট খপাখপ গপাগপ ঝনাজ্‌ঝন টকাটক টপাটপ ঠকাঠক ধড়াধ্বড় ধপাধপ, ধমাধ্বম, পটাপট, ফসাফস।

কপকপ এবং কপাকপ, ফসফস এবং ফসাফস, টপটপ এবং টপাটপ শব্দের মধ্যে কেবলমাত্র আকারযোগে অর্থের যে সূক্ষ্ম বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, তাহা কোনো বিদেশীকে অর্থবিশিষ্ট ভাষার সাহায্যে বোঝানো শক্ত। ঠকাঠক বলিলে এই বুঝায় যে, একবার ঠক করিয়া তাহার পরে বলসঞ্চয়পূর্বক পুনর্বার দ্বিতীয়বার ঠক করা; মাঝখানের সেই উদ্যত অবস্থার যতিটুকু আকারযোগে আপনাকে প্রকাশ করে। এইরূপে বাংলা ভাষা যেন অ আ ই উ স্বরবর্ণ

কয়টাকে লইয়া সুরের মতো ব্যবহার করিয়াছে। সে-সুর যাহার কানে অভ্যস্ত হইয়াছে সে-ই তাহার সূক্ষ্মতম মর্মটুকু বুঝিতে পারে।

উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে লক্ষ করিবার বিষয় আর-একটি আছে। আত্মক্ষরে যেখানে অকার আছে সেইখানে পরবর্তী অক্ষরে আকার-যোজন চলে, অন্যত্র নহে।

যেমন টকটক হইতে টকাটক হইয়াছে, কিন্তু টিকটিক হইতে টিকাটিক বা ঠুকঠুক হইতে ঠুকাঠুক হয় না। এইরূপে মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে, বাংলা ভাষার উচ্চারণে স্বরবর্ণগুলির কতকগুলি কঠিন বিধি আছে।

স্বরবর্ণ আকারকে আবার আর-এক জায়গায় প্রয়োগ করিলে আর-এক রকমের সুর বাহির হয়; তাহার দৃষ্টান্ত, টুকটাক ঠুকঠাক খুটখাট ভুটভাট দুড়দাড় কুপকাপ গুপগাপ ঝুপঝাপ টুপটাপ ধুপধাপ হুপহাপ দুমদাম ধুমধাম ফুসফাস হুসহাস।

এই শব্দগুলি দুই প্রকারের ধ্বনিব্যঞ্জন করে, একটি অস্ফুট আর-একটি স্ফুট। যখন বলি, টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে তখন এই বুঝায় যে, ছোটো ফোঁটাটি টুপ করিয়া এবং বড়ো ফোঁটাটি টাপ করিয়া পড়িতেছে, ঠুকঠাক শব্দের অর্থ একটা শব্দ ছোটো আর-একটা বড়ো। উকারে অব্যক্তপ্রায় প্রকাশ, আকারে পরিস্ফুট প্রকাশ।

আমরা এতক্ষণ যে-সকল জোড়াকথার দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করিলাম তাহারা বিশুদ্ধ ধ্বন্যাত্মক। আর-একরকমের জোড়াকথা আছে তাহার মূলশব্দটি অর্থসূচক এবং দোসর শব্দটি মূলশব্দেরই অর্থহীন বিকার; যেমন, চুপচাপ ঘুষঘাষ তুকতাক ইত্যাদি। চুপ ঘুষ এবং তুক এ-তিনটে শব্দ আভিধানিক, ইহারা অর্থহীন ধ্বনি নহে; ইহাদের সঙ্গে চাপ ঘাষ ও তাক, এই তিনটে অর্থহীন শব্দ শুদ্ধমাত্র ইঙ্গিতের কাজ করিতেছে।

জলের ধারেই যে-গাছটা দাঁড়াইয়া আছে সেই গাছটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংলগ্ন বিকৃত ছায়াটাকে একত্র করিয়া দেখিলে যেমন হয়, বাংলা ভাষার এই কথাগুলাও সেইরূপ; চুপ কথাটার সঙ্গে তাহার একটা বিকৃত ছায়া যোগ করিয়া দিয়া চুপচাপ হইয়া গেল। ইহাতে অর্থেরও একটু অনির্দিষ্টভাবের বিস্তৃতি হইল। যদি বলা যায় কেহ চুপ করিয়া আছে, তবে বুঝায় সে নিঃশব্দ হইয়া আছে; কিন্তু যদি বলি চুপচাপ আছে, তবে বুঝায় লোকটা কেবলমাত্র

নিঃশব্দ নহে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়াও আছে। একটা নির্দিষ্ট অর্থের পশ্চাতে একটা অনির্দিষ্ট আভাস জুড়িয়া দেওয়া এই শ্রেণীর জোড়াকথার কাজ।

ছায়াটা আসল জিনিসের চেয়ে বড়োই হইয়া থাকে। অনির্দিষ্টটা নির্দিষ্টের চেয়ে অনেক মস্ত। আকার স্বরটাই বাংলায় বড়োত্বের সুর লাগাইবার জন্য আছে। আকার স্বরবর্ণের যোগে ঘুষঘাষ-এর ঘাষ, তুকতাক-এর তাক, ঘুষ অর্থ ও তুক অর্থকে কল্পনাক্ষেত্রে অনেকখানি বাড়াইয়া দিল অথচ স্পষ্ট কিছুই বলিল না।

কিন্তু যেখানে মূলশব্দে আকার আছে সেখানে দোসর শব্দে এ নিয়ম খাটে না, পুনর্বার আকার যোগ করিলে কথাটা দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে। কিন্তু দ্বিগুণিত করিলে তাহার অর্থ অন্য রকম হইয়া যায়। যদি বলি গোল-গোল, তাহাতে হয় একাধিক গোল পদার্থকে বুঝায়, নয় প্রায়-গোল জিনিসকে বুঝায়। কিন্তু গোল-গাল বলিলে গোল আকৃতি বুঝায়, সেইসঙ্গেই পরিপুষ্টতা প্রভৃতি আরো কিছু অনির্দিষ্ট ভাব মনে আনিয়া দেয়।

এইজন্য এইপ্রকার অনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনার স্থলে দ্বিগুণিত করা চলে না, বিকৃতির প্রয়োজন। তাই গোড়ায় যেখানে আকার আছে সেখানে দোসর শব্দে অন্য স্বরবর্ণের প্রয়োজন; তাহার দৃষ্টান্ত, দাগদোগ ডাকডোক বাছবোছ সাজসোজ ছাঁটছোঁট চালচোল ধারধোর সাফসোফ।

অন্যরকম: কাটাকোটা খাটাখোটা ডাকাডোকা ঢাকাঢোকা ঘাঁটাঘোঁটা ছাঁটাছোঁটা ঝাড়াঝোড়া চাপাচোপা ঠাসাঠোসা কালোকোলো।

এইগুলির রূপান্তর: কাটাকুটি ডাকাডুকি ঢাকাঢুকি ঘাঁটাঘুঁটি ছাঁটাছুঁটি কাড়াকুড়ি ছাড়াছুড়ি ঝাড়াঝুড়ি ভাজাভুজি তাড়াতুড়ি টানাটুনি চাপাচুপি ঠাসাঠুসি। এইগুলি ক্রিয়াপদ হইতে উৎপন্ন। বিশেষ্যপদ হইতে উৎপন্ন শব্দ: কাঁটাকুঁটি ঠাট্টাঠুট্টি ধাক্কাধুক্কি।

শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায়, পূর্বে আকার ও পরে ইকার থাকিলে মাঝখানের ওকারটি উচ্চারণের সুবিধার জন্য উকাররূপ ধরে। শুদ্ধমাত্র 'কোটি' উচ্চারণ সহজ, কিন্তু 'কোটাকোটি' দ্রুত উচ্চারণের পক্ষে ব্যাঘাতজনক। চাপাচোপি ডাকাডোকি ঘাঁটাঘোঁটি, উচ্চারণের চেষ্টা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে, অথচ, চুপি ডুকি ঘুঁটি উচ্চারণ কঠিন নহে।

তাহা হইলে মোটের উপরে দেখা যাইতেছে যে, জোড়া কথাগুলির

প্রথমাংশের আদ্যক্ষরে যেখানে ই উ বা ও আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে আকার-স্বর যুক্ত হয়; যেমন ঠিকঠাক মিটমাট ফিটফাট ভিরভার ঢিলেঢালা ঢিপঢাপ ইত্যাদি; কুচোকাচা গুঁড়োগাঁড়া গুঁতোগাঁতা কুটোকাটা ঘুষোঘাষা ফুটোফাটা ভুজংভাজাং টুকরো-টাকরা হুকুম-হাকাম শুকনো-শাকনা; গোলগাল যোগযাগ সোরসার রোখরাখ খোঁচখাঁচ গোছগাছ মোটমাট খোপখাপ খোলাখালা জোগাড়জাগাড়।

কিন্তু যেখানে প্রথমাংশের আদ্যক্ষরে আকার যুক্ত আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে ওকার জুড়িতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে; জোগাড় শব্দের বেলায় হইল জোগাড়-জাগাড়, ডাগর শব্দের বেলায় হইল ডাগর-ডোগর। একদিকে দেখো টুকরো-টাকরা হুকুম-হাকাম, অন্য দিকে হাপুস-হুপুস নাদুস-নুদুস। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আকারে ওকারে একটা বোঝাপড়া আছে। ফিরিঙ্গি যেমন ইংরেজের চালে চলে, আমাদের সংকরজাতীয় অ্যাকারও এখানে আকারের নিয়ম রক্ষা করেন; যথা, ঠ্যাকা-ঠোকা গ্যাঁটাগোটা অ্যালাগোলা।

উল্লিখিত নিয়মটি বিশেষ শ্রেণীর কথা সম্বন্ধেই খাটে, অর্থাৎ যে-সকল কথায় প্রথমার্ধের অর্থ নির্দিষ্ট ও দ্বিতীয়ার্ধের অর্থ অনির্দিষ্ট; যেমন ঘুষোঘাষা। কিন্তু ঘুষোঘুষি কথাটার ভাব অন্য রকম, তাহার অর্থ দুই পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট ঘুষি-চালাচালি; ইহার মধ্যে আভাস ইঙ্গিত কিছুই নাই। এখানে দ্বিতীয়াংশের আদ্যক্ষরে সেইজন্য স্বরবিকার হয় নাই।

এইরূপ ঘুষোঘুষি-দলের কথাগুলি সাধারণত অন্যোন্যতা বুঝাইয়া থাকে; কানাকানি-র মানে, এর কানে ও বলিতেছে, ওর কানে এ বলিতেছে। গলাগলি বলিতে বুঝায়, এর গলা ও, ওর গলা এ ধরিয়াছে। এই শ্রেণীর শব্দের তালিকা এইখানেই দেওয়া যাক:

কষাকষি কচলা-কচলি গড়াগড়ি গলাগলি চটাচটি চটকা-চটকি ছড়াছড়ি জড়াজড়ি টক্করা-টক্করি ডলাডলি ঢলাঢলি দলাদলি ধরাধরি ধস্তাধস্তি বকাবকি বলাবলি।

আঁটাআঁটি আঁচাআঁচি আড়াআড়ি আধাআধি কাছাকাছি কাটাকাটি ঘাঁটাঘাঁটি চাটাচাটি চাপাচাপি চালাচালি চাওয়া-চাওয়ি ছাড়াছাড়ি জানাজানি জাপটা-জাপটি টানাটানি ডাকাডাকি ঢাকাঢাকি তাড়াতাড়ি দাপাদাপি

ধাক্কাধাক্কি নাচানাচি নাড়ানাড়ি পালটা-পালটি পাকাপাকি পাড়াপাড়ি পাশাপাশি ফাটাফাটি মাখামাখি মাঝামাঝি মাতামাতি মারামারি বাছাবাছি বাঁধাবাঁধি বাড়াবাড়ি ভাগাভাগি রাগারাগি রাতারাতি লাগালাগি লাঠালাঠি লাথালাথি লাফালাফি সামনা-সামনি হাঁকাহাঁকি হাঁটাহাঁটি হাতাহাতি হানাহানি হারাহারি (হারাহারি ভাগ করা) খ্যাঁচাখেঁচি খ্যামচা-খেমচি ঘ্যাঁষাঘেঁষি ঠ্যাসাঠেসি ঠ্যালাঠেলি ঠ্যাকাঠেকি ঠ্যাঙাঠেঙি ভাখাদেখি ব্যাঁকাবেঁকি হ্যাঁচকা-হেঁচকি ল্যাপালেপি।

কিলোকিলি পিঠোপিঠি (ভাইবোন)।

খুনোখুনি গুঁতোগুঁতি ঘুষোঘুষি চুলোচুলি ছুটোছুটি ঝুলোঝুলি মুখোমুখি সুমুখো-সুমুখি।

টেপাটেপি পেটাপিটি লেখালিখি ছেঁড়াছিঁড়ি।

কোনাকুনি কোলাকুলি কোস্তাকুস্তি খোঁচাখুঁচি খোঁজাখুঁজি খোলাখুলি গোড়াগুড়ি ঘোরাঘুরি ছোঁড়াছুঁড়ি ছোঁয়াছুঁয়ি ঠোকাঠোকি ঠোকরা-ঠুকরি দোলাদুলি ধোকাধুকি রোখারুখি লোফালুফি শোঁকাশুঁকি দৌড়োদৌড়ি।

এই শ্রেণীর জোড়াকথা তৈরির নিয়মে দেখা যাইতেছে— প্রথমার্ধের শেষে আ ও দ্বিতীয়ার্ধের শেষে ই যোগ করিতে হয়; যেমন, ছড়্ ধাতুর উত্তরে একবার আ ও একবার ই যোগ করিয়া ছড়াছড়ি, বল্ ধাতুর উত্তরে আ এবং ই যোগ করিয়া বলাবলি ইত্যাদি।

কেবল ক্রিয়াপদের ধাতু নহে, বিশেষ্য শব্দের উত্তরেও এই নিয়ম খাটে ; যেমন, রাতারাতি হাতাহাতি মাঝামাঝি ইত্যাদি।

কিন্তু যেখানে আদ্যক্ষরে ইকার উকার বা ঔকার আছে, সেখানে আ প্রত্যয়কে তাহার বন্ধু ওকারের শরণাপন্ন হইতে হয় ; যেমন, কিলোকিলি খুনোখুনি দৌড়োদৌড়ি।

ইহাতে প্রমাণ হয়, ইকার ও উকারের পরে আকার অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। অন্যত্র তাহার দৃষ্টান্ত আছে ; যথা, যেখানে লিখিত ভাষায় লিখি— মিলাই মিশাই বিলাই, সেখানে কথিত ভাষায় উচ্চারণ করি— মিলোই মিশোই বিলোই ; ডিবা-কে বলি ডিবে, চিনাবাসন-কে বলি চিনেবাসন ; ডুবাই লুকাই জুড়াই-কে বলি— ডুবোই লুকোই জুড়োই ; কুলা-কে বলি কুলো, ধুলাকে বলি ধুলো ইত্যাদি। অতএব এখানে নিয়মের যে ব্যতিক্রম দেখা যায়

তাহা উচ্চারণবিধিবশত।

যেখানে আদ্যক্ষরে অ্যাকার একার বা ওকার আছে সেখানে আবার আর-এক দিকে স্বরব্যত্যয় ঘটে; নিয়মমত, ঠ্যালাঠ্যালি না হইয়া ঠ্যালাঠেলি, টিপাটেপি না হইয়া টেপাটিপি, এবং কোনাকোনি না হইয়া কোনাকুনি হয়।

কিন্তু, শেষাশেষি ঘেষাঘেষি রেষারেষি মেশামেশি প্রভৃতি শ-ওয়ালা কথায় একারের কোনো বৈলক্ষণ্য ঘটে না। বাংলা উচ্চারণবিধির এই-সকল রহস্য আলোচনার বিষয়।

আমরা শেষোক্ত তালিকাটিকে বাংলার ইঙ্গিত-বাক্যের মধ্যে ভুক্ত করিলাম কেন তাহা বলা আবশ্যক। কানাকানি করিতেছে বা বলাবলি করিতেছে, বলিলে যে-সকল কথা উহ্য থাকে তাহা কেবল কথার ভঙ্গিতে ব্যক্ত হইতেছে। পরস্পর পরস্পরের কানে কথা বলিতেছে, বলিলে প্রকৃত ব্যাপারটাকে অর্থবিশিষ্ট কথায় ব্যক্ত করা হয়, কিন্তু কান কথাটাকে দুইবার বাঁকাইয়া বলিয়া একটা ইঙ্গিতে সমস্তটা সংক্ষেপে সারিয়া দেওয়া হইল।

এ পর্যন্ত আমরা তিন রকমের ইঙ্গিত-বাক্য পাইলাম। একটা ধ্বনিমূলক যেমন, সোঁ-সোঁ কন্‌কন্ ইত্যাদি। আর-একটা পদবিকারমূলক যেমন, খোলাখালা গোলগাল চুপচাপ ইত্যাদি। আর-একটা পদদ্বৈতমূলক যেমন, বলাবলি দলাদলি ইত্যাদি।

ধ্বনিমূলক শব্দগুলি দুই রকমের; একটা ধ্বনিদ্বৈত, আর-একটা ধ্বনিদ্বৈধ। ধ্বনিদ্বৈত যেমন, কলকল কটকট ইত্যাদি; ধ্বনিদ্বৈধ যেমন, ফুটফাট কুপকাপ ইত্যাদি। ধ্বনিমূলক এই শব্দগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ বেদনাবোধ প্রভৃতি অনুভূতি প্রকাশ করে।

পদবিকারমূলক শব্দগুলি একটা নির্দিষ্ট অর্থকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারি দিকে অনির্দিষ্ট আভাসটুকু ফিকা করিয়া লেপিয়া দেয়। পদদ্বৈতমূলক শব্দগুলি সাধারণত অন্যোন্যতা প্রকাশ করে।

ধ্বনিদ্বৈধ ও পদবিকারমূলক শব্দগুলিতে আমরা এ পর্যন্ত কেবল স্বরবিকারেরই পরিচয় পাইয়াছি; যেমন, হুসহাস— হুসের সহিত যে বর্ণভেদ ঘটিয়াছে তাহা স্বরবর্ণভেদ; খোলাখালা প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ। এবারে ব্যঞ্জনবর্ণবিকারের দৃষ্টান্ত লইয়া পড়িব।

প্রথমে অর্থহীন শব্দমূলক কথাগুলি দেখা যাক; যেমন, উসখুস উস্কোখুস্কো

গজগজ নিশপিশ আইঢাই কাঁচুমাচু আবল-তাবল হাঁসফাঁস খুঁটিনাটি আগড়ম-বাগড়ম এবড়ো-খেবড়ো ছটফট তড়বড় হিজিবিজি কাটনাটি আঁকুবাঁকু হাবজা-গোবজা লটখটে তড়বড়ে ইত্যাদি।

এই কথাগুলির অধিকাংশই আগাগোড়া অনির্দিষ্টভাব প্রকাশ করে। হাতপা চোখমুখ কাপড়চোপড় লইয়া ছোটোখাটো কত কী করাকে যে উসখুস করা বলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে হতাশ হইতে হয়; কী কী বিশেষ কার্য করাকে যে আইঢাই করা বলে তাহা আমাদের মধ্যে কে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারেন। কাঁচুমাচু করা কাহাকে বলে তাহা আমরা বেশ জানি, কিন্তু কাঁচুমাচু করার প্রক্রিয়াটি যে কী তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিবার ভার লইতে পারি না।

এ তো গেল অর্থহীন কথা; কিন্তু যে-জোড়াকথার প্রথমাংশ অর্থবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়াংশ বিকৃতি, বাংলায় তাহার প্রধান কর্ণধার ট ব্যঞ্জনবর্ণটি। ইনি একেবারে সরকারিভাবে নিযুক্ত; জলটল কথাটথা গিয়েটিয়ে কালোটালো ইত্যাদি বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া কোথাও ইঁহার অনধিকার নাই। অভিধানে দেখা যায় ট অক্ষরের কথা বড়ো বেশি নাই, কিন্তু বেকার ব্যক্তিকে যেমন পৃথিবীসুদ্ধ লোকের বেগার ঠেলিয়া বেড়াইতে হয় তেমনই বাংলা ভাষায় কুঁড়েমিচর্চার যেখানে প্রয়োজন সেইখানেই ট-টাকে হাজরে দিতে হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মূলশব্দের বিকৃতিটাকে মূলের পশ্চাতে জুড়িয়া দিয়া বাংলা ভাষা একটা স্পষ্ট অর্থের সঙ্গে অনেকখানি ঝাপসা অর্থ ইশারায় সারিয়া দেয়; জলটল গানটান তাহার দৃষ্টান্ত। এই সরকারি ট-এর পরিবর্তে এক-এক সময় ফ একটিনি করিতে আসে, কিন্তু তাহাতে একটা অবজ্ঞার ভাব আনে; যদি বলি লুচিটুচি তবে লুচির সঙ্গে কচুরি নিমকি প্রভৃতি অনেক উপাদেয় পদার্থ বুঝাইবার আটক নাই, কিন্তু লুচিফুচি বলিলে লুচির সঙ্গে লোভনীয়তার সম্পর্কমাত্র থাকে না।

আর দুটি অক্ষর আছে, স এবং ম। বিশেষভাবে কেবল কয়েকটি শব্দেই ইহাদের প্রয়োগ হয়।

স-এর দৃষ্টান্ত: জো-সো জড়োসড়ো মোটাসোটা রকম-সকম ব্যামোস্তামো ব্যারাম-স্যারাম বোকাসোকা নরম-সরম বুড়োসুড়ো আঁটসাট গুটিয়ে-সুটিয়ে বুঝেসুঝে।

ম-এর দৃষ্টান্ত : চটেমটে রেগেমেগে হিঁচকে-মিচকে সিটকে-মিটকে চটকে-মটকে চম্‌কে-মমকে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে আঁৎকে-মাৎকে জড়িয়ে-মড়িয়ে আঁচড়ে-মাচড়ে শুকিয়ে-মুকিয়ে কুঁচকে-মুচকে তেড়েমেড়ে এলোমেলো খিটিমিটি হুড়মুড় ঝাঁকড়া-মাকড়া কটোমটো।

দেখা যাইতেছে ম-এর দৃষ্টান্তগুলি বেশ সাধু শান্ত ভাবের নহে, কিছু রুক্ষ রকমের। বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সচরাচর কথাতেও আমরা ম অক্ষরটাকে ট-এর পরিবর্তে ব্যবহার করি, অন্তত ব্যবহার করিলে কানে লাগে না, কিন্তু সে-সকল জায়গায় ম আপনার মেজাজটুকু প্রকাশ করে। আমরা বিষ-মিষ বলিতে পারি কিন্তু সন্দেশ-মন্দেশ যদি বলি তবে সন্দেশের গৌরবটুকু একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। দুটো ঘুষোমুষো লাগিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে, এ কথা বলা চলে কিন্তু বন্ধুকে যত্নমত্ন বা গরিবকে দানমান করা উচিত, একেবারে অচল। হিংসে-মিংসে করা যায়, কিন্তু ভক্তি-মক্তি করা যায় না; তেমন তেমন স্থলে খোঁচা-মোচা দেওয়া যায় কিন্তু আদর-মাদর নিষিদ্ধ। অতএব ট-এর ন্যায় ফ ও ম প্রশান্ত নিরপেক্ষ স্বভাবের নহে, ইহা নিশ্চয়।

তার পরে, কতকগুলি বিশেষ কথার বিশেষ বিকৃতি প্রচলিত আছে। সেগুলি সেই কথারই সম্পত্তি; যেমন, পড়েহড়ে বেছেগুছে মিলেজুলে খেয়েদেয়ে মিশেগুশে সেজেগুজে মেখেচুখে জুটেপুটে লুটেপুটে চুকেবুকে বকেঝকে। এইগুলি বিশেষ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।

উল্লিখিত তালিকাটি ক্রিয়াপদের। এখানে বিশেষ্য পদেরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে: কাপড়-চোপড় আশপাশ বাসন-কোসন রসকস রাবদাব গিন্নিবান্নি তাড়াহুড়ো চোটপাট চাকর-বাকর হাঁড়িকুঁড়ি[১] ফাঁকিজুকি আঁকজোক এলাগোলা এলোথেলো বেঁটেখেটে খাবার-দাবার ছুঁতোনাতা চাষাভুষো[২] অন্ধিসন্ধি অলিগলি হাবুডুবু নড়বড় হুলস্থুল।

১ সংস্কৃত ভাষায় কুণ্ডি শব্দের অর্থ পাত্রবিশেষ, সম্ভবত ইহা হইতে হাঁড়িকুঁড়ি শব্দের কুঁড়ি উৎপন্ন; এই-সকল তালিকার মধ্যে এমন আরো থাকিতে পারে যে-স্থলে এই দোসর শব্দগুলিকে অর্থহীনের কোঠায় ফেলা চলিবে না।

২ ছুঁতোনাতা শব্দে ছুতা কী নিয়ম অনুসারে ছুঁতো হইয়াছে এবং চাষাভূষা শব্দের ভূষা কী কারণে ভুষো হইল পূর্বেই তাহা বলিয়াছি।

এই দৃষ্টান্তগুলির গুটিকয়েক কথায় একটা উলটাপালটা দেখা যায়; বিকৃতিটা আগে এবং মূলশব্দটা পরে, যেমন: আশপাশ অন্ধিসন্ধি অলিগলি হাবুডুবু হুলস্থুল।

উল্লিখিত তালিকার প্রথমার্ধের শেষ অক্ষরের সহিত শেষার্ধের শেষ অক্ষরের মিল পাওয়া যায়। কতকগুলি কথা আছে যেখানে সে-মিলটুকুও নাই; যেমন: দৌড়ধাপ পুঁজিপাটা কান্নাকাটি তিতিবিরক্ত।

এইবার আমরা ক্রমে ক্রমে একটা জায়গায় আসিয়া পৌঁছিতেছি যেখানে জোড়াশব্দের দুইটি অংশই অর্থবিশিষ্ট। সে স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তাহাকে সমাসের কোঠায় ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু কেন যে তাহা সম্ভবপর নহে দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা বোঝানো যাক। ছাইভস্ম কালিকিষ্টি লজ্জা-শরম প্রভৃতি জোড়াকথার দুই অংশের একই অর্থ; এ কেবল জোর দিবার জন্য কথাগুলাকে গালভরা করিয়া তোলা হইয়াছে। এইরূপ সম্পূর্ণ সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেল:

চিঠিপত্র লোকজন ব্যাবসা-বাণিজ্য দুঃখধান্দা ছাইপাঁশ ছাইভস্ম মাথামুণ্ডু কাজকর্ম ক্রিয়াকর্ম ছোটোখাটো ছেলেপুলে ছেলে-ছোকরা খড়কুটো সাদাসিধে জাঁক-জমক বসবাস সাফ-সুৎরো ত্যাড়াবাঁকা পাহাড়-পর্বত মাপজোখ সাজসজ্জা লজ্জাশরম ভয়ডর পাকচক্র ঠাট্টা-তামাশা ইশারা-ইঙ্গিত পাখি-পাখালি জন্তু-জানোয়ার মামলা-মকদ্দমা গা-গতর খবর-বার্তা অসুখ-বিসুখ গোনা-গুনতি ভরা-ভরতি কাঙাল-গরিব গরিবদুঃখী গরিব-গুরবো রাজা-রাজড়া খাটপালং বাজনা-বাদ্য কালিকিষ্টি দয়ামায়া মায়া-মমতা ঠাকুর-দেবতা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য চালাক-চতুর শক্ত-সমর্থ গালি-গালাজ ভাবনা-চিন্তে ধর-পাকড় টানা-হ্যাঁচড়া বাঁধাছাঁদা নাচাকোঁদা বলা-কওয়া করাকর্ম।

এমন কতকগুলি কথা আছে যাহার দুই অংশের কোনো অর্থসামঞ্জস্য পাওয়া যায় না; যেমন: মেগেপেতে কেঁদেকেটে বেয়েছেয়ে জুড়েতেড়ে পুড়েঝুড়ে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আগেভাগে গালমন্দ পাকে-প্রকারে।

বাংলা ভাষায় পত্র শব্দযোগে যে-কথাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে সেগুলিকেও এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে; কারণ, গহনাপত্র শব্দে গহনা শব্দের সহিত পত্র শব্দের কোনো অর্থসামঞ্জস্য দেখা যায় না। ওইরূপ, তৈজসপত্র জিনিসপত্র খরচপত্র বিছানাপত্র ঔষধপত্র হিসাবপত্র দেনাপত্র আসবাবপত্র পুঁথিপত্র বিষয়পত্র

চোতাপত্র দলিলপত্র এবং খাতাপত্র। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনো কথায় পত্র শব্দের কিঞ্চিৎ সার্থকতা পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক স্থলে নয়।

যে-সকল জোড়াশব্দের দুই অংশের এক অর্থ নহে কিন্তু অর্থটা কাছাকাছি, তাহাদের দৃষ্টান্ত: মাল-মসলা দোকান-হাট হাঁকডাক ধীরেসুস্থে ভাব-গতিক ভাবভঙ্গি লম্ফঝম্ফ চাল-চলন পাল-পার্বণ কাণ্ড-কারখানা কালিঝুলি ঝড়ঝাপট বনজঙ্গল খানাখন্দ জোতজমা লোক-লশকর চুরি-চামারি উঁকিঝুঁকি পাঁজিপুঁথি লম্বা-চওড়া দলামলা বাছ-বিচার জ্বালা-যন্ত্রণা সাতপাঁচ নয়ছয় ছকড়া-নকড়া উনিশ-বিশ সাত-সতেরো আলাপ-পরিচয় কথাবার্তা বন-বাদাড় ঝোপঝাড় হাসিখুশি আমোদ-আহ্লাদ লোহা-লক্কড় শাক-সবজি বৃষ্টি-বাদল ঝড়তুফান লাথিঝাঁটা সেঁকতাপ আদর-অভ্যর্থনা চালচুলো চাষবাস মুটে-মজুর ছলবল।

ছাইভস্ম প্রভৃতি দুই সমানার্থক জোড়াশব্দ জোর দিবার জন্য প্রয়োগ করা হয়— মালমসলা দোকানহাট প্রভৃতি সমশ্রেণীর ভিন্নার্থক জোড়াশব্দে একটা ইত্যাদিসূচক অনির্দিষ্টতা প্রকাশ করে। কাণ্ড-কারখানা চুরি-চামারি হাসিখুশি প্রভৃতি কথাগুলির মধ্যে ভাষাও আছে আভাসও আছে।

যে-সকল পদার্থ আমরা সচরাচর একসঙ্গে দেখি তাহাদের মধ্যে বাছিয়া দুটি পদার্থের নাম একত্রে জুড়িয়া বাকিগুলাকে ইত্যাদিভাবে বুঝাইয়া দিবার প্রথাও বাংলায় প্রচলিত আছে, যেমন, ঘটিবাটি। যদি বলা যায় ঘটি-বাটি সামলাইয়ো, তাহার অর্থ এমন নহে যে, কেবল ঘটি ও বাটিই সামলাইতে হইবে, এইসঙ্গে থালা ঘড়া প্রভৃতি অনেক অস্থাবর জিনিস আসিয়া পড়ে। কাহারো সহিত মাঠে-ঘাটে দেখা হইয়া থাকে, বলিলে কেবল যে ওই দুটি মাত্র স্থানেই সাক্ষাৎ ঘটে তাহা বুঝায় না, উক্ত লোকটির সঙ্গে যেখানে-সেখানেই দেখা হয় এইরূপ বুঝিতে হয়। এইরূপ জোড়াকথার দৃষ্টান্ত: পথঘাট ঘর-দুয়োর ঘটিবাটি কাছা-কোঁচা হাতিঘোড়া বাঘ-ভাল্লুক খেলাধুলা (খেলা-দেয়ালা) পড়াশুনা খালবিল লোক-লশকর গাড়ু-গামছা লেপকাঁথা গান-বাজনা খেতখোলা কানা-খোঁড়া কালিয়া-পোলাও শাকভাত সেপাই-সান্ত্রী নাড়ি-নক্ষত্র কোলেপিঠে কাঠখড় দত্যিদানো ভূতপ্রেত।

বিপরীতার্থক শব্দ জুড়িয়া সমগ্রতা ও বৈপরীত্য বুঝাইবার দৃষ্টান্ত: আগা-গোড়া ল্যাজামুড়ো আকাশ-পাতাল দেওয়া-থোওয়া নরম-গরম আনাগোনা উলটোপালটা তোলপাড় আগা-পান্তাড়া।

এই যতপ্রকার জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেছে সংস্কৃত সমাসের সঙ্গে তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, শব্দগুলির যে-অর্থ তাহাদের ভাবটা তাহার চেয়ে বেশি এবং এই কথার জুড়িগুলি যেন একেবারে চিরদাম্পত্যে বাঁধা। বাঘভাল্লুক না বলিয়া বাঘসিংহ বলিতে গেলে একটা অত্যাচার হইবে; বনজঙ্গল এবং ঝোপঝাড় শব্দকে বনঝাড় এবং ঝোপজঙ্গল বলিলে ভাষা নারাজ হয় অথচ অর্থের অসংগতি হয় না।

এইখানে ইংরেজিতে যে-সকল ইঙ্গিত-বাক্য প্রচলিত আছে তাহার যে-কয়েকটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি; বাংলার সহিত তুলনা করিলে পাঠকেরা সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন: nick-nack riff-raff wishy-washy dilly-dally shilly-shally pit-a-pat bric-a-brac।

এই উদাহরণগুলিতে জোড়াশব্দের দ্বিতীয়ার্ধে আকারের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বাংলাতেও এইরূপ স্থলে শেষার্ধে আকারটাই আসিয়া পড়ে; যেমন, হো-হা জো-জা জোর-জার। কিন্তু যেখানে প্রথমার্ধে আকার থাকে, দ্বিতীয়ার্ধে সেখানে ওকারের প্রচলনই বেশি; যেমন, ঘা-ঘো টান-টোন টায়-টোয় ঠারে-ঠোরে। সবশেষে যদি ইকার থাকে তবে মাঝের ওকার উ হইয়া যায়, যেমন জারি-জুরি।

দ্বিতীয়ার্ধে ব্যঞ্জনবর্ণবিকারের দৃষ্টান্ত: hotch-potch higgledy-piggledy harum-scarum helter-skelter hoity-toity hurly-burly roly-poly hugger-mugger namby-pamby wishy-washy।

আমাদের যেমন টুংটাং ইংরেজিতে তেমনই ding-dong, আমাদের যেমন ঠঙাঠঙ ইংরেজিতে তেমনই ding-a-dong।

প্রথমার্ধের সহিত দ্বিতীয়ার্ধের মিল নাই এমন দৃষ্টান্ত: topsyturvy।

জোড়াশব্দের দুই অংশে মিল নাই, এমন কথা সকল ভাষাতেই দুর্লভ। মিলের দরকার আছে। মিলটা মনের উপর ঘা দেয়, তাহাকে বাজাইয়া তোলে; একটা শব্দের পরে ঠিক তাহার অনুরূপ আর-একটা শব্দ পড়িলে সচকিত মনোযোগ ঝংকৃত হইয়া উঠে, জোড়া মিলের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে মনকে সচেষ্ট করিয়া তোলে, সে সুরের সাহায্যে অনেকখানি আন্দাজ করিয়া লয়। কবিতার মিলও এই সুবিধাটুকু ছাড়ে না, ছন্দের পর্বে পর্বে বারংবার আঘাতে মনের বোধশক্তিকে জাগ্রত করিয়া রাখে; কেবলমাত্র কথা-দ্বারা মন

যতটুকু বুঝিত, মিলের ঝংকারে অনির্দিষ্টভাবে তাহাকে আরো অনেকখানি বুঝাইয়া দেয়। অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করিবার ভার যাহাকে লইতে হয় তাহাকে এইরূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে চলে না।

এইখানে আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমার আশঙ্কা হইতেছে, এই প্রবন্ধের বিষয়টি অনেকের কাছে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঠেকিবে। আমার কৈফিয়ত এই যে, বিজ্ঞানের কাছে কিছুই অবজ্ঞেয় নাই এবং প্রেমের কাছেও তদ্রূপ। আমার মতো সাহিত্যওয়ালা বিপদে পড়িয়া বিজ্ঞানের দোহাই মানিলে লোকে হাসিবে, কিন্তু প্রেমের নিবেদন যদি জানাই, বলি মাতৃভাষার কিছুই আমার কাছে তুচ্ছ নহে— তবে আশা করি কেহ নাসা কুঞ্চিত করিবেন না। মাতাকে সংস্কৃত ভাষার সমাসসন্ধি-তদ্ধিতপ্রত্যয়ে দেবীবেশে ঝলমল করিতে দেখিলে গর্ব বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে কাজকর্মের সংসারে আটপৌরে কাপড়ে তাঁহাকে গেহিনী বেশে দেখিতে যদি লজ্জা বোধ করি তবে সেই লজ্জার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।

বৈয়াকরণের যে-সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই, শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু ; কিন্তু বাংলা ভাষাকে তাহার সকলপ্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয়সাধনে আমি ক্লান্তি বোধ করি না। এই চেষ্টার ফলস্বরূপে ভাষার ভাণ্ডার হইতে যাহা কিছু আহরণ করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে তাহার এটা ওটা সকলকে দেখাইবার জন্য আনিয়া উপস্থিত করি ; ইহাতে ব্যাকরণকে চিরঋণে বদ্ধ করিতেছি বলিয়া স্পর্ধা করিব না, ভুলচুক অসম্পূর্ণতাও যথেষ্ট থাকিবে। কিন্তু আমার এই চেষ্টায় কাহারো মনে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, প্রাকৃত বাংলা ভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকার-প্রকার আছে এবং এই আকৃতি-প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণরচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টাসকল সার্থক হইবে।

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১১

বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ

মারাঠি হিন্দি প্রভৃতি অধিকাংশ গৌড়ীয় ভাষায় শব্দকে আড় করিয়া বলিবার একটা প্রথা আছে। যেমন হিন্দিতে 'কুত্তা' সহজরূপ, 'কুত্তে' বিকৃতরূপ। 'ঘোড়া' সহজরূপ, 'ঘোড়ে' বিকৃতরূপ। মারাঠিতে ঘর ও ঘরা, বাপ ও বাপা, জিভ ও জিভে ইহার দৃষ্টান্ত।

এই বিকৃতরূপকে ইংরেজি পারিভাষিকে oblique form বলা হয়; আমরা তাহাকে তির্যক্‌রূপ নাম দিব।

অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষাতেও তির্যক্‌রূপের দৃষ্টান্ত আছে।

যেমন বাপা, ভায়া (ভাইয়া), চাঁদা, লেজা, ছাগলা, পাগলা, গোরা, কালা, আমা, তোমা, কাগাবগা (কাকবক), বাদলা, বামনা, কোণা ইত্যাদি।

সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় এই তির্যক্‌রূপের প্রচলন অধিক ছিল। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত প্রাচীন বাক্য হইতে বুঝা যাইবে।

'নরা গজা বিশে শয়।'

'গণ' শব্দের তির্যক্‌রূপ 'গণা' কেবলমাত্র 'গণাগুষ্টি' শব্দেই টিঁকিয়া আছে। 'মুড়া' শব্দের সহজরূপ 'মুড়' 'মাথা-মোড় খোঁড়া' 'ঘাড়-মুড় ভাঙা' ইত্যাদি শব্দেই বর্তমান। যেখানে আমরা বলি 'গড়গড়া ঘুমচ্চে' সেখানে এই 'গড়া' শব্দকে 'গড়' শব্দের তির্যক্‌রূপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। 'গড় হইয়া প্রণাম করা' ও 'গড়ানো' ক্রিয়াপদে 'গড়' শব্দের পরিচয় পাই। 'দেব' শব্দের তির্যক্‌রূপ 'দেবা' ও 'দেয়া'। মেঘ ডাকা ও ভূতে পাওয়া সম্বন্ধে 'দেয়া' শব্দের ব্যবহার আছে। 'যেমন দেবা তেম্‌নি দেবী' বাক্যে 'দেবা' শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলায় কাব্যভাষায় 'সব' শব্দের তির্যক্‌রূপ 'সবা' এখনো ব্যবহৃত হয়। যেমন আমাসবা, তোমাসবা, সবারে, সবাই। কাব্য-ভাষায় 'জন' শব্দের তির্যক্‌রূপ 'জনা'। সংখ্যাবাচক বিশেষণের সঙ্গে 'জন' শব্দের যোগ হইলে চলিত ভাষায় তাহা অনেক স্থলেই 'জনা' হয়। একজনা, দুইজনা ইত্যাদি। 'জনাজনা' শব্দের অর্থ প্রত্যেক জন। আমরা বলিয়া থাকি 'একো জনা একো রকম'।

তির্যক্‌রূপে সহজরূপ হইতে অর্থের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা ঘটে এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। 'হাত' শব্দকে নির্জীব পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহার কালে তাহাকে তির্যক্

করিয়া লওয়া হইয়াছে, যেমন জামার হাতা, অথবা পাকশালার উপকরণ হাতা। 'পা' শব্দের সম্বন্ধেও সেইরূপ 'চৌকির পায়া'। 'পায়া ভারি' প্রভৃতি বিদ্রূপসূচক বাক্যে মানুষের সম্বন্ধে 'পায়া' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সজীব প্রাণী সম্বন্ধে যাহা খুর, খাট প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাই খুরা। কান শব্দ কলস প্রভৃতির সংস্রবে প্রয়োগ করিবার বেলা 'কানা' হইয়াছে। 'কাঁধা' শব্দও সেইরূপ।

খাঁটি বাংলা ভাষার বিশেষণপদগুলি প্রায়ই হলন্ত নহে এ কথা রামমোহন রায় তাঁহার বাংলা ব্যাকরণে প্রথম নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত শব্দ 'কাণ' বাংলায় তাহা 'কানা'। সংস্কৃত 'খঞ্জ' বাংলায় 'খোঁড়া'। সংস্কৃত 'অর্ধ' বাংলা 'আধা'। শাদা, রাঙা, বাঁকা, কালা, খাঁদা, পাকা, কাঁচা, মিঠা ইত্যাদি বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। 'আলো' বিশেষ্য, 'আলা' বিশেষণ। 'ফাঁক' বিশেষ্য 'ফাঁকা' বিশেষণ। 'মা' বিশেষ্য, 'মায়্যা' (মায়্যা মানুষ) বিশেষণ। এই আকার প্রয়োগের দ্বারা বিশেষণ নিষ্পন্ন করা ইহাও বাংলা ভাষায় তির্যক্‌রূপের দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

মারাঠিতে তির্যক্‌রূপে আকার ও একার দুই স্বরবর্ণের যেমন ব্যবহার দেখা যায় বাংলাতেও সেইরূপ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে আকারের ব্যবহার বিশেষ কয়েকটি মাত্র শব্দে বদ্ধ হইয়া আছে; তাহা সজীব ভাবে নাই, কিন্তু একারের ব্যবহার এখনো গতিবিশিষ্ট।

'পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়' এই বাক্যে 'পাগলে' ও 'ছাগলে' শব্দে যে একার দেখিতেছি তাহা উক্ত প্রকার তির্যক্‌রূপের একার। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর তির্যক্‌রূপ কোন্ কোন্ স্থলে ব্যবহৃত হয় আমরা তাহার আলোচনা করিব।

সা মা ন্য বি শে ষ্য : বাংলায় নাম সংজ্ঞা (Proper names) ছাড়া অন্যান্য বিশেষ্যপদে যখন কোনো চিহ্ন থাকে না, তখন তাহাদিগকে সামান্য বিশেষ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যেমন, বানর, টেবিল, কলম, ছুরি ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিশেষ্যপদগুলির দ্বারা সাধারণভাবে সমস্ত বানর, টেবিল, চৌকি, ছুরি বুঝাইতেছে, কোনো বিশেষ এক বা একাধিক বানর, টেবিল, চৌকি, ছুরি বুঝাইতেছে না বলিয়াই ইহাদিগকে সামান্য বিশেষ্য পদ নাম দেওয়া হইয়াছে। বলা আবশ্যক ইংরেজি common names ও বাংলা

সামান্ত বিশেষ্যে প্রভেদ আছে। বাংলায় আমরা যেখানে বলি 'এইখানে ছাগল আছে' সেখানে ইংরেজিতে বলে 'There is a goat here' কিংবা 'There are goats here'। বাংলায় এ স্থলে সাধারণভাবে বলা হইতেছে ছাগলজাতীয় জীব আছে। তাহা কোনো একটি বিশেষ ছাগল বা বহু ছাগল তাহা নির্দেশ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই, কিন্তু ইংরেজিতে এরূপ স্থলেও বিশেষ্যপদকে article-যোগে বা বহুবচনের চিহ্নযোগে বিশেষ-ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। ইংরেজিতে যেখানে বলে 'There is a bird in the cage' বা 'There are birds in the cage' আমরা উভয় স্থলেই বলি 'খাঁচায় পাখি আছে'— কারণ এ স্থলে খাঁচার পাখি এক কিংবা বহু তাহা বক্তব্য নহে কিন্তু খাঁচার মধ্যে পাখি নামক পদার্থ আছে ইহাই বক্তব্য। এই কারণে, এ-সকল স্থলে বাংলায় সামান্ত বিশেষ্যপদই ব্যবহৃত হয়।

এই সামান্ত বিশেষ্যপদ যখন জীববাচক হয় প্রায় তখনই তাহা তির্যক্‌রূপ গ্রহণ করে। কখনো বলি না, 'গাছে নড়ে', বলি 'গাছ নড়ে'। কিন্তু 'বানরে লাফায়' বলিয়া থাকি। কেবল কর্তৃকারকেই এই শ্রেণীর তির্যক্‌রূপের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু তাহার বিশেষ নিয়ম আছে।

প্লেগে ধরে বা ম্যালেরিয়ায় ধরে— এরকম স্থলে প্লেগ ও ম্যালেরিয়া বস্তুত অচেতন পদার্থ। কিন্তু আমরা বলিবার সময় উহাতে চেতনতা আরোপ করিয়া উহাকে আক্রমণ ক্রিয়ার সচেষ্টক কর্তা বলিয়াই ধরি। তাই উহা রূপকভাবে চেতন বাচকের পর্যায় স্থান লাভ করিয়া তির্যক্‌রূপ প্রাপ্ত হয়।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে সকর্মক ক্রিয়ার সহযোগেই জীববাচক সামান্ত বিশেষ্যপদ কর্তৃকারকে তির্যক্‌রূপ ধারণ করে। 'এই ঘরে ছাগলে আছে' বলি না কিন্তু 'ছাগলে ঘাস খায়' বলা যায়। বলি 'পোকায় কেটেছে', কিন্তু অকর্মক 'লাগা' ক্রিয়ার বেলায় 'পোকা লেগেছে'। 'তাকে ভূতে পেয়েছে' বলি, 'ভূত পেয়েছে' নয়। পাওয়া ক্রিয়া সকর্মক।

কিন্তু এই সকর্মক ও অকর্মক শব্দটি এখানে সম্পূর্ণ খাটিবে না। ইহার পরিবর্তে বাংলায় নূতন শব্দ তৈরি করা আবশ্যক। আমরা এ স্থলে 'সচেষ্টক' ও 'অচেষ্টক' শব্দ ব্যবহার করিব। কারণ প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে সকর্মক ক্রিয়ার সংশ্রবে উহ্য বা ব্যক্তভাবে কর্ম থাকা চাই কিন্তু আমরা যে শ্রেণীর ক্রিয়ার কথা বলিতেছি তাহার কর্ম না থাকিতেও পারে। 'বানরে লাফায়'

এই বাক্যে 'বানর' শব্দ তির্যক্‌রূপ গ্রহণ করিয়াছে, অথচ 'লাফায়' ক্রিয়ার কর্ম নাই। কিন্তু 'লাফানো' ক্রিয়াটি সচেষ্টক।

'আছে' এবং 'থাকে' এই দুইটি ক্রিয়ার পার্থক্য চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, 'আছে' ক্রিয়াটি অচেষ্টক কিন্তু 'থাকে' ক্রিয়া সচেষ্টক— সংস্কৃত 'অস্তি' এবং 'তিষ্ঠতি' ইহার প্রতিশব্দ। 'আছে' ক্রিয়ার কর্তৃকারকে তির্যক্‌রূপ স্থান পায় না— 'ঘরে মানুষে আছে' বলা চলে না কিন্তু 'এ ঘরে কি মানুষে থাকতে পারে' এরূপ প্রয়োগ সংগত।

'প্লেগে স্ত্রীলোকেই অধিক মরে' এ স্থলে মরা ক্রিয়া অচেষ্টক সন্দেহ নাই। 'বেশি আদর পেলে ভালো মানুষেও বিগড়ে যায়', 'অধ্যবসায়ের দ্বারা মূর্খেও পণ্ডিত হ'তে পারে', 'অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কায় বীরপুরুষেও ভীত হয়' এ-সকল অচেষ্টক ক্রিয়ার দৃষ্টান্তে আমার নিয়ম খাটে না। বস্তুত এই নিয়মে ব্যতিক্রম যথেষ্ট আছে।

কিন্তু 'আছে' ক্রিয়ার স্থলে কর্তৃপদে একার বসে না, এ নিয়মের ব্যতিক্রম এখনো ভাবিয়া পাই নাই।

আসা এবং যাওয়া ক্রিয়াটি যদিও সাধারণত সচেষ্টক, তবু তাহাদের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত নিয়মটি ভালোরূপে খাটে না। আমরা বলি 'সাপে কামড়ায়' বা 'কুকুরে আঁচড়ায়' কিন্তু 'সাপে আসে' বা 'কুকুরে যায়' বলি না। অথচ 'যাতায়াত করা' ক্রিয়ার অর্থ যদিচ যাওয়া আসা করা, সেখানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। আমরা বলি এ পথ দিয়ে মানুষে যাতায়াত করে, বা 'যাওয়া আসা করে' বা 'আনাগোনা করে'। কারণ, 'করে' ক্রিয়াযোগে আসা যাওয়াটা নিশ্চিতভাবেই সচেষ্টক হইয়াছে। 'খেতে যায়' বা 'খেতে আসে' প্রভৃতি সংযুক্ত ক্রিয়াপদেও এ নিয়ম অব্যাহত থাকে— যেমন, 'এই পথ দিয়ে বাঘে জল খেতে যায়'।

'সকল' ও 'সব' শব্দ সচেষ্টক অচেষ্টক উভয় শ্রেণীর ক্রিয়া-সহযোগেই তির্যক্‌রূপ লাভ করে। যথা, এ ঘরে সকলেই আছেন বা সবাই আছে।

ইহার কারণ এই যে, 'সকল' ও 'সব' শব্দ দুটি বিশেষণপদ। ইহারা তির্যক্‌রূপ ধারণ করিলে তবেই বিশেষ্যপদ হয়। 'সকল' ও 'সব' শব্দটি হয় বিশেষণ, নয় অন্য শব্দের যোগে বহুবচনের চিহ্ন— কিন্তু 'সকলে' বা 'সবে' বিশেষ্য। কথিত বাংলায় 'সব' শব্দটি বিশেষ্যরূপ গ্রহণকালে দ্বিগুণভাবে

তির্যক্‌রূপ প্রাপ্ত হয়— প্রথমত 'সব' হইতে হয় 'সবা' তাহার পরে পুনশ্চ তাহাতে এ যোগ হইয়া হয় 'সবাএ'। এই 'সবাএ' শব্দকে আমরা 'সবাই' উচ্চারণ করিয়া থাকি।

'জন' শব্দ 'সব' শব্দের ন্যায়। বাংলায় সাধারণত 'জন' শব্দ বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হয়। একজন লোক, দুজন মানুষ ইত্যাদি। বস্তুত মানুষের পূর্বে সংখ্যা যোগ করিবার সময় আমরা তাহার সঙ্গে 'জন' শব্দ যোজনা করিয়া দিই। পাঁচ মানুষ কখনোই বলি না, পাঁচজন মানুষ বলি। কিন্তু এই 'জন' শব্দকে যদি বিশেষ্য করিতে হয় তবে ইহাকে তির্যক্‌রূপ দিয়া থাকি। দুজনে, পাঁচজনে ইত্যাদি। 'সবাএ' শব্দের ন্যায় 'জনাএ' শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে— এক্ষণে ইহা 'জনায়' রূপে লিখিত হয়।

বাংলায় 'অনেক' শব্দটি বিশেষণ। ইহাও বিশেষ্যরূপ গ্রহণকালে 'অনেকে' হয়। সর্বত্রই এ নিয়ম খাটে। 'কালোএ' (কালোয়) যার মন ভুলেছে 'শাদাএ' (শাদায়) তার কি করবে।' এখানে কালো ও শাদা বিশেষণপদ তির্যক্‌রূপ ধরিয়া বিশেষ্য হইয়াছে। 'অপর' 'অন্য' শব্দ বিশেষণ কিন্তু 'অপরে' 'অন্যে' বিশেষ্য। 'দশ' শব্দ বিশেষণ, 'দশে' বিশেষ্য (দশে যা বলে)।

নামসংজ্ঞা সম্বন্ধে এ-প্রকার তির্যক্‌রূপ ব্যবহার হয় না— কখনো বলি না, 'যাদবে ভাত খাচ্চে'। তাহার কারণ পূর্বেই নির্দেশ করা হইয়াছে, বিশেষ নাম কখনো সামান্য বিশেষ্যপদ হইতে পারে না। বাংলায় একটি প্রবাদবাক্য আছে 'রামে মারলেও মরব রাবণে মারলেও মরব।' বস্তুত এখানে 'রাম' ও 'রাবণ' সামান্য বিশেষ্যপদ— এখানে উক্ত দুই শব্দের দ্বারা দুই প্রতিপক্ষকে বুঝাইতেছে। কোনো বিশেষ রাম-রাবণকে বুঝাইতেছে না।

তির্যক্‌রূপের মধ্যে প্রায়ই একটি সমষ্টিবাচকতা থাকে। যথা 'আত্মীয়ে তাকে ভাত দেয় না।' এখানে আত্মীয় সমষ্টিই বুঝাইতেছে। এইরূপ 'লোকে বলে।' এখানে 'লোকে' অর্থ সর্বসাধারণে। 'লোক বলে' কোনোমতেই হয় না। সমষ্টি যখন বুঝায় তখন 'বানরে বাগান নষ্ট করিয়াছে' ইহাই ব্যবহার্য— 'বানর করিয়াছে' বলিলে বানর দল বুঝাইবে না।

সংখ্যা-সহযোগে বিশেষ্যপদ যদিচ সামান্যতা পরিহার করে তথাপি সকর্মক রূপে তাহাদের প্রতিও একার প্রয়োগ হয়, যেমন 'তিন শেয়ালে যুক্তি করে গর্তে ঢুকল', এমন-কি 'আমরা' 'তোমরা' 'তারা' ইত্যাদি সর্বনাম বিশেষণের

দ্বারা বিশেষ্যপদ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইলেও সংখ্যায় সংশ্রবে তাহারা তির্যক্‌রূপ গ্রহণ করে। যেমন, 'তোমরা দুই বন্ধুতে' 'সেই দুটো কুকুরে' ইত্যাদি।

অনেকের মধ্যে বিশেষ একাংশ যখন এমন কিছু করে অপরাংশ যাহা করে না তখন কর্তৃপদে তির্যক্‌রূপ ব্যবহার হয়। যথা 'তাদের মধ্যে দুজনে গেল দক্ষিণে'— এরূপ বাক্যের মধ্যে একটি অসমাপ্তি আছে। অর্থাৎ আর কেহ আর কোনো দিকে গিয়াছে বা বাকি কেহ যায় নাই এরূপ বুঝাইতেছে। যখন বলি 'একজনে বললে হাঁ' তখন 'আর-একজন বললে না' এমন আর-একটা কিছু শুনিবার অপেক্ষা থাকে। কিন্তু যদি বলা যায় 'একজন বললে, হাঁ' তবে সেই সংবাদই পর্যাপ্ত।

তির্যক্‌রূপে হলন্ত শব্দে একার যোজনা সহজ, যেমন বানর বানরে। (বাংলায় বানর শব্দ হলন্ত)। অকারান্ত, আকারান্ত এবং ওকারান্ত শব্দের সঙ্গেও 'এ' যোজনায় বাধা নাই— 'ঘোড়াএ' (ঘোড়ায়) 'পেঁচোএ' (পেঁচোয়) ইত্যাদি। এতদ্‌ব্যতীত অন্য স্বরান্ত শব্দে 'এ' যোগ করিতে হইলে 'ত' ব্যঞ্জন-বর্ণকে মধ্যস্থ করিতে হয়। যেমন 'গোরুতে', ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের শেষে যখন ব্যঞ্জনকে আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ স্বর থাকে তখন 'ত'কে মধ্যস্থরূপে প্রয়োজন হয় না। যেমন উই, উইএ (উইয়ে), বউ, বউএ (বউয়ে) ইত্যাদি। এ কথা মনে রাখা আবশ্যক বাংলায় বিভক্তিরূপে যেখানে একার প্রয়োগ হয় সেখানে প্রায় সর্বত্রই বিকল্পে 'তে' প্রয়োগ হইতে পারে। এই-জন্য 'ঘোড়ায় লাথি মেরেছে' এবং 'ঘোড়াতে লাথি মেরেছে' দুইই হয়। 'উইয়ে নষ্ট করেছে' এবং 'উইতে' বা 'উইয়েতে' নষ্ট করেছে।' হলন্ত শব্দে এই 'তে' বিভক্তি গ্রহণকালে তৎপূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে পুনশ্চ একার যোগ করিতে হয়। যেমন 'বানরেতে', 'ছাগলেতে'।

আষাঢ় ১৩১৮

বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য[1]

আমরা পূর্বে এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, বাংলায় নামসংজ্ঞা ছাড়া বিশেষ্যপদবাচক শব্দ মাত্রই সহজ অবস্থায় সামান্য বিশেষ্য। অর্থাৎ তাহা জাতিবাচক। যেমন শুধু 'কাগজ' বলিলে বিশেষভাবে একটি বা অনেকগুলি কাগজ বোঝায় না, তাহার দ্বারা সমস্ত কাগজকেই বোঝায়।

এমন স্থলে যদি কোনো বিশেষ কাগজকে আমরা নির্দেশ করিতে চাই তবে সেজন্য বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা আবশ্যক হয়।

ইংরেজি ব্যাকরণে এইরূপ নির্দেশক চিহ্নকে Article বলে। বাংলাতেও এই শ্রেণীর সংকেত আছে। সেই সংকেতের দ্বারা সামান্য বিশেষ্যপদ একবচন ও বহুবচন রূপ ধারণ করিয়া বিশেষ বিশেষ্যে পরিণত হয়। এ কথা মনে রাখা কর্তব্য, বিশেষ্যপদ, একবচন বা বহুবচনরূপ গ্রহণ করিলেই, সামান্যতা পরিহার করে। একটি ঘোড়া বা তিনটি ঘোড়া বলিলেই ঘোড়া শব্দের জাতিবাচক অর্থ সংকীর্ণ হইয়া আসে— তখন বিশেষ এক বা একাধিক ঘোড়া বোঝায়— সুতরাং তখন তাহাকে সামান্য বিশেষ্য না বলিয়া বিশেষ বিশেষ্য বলাই উচিত। এই কথা চিন্তা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন আমাদের সামান্য বিশেষ্য এবং ইংরেজি Common name এক নহে।

---

১ বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ নামক প্রবন্ধে, বাংলায় বিশেষ বিশেষ স্থলে কর্তৃকারকে একারযোগে যে রূপ হয় তাহাকে তির্যক্‌রূপ নাম দিয়াছিলাম। তাহাতে কোনো পাঠক আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহাকে বলা উচিত কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি। নাম লইয়া তর্ক নিষ্ফল। নাহয় নাই বলিলাম 'তির্যক্‌রূপ'— নাহয় আর-কোনো নাম দেওয়া গেল। আমার বক্তব্য এই ছিল যে, কোনো কোনো স্থলে বাংলা বিশেষ্যপদ তাহার সহজরূপ পরিত্যাগ করে। তাহার এই রূপের বিকারকেই অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সহিত তুলনা করিয়া 'তির্যক্‌রূপ' নাম দিয়াছিলাম। ঘোড়ে, কুত্তে প্রভৃতি হিন্দি শব্দই হিন্দি তির্যক্‌রূপের দৃষ্টান্ত; ঘোড়্‌ওয়া কাহারওয়া প্রভৃতি শব্দ নহে— অন্তত তুলনামূলক ব্যাকরণবিদ্‌গণ শেষোক্তগুলিকে তির্যক্‌রূপের দৃষ্টান্ত বলিয়া ব্যবহার করেন নাই। দ্বিতীয় কথা এই— বাংলা কর্তৃকারকের একার-সংযুক্ত রূপকে যদি সংস্কৃত কোনো বিভক্তির নাম দিতেই হয় তবে আমার মতে তাহা সপ্তমী নহে তৃতীয়া। বাংলা 'বাঘে খাইল' বাক্যটি সংস্কৃত 'ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ' বাক্য হইতে উৎপন্ন এমন অনুমান করা যাইতেও পারে। যাহাই হউক এ-সকল অনুমানের কথা। আমার সে প্রবন্ধে আসল কথাটা ব্যাকরণের নাম নহে, ব্যাকরণের নিয়ম।

বিশেষ বিশেষ্য একবচন

মোটামুটি বলা যাইতে পারে বাংলার নির্দেশক চিহ্নগুলি শব্দের পূর্বে না বসিয়া শব্দের পরেই যোজিত হয়। ইংরেজিতে 'the room'— বাংলায় 'ঘরটি'। এখানে 'টি' নির্দেশক চিহ্ন।

টি ও টা

ইংরেজিতে the আর্টিক্‌ল্ একবচন এবং বহুবচন উভয়ত্রই বসে কিন্তু বাংলায় টি ও টা সংকেতের দ্বারা একটিমাত্র পদার্থকে বিশিষ্ট করা হয়। যখন বলা হয়, 'রাস্তা কোন্ দিকে' তখন সাধারণভাবে পথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়— যখন বলি, 'রাস্তাটা কোন্ দিকে'— তখন বিশেষ একটা রাস্তা কোন্ দিকে সেই সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হয়।

ইংরেজিতে 'the' শব্দের প্রয়োগ যত ব্যাপক বাংলায় 'টি' তেমন নহে। আমাদের ভাষায় এই প্রয়োগ সম্বন্ধে মিতব্যয়িতা আছে। সেইজন্যে যখন সাধারণভাবে আমরা খবর দিতে চাই, মধু বাহিরে নাই, তখন আমরা শুধু বলি, মধু ঘরে আছে— ঘর শব্দের সঙ্গে কোনো নির্দেশক চিহ্ন যোজনা করি না। কারণ ঘরটাকেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই। ইংরেজিতে এ স্থলেও 'the room' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কোনো একটি বিশেষ ঘরে মধু আছে এই সংবাদটি দিবার প্রয়োজন ঘটে তখন আমরা বলি, ঘরটাতে মধু আছে। এইরূপ, যে বাক্যে একাধিক বিশেষ্যপদ আছে তাহাদের মধ্যে বক্তা যেটিকে বিশেষভাবে নির্দেশ করিতে চান সেইটির সঙ্গেই নির্দেশক যোজনা করেন। যেমন, গোরুটা মাঠে চরছে, বা মাঠটাতে গোরু চরছে। জাজিমটা ঘরে পাতা, বা ঘরটাতে জাজিম পাতা। 'আমার মন খারাপ হয়ে গেছে' বা 'আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে'— দুইই আমরা বলি। প্রথম বাক্যে, মন খারাপ হওয়া ব্যাপারটাই বলা হইতেছে— দ্বিতীয় বাক্যে, আমার মনই যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহার উপরেই ঝোঁক।

'টি' সংকেতটি ছোটো আয়তনের জিনিস ও আদরের জিনিস সম্বন্ধে এবং 'টা' বড়ো জিনিস সম্বন্ধে বা অবজ্ঞা কিংবা অপ্রিয়তা বুঝাইবার স্থলে বসে। যে পদার্থ সম্বন্ধে আদর বা অনাদর কিছুই বোঝায় না, তৎসম্বন্ধেও 'টা' প্রয়োগ

হয়। 'ছাতাটি কোথায়' এই বাক্যে ছাতার প্রতি বক্তার একটু যত্ন প্রকাশ হয়, কিন্তু 'ছাতাটা কোথায়' বলিলে যত্ন বা অযত্ন কিছুই বোঝায় না।

সাধারণত নামসংজ্ঞার সহিত 'টা' 'টি' বসে না। কিন্তু বিশেষ কারণে ঝোঁক দিতে হইলে নামসংজ্ঞার সঙ্গেও নির্দেশক বসে। যেমন, হরিটা বাড়ি গেছে। সম্ভবত হরির বাড়ি যাওয়া বক্তার পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই, টা তাহাই বুঝাইল। 'রামটি মারা গেছে', এখানে বিশেষভাবে করুণা প্রকাশের জন্য টি বসিল। এইরূপ, শ্যামটা ভারি দুষ্ট, শৈলটি ভারি ভালো মেয়ে। এইরূপে টি ও টা অনেক স্থলে বিশেষ পদের সঙ্গে বক্তার হৃদয়ের সুর মিশাইয়া দেয়। বলা আবশ্যক মান্য ব্যক্তির নাম সম্বন্ধে টি বা টা ব্যবহার হয় না।

সামান্যতাবাচক বা সমষ্টিবাচক বিশেষ্যপদকেও বিশেষভাবে নির্দেশ করিতে হইলে নির্দেশক প্রয়োগ করা যায়। যেমন, 'গিরিডির কয়লাটা ভালো', 'বেহারের মাটিটা উর্বরা', 'এখানে মশাটা বড়ো বেশি', 'ভীম নাগ সন্দেশটা করে ভালো'। কিন্তু শুদ্ধ অস্তিত্ব জ্ঞাপনের সময় এরূপ প্রয়োগ খাটে না ; বলা যায় না, 'ভীমের দোকানে সন্দেশটা আছে।'

এখানে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যখন বলা যায় 'বেহারের মাটিটা উর্বরা' বা 'ভীমের দোকানের সন্দেশটা ভালো' তখন প্রশংসা সূচনা সত্ত্বেও 'টা' নির্দেশক ব্যবহার হয় তাহার কারণ এই যে, এই বিশেষ্যপদগুলিতে যে-সকল বস্তু বুঝাইতেছে তাহা পরিমাণে অল্প নহে।

যখন আমরা কর্তৃবাচক বিশেষ্যকে সাধারণভাবে উল্লেখ করিয়া পরিচয়বাচক বিশেষ্যকে বিশেষভাবে নির্দেশ করি, তখন শেষোক্ত বিশেষ্যের সহিত নির্দেশক যোগ হয়। যেমন, 'হরি মানুষটা ভালো', 'বাঘ জন্তুটা ভীষণ'।

সাধারণত গুণবাচক বিশেষ্যে নির্দেশক যোগ হয় না— বিশেষত শুদ্ধমাত্র অস্তিত্ব জ্ঞাপনকালে তো হয়ই না। যেমন, আমরা বলি, 'রামের সাহস আছে।' কিন্তু 'রামের সাহসটা কম নয়', 'উমার লজ্জাটা বেশি' বলিয়া উমার বিশেষ লজ্জা ও রামের বিশেষ সাহসের উল্লেখকালে টা প্রয়োগ করি।

ইংরেজিতে 'this' 'my' প্রভৃতি সর্বনাম বিশেষণপদ থাকিলে বিশেষ্যের পূর্বে আর্টিক্‌ল্‌ বসে না কিন্তু বাংলায় তাহার বিপরীত। এরূপ স্থলে বিশেষ করিয়াই নির্দেশক বসে। যেমন, 'এই বইটা', 'আমার কলমটি'।

বিশেষণপদের সঙ্গে 'টা' 'টি' যুক্ত হয় না। যদি যুক্ত হয় তবে তাহা

বিশেষ্য হইয়া যায়। যেমন, 'অনেকটা নষ্ট হয়েছে', 'অর্ধেকটা রাখো', 'একটা দাও', 'আমারটা লও', 'তোমরা কেবল মন্দটাই দেখো' ইত্যাদি।

নির্দেশক-চিহ্ন-যুক্ত বিশেষ্যপদে কারকের চিহ্নগুলি নির্দেশকের সহিত যুক্ত হয়। যেমন, 'মেয়েটির', 'লোকটাকে', 'বাড়িটাতে' ইত্যাদি।

অচেতন পদার্থবাচক বিশেষ্যপদে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তিচিহ্ন প্রায় বসে না। কিন্তু 'টি' 'টা'-র সহযোগে বসিতে পারে। যেমন, 'লোহাটাকে', 'টেবিলটিকে' ইত্যাদি।

ক্রোশটাক্ সেরটাক্ প্রভৃতি দূরত্ব ও পরিমাণ -বাচক শব্দের 'টাক্' প্রত্যয়টি টা ও এক শব্দের সন্ধিজাত। কিন্তু এই 'টাক্' প্রত্যয়যোগে উক্ত শব্দগুলি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন ক্রোশটাক্ পথ, সেরটাক্ দুধ ইত্যাদি। কেহ কেহ মনে করেন এগুলি বিশেষণ নহে। কারণ, বিশেষ্য ভাবেও উহাদের প্রয়োগ হয়। যেমন, 'ক্রোশটাক্ গিয়েই বসে পড়ল', 'পোয়াটাক্ হলেই চলবে'।

যদিচ সাধারণত টি টা প্রভৃতি নির্দেশক সংকেত বিশেষণের সহিত বসে না, তবু এক স্থলে তাহার ব্যতিক্রম আছে। সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত নির্দেশক যুক্ত হইয়া বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, একটা গাছ, দুইটি মেয়ে ইত্যাদি।

বাংলায় ইংরেজি Indefinite article-এর অনুরূপ শব্দ, একটি, একটা। একটা মানুষ বলিলে অনির্দিষ্ট কোনো একজন মানুষ বুঝায়। 'একটা মানুষ ঘরে এল' এবং 'মানুষটা ঘরে এল' এই দুই বাক্যের মধ্যে অর্থভেদ এই— প্রথম বাক্যে যে হউক একজন মানুষ ঘরে আসিল এই তথ্য বলা হইতেছে, দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষ কোনো একজন মানুষের কথা বলা হইতেছে।

কিন্তু 'একটা' বা 'একটি' যখন বিশেষভাবে এক সংখ্যাকে জ্ঞাপন করে তখন তাহাকে indefinite বলা চলে না। ইংরেজিতে তাহার প্রতিশব্দ one। সেখানে একটা লোক মানে এক সংখ্যক লোক, কোনো একজন অনির্দিষ্ট লোক নহে।

যেখানে 'এক' শব্দটি অপর একটি বিশেষণের পরে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় সেখানে সাধারণত 'টি' 'টা' প্রয়োগ চলে না, যেমন, লম্বা-এক ফর্দ, মস্ত-এক বাবু, সাতহাত-এক লাঠি।

বলা বাহুল্য, এক ভিন্ন অন্য সংখ্যা সহযোগে যেখানে টি, টা বসে সেখানে তাহাকে Indefinite article-এর সহিত তুলনীয় করা চলে না, সেখানে তাহা সংখ্যাবাচক বিশেষণ।

খানি, খানা প্রভৃতি আরো কয়েকটি নির্দেশক চিহ্ন আছে, তাহাদের কথা পরে হইবে।

বলা আবশ্যক সংস্কৃতের অনুকরণ করিতে গিয়া বাংলা লিখিত ভাষায় নির্দেশক সংকেতের ব্যবহার বিরল হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত রীতির পক্ষপাতী তাঁহাদের রচনায় ইহা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেহেতু বাংলায় বক্তা ইচ্ছা করিলে কোনো একটি বিশেষ্যপদকে বিশেষভাবে নির্দেশ করিতেও পারেন নাও করিতে পারেন সেইজন্য ইহাকে বর্জন করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক রীতিকে ত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে দুর্বল করা হয়। আধুনিক কালের লেখকগণ মাতৃভাষার সমস্ত স্বকীয় সম্পদগুলিকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়া ক্রমশই ভাষাকে প্রাণপূর্ণ ও বেগবান করিয়া তুলিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।[১]

ভাদ্র ১৩১৮

১ এই প্রবন্ধে নির্দেশক নামক একটি নূতন পারিভাষিক ব্যবহার করিয়াছি। পাঠকদের প্রতি আমার নিবেদন, এইরূপ নামকরণ অভাবে ঠেকিয়া দায়ে পড়িয়া করিতে হয়। ইহাদের সম্বন্ধে আমার কোনো মমতা বা অভিমান নাই। এই-সকল নামকে উপলক্ষ করিয়া ভাষার মর্মগত সমস্ত নিয়মের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার মধ্যে ভুল ও অসম্পূর্ণতা থাকাই সম্ভব। কারণ বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলিয়া গণ্য করিয়া তাহার নিয়ম আলোচনার চেষ্টা তেমন করিয়া হয় নাই। পাঠকগণ আমার এই ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রবন্ধের ভুল সংশোধন ও অভাব পূরণ করিয়া দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

বাংলা নির্দেশক

আমরা বাংলা ভাষার নির্দেশক চিহ্ন 'টি' ও 'টা' সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই শ্রেণীর সংকেত আরো কয়েকটি আছে।

খানি ও খানা

বাংলা ভাষায় 'গোটা' শব্দের দ্বারা অখণ্ডতা বুঝায়। এই কারণে, এই 'গোটা' শব্দেরই অপভ্রংশ 'টা' চিহ্ন পদার্থের সমগ্রতা সূচনা করে। হরিণটা, টেবিলটা, মাঠটা, শব্দে একটা সমগ্র পদার্থ বুঝাইতেছে।

বাংলা ভাষার অপর একটি একত্ব নির্দেশক চিহ্ন খানা, খানি। 'খণ্ড' শব্দ হইতে উহার উৎপত্তি। এখনো বাংলায় 'খান্ খান্' শব্দের দ্বারা খণ্ড খণ্ড বুঝায়।

ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, এক-একটি সমগ্র বস্তুকে বুঝাইতে 'টা' চিহ্নের প্রয়োগ এবং এক-একটি খণ্ডকে বুঝাইতে 'খানা' চিহ্নের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

গোড়ায় কী ছিল বলিতে পারি না, এখন কিন্তু এরূপ দেখা যায় না। আমরা বলি কাগজখানা, শ্লেটখানা। এই কাগজ ও শ্লেট সমগ্র পদার্থ হইলেও আসে যায় না।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যে-সকল সামগ্রী দীর্ঘ প্রস্থ বেধে সম্পূর্ণ, সাধারণত তাহাদের সম্বন্ধে 'খানা' ব্যবহার হয় না। যে জিনিসকে প্রস্থের প্রসারের দিক হইতেই দেখি, লম্বের বা বেধের দিক হইতে নয় প্রধানত তাহারই সম্বন্ধে 'খানা' ও 'খানি'র যোগ। মাঠখানা, ক্ষেতখানা; কিন্তু পাহাড়খানা নদীখানা নয়। থালখানা, খাতাখানা; কিন্তু ঘটিখানা বাটিখানা নয়। লুচিখানা, কচুরিখানা; কিন্তু সন্দেশখানা মেঠাইখানা নয়। শালপাতাখানা, কলাপাতা-খানা; কিন্তু আমখানা কাঁঠালখানা নয়।

এই যে নিয়মের উল্লেখ করা গেল ইহা সর্বত্র খাটে না। যে জিনিস পাতলা নহে তাহার সম্বন্ধেও 'খানা' ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন খাটখানা, চৌকিখানা, ঘরখানা, নৌকাখানা। ইহাও দেখা গিয়াছে, এই 'খানা' চিহ্নের ব্যবহার সম্বন্ধে সকলের অভ্যাস সমান নহে

তবে 'খানা'র প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ নিয়ম বলা যায়। জীব সম্বন্ধে কোথাও ইহার ব্যবহার নাই ; গোরুখানা ভেড়াখানা হয় না। দেহ ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহারে বাধা নাই। দেহখানা, হাতখানা, পাখানা। বুকখানা সাত হাত হয়ে উঠল ; মায়ের কোলখানি ভরে আছে ; মাংসখানা ঝুলে পড়েছে ; ঠোঁটখানি রাঙা ; ভুরুখানি বাঁকা।

অরূপ পদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। বাতাসখানা বলা চলে না ; আলোখানাও সেইরূপ ; কারণ, তাহার অবয়ব নাই। যত্নখানা, আদরখানা, ভয়খানা, রাগখানা হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে ; যথা, ভাবখানা, স্বভাবখানা, ধরনখানা, চলনখানি।

যে-সকল বস্তু অবয়ব গ্রহণ না করিয়া তরল বা বিচ্ছিন্নভাবে থাকে তাহাদের সম্বন্ধে 'খানা' বসে না। যেমন, বালিখানা, ধুলোখানা, মাটিখানা, দুধখানা, জলখানা, তেলখানা হয় না।

ধুলা কাদা তেল জল প্রভৃতি শব্দের সহিত 'এক' শব্দটিকে বিশেষণরূপে যোগ করা যায় না। যেমন, একটা ধুলা বা একটা জল বলি না। কিন্তু 'অনেক' শব্দটির সহিত এরূপ কোনো বাধা নাই। যেমন, অনেকটা জল বা অনেকখানি জল বলা চলে। বলা বাহুল্য এখানে 'অনেক' শব্দ দ্বারা সংখ্যা বুঝাইতেছে না —পরিমাণ বুঝাইতেছে।

এখানে বিশেষরূপে লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, এরূপ স্থলে আমরা 'খানি' ব্যবহার করি ; 'খানা' ব্যবহার করি না। 'অনেকখানি দুধ' বলি, 'অনেকখানা দুধ' বলি না। এ স্থলে দেখা যাইতেছে, পরিমাণ ও সংখ্যা সম্বন্ধে 'খানি' ব্যবহার হয়, 'খানা' কেবলমাত্র সংখ্যা সম্বন্ধেই খাটে।

বাংলায় হাসিখানি শব্দ প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা আদরের ভাষা। আদর করিয়া হাসিকে যেন স্বতন্ত্র একটি বস্তুর মতো করিয়া দেখা যাইতেছে। মনে পড়িতেছে বৈষ্ণব সাহিত্যে এমন ভাবের কথা কোথায় দেখিয়াছি যে, 'তাহার মুখের কথাখানির যদি লাগ পাইতাম'— এখানে আদর করিয়া মুখের কথাটিকে যেন মূর্তি দেওয়া হইতেছে। এইরূপ ভাবেই 'স্পর্শখানি' বলিয়া থাকি।

খানি ও খানা যেখানে বসে সেখানে ইচ্ছামত সর্বত্রই টি ও টা বসিতে পারে— কিন্তু টি ও টা-র স্থলে সর্বত্র খানি ও খানার অধিকার নাই।

গাছা ও গাছি

'খানি খানা' যেমন মোটের উপরে চওড়া জিনিসের পক্ষে, 'গাছা' তেমনি সরু জিনিসের পক্ষে। যেমন, ছড়িগাছা, লাঠিগাছা, দড়িগাছা, সুতোগাছা, হারগাছা, মালাগাছা, চুড়িগাছা, মলগাছা, শিকলগাছা।

এই সংকেতের সঙ্গে যখন পুনশ্চ 'টি' ও 'টা' চিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে তখন 'গাছি' 'গাছা' শব্দের অন্তস্থিত ইকার আকার লুপ্ত হইয়া যায়। যথা, লাঠি-গাছটা মালাগাছটা ইত্যাদি।

জীববাচক পদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। কেঁচোগাছি বলা চলে না।

সরু জিনিস লম্বায় ছোটো হইলে তাহার সম্বন্ধে ব্যবহার হয় না। দড়ি-গাছা, কিন্তু গোঁফগাছা নয়। শলাগাছটা, কিন্তু ছুঁচগাছটা নয়। চুলগাছি যখন বলা হয় তখন লম্বাচুলই বুঝায়।

যেখানে গাছি ও গাছা বসে সেখানে সর্বত্রই বিকল্পে টি ও টা বসিতে পারে —এবং কোনো কোনো স্থলে খানি ও খানা বসিতে পারে।

টুকু

টুকু শব্দ সংস্কৃত তনুক শব্দ হইতে উৎপন্ন। মৈথিলি সাহিত্যে তনুক শব্দ দেখিয়াছি। 'তনিক' এখনো হিন্দিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার সগোত্র 'টুক্‌রা' শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে।

টুকু স্বল্পতাবাচক।

সজীব পদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। ভেড়াটুকু গাধাটুকু হয় না। পরিহাসচ্ছলে মানুষটুকু বলা চলে।

ক্ষুদ্রায়তন হইলেও এমন পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় না যাহার বিশেষ গঠন আছে। যেমন ইয়ারিংটুকু বলা যায় না, সোনাটুকু বলা যায়। পদ্মটুকু বলা যায় না— চুনটুকু বলা যায়। পাগড়িটুকু বলা যায় না, রেশমটুকু বলা যায়। অর্থাৎ যাহাকে টুকরা করিলে তাহার বিশেষত্ব যায় না তাহার সম্বন্ধেই 'টুকু' ব্যবহার করা চলে। কাগজকে টুকরা করিলেও তাহা কাগজ, কাপড়কে টুকরা করিলেও তাহা কাপড়, এক পুকুর জলও জল, এক ফোঁটা জলও জল, এইজন্য কাগজটুকু কাপড়টুকু জলটুকু বলা যায় কিন্তু চৌকিটুকু খাটটুকু বলা যায় না।

কিন্তু, এই ঐ সেই কত এত তত যত সর্বনামপদের সহিত যুক্ত করিয়া তাহাকে ক্ষুদ্রার্থক সকল বিশেষ্যপদের বিশেষণ রূপে ব্যবহার করা যায়। যেমন, এইটুকু মানুষ, ঐটুকু বাড়ি, ঐটুকু পাহাড়।

অরূপ পদার্থবাচক বিশেষ্যপদে ইহার ব্যবহার চলে। যেমন, হাওয়াটুকু, কৌশলটুকু, ভারটুকু, সন্ন্যাসী ঠাকুরের রাগটুকু।

অন্যান্য নির্দেশক চিহ্নের ন্যায় 'এক' বিশেষণ শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ইহা ব্যবহৃত হয়— কিন্তু দুই তিন প্রভৃতি অন্য সংখ্যার সহিত ইহার যোগ নাই। দুইটা, দুইখানি, দুইগাছি হয় কিন্তু দুইটুকু তিনটুকু হয় না। 'এক' শব্দের সহিত যোগ হইলে টুকু বিকল্পে টু হয়, যথা একটু। অন্যত্র কোথাও এরূপ হয় না। এই 'একটু' শব্দের সহিত 'খানি' যোজনা ওরা যায়— যথা, একটুখানি বা একটুকখানি। এখানে 'খানা' চলে না। অন্যত্র, যেখানে টুকু বসিতে পারে সেখানে কোথাও বিকল্পে খানি খানা বসিতে পারে না, কিন্তু টি টা সর্বত্রই বসে।

আশ্বিন ১৩১৮

বাংলা বহুবচন

পূর্বে বলা হইয়াছে 'গোটা' শব্দের অর্থ সমগ্র। বাংলায় যেখানে বলে 'একটা', উড়িয়া ভাষায় সেখানে বলে গোটা। এবং এই গোটা শব্দের টা অংশই বাংলা বিশেষ বিশেষ্যে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ববঙ্গে ইহার প্রথম অংশটুকু ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে 'চৌকিটা', পূর্ববঙ্গে 'চৌকি গুয়া'।

ভাষায় অন্যত্র ইহার নজির আছে। একদা 'কর' শব্দ সম্বন্ধকারকের চিহ্ন ছিল— যথা, তোমাকর, তাকর। এখন পশ্চিমভারতে ইহার 'ক' অংশ ও পূর্বভারতে 'র' অংশ সম্বন্ধ চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দি হম্‌কা, বাংলা আমার।

একবচনে যেমন গোটা, বহুবচনে তেমনি গুলা। (মানুষগোটা), মানুষটা একবচন, মানুষগুলা বহুবচন। উড়িয়া ভাষায় এইরূপ বহুবচনার্থে 'গুড়িয়ে' শব্দের ব্যবহার আছে।

এই 'গোটা'রই বহুবচনরূপ গুলা, তাহার প্রমাণ এই যে, 'টা' সংযোগে যেমন বিশেষ্য শব্দ তাহার সামান্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তাহার বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে— গুলা ও গুলির দ্বারাও সেইরূপ ঘটে। যেমন, 'টেবিলগুলা বাঁকা' —অর্থাৎ বিশেষ কয়েকটি টেবিল বাঁকা, সামান্যত টেবিল বাঁকা নহে। কাক শাদা বলা চলে না, কিন্তু কাকগুলো শাদা বলা চলে, কারণ, বিশেষ কয়েকটা কাক শাদা হওয়া অসম্ভব নহে।

এই 'গুলা' শব্দযোগে বহুবচনরূপ নিষ্পন্ন করাই বাংলার সাধারণ নিয়ম। বিশেষ স্থলে বিকল্পে শব্দের সহিত 'রা' ও 'এরা' যোগ হয়। যেমন, মানুষেরা, কেরানীরা ইত্যাদি।

এই 'রা' ও 'এরা' জীববাচক বিশেষ্যপদ ছাড়া অন্যত্র ব্যবহৃত হয় না।

হলন্ত শব্দের সঙ্গে 'এরা' এবং অন্য স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে 'রা' যুক্ত হয়। যেমন বালকেরা, বধূরা। বালকগুলি, বধূগুলি ইত্যাদিও হয়।

কথিতভাষায় এই 'এরা' চিহ্নের 'এ' প্রায়ই লুপ্ত হইয়া থাকে— আমরা বলি বালকরা, ছাত্ররা ইত্যাদি।

ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যপদেরও বহুবচনরূপ হইয়া থাকে। যথা, রামেরা—

অর্থাৎ রাম ও আনুষঙ্গিক অন্য সকলে। এরূপ স্থলে কদাপি গুলা গুলির প্রয়োগ হয় না। কারণ রামগুলি বলিলে প্রত্যেকটিরই রাম হওয়া আবশ্যক হয়।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে এই 'এরা' সম্বন্ধকারকরূপ হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ রামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যাহারা তাহারাই 'রামেরা'। যেমন তির্যক্‌রূপে 'জন' শব্দকে জোর দিয়া হইয়াছে 'জনা', সেইরূপ 'রামের' শব্দকে জোর দিয়া হইয়াছে রামেরা।

'সব', 'সকল' ও 'সমুদয়' শব্দ বিশেষ্য শব্দের পূর্বে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়া বহুত্ব অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু বস্তুত এই বিশেষণগুলি সমষ্টিবাচক। 'সব লোক' এবং 'লোকগুলি'-র মধ্যে অর্থভেদ আছে। 'সব লোক' ইংরেজিতে all men এবং লোকগুলি the men।

লিখিত বাংলায়, 'সকল' ও 'সমুদয়' শব্দ বিশেষ্যপদের পরে বসে। কিন্তু কথিত বাংলায় কখনোই তা হয় না। সকল গোরু বলি, গোরু সকল বলি না। বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এইরূপ প্রয়োগ সম্ভবত আধুনিককালে গদ্যরচনা সৃষ্টির সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছে। লিখিত ভাষায় 'সকল' যখন কোনো শব্দের পরে বসে তখন তাহা তাহার মূল অর্থ ত্যাগ করিয়া শব্দটিকে বহুবচনের ভাব দান করে। লোকগুলি এবং লোকসকল একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রাচীন লিখিত ভাষায় 'সব' শব্দ বিশেষ্যপদের পরে যুক্ত হইত। এখন সে রীতি উঠিয়া গেছে, এখন কেবল পূর্বেই তাহার ব্যবহার আছে। কেবল বর্তমান কাব্যসাহিত্যে এখনো ইহার প্রয়োগ দেখা যায়— যথা, 'পাখি সব করে রব'। বর্তমানে বিশেষ্যপদের পরে 'সব' শব্দ বসাইতে হইলে বিশেষ্য বহুবচনরূপ গ্রহণ করে। যথা, পাখিরা সব, ছেলেরা সব অথবা ছেলেরা সবাই। বলা বাহুল্য জীববাচক শব্দ ব্যতীত অন্যত্র বহুবচনে এই 'রা' ও 'এরা' চিহ্ন বসে না। বানরগুলা সব, ঘোড়াগুলা সব, টেবিলগুলা সব, দোয়াতগুলা সব— এইরূপ গুলাযোগে, সচেতন অচেতন সকল পদার্থ সম্বন্ধেই 'সব' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে।

'অনেক' বিশেষণ শব্দ যখন বিশেষ্যপদের পূর্বে বসে তখন স্বভাবতই তদ্দ্বারা বিশেষ্যের বহুত্ব বুঝায়। কিন্তু এই 'অনেক' বিশেষণের সংস্রবে বিশেষ্যপদ পুনশ্চ বহুবচনরূপ গ্রহণ করে না। ইংরেজিতে many বিশেষণ

সত্ত্বেও man শব্দ বহুবচনরূপ গ্রহণ করিয়া men হয়— সংস্কৃতে অনেকা লোকাঃ, কিন্তু বাংলায় অনেক লোকগুলি হয় না।

অথচ 'সকল' বিশেষণের যোগে বিশেষ্যপদ বিকল্পে বহুবচনরূপও গ্রহণ করে। আমরা বলিয়া থাকি, সকল সভ্যেরাই এসেছেন— সকল সভ্যই এসেছেন এরূপও বলা যায়। কিন্তু অনেক সভ্যেরা এসেছেন কোনোমতেই বলা চলে না। 'সব' শব্দও 'সকল' শব্দের ন্যায়। 'সব পালোয়ানরাই সমান' এবং 'সব পালোয়ানই সমান' দুই চলে।

'বিস্তর' শব্দ 'অনেক' শব্দের ন্যায়। অর্থাৎ এই বিশেষণ পূর্বে থাকিলে বিশেষ্যপদ আর বহুবচন রূপ গ্রহণ করে না— 'বিস্তর লোকেরা' বলা চলে না।

এইরূপ আর-একটি শব্দ আছে তাহা লিখিত বাংলায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না— কিন্তু কথিত বাংলায় তাহারই ব্যবহার অধিক, সেটি 'ঢের'। ইহার নিয়ম 'বিস্তর' ও 'অনেক' শব্দের ন্যায়ই। 'গুচ্ছার' শব্দও প্রাকৃত বাংলায় প্রচলিত। ইহা প্রায়ই বিরক্তি-প্রকাশক। যখন বলি গুচ্ছার লোক জমেছে তখন বুঝিতে হইবে সেই লোকসমাগম প্রীতিকর নহে। ইহা সম্ভবত গোটাচার শব্দ হইতে উদ্‌ভূত।

সংখ্যাবাচক বিশেষ্য পূর্বে যুক্ত হইলে বিশেষ্যপদ বহুবচনরূপ গ্রহণ করে না। যেমন, চার দিন, তিন জন, দুটো আম।

গণ, দল, সমূহ, বৃন্দ, বর্গ, কুল, চয়, মালা, শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি প্রভৃতি শব্দযোগে বিশেষ্যপদ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহা সংস্কৃত রীতি। এইজন্য অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্যত্র ইহার ব্যবহার নাই। বস্তুত ইহাদিগকে বহুবচনের চিহ্ন বলাই চলে না। কারণ ইহাদের সম্বন্ধেও বহুবচনের প্রয়োগ হইতে পারে— যেমন সৈন্যগণেরা, পদাতিক দলেরা ইত্যাদি। ইহারা সমষ্টিবোধক।

ইহাদের মধ্যে 'গণ' শব্দ প্রাকৃত বাংলার অন্তর্গত হইয়াছে। এইজন্য 'পদাতিকগণ' এবং 'পাইকগণ' দুই বলা চলে। কিন্তু 'লাঠিয়ালবৃন্দ' 'কলুকুল' বা 'আটচালাচয়' বলা চলে না।

গণ, মালা, শ্রেণী ও পঙ্‌ক্তি শব্দ সর্বত্র ব্যবহৃত হইতে পারে না। গণ ও দল কেবল প্রাণীবাচক শব্দের সহিতই চলে। কখনো কখনো রূপকভাবে মেঘদল তরঙ্গদল বৃক্ষদল প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মালা, শ্রেণী ও পঙ্‌ক্তি শব্দের অর্থ অনুসারেই তাহার ব্যবহার, এ কথা বলা বাহুল্য।

প্রাকৃত বাংলায় এইরূপ অর্থবোধক শব্দ ঝাঁক, গোচ্ছা, আঁটি, গ্রাস। কিন্তু এগুলি সমাস-রূপে শব্দের সহিত সংযুক্ত হয় না। আমরা বলি পাখির ঝাঁক, চাবির গোচ্ছা, ধানের আঁটি, ভাতের গ্রাস, অথবা দুই ঝাঁক পাখি, এক গোচ্ছা চাবি, চার আঁটি ধান, দুই গ্রাস ভাত।

'পত্র' শব্দযোগে বাংলায় কতকগুলি শব্দ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু সেই বিশেষ কয়েকটি শব্দ ছাড়া অন্য শব্দের সহিত উহার ব্যবহার চলে না। গহনাপত্র, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, জিনিসপত্র, বিছানাপত্র, ঔষধপত্র, খরচপত্র, দেনাপত্র, চিঠিপত্র, খাতাপত্র, চোতাপত্র, হিসাবপত্র, নিকাশপত্র, দলিলপত্র, পুঁথিপত্র, বিষয়পত্র।

পরিমাণ-সম্বন্ধীয় বহুত্ব বোঝাইবার জন্য বাংলায় শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে; যেমন, বস্তাবস্তা, ঝুড়িঝুড়ি, মুঠামুঠা, বাক্সবাক্স, কলসিকলসি, বাটিবাটি। এগুলি কেবলমাত্র আধারবাচক শব্দ সম্বন্ধেই খাটে; মাপ বা ওজন সম্বন্ধে খাটে না— গজ-গজ বা সের-সের বলা চলে না।

সময় সম্বন্ধেও বহুত্ব অর্থে শব্দদ্বৈত ঘটে— বার বার, দিন দিন, মাস মাস, ঘড়ি ঘড়ি। বহুত্ব বুঝাইবার জন্য সমার্থক দুই শব্দের যুগ্মতা ব্যবহৃত হয়, যেমন: লোকজন, কাজকর্ম, ছেলেপুলে, পাখিপাখালী, জন্তুজানোয়ার, কাঙালগরিব, রাজারাজড়া, বাজনাবাদ্য। এই-সকল যুগ্ম শব্দের দুই অংশের এক অর্থ নহে কিন্তু কাছাকাছি অর্থ এমন দৃষ্টান্তও আছে; দোকানহাট, শাকসবজি, বনজঙ্গল, মুটেমজুর, হাঁড়িকুঁড়ি। এরূপ স্থলে বহুত্বের সঙ্গে কতকটা বৈচিত্র্য বুঝায়। যুগ্ম শব্দের একাংশের কোনো অর্থ নাই এমনও আছে। যেমন, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, চাকরবাকর। এ স্থলেও কতকটা বৈচিত্র্য অর্থ দেখা যায়।

কথিত বাংলায় 'ট' অক্ষরের সাহায্যে একপ্রকার বিকৃত শব্দদ্বৈত আছে। যেমন, জিনিসটিনিস, ঘোড়াটোড়া। ইহাতে প্রভৃতি শব্দের ভাবটা বুঝায়।

কার্তিক ১৩১৮

স্ত্রীলিঙ্গ

ভারতবর্ষের অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষায় শব্দগুলি অনেক স্থলে বিনা কারণেই স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দিতে ভোঁ (ভ্রূ), মৃত্যু, আগ (অগ্নি), ধূপ শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। সোনা, রুপা, হীরা, প্রেম, লোভ পুংলিঙ্গ। বাংলা শব্দে এরূপ অকারণ, কাল্পনিক, বা উচ্চারণমূলক স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। এমন-কি, অনেক সময় স্বাভাবিক স্ত্রীবাচক শব্দও স্ত্রীলিঙ্গসূচক কোনো প্রত্যয় গ্রহণ করে না। সেরূপ স্থলে বিশেষভাবে স্ত্রীজাতীয়ত্ব বুঝাইতে হইলে বিশেষণের প্রয়োজন হয়। কুকুর, বিড়াল, উট, মহিষ, প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দের নিয়মে ব্যবহারকালে লিখিত ভাষায় কুক্কুরী, বিড়ালী, উষ্ট্রী, মহিষী হইয়া থাকে কিন্তু কথিত ভাষায় এরূপ ব্যবহার হাস্যকর।

সাধারণত ই এবং ঈ প্রত্যয় ও নি এবং নী প্রত্যয় যোগে বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয়। ই ও ঈ প্রত্যয়: ছোঁড়া ছুঁড়ি, ছোকরা ছুকরি, খুড়া খুড়ি, কাকা কাকি, মামা মামি, পাগলা পাগলি, জেঠা জেঠি জেঠাই, বেটা বেটি, দাদা দিদি, মেসো মাসি, পিসে পিসি, পাঁঠা পাঁঠি, ভেড়া ভেড়ি, ঘোড়া ঘুড়ি, বুড়া বুড়ি, বামন বাম্‌নি, খোকা খুকি, শ্যালা শ্যালি, অভাগা অভাগী, হতভাগা হতভাগী, বোষ্টম বোষ্টমী, নেড়া নেড়ি।

নি ও নী প্রত্যয়: কলু কলুনি, তেলি তেলিনি, গয়লা গয়লানি, বাঘ বাঘিনি, মালি মালিনী, ধোবা ধোবানি, নাপিত নাপ্‌তানি (নাপ্‌তিনি), কামার কামারনি, চামার চামারনি, পুরুত পুরুতনি, মেথর মেথরানি, তাঁতি তাঁতিনি, মজুর মজুরনি, ঠাকুর ঠাকুরানি (ঠাকরুন), চাকর চাকরানি, হাড়ি হাড়িনি, সাপ সাপিনি, পাগল পাগলিনি, উড়ে উড়েনি, কায়েত কায়েতনি, খোট্টা খোট্টানি, চৌধুরী চৌধুরানী, মোগল মোগলানি, মুসলমান মুসলমাননি, জেলে জেলেনি, রাজপুত রাজপুতনি, বেয়াই বেয়ান।

এই প্রত্যয়যোগের নিয়ম কী তাহা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ এ প্রত্যয়টি কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দেই আবদ্ধ, তাহার বাহিরে প্রয়োজন হইলেও ব্যবহার হয় না। পাঞ্জাবি সম্বন্ধে পাঞ্জাবিনি, মারাঠা সম্বন্ধে মারাঠনি, গুজরাটি সম্বন্ধে গুজরাট্‌নি প্রয়োগ নাই। উড়েনি আছে কিন্তু শিখ্‌নি মগ্‌নি মান্দ্রাজিনী নাই।

ময়ুর জাতির স্ত্রী পুরুষের মধ্যে দৃশ্যত বিশেষ পার্থক্য থাকাতে ভাষায় ময়ুর ময়ূরী ব্যবহৃত হয় কিন্তু চিল সম্বন্ধে এরূপ ব্যবহার নাই।

পুরুষ মেয়ে, অথবা পুরুষ মানুষ, মেয়ে মানুষ, স্বামী স্ত্রী, ভাই বোন, বাপ মা, ছেলে মেয়ে, মদ্দা মাদী, ষাঁড় গাই, বর কনে, জামাই বউ, (বউ শব্দটি পুত্রবধূ ও স্ত্রী উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়)। সাহেব বিবি বা মেম, কর্তা গিন্নি (গৃহিণী), ভূত পেত্নী প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ আছে যাহার স্ত্রীলিঙ্গবাচক ও পুংলিঙ্গবাচক রূপ স্বতন্ত্র।

সংস্কৃত ভাষার মতো বাংলা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। বাংলায় লিখিত বা কথিত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারকালে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে কখনো কখনো স্ত্রীলিঙ্গ রূপ ব্যবহার হয়— কিন্তু ক্রমশ ভাষা যতই সহজ হইতেছে ততই ইহা কমিয়া আসিতেছে। বিষমা বিপদ, পরমা সম্পদ, বা মধুরা ভাষা পরম পণ্ডিতেও বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেন না। বিশেষত বিশেষণ যখন বিশেষ্যের পরে ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় তখন তাহা বর্তমান বাংলায় কখনোই স্ত্রীলিঙ্গ হয় না— অতিক্রান্তা রজনী বলা যাইতে পারে কিন্তু রজনী অতিক্রান্তা হইল, আজকালকার দিনে কেহই লিখে না।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উচ্চারণমতে কতকগুলি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারকালে আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানি কিন্তু আধুনিক ভাষায় দেশ সম্বন্ধে তাহা খাটে না। ভারতবর্ষ বা ভারত, সংস্কৃত ভাষায় কখনোই স্ত্রী শ্রেণীয় শব্দ হইতে পারে না, কিন্তু আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে তাহাকে ভারতমাতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। বঙ্গও সেইরূপ বঙ্গমাতা। দেশকে মাতৃভাবে চিন্তা করাই প্রচলিত হওয়াতে দেশের নামকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে মানা হয় না।

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় গ্রহণকালে সংস্কৃত নিয়ম রক্ষা করে না। যেমন, সিংহিনী (সিংহী), গৃধিনী (গৃধ্রী, গৃধ্র শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না), অধীনী (অধীনা), হংসিনী (হংসী), সুকেশিনী (সুকেশী), মাতঙ্গিনী (মাতঙ্গী), কুরঙ্গিনী (কুরঙ্গী), বিহঙ্গিনী (বিহঙ্গী), ভুজঙ্গিনী (ভুজঙ্গী), হেমাঙ্গিনী (হেমাঙ্গী)।

বিশেষণ শব্দ বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় প্রাপ্ত হয় না কিন্তু বিশেষণপদ বিশেষ্য অর্থ গ্রহণ করিলে এ নিয়ম সর্বত্র খাটে না। ধেঁদী, নেকী।

ইয়া প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ইয়া প্রত্যয় ত্যাগ করিয়া ই প্রত্যয় গ্রহণ করে। ঘরভাঙানিয়া (ভাঙানে) ঘরভাঙানী, মনমাতানিয়া মনমাতানী, পাড়া-কুঁদুলিয়া পাড়াকুঁদুলি, কীর্তনীয়া কীর্তনী।

হিন্দিতে ক্ষুদ্রতা ও সৌকুমার্য -বোধক ই প্রত্যয়যুক্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়— পুং গাড়া, স্ত্রীং গাড়ি, পুং রস্‌সা, স্ত্রীং রস্‌সী।

বাংলায় বৃহত্ত্ব অর্থে আ ও ক্ষুদ্রত্ব অর্থে ই প্রত্যয় প্রয়োগ হইয়া থাকে, অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার দৃষ্টান্ত অনুসারে ইহাদিগকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

রসা রসি, দড়া দড়ি, ঘড়া ঘটি, বড়া বড়ি, ঝোলা ঝুলি, নোড়া নুড়ি, গোলা গুলি, হাঁড়া হাঁড়ি, ছোরা ছুরি, ঘুষা ঘুষি, কুপা কুপি, কড়া কড়ি, ঝোড়া ঝুড়ি, কলস কল্‌সি, জোড়া জুড়ি, ছাতা ছাতি।

কোনো কোনো স্থলে এইপ্রকার রূপান্তরে কেবল ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ত্ব -ভেদ বুঝায় না একেবারে দ্রব্যভেদ বুঝায়। যথা, কোঁড়া (বাঁশের) কুঁড়ি (ফুলের), জাঁতা জাঁতি, বাটা (পানের) বাটি।

কিন্তু এ কথা বলা আবশ্যক টা ও টি, গুলা ও গুলি, স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ উভয় প্রকার শব্দেই ব্যবহৃত হয়। মেয়েগুলো ছেলেগুলি, বউটা জামাইটি ইত্যাদি।

অগ্রহায়ণ ১৩১৮

আলোচনা

একটি প্রশ্ন

ইংরাজি শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিবার সময় কতকগুলি জায়গায় ভাবনা উপস্থিত হয়। যথা— ইংরাজি sir। বাংলায় সার লেখা উচিত না সর্ লেখা উচিত? ইংরাজি v অক্ষর বাংলায় ব না ভ? vow শব্দ বাংলায় কি বৌ লিখিব না ভৌ লিখিব না বাউ অথবা ভাউ লিখিব। এ সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত যাহা বলেন তাহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়, তাই এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিলাম।

সাধারণত পণ্ডিতেরা বলেন, perfect শব্দের e, sir শব্দের i আ নহে— উহা অ। stir শব্দের i এবং star শব্দের a কখনো এক হইতে পারে না— শেষোক্ত a আমাদের আ এবং প্রথমোক্ত i আমাদের অ। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। শুনিবামাত্র অনুভব করা যায় যে, stir শব্দের i এবং star শব্দের a একই স্বর; কেবল উহাদের মধ্যে হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভেদ মাত্র। সংস্কৃত বর্ণমালায় অ এবং আ-এ হ্রস্বদীর্ঘের প্রভেদ, কিন্তু বাংলা বর্ণমালার তাহা নহে। বাংলা অ আকারের হ্রস্ব নহে, তাহা একটি স্বতন্ত্র স্বর, অতএব সংস্কৃত অ যেখানে খাটে বাংলা অ সেখানে খাটে না। হিন্দুস্থানিরা কলম শব্দ কিরূপে উচ্চারণ করে এবং আমরা কিরূপ করি তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিলেই উভয় অকারের প্রভেদ বুঝা যায়। হিন্দুস্থানিরা যাহা বলে তাহা বাংলা অক্ষরে 'কালাম' বলিলেই ঠিক হয়। কারণ, আ স্বর আমরা প্রায় হ্রস্বই ব্যবহার করিয়া থাকি। বাংলায় কল লিখিলে ইংরাজি call কথাই মনে আসে, কখনো cull মনে হয় না; শেষোক্ত কথা বাংলায় কাল লিখিলেই প্রকৃত উচ্চারণের কাছাকাছি যায়। এইরূপ noun শব্দবর্তী ইংরাজি ou আমাদের ঔ নহে, তাহা আউ;— অথবা time শব্দবর্তী i আমাদের ঐ নহে তাহা আই। v শব্দের উচ্চারণ অনেকে বলিয়া থাকেন অন্ত্যস্থ ব। আমার তাহা ঠিক মনে হয় না। ইংরাজি w প্রকৃত অন্তাস্থ ব, ইংরাজি f অন্ত্যস্থ ফ, ইংরাজি v অন্ত্যস্থ ভ। কিন্তু অন্ত্যস্থ ফ অথবা অন্ত্যস্থ ভ আমাদের নাই এইজন্য বাধ্য হইয়া f ও v -র জায়গায় আমাদিগকে ফ ও ভ ব্যবহার করিতে হয়। wise এবং voice শব্দ উচ্চারণ করিলে w এবং v -এর প্রভেদ বুঝা যায়। w-এর স্থানে ব দিলে বরঞ্চ সংস্কৃত বর্ণমালার হিসাবে ঠিক হয়, কিন্তু v-র

স্থানে ব দিলে কোন্ হিসাবে ঠিক হয় বুঝিতে পারি না। আমার মতে আমাদের বর্ণমালায় ভ-ই v-এর সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি আসে। যাহা হউক এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রার্থনা করি।

অগ্রহায়ণ ১২৯২

সংজ্ঞাবিচার

পৌষ মাসের বালকে উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বাহির করিবার জন্য 'হুজুগ', 'ন্যাকামি' এবং 'আহ্লাদে' এই তিনটি শব্দ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম, পাঠকদের নিকট হইতে অনেকগুলি সংজ্ঞা আমাদের হাতে আসিয়াছে।[১]

কথাগুলি সম্পূর্ণ প্রচলিত। আমরা পরস্পর কথোপকথনে ওই কথাগুলি যখন ব্যবহার করি তখন কাহারো বুঝিবার ভুল হয় না, অথচ স্পষ্ট করিয়া অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে ভিন্ন লোকে ভিন্ন অর্থ বলিয়া থাকেন। ইহা হইতে এমন বুঝাইতেছে না যে, বাস্তবিকই ওই কথাগুলির ভিন্ন লোকে ভিন্ন অর্থ বুঝিয়া থাকেন— কারণ, তাহা হইলে তো ও কথা লইয়া কোনো কাজই চলিত না। প্রকৃত কথা এই, আমরা অনেক জিনিস বুঝিয়া থাকি, কিন্তু কী বুঝিলাম সেটা ভালো করিয়া বুঝিতে অনেক চিন্তা আবশ্যক করে। যেমন আমরা অনেকে সহজেই সাঁতার দিতে পারি, কিন্তু কী উপায়ে সাঁতার দিতেছি তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারি না। অথবা, একজন মানুষ রাগিলে তাহার মুখভঙ্গি দেখিলে আমরা সহজেই বলিতে পারি মানুষটা রাগিয়াছে ; কিন্তু আমি যদি পাঁচজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা বলো দেখি রাগিলে মানুষের মুখের কিরূপ পরিবর্তন হয়, মুখের কোন্ কোন্ মাংসপেশীর কিরূপ বিকার হয়, মুখের কোন্ অংশের কিরূপ অবস্থান্তর হয়, তাহা হইলে পাঁচজনের বর্ণনায় প্রভেদ লক্ষিত হইবে অথচ ক্রুদ্ধ মনুষ্যকে দেখিলেই পাঁচজনে বিনা মতভেদে সমস্বরে বলিয়া উঠিবে লোকটা ভারি চটিয়া উঠিয়াছে। পাঠকদের নিকট হইতে যে-সকল সংজ্ঞা পাইয়াছি তাহার কতকগুলি এই স্থানে পরে পরে আলোচনা করিয়া দেখিলেই পরস্পরের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যাইবে।

একজন বলিতেছেন, 'হুজুক— জনসাধারণের হৃদয়োন্মাদক আন্দোলন।' তা যদি হয় তো, বুদ্ধ চৈতন্য যিশু ক্রমোয়েল ওয়াশিংটন প্রভৃতি সকলেই হুজুক

১ পাঠকদের প্রতি : বালকের যে-কোনো গ্রাহক 'হুজুগ', 'ন্যাকামি' ও 'আহ্লাদে' শব্দের সর্বোৎকৃষ্ট সংক্ষেপ সংজ্ঞা (definition) লিখিয়া পৌষমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন তাঁহাকে একটি ভালো গ্রন্থ পুরস্কার দেওয়া হইবে। একেকটি সংজ্ঞা পাঁচটি পদের অধিক না হয়।—বালক, পৌষ ১২৯২।

করিয়াছিলেন! কিন্তু লেখক কখনোই সচরাচর কথোপকথনে এরূপ অর্থে হুজুক ব্যবহার করেন না।

ইনিই বলিতেছেন, 'ন্যাকামি— অভিমানবশত কিছুতে অনিচ্ছা প্রকাশ অথবা ইচ্ছাসত্ত্বে অভিমানীর অনিচ্ছা প্রকাশ।'

স্থলবিশেষে অভিমানচ্ছলে কোনো ব্যক্তি ন্যাকামি করিতেও পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অভিমানবশত অনিচ্ছা প্রকাশ করাকেই যে ন্যাকামি বলে তাহা নহে।

আহ্লাদে শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইনি বলেন, 'দশজনের আহ্লাদ পাইয়া অহংকৃত।' প্রশ্রয়প্রাপ্ত, অহংকৃত এবং 'আহ্লাদে'-র মধ্যে যে অনেক প্রভেদ বলাই বাহুল্য।

হুজুগ শব্দের নিম্নলিখিত প্রাপ্ত সংজ্ঞাগুলি পরে পরে প্রকাশ করিলাম।

হুজুগ

১। বিস্ময়জনক সংবাদ যাহা সত্য কি মিথ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

২। অকারণ বিষয়ে উদ্যোগ ও উৎসাহ (অকারণ শব্দের দুই অর্থ— ১ অনির্দিষ্ট; ২ তুচ্ছ, সামান্য)।

৩। অল্পেতে নেচে ওঠার নাম।

৪। অতিরঞ্জিত জনরব।

*

৬। ফল অনিশ্চিত এরূপ বিষয়ে মাতা।

৭। কোনো এক ঘটনা, লোকে যাহার হ্যাপায় প'ড়ে স্রোতে ভাসে। 'বাজারদরে নেচে বেড়ানো।' 'ঝড়ের আগে ধুলা উড়া।'

৮। ফস্ কথায় নেচে ওঠা।

৯। দেশব্যাপী কোনো নূতন (সত্য এবং মিথ্যা) আন্দোলন।

১০। বাহ্যাড়ম্বরে মত্ততা।

প্রথম সংজ্ঞাটি যে ঠিক হয় নাই তাহা ব্যক্ত করিয়া বলাই বাহুল্য।

* মূলে মুদ্রাকরপ্রমাদ।

দ্বিতীয় সংজ্ঞা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, লেখক নিজেই অকারণ শব্দের যে-অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার নহে। অনির্দিষ্ট অর্থাৎ যাহার লক্ষ স্থির হয় নাই এমন কোনো তুচ্ছ সামান্য বিষয়কেই বোধ করি তিনি অকারণ বিষয় বলিতেছেন— তাঁহার মতে এইরূপ বিষয়ে উদ্যোগ ও উৎসাহকেই হুজুগ বলে। কেহ যদি বিশেষ উদ্যোগের সহিত একটা বালুকার স্তূপ নির্মাণ করিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া পরমোৎসাহে তাহা আবার ভাঙিতে থাকে তবে তাহাকে হুজুগে বলিবে না পাগল বলিবে?

তৃতীয় সংজ্ঞা। রাম যদি ঘুড়ি উড়াইবার প্রস্তাব শুনিবা মাত্র উৎসাহে নাচিয়া উঠে তবে রামকে কি হুজুগে বলিবে।

চতুর্থ সংজ্ঞা। অতিরঞ্জিত জনরবকে যে হুজুগ বলে না তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে বলিতে হইবে না। শ্যাম তাহার কন্যার বিবাহোপলক্ষে পাঁচ শ টাকা খরচ করিয়াছে; লোকে যদি রটায় যে সে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়াছে, তবে সেই জনরবকেই কি হুজুগ বলিবে।

পঞ্চম সংজ্ঞা। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে অসম্ভব সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া থাকে, তাহাকে কেহ হুজুগ বলে না।

ষষ্ঠ সংজ্ঞা। লাভ অনিশ্চিত এমনতরো ব্যবসায়ে অনেকে অর্থলোভে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সেরূপ ব্যবসায়কে কেহ হুজুগ বলে না।

সপ্তম। এ সংজ্ঞাটি পরিষ্কার নহে। যে-ঘটনার স্রোতে লোকে ভাসিতে থাকে তাহাকে হুজুগ বলা যায় না; তবে লেখক হ্যাপা শব্দের যোগ করিয়া ইহার মধ্যে আর-একটি নূতন ভাব প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু হ্যাপা শব্দের ঠিক অর্থটি কী সে সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে, অতএব হুজুগ শব্দের ন্যায় হ্যাপা শব্দও সংজ্ঞানির্দেশযোগ্য। সুতরাং হ্যাপা শব্দের সাহায্যে হুজুগ শব্দ বোঝাইবার চেষ্টা সংগত হয় না। 'বাজারদরে নেচে বেড়ানো', 'ঝড়ের আগে ধুলা উড়া'— দুটি ব্যাখ্যাও সুস্পষ্ট নহে।

অষ্টম। হরি যদি মাধবকে বলে, তুই ট্যাকশালের দাওয়ান হইবি— অমনি যদি মাধব নাচিয়া উঠে— তবে মাধবের সেই উৎসাহ-উল্লাসকে হুজুগ বলা যায় না।

নবম। আন্দোলন নূতন হইলেই তাহাকে হুজুগ বলা যাইতে পারে না।

দশম। বাহ্যাড়ম্বরে মত্ততা মাত্রই হুজুগ বলিতে পারি না। কোনো

রায়বাহাদুর যদি তাহার খেতাব ও গাড়িজুড়ি লইয়া মাতিয়া থাকে, তাহার সেই মত্ততাকে কি হুজুগ বলা যায়।

আমরা যে-লেখককে পুরস্কার দিয়াছি তিনি হুজুগ শব্দের নিম্নলিখিতমত ব্যাখ্যা করেন :

> 'মাথা নাই মাথা ব্যথা' গোছের কতকগুলা নাচুনে জিনিস লইয়া যে-নাচন আরম্ভ হয় সেই নাচনের অবস্থাকেই হুজুগ বলে। বিশেষ কিছুই হয় নাই অথবা অতি সামান্য একটা-কিছু হইয়াছে আর সেইটাকে লইয়া সকলে নাচিয়া উঠিয়াছে, এই অবস্থার নাম হুজুগ।

আমরা দেখিতেছি হুজুগে প্রথমত এমন একটা বিষয় থাকা চাই যাহার প্রতিষ্ঠাভূমি নাই— যাহার ডালপালা খুব বিস্তৃত, কিন্তু শিকড়ের দিকের অভাব। মনে করো আমি 'সার্বজনীনতা' বা 'বিশ্বপ্রেম' প্রচারের জন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছি ; তাহার কত মন্ত্রতন্ত্র কত অনুষ্ঠান তাহার ঠিক নাই, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বহির্ভূত লোকদের প্রতি আমাদের জাত-বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে— মূলেই প্রেমের অভাব অথচ প্রেমের অনুষ্ঠানের ক্রটি নাই। দ্বিতীয়ত, ইহার সঙ্গে একটা নাচনের যোগ থাকা চাই, অর্থাৎ কাজের প্রতি ততটা নহে যতটা মত্ততার প্রতি লক্ষ। অর্থাৎ হো-হো করিয়া বেশ সময় কাটিয়া যাইতেছে, খুব একটা হাঙ্গামা হইতেছে এবং তাহাতেই একটা আনন্দ পাইতেছি। যদি স্থির হইয়া শুদ্ধভাবে কাজ করিতে বলো তবে তাহাতে মন লাগে না, কারণ নাচানো এবং নাচা, এ-দুটোই মুখ্য আবশ্যক। তৃতীয়ত, কেবল একজনকে লইয়া হুজুগ হয় না— সাধারণকে আবশ্যক— সাধারণকে লইয়া একটা হট্টগোল বাধাইবার চেষ্টা। চতুর্থত, হুজুগ কেবল একটা খবরমাত্র রটানো নহে ; কোনো অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সমারোহের সহিত উদ্যোগ করা, তার পরে সেটা হউক বা না-হউক।

আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখকের সংজ্ঞা যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তিনি তাঁহার সংজ্ঞার দুইটি পদকে সংক্ষেপ করিয়া অনায়াসেই একপদে পরিণত করিতে পারিতেন।

সংজ্ঞা রচনা করা যে দুরূহ তাহার প্রধান একটা কারণ এই দেখিতেছি যে, একটি কথার সহিত অনেকগুলি জটিল ভাব জড়িত হইয়া থাকে, লেখকেরা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার মধ্যে তাহার সকলগুলি গুছাইয়া লইতে পারেন না—

অনবধানতাদোষে একটা-না-একটা বাদ পড়িয়া যায়। উদ্ধৃত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে পাঠকেরা তাহার দৃষ্টান্ত পাইয়াছেন।

ন্যাকামি

১। জানিয়া না-জানার ভান।

২। জানিয়া না-জানার ভাব প্রকাশ করা।

৩। জেনেও জানি না, এই ভাব প্রকাশ করা।

৪। জানিয়াও না-জানার ভান।

৫। অবগত থাকিয়া অজ্ঞতা দেখানো।

৬। বিলক্ষণ জানিয়াও অজ্ঞানতার লক্ষণ প্রকাশ করা।

৭। বুঝেও নিজেকে অবুঝের ন্যায় প্রতিপন্ন করা।

৮। সেয়ানা হয়ে বোকা সাজা।

৯। জেনেশুনে ছেলেমি।

১০। বুঝে অবুঝ হওয়া। জেনেশুনে হাবা হওয়া।

১১। ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা এবং মিথ্যা সরলতা।

প্রথম হইতে সপ্তম সংজ্ঞা পর্যন্ত সকলগুলির ভাব প্রায় একই রকম। অর্থাৎ সকলগুলিতেই জানিয়াও না-জানার ভান, এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু এরূপ ভাবকে অসরলতা মিথ্যাচরণ বা কপটতা বলা যায়। কিন্তু কপটতা ও ন্যাকামি ঠিক একরূপ জিনিস নহে। অষ্টম সংজ্ঞায় লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় যে বলিয়াছেন, সেয়ানা হইয়া বোকা সাজা, ইহাই আমার ঠিক বোধ হয়। জানিয়া না-জানার ভাব প্রকাশ করিলেই হইবে না, সেইসঙ্গে প্রকাশ করিতে হইবে আমি যেন নির্বোধ, আমার যেন বুঝিবার শক্তিই নাই। ষষ্ঠ এবং সপ্তম সংজ্ঞাতেও কতকটা এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তেমন স্পষ্ট হয় নাই। নবম ও দশম সংজ্ঞা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু অষ্টম হইতে দশম সংজ্ঞাতে বোকা, ছেলেমি, হাবা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; এই শব্দগুলি সংজ্ঞানির্দেশযোগ্য। অর্থাৎ হাবামি, বোকামি ও ছেলেমির বিশেষ লক্ষণ কী তাহা মনোযোগসহকারে আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। এইজন্য একাদশ সংজ্ঞার লেখক যে ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতার ভানের সঙ্গে 'মিথ্যা সরলতা' শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ন্যাকামি শব্দের অর্থ পরিষ্কার হইয়াছে। অজ্ঞতা এবং সরলতা উভয়ের

ভান থাকিলে তবে ন্যাকামি হইতে পারে। আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখক লিখিয়াছেন, "ন্যাকামি বলিতে সাধারণত জানিয়া শুনিয়া বোকা সাজার ভাব বুঝায়" পরে দ্বিতীয় পদে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, "যেন কিছু জানে না, যেন কিছু বুঝে না এই ভাবের নাম ন্যাকামি।" যেন কিছু জানে না, যেন কিছু বুঝে না বলিতে লোকটা যেন নেহাত হাবা, নিতান্ত খোকা এইরূপ বুঝায়, লোকটা যেন কিছু বুঝেই না, এবং তাহাকে বুঝাইবার উপায়ও নাই।

আহ্লাদে

১। স্বার্থের জন্য বিবেচনারহিত।

২। যাহারা পরিমাণাধিক আহ্লাদে সর্বদাই মত্ত।

৩। যে সকল-তাতেই অন্যায়রূপে আমোদ চায়, অথবা যে হক্ না হক্ দাঁত বের করে।

৪। অযথা আনন্দ বা অভিমান প্রকাশক।

৫। অন্যকে অসন্তুষ্ট করিয়া যে নিজে হাসে।

৬। যে সর্বদা আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়।

৭। কী সময়ে কী অসময়ে যে আহ্লাদ প্রকাশ করে।

৮। যে অভিমানী অল্পে অধৈর্য হয়।

৯। যে অনুপযুক্ত সময়েও আবদারী।

১০। সাধের গোপাল নীলমণি।

আমার বোধ হয়, যে-ব্যক্তি নিজেকে জগতের আদুরে ছেলে মনে করে তাহাকে আহ্লাদে বলে; প্রশ্রয়দাত্রী মায়ের কাছে আদুরে ছেলেরা যেরূপ ব্যবহার করে যে-ব্যক্তি সকল জায়গাতেই কতকটা সেইরূপ ব্যবহার করিতে যায়। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি সময়-অসময় পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্বত্র আবদার করিতে যায়, সর্বত্রই দাঁত বাহির করে, মনে করে সকলেই তাহার সকল বাড়াবাড়ি মাপ করিবে সে-ই আহ্লাদে। তাহাকে কে চায় না-চায়, তাহাকে কে কী-ভাবে দেখে, সে-বিষয় বিবেচনা না করিয়া সে ঢুলিতে ঢুলিতে গায়ে পড়িয়া সকলের গা ঘেঁষিয়া বসে, সকলের আদর কাড়িতে চেষ্টা করে। সংজ্ঞালেখকগণ অনেকেই আহ্লাদে ব্যক্তির এক-একটি লক্ষণমাত্র নির্দেশ

করিয়াছেন, কিন্তু যাহা বলিলে তাহার সকল লক্ষণ ব্যক্ত হয় এমন কোনো কথা বলেন নাই। দশম সংজ্ঞাকে ঠিক সংজ্ঞা বলাই যায় না।

যাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে তাঁহার আহ্লাদে শব্দের সংজ্ঞা ঠিক হয় নাই। তিনি বলেন :

> ভাতের ফেনের মতো টগবগে। যাহাদিগের প্রায় সকল কার্যেই 'একের মরণ অন্যের আমোদ' কথার সত্যতা প্রমাণ হয়, অর্থাৎ তুমি বাঁচ আর মর আমার আমোদ হইলেই হইল, ইহাই যাহাদিগের মত ও কার্য, তাহাদিগকেই 'আহ্লাদে' বলা যায়।

আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখক ছুটি সংজ্ঞার উত্তর দিয়াছেন। তৃতীয়টিতে কৃতকার্য হন নাই। শ্রী বঃ— বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন, বোধকরি নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত। আমরা বলিয়াছিলাম সংজ্ঞা পাঁচ পদের অধিক না হয়, কেহ কেহ পদ বলিতে শব্দ বুঝিয়াছেন। আমরা ইংরাজি sentence অর্থে পদ ব্যবহার করিয়াছি।

ফাল্গুন ১২৯২

'নিছনি'

১

তৃতীয়সংখ্যক 'সাধনা'য় কোনো পাঠক নিছনি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; তাহার উত্তরে জগদানন্দবাবু নিছনি শব্দের অর্থ অনিচ্ছা লিখিয়াছেন।[১] কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অনিচ্ছা অর্থে নিছনির ব্যবহার কোথাও দেখা যায় নাই। গোবিন্দদাসে আছে:

গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।

স্পষ্টই অনুমান করা যায়, 'বালাই লইয়া মরি' বলিতে যে ভাব বুঝায় 'নিছনি লইয়া মরি' বলিতে তাহাই বুঝাইতেছে। কিন্তু সর্বত্র নিছনি শব্দের এরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। বসন্ত রায়ের কোনো পদে আছে:

পরাণ কেমন করে মরম কহিনু তোরে,
জীবন নিছনি তুয়া পাশ।

এখানে নিছনি বলিতে কতকটা উপহারের ভাব বুঝায়।

বসন্ত রায়ের অন্যত্র আছে:

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী,
মূলে বিকালাঙ আর কি দিব নিছনি।

এখানে নিছনি বলিতে কী বুঝাইতেছে ঠিক করিয়া বলা শক্ত। এরূপ স্থলে নিছনি শব্দের সংস্কৃত মূলটি বাহির করিতে পারিলে অর্থ নির্ণয়ের সাহায্য হইতে পারে।

গোবিন্দদাসের এক স্থলে আছে:

দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই।

এ স্থলে 'নিছিয়া' এবং 'নিরছাই' এক ধাতুমূলক বলিয়া সহজেই বোধ হয়।

১ প্রশ্ন: প্রাচীন কাব্যে নিছনি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। তাহার প্রকৃত অর্থ কী এবং তাহা সংস্কৃত কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। শব্দতত্ত্বান্বেষী। সাধনা, মাঘ ১২৯৮।

উত্তর: নিছনি শব্দের অর্থ অনিচ্ছা। শ্রীজগদানন্দ রায়, কৃষ্ণনগর। সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮।

অন্যত্র আছে :

বরু হাম জীবন তোহে নিরমঞ্ছব

তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ।

ইহার অর্থ, বরং আমার জীবন তোমার নিকট পরিত্যাগ করিব তথাপি অঙ্গ সমর্পণ করিব না।

আর-এক স্থলে দেখা যায় :

কুণ্ডল পিচ্ছে চরণ নিরমঞ্ছল

অব কিয়ে সাধসি মান।

অর্থাৎ তোমার চরণে মাথা লুটাইয়া কানের কুণ্ডল ও চূড়ার ময়ূরপুচ্ছ দিয়া তোমার পা মুছাইয়া দিয়াছে, তথাপি তোমার মান গেল না?

এই নির্মঞ্ছন শব্দই যে নিছনি শব্দের মূল রূপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অভিধানে নির্মঞ্ছন শব্দের অর্থ দেখা যায়— 'নীরাজনা, আরুতি, সেবা, মোছা।' নীরাজনা অর্থ "আরাত্রিক, দীপমালা, সজলপদ্ম, ধৌতবস্ত্র, বিল্বপত্রাদি, সাষ্টাঙ্গপ্রণাম— এই পঞ্চ দ্বারা আরাধনা, আরুতি।" উহার আর-এক অর্থ 'শান্তিকর্মবিশেষ।'

অতএব যেখানে 'নিছনি লইয়া মরি' বলা হয় সেখানে বুঝায় তোমার সমস্ত অমঙ্গল লইয়া মরি— এখানে 'শান্তিকর্ম' অর্থের প্রয়োগ।

দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই

এ স্থলে নিরছাই অর্থে মোছা।

নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন,

নিছনি করিনু তোমার ছুঁইয়া চরণ।

এখানে নিছনি অর্থে স্পষ্টই আরাধনার অর্ঘ্যোপহার বুঝাইতেছে।

পরাণ নিছিয়া দিই পিরীতে তোমার

অর্থাৎ, তোমার প্রেমে প্রাণকে উপহারস্বরূপে অর্পণ করি।

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী

মূলে বিকালাঙ, আর কি দিব নিছনি!

ইহার অর্থ বোধ করি নিম্নলিখিতমত হইবে—

তোমার প্রেমে যখন আমি সমূলে বিক্রীত হইয়াছি তখন বিশেষ করিয়া আরাধনাযোগ্য উপহার আর কী দিব।

বর্তমান-প্রচলিত ভাষায় এই নিছনি শব্দের ব্যবহার আছে কি না জানিতে উৎসুক আছি[১]; যদি কোনো পাঠক অনুগ্রহ করিয়া জানান তো বাধিত হই। চণ্ডিদাসের পদাবলীতে নিছনি শব্দ কোথাও দেখি নাই।

চৈত্র ১২৯৮

২

মনেতে করিয়ে সাধ যদি হয় পরিবাদ যৌবন সকল করি মানি
জ্ঞানদাসেতে কয় এমত যাহার হয় ত্রিভুবনে তাহার নিছনি।

এ স্থলে নিছনি অর্থে পূজা। আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি 'নির্মঞ্ছন' শব্দের একটি অর্থ আরাধনা।

সই এবে বলি কিরূপ দেখিনু
দেখিয়া মোহন রূপ আপনে নিছিনু।

নিছনি অর্থে যখন মোছা হয় তখন 'আপনে নিছিনু' অর্থে আপনাকে মুছিলাম অর্থাৎ আপনাকে ভুলিলাম অর্থ অসংগত হয় না।

পদ পঙ্কজপরি মণিময় নূপুর রুনুঝুনু খঞ্জন ভাব
মদন মুকুর জনু নখমণি দরপণ নিছনি গোবিন্দদাস।

আমার মতে এ স্থলে নিছনি অর্থে পূজার উপহার। অর্থাৎ গোবিন্দদাস চরণপঙ্কজে আপনাকে অর্ঘ্যস্বরূপে সমর্পণ করিতেছেন।

যশোদা আকুল হইয়া ব্যাকুলি রাইএরে করল কোলে
ও মোর বাছনি জান মু নিছনি ভোজন করহ ব'লে।

'জান মু নিছনি' অর্থাৎ আমি তোমার নিছনি যাই। অর্থাৎ তোমার অশান্তি অমঙ্গল আমি মুছিয়া লই; যেরূপ ভাবে 'বালাই লইয়া মরি' ব্যবহার হয়, 'নিছনি যাই' বলিতেও সেইরূপ ভাব প্রকাশ হইতেছে।

নয়নে গলয়ে ধারা দেখি মুখখানি
কার ঘরের শিশু তোমার যাইতে নিছনি।

১ দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রসংগীতে 'নিছনি' শব্দের ব্যবহার— আমার মন মানে না— দিন রজনী··· আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখ-ব্যাকুলতা কাহার চরণতলে/দিব নিছনি।

আমার বিবেচনায় এখানেও নিছনি অর্থে বালাই বুঝাইতেছে।

সবার অগ্রজ তুমি, তোরে কি শিখাব আমি
বাপ মোর যাইবে নিছনি।

এখানেও তাহাই।

নিছনি যাইয়ে পুত্র উঠহ এখন
কহয়ে মাধব উঠি বসিল তখন।

নিছনি যাইয়ে— অর্থাৎ সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া।

১। অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘনে মধুর মুরলী গীত
অবিচল কুল রমণী সকল শুনিয়া হরল চিত।

অমিয়া নিছনি— অর্থাৎ অমৃত মুছিয়া লইয়া।

২। নন্দের নন্দন গোকুল কানাই সবাই আপনা বোলে
মোপুনি ইছিয়া নিছিয়া লইনু অনাদি জনম ফলে।

নিছিয়া লইনু— আরাধনা করিয়া লইনু, অর্থাৎ বরণ করিয়া লইনু অর্থ হইতে পারে।

৩। তথা কনক বরণ কিরে দরপণ নিছনি দিয়ে যে তার
কপালে ললিত চান্দ যে শোভিত সিন্দুর অরুণ আর।

৪। তনু ধন জন যৌবন নিছিনু কালার পিরিতে।

উদ্‌ধৃত [১, ২, ৩, ৪] অংশগুলি চণ্ডিদাসের পদের অন্তর্গত সন্দেহ নাই।

নিছনি শব্দ যদি নির্মঞ্ছন শব্দেরই অপভাষা হয় তবে নির্মঞ্ছন শব্দের যতগুলি অর্থ আছে নিছনি শব্দের তদতিরিক্ত অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। দীনেন্দ্রকুমার বাবু নিছনি শব্দের যতগুলি প্রয়োগ উদ্‌ধৃত করিয়াছেন[১] তাহার সকলগুলিতেই কোনো-না-কোনো অর্থে নির্মঞ্ছন শব্দ খাটে।

দীনেন্দ্রবাবু শ্রম স্বীকার করিয়া এই আলোচনায় যোগ দিয়াছেন সেজন্য আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমাদের প্রাচীন কাব্যে যে-সকল দুর্বোধ শব্দপ্রয়োগ আছে সাধারণের মধ্যে আলোচিত হইয়া এইরূপে তাহার মীমাংসা হইতে পারিলে বড়োই সুখের বিষয় হইবে।

বৈশাখ ১২৯৯

১ শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়, 'নিছনি', সাধনা, বৈশাখ ১২৯৯।

'পহুঁ'

বৈষ্ণব কবিদের গ্রন্থে সচরাচর পহুঁ শব্দের দুই অর্থ দেখা যায়, প্রভু এবং পুনঃ। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহের টীকায় লিখিয়াছেন পহু অর্থে প্রভু এবং পঁহু অর্থে পুনঃ। কিন্তু উভয় অর্থেই পহুঁ শব্দের ব্যবহার এত দেখা গিয়াছে যে, নিশ্চয় বলা যায় এ নিয়ম এক্ষণে আর খাটে না।

দীনেন্দ্রবাবু যতগুলি ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন প্রায় তাহার সকলগুলিতেই পহু এবং পহুঁ শব্দের অর্থ প্রভু।[১]

গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর শেখর

অর্থাৎ গোন্দবিদাসের প্রভু নটবর শেখর।

রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ

অর্থাৎ রাধামোহনের প্রভু রসিক সু-নাথ।

নরোত্তমদাস পহুঁ নাগর কান,
রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান।

ইহার অর্থ এই, তুমি নরোত্তমদাসের প্রভু নাগর কান, তুমি রসিক কলাগুরু, তুমি সকলই জান। এরূপ ভণিতা হিন্দি গানেও দেখা যায়। যথা:

তানসেনপ্রভু আকবর।

বৈষ্ণব পদে স্থানে স্থানে সমাস ভাঙাও দেখা যায়। যথা:

গোবিন্দদাসের পহু
হাসিয়া হাসিয়া রহু।

কেবল একটা ভণিতায় এই অর্থ খাটে না।

রাধামোহন পহুঁ দুঁহু অতি নিরুপম।

এ স্থলে পহুঁ-র ভণে অর্থ না হইলে আর-কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে গোবিন্দদাস এবং তাহার অনুকরণকারী রাধামোহন ব্যতীত আর-কোনো বৈষ্ণব কবিতায় পহু শব্দের

১ শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়, 'পহুঁ (১)', সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯।

এরূপ অর্থ নাই। রাধামোহনেও ভণে অর্থে পহুঁ-র ব্যবহার অত্যন্ত বিরল—দৈবাৎ দুই-একটি যদি পাওয়া যায়।

রাধামোহন পহুঁ তুয়া পায়ে নিবেদয়ে।

এ স্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃ এবং অন্যত্র অধিকাংশ স্থলেই পহুঁ অর্থে প্রভু। কিন্তু গোবিন্দদাসের অনেক স্থলে পহুঁ-র 'ভণে' অর্থব্যবহার দেখা যায়।

গোবিন্দদাস পহুঁ দীপ সায়াহ্ন, বেলি অবসান ভৈ গেলি।

অর্থাৎ গোবিন্দদাস কহিতেছেন বেলা অবসান হইয়াছে, সন্ধ্যাদীপের সময় হইল। ইহা ছাড়া এ স্থলে আর-কোনোরূপ অর্থ কল্পনা করা যায় না। আরো এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে কথা এই, কোন্ ধাতু অনুসারে পঁহু-র ভণে অর্থ স্থির হইতে পারে। এক, ভণহুঁ[১] হইতে ভহুঁ এবং ক্রমে পহুঁ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে— কিন্তু ইহা একটা কাল্পনিক অনুমানমাত্র। বিশেষত, যখন গোবিন্দদাস ব্যতীত অন্য কোনো প্রাচীন পদকর্তার পদে পহুঁ-র এরূপ অর্থ দেখা যায় না, তখন উক্ত অনুমানের সংগত ভিত্তি নাই বলিতে হইবে।

আমার বিবেচনায় পূর্বোক্তরূপ ভণিতার পহুঁ অর্থে পুনঃ-ই ধরিয়া লইতে হইবে, এবং স্থির করিতে হইবে এরূপ ক্রিয়াহীন অসম্পূর্ণ পদবিন্যাস গোবিন্দদাসের একটি বিশেষত্ব ছিল। 'গোবিন্দদাস পঁহু,' অর্থাৎ 'গোবিন্দদাস পুনশ্চ বলিতেছেন', এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। গোবিন্দদাসের স্থানে স্থানে পহুঁ শব্দের পরে ক্রিয়ার যোগও দেখা যায়। যথা :

গোবিন্দদাস পহুঁ এই রস গায়

অর্থাৎ গোবিন্দদাস পুনশ্চ এই রস গান করেন।

পাঠকেরা আপত্তি করিতে পারেন এরূপ স্থলে পুনঃ অর্থের বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন কবিদের পদে একপ্রকার অনির্দিষ্ট অর্থে পুনঃ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথা :

তুহারি চরিত নাহি জানি, বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি।
রাধামোহন পুন তঁহি ভেল বঞ্চিত।
গোবিন্দদাস কহই পুন এতিখনে জানিয়ে কী ভেল গোরি।

১ ভণহুঁ বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতী।

যাহা হউক, গোবিন্দদাস কখনো বা ক্রিয়াপদের সহিত যোগ করিয়া কখনো বা ক্রিয়াপদকে উহ্য রাখিয়া পহুঁ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সেই সেই স্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃ-ই বুঝিতে হইবে। অন্য কোনোরূপ আনুমানিক অমূলক অর্থ কল্পনা করিয়া লওয়া সংগত হয় না।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, আমার কোনো শ্রদ্ধেয় পূর্ববঙ্গবাসী বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে, তাঁহাদের দেশে 'নিছেপুঁছে' শব্দের চলন আছে। এবং নববধূ ঘরে আসিলে তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে 'নিছিয়া' লওয়া হয়। অতএব এরূপ চলিত প্রয়োগ থাকিলে নিছনি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

প্রত্যুত্তর : পঁহু-প্রসঙ্গ

১

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী[১]

মান্যবরেষু

আপনি বলিয়াছেন :

> অপভ্রংশের নিয়ম সকলজাতির মধ্যে সমান নহে, কারণ কণ্ঠের ব্যাবৃত্তি সকলের সমান নহে। দুঃখের বিষয় বাংলার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই।

এ কথা নিঃসন্দেহ সত্য। এবং এইজন্যই বাংলার কোন্ শব্দটা শব্দশাস্ত্রের কোন্ নিয়মানুসারে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

আপনার মতে :

> শব্দশাস্ত্রের কোনো সূত্র অনুসারে প্রভু হইতে পঁহু শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায় না।

কিন্তু যে-হেতুক বাংলার শব্দশাস্ত্র এখনো রচিত হয় নাই, ইহার সূত্র নির্ধারণ করার কোনো উপায় নাই। অতএব বাংলার আরো দুই-চারিটা শব্দের সহিত তুলনা করা ছাড়া অন্য পথ দেখিতেছি না।

বোধ করি আপনার তর্কটা এই যে, মূল শব্দে যেখানে অনুনাসিকের কোনো সংস্রব নাই, সেখানে অপভ্রংশে অনুনাসিকের প্রয়োগ শব্দশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ। 'বন্ধু' হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি স্থির করিলে এই সংকট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

কিন্তু শব্দতত্ত্বে সর্বত্র এ নিয়ম খাটে না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাই ; যথা, কক্ষ হইতে কাঁকাল, বক্র হইতে বাঁকা, অক্ষি হইতে আঁখি, শস্য হইতে শাঁস, সত্য হইতে সাঁচ্চা। যদি বলেন, পরবর্তী যুক্ত-অক্ষরের পূর্বে চন্দ্রবিন্দু যোগ হইতে পারে কিন্তু অযুক্ত অক্ষরের পূর্বে হয় না, সে কথাও ঠিক নহে। শাবক হইতে ছাঁ, প্রাচীর হইতে পাঁচিল তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সাধারণত অপ্রচলিত এবং

১ প্রশ্নকর্তা। 'পঁহু', সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯।

বৈষ্ণব পদাবলীতেই বিশেষরূপে ব্যবহৃত দুই-একটি শব্দ উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে ; যথা, শৈবাল হইতে শেঁয়লি, শ্রাবণ হইতে সাঙন।

ত বর্গের চতুর্থ বর্ণ ধ যেমন হ-এ পরিবর্তিত হইতে পারে তেমনই প বর্গের চতুর্থ বর্ণ ভ-ও অপভ্রংশে হ হইতে পারে, এ বিষয়ে বোধ করি আমার সহিত আপনার কোনো মতান্তর নাই। তথাপি দুই-একটা উদাহরণ দেওয়া কর্তব্য ; যথা, শোভন হইতে শোহন, গাভী হইতে গাই (গাভী হইতে গাহী, গাহী হইতে গাই), নাভি হইতে নাই (হি হইতে ই হওয়ার উদাহরণ বিস্তর আছে, যেমন আপনি দেখাইয়াছেন, রাধিকা হইতে রাহী এবং রাহী হইতে রাই)।

আমি যে-সকল দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিলাম তাহার মধ্যে যদি কোনো ভ্রম না থাকে তবে প্রভু হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব বোধ হইবে না।

বন্ধু হইতেও পঁহু-র উদ্‌ভব হইতে আটক নাই, আপনি তাহার প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত পঁহু শব্দ বিদ্যাপতির কোনো মৈথিলী পদে পাইয়াছেন কি। আমি তো গ্রিয়ার্সনের ছাপায় এবং বিদ্যাপতির মিথিলাপ্রচলিত পুঁথিতে কোথাও 'পহু' ছাড়া 'পঁহু' দেখি নাই। যদি বন্ধু হইতে বহ্ন্‌, বহ্ন্‌ হইতে পহ্ন্‌ এবং পহ্ন্‌ হইতে পঁহুর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তবে উক্ত শব্দ মৈথিলী বিদ্যাপতিতে প্রচলিত থাকাই সম্ভব। কিন্তু প্রভু শব্দের বিকারজাত পহু শব্দ যে বাঙালির মুখে একটি চন্দ্রবিন্দু লাভ করিয়াছে, ইহাই আমার নিকট অধিকতর সংগত বোধ হয়। বিশেষত বৈষ্ণব কবিদিগের আদিস্থান বীরভূম অঞ্চলে এই চন্দ্রবিন্দুর যে কিরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা সকলেই জানেন।

আর-একটা কথা এই যে, বৈষ্ণব কবিরা অনেকেই ভণিতায় পঁহু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা :

গোবিন্দদাস পঁহু নটবর শেখর।
রাধামোহন পঁহু রসিক সুনাহ।
নরোত্তমদাস পঁহু নাগর কান। ইত্যাদি।

এ স্থলে কবিগণ কৃষ্ণকে বঁধু শব্দে অথবা প্রভু শব্দে সম্ভাষণ করিতেছেন দু-ই হইতে পারে, এখন যাঁহার মনে যেটা অধিকতর সংগত বোধ হয়।

পুনঃ শব্দ হইতেও পঁহু শব্দের উৎপত্তি শব্দশাস্ত্রসিদ্ধ নহে, এ কথা আপনি বলিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, পুনঃ অর্থে পহুঁ শব্দের

ব্যবহার এতস্থানে দেখিয়াছি যে, ওটা বানানভুল বলিয়া ধরিতে মনে লয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার হাতের কাছে বহি নাই; যদি আপনার সন্দেহ থাকে তো ভবিষ্যতে উদাহরণ উদ্‌ধৃত করিয়া দেখাইব।

দ্বিতীয়ত, পুনঃ শব্দ হইতে পহুঁ শব্দের উৎপত্তি শব্দতত্ত্ব অনুসারে আমার নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। বিশেষত, পুনঃ শব্দের পর বিসর্গ থাকাতে উক্ত বিসর্গ হ-এ এবং ন চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া এবং উকারের স্থানবিপর্যয় নিয়ম-বিরুদ্ধ হয় নাই। নিবেদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রাবণ ১২৯৯

২

পঁহু শব্দ বন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় নাই ইহা আপনি[১] স্বীকার করেন, তথাপি উক্ত শব্দ যে প্রভুশব্দমূলক তাহা আপনার সংগত বোধ হয় না। কিন্তু পঁহু যে তৎসম বা তদ্‌ভব সংস্কৃত শব্দ নহে পরন্তু দেশজ শব্দ, আপনার এরূপ অনুমানের পক্ষে কোনো উপযুক্ত কারণ দেখাইতে পারেন নাই। কেবল আপনি বলিয়াছেন, "মধুররসসর্বস্ব পরকীয়া প্রেমে দাস্যভাব অসংযুক্ত।" কিন্তু এই একমাত্র যুক্তি আমার নিকট যথেষ্ট প্রবল বোধ হয় না; কারণ, বৈষ্ণব-পদাবলীতে অনেক স্থানেই রাধিকা আপনাকে কৃষ্ণের দাসী ও কৃষ্ণ আপনাকে রাধিকার দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, পদাবলীতে স্থানে স্থানে পঁহু শব্দ প্রভু অথবা বঁধু ছাড়াও অন্য অর্থে যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি।

রাধামোহন দাস রাধিকার বিরহবর্ণনা করিতেছেন :

> প্রেমগজদলন সহই না পারই জীবইতে করই ধিকার।
> অন্তরগত তুহুঁ নিরগত করইতে কত কত করত সঞ্চার।
> অথির নয়ন শরঘাতে বিষম জর ছটফট জলজ শয়ান।
> রাধামোহন পঁহু কহই অপরূপ নহ যাহে লাগয়ে পাঁচবাণ।

১ ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, 'পঁহু', সাধনা, চৈত্র ১২৯৯

অর্থাৎ শ্যামকে সম্বোধন করিয়া দূতী কহিতেছে :

> প্রেমগজের দলন সহিতে না পারিয়া রাধিকা বাঁচিয়া থাকা ধিক্কার-যোগ্য জ্ঞান করিতেছেন এবং অন্তর্গত তোমাকে নির্গত করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। তোমার অস্থির নয়নশরঘাতে বিষম জরাতুর হইয়া বিরহিণী পদ্মশয়ন অবলম্বন করিয়াছেন। রাধামোহন কহিতেছেন, যাহাকে পঞ্চবাণ লাগে তাহার এরূপ আচরণ কিছুই অপরূপ নহে।

এ স্থলে পহুঁ শব্দের কী অর্থ হইতেছে। 'রাধামোহনের প্রভু বলিতেছেন' এরূপ অর্থ অসংগত। কারণ, কৃষ্ণের মুখে এরূপ উত্তর নিতান্ত রসভঙ্গজনক। 'রাধামোহন কহিতেছেন হে প্রভু' এরূপ অর্থও এ স্থলে ঠিক খাটে না ; কারণ, সেরূপ অর্থ হইলে পঁহু শব্দ পরে বসিত— তাহা হইলে কবি সম্ভবত 'রাধামোহন কহে অপরূপ নহে পঁহু' এইরূপ শব্দবিন্যাস ব্যবহার করিতেন।

যুগলমূর্তি বর্ণনায় গোবিন্দদাস কহিতেছেন :

> ও নব পদুমিনী সাজ,
> ইহ মত্ত মধুকর রাজ।
> ও মুখ চন্দ উজোর,
> ইহ দিঠি লুবধ চকোর।
> গোবিন্দদাস পহু ধন্দ,
> অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।

এখানে ভণিতার অর্থ :

> অরুণের নিকট চাঁদ দেখিয়া গোবিন্দদাসের ধাঁদা লাগিয়াছে।

গোবিন্দদাসের প্রভুর ধাঁদা লাগিয়াছে এ কথা বলা যায় না, কারণ তিনিই বর্ণনার বিষয়। এখানে পঁহু সম্বোধন পদ নহে তাহা পড়িলেই বুঝা যায়।

শ্যামের সেবাসমাপনান্তে রাধিকা সখীসহ গৃহে ফিরিতেছেন :

> সখীগণ মেলি করল জয়কার,
> শ্যামক অঙ্গে দেয়ল ফুলহার।
> নিজ মন্দিরে ধনী করল প্রয়াণ,
> ঘন বনে রহল সুনাগর কান।
> সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী,
> মণিময় ভূষণে অঙ্গ উজোরি।

শঙ্খ শব্দ ঘন জয়জয় কার,
সুন্দর বদনে কবরী কেশভার।
হেরি মদন কত পরাভব পায়
গোবিন্দদাস পহুঁ এহ রস গায়।

এখানেও পঁহু অর্থে প্রভু অথবা বঁধু অসংগত।

সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ,
দোহত ধেনু করত কত ছন্দ।
গোধন গরজত বড়ই গভীর
ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর।
গোরস ধীর ধীর বিরাজিত অঙ্গ,
তমালে বিথারল মোহিত রঙ্গ।
মুটকি মুটকি ভরি রাখত ঢারি।
গোবিন্দদাস পঁহু করত নেহারি।

এখানে 'গোবিন্দদাসের প্রভু নিরীক্ষণ করিতেছেন' এরূপ অর্থ হয় না; কারণ, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে তিনি দোহনে নিযুক্ত।

বনি বনমালা আজানুলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গায়ত গোবিন্দদাস পঁহু।

এখানে 'গোবিন্দদাসের প্রভু গান গাহিতেছেন' ঠিক হয় না ; কারণ, তাঁহার মুখে মোহন মুরলী।

নিজ মন্দির যাই বৈঠল রসবতী
গুরুজন নিরখি আনন্দ।
শিরীষ কুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল
ঢর ঢর ও মুখচন্দ।...
গৃহ নিজ কাজ সমাপল সখীজন
গুরুজন সেবন ফেলি।
গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্ন
বেলি অবসান ভৈ গেলি।

এই পদে কেবল রাধিকার গৃহের কথা হইতেছে ; তিনি ক্রমে ক্রমে গৃহকার্য এবং ভোজনাদি সমাধা করিলেন এবং সন্ধ্যা হইল— কবি ইহাই দর্শন এবং বর্ণনা করিতেছেন। এখানে শ্যাম কোথায় যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন যে, 'হে গোবিন্দদাসের বঁধু, বেলা গেল সন্ধ্যা হল।'

আমি কেবল নির্দেশ করিতে চাহি যে, গোবিন্দদাসের এবং দুই-একস্থলে রাধামোহন দাসের পদাবলীতে পঁহু পহুঁ বা পহু— প্রভু ও বঁধু অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কী অর্থে হয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

কিন্তু প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে বিদ্যাপতির নোটে অক্ষয়বাবু একস্থলে পহু অর্থে পুনঃ লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই অর্থ নিতান্ত অনুমানমূলক না মনে করিয়া আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি এবং দেখিয়াছি স্থানে স্থানে পহুঁ শব্দের পুনঃ অর্থ সংগত হয়। কিন্তু তথাপি স্থানে স্থানে 'ভণে' অর্থ না করিয়া পুনঃ অর্থ করিলে ভাব অসম্পূর্ণ থাকে ; যেমন, গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্ন ইত্যাদি।

এই কারণে আমরা কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়িয়া আছি। ভণহুঁ এবং পুনহুঁ এই দুই শব্দ হইতেই যদি পহুঁ-র উৎপত্তি হইয়া থাকে তবে স্থানভেদে এই দুই অর্থই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, গোবিন্দদাস (এবং কদাচিৎ রাধামোহন) ছাড়া আর-কোনো বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে পহুঁ শব্দ প্রয়োগের এরূপ গোলযোগ নাই। অতএব ইহার বিরুদ্ধে যদি অন্য কোনো দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ না থাকে তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই শব্দ ব্যবহারে গোবিন্দদাসের বিশেষ একটু শৈথিল্য ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করি : আপনি মিথিলাপ্রচলিত বিদ্যাপতির পদ হইতে যে-সকল দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহাতে পহু শব্দে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ দেখা যাইতেছে ; এই চন্দ্রবিন্দু কি আপনি কোনো পুঁথিতে পাইয়াছেন। গ্রিয়ার্সন-প্রকাশিত গ্রন্থে কোথাও পঁহু দেখি নাই ; এবং কিছুকাল পূর্বে যে হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছিলাম তাহাতে পহু ব্যতীত কুত্রাপি পহুঁ দেখি নাই।

চৈত্র ১২৯৯

প্রতিশব্দ

১

ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার একটা কারবার চলিয়াছে। সেই কারবার-সূত্রে বিশ্বের হাটে আমাদের ভাবের লেনা-দেনা ঘটিতেছে। এই লেনা-দেনায় সব চেয়ে বিঘ্ন ভাষায় শব্দের অভাব। একদিন আমাদের দেশের ইংরেজি পড়ুয়ারা এই দৈন্য দেখিয়া নিজের ভাষার প্রতি উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা ইংরাজিতেই লেখাপড়া শুরু করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাংলাদেশের বড়ো সৌভাগ্য এই যে, সেই বড়ো দৈন্যের অবস্থাতেও দেশে এমন সকল মানুষ উঠিয়াছিলেন যাঁহারা বুঝিয়াছিলেন বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া ছাড়া দেশের মনকে বলবান করিবার কোনো উপায় নাই। তাঁহারা ভরসা করিয়া তখনকার দিনের বাংলা ভাষার গ্রাম্য হাটেই বিশ্ব-সম্পদের কারবার খুলিয়া বসিলেন। সেই কারবারের মূলধন তখন সামান্য ছিল কিন্তু আশা ছিল মস্ত। সেই আশা দিনে দিনেই সার্থক হইয়া উঠিতেছে। আজ মূলধন বাড়িয়া উঠিয়াছে— আজ শুধু কেবল আমাদের আমদানির হাট নয়— রফ্‌তানিও শুরু হইল।

ইহার ফল হইয়াছে এই যে বাংলা দেশ, ধনের বাণিজ্যে যথেষ্ট পিছাইয়া আছে বটে কিন্তু ভাবের বাণিজ্যে বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে ছাড়াইয়া গেল। মান্দ্রাজে যখন গিয়াছিলাম তখন একটা প্রশ্ন বারবার অনেকের কাছেই শুনিয়াছি—"মৌলিক্যে[১] বাংলাদেশ আমাদের চেয়ে এত অগ্রসর হইল কেন?" তাহার সব কারণ স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা সহজ নহে। কিন্তু অন্তত একটা কারণ এই যে, বাঙালির ছেলেমেয়ে শিশুকাল হইতেই বাংলা সাহিত্য হইতে তাহাদের মনের খোরাক পাইয়া আসিতেছে। অধিক বয়সে যে পর্যন্ত না ইংরেজি শেখে সে পর্যন্ত তাহার মন উপবাসী থাকে না।

আজ পর্যন্ত আমাদের ভাষা প্রধানত ধর্মসাহিত্য এবং রসসাহিত্য লইয়াই চলিয়া আসিতেছে। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় যে-সকল শব্দের

১ দ্রষ্টব্য : প্রতিশব্দ ২

দরকার তাহা আমাদের ভাষায় জমে নাই। এইজন্য আমাদের ভাষায় শিক্ষার উচ্চ অঙ্গ কানা হইয়া আছে।

কিন্তু কেবল পরিভাষা নহে, সকলপ্রকার আলোচনাতেই আমরা এমন অনেক কথা পাই যাহা ইংরেজি ভাষায় সুপ্রচলিত, অথচ যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় নাই। ইহা লইয়া আমাদের পদে পদেই বাধে। আজিকার দিনে সে-সকল কথার প্রয়োজন উপেক্ষা করিবার জো নাই। এইজন্য শান্তিনিকেতন পত্রে আমরা মাঝে মাঝে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা প্রতিশব্দ বানাইবার চেষ্টা করিব— তাহা যে সাহিত্যে চলিবে এমন দাবি করিব না, কেবল তাহার যাচাই করিতে ইচ্ছা করি। আমি চাই আমাদের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা এ সময়ে কিছু ভাবিবেন। কোনো শব্দ যদি পছন্দ না হয়, বা আর-একটা শব্দ যদি তাঁহাদের মাথায় আসে, তবে এই পত্রে তাহা জানাইবেন।

ইংরেজি Nation[১] কথাটার আমরা প্রতিশব্দরূপে 'জাতি' কথাটা ব্যবহার করি। নেশান শব্দের মূল ধাতুগত অর্থ জাতি শব্দের সঙ্গে মেলে। যাহাদের মধ্যে জন্মগত বন্ধনের ঐক্য আছে তাহারাই নেশন। তাহাদিগকেই আমরা জাতি বলিতে পারিতাম কিন্তু আমাদের ভাষায় জাতি শব্দ একদিকে অধিকতর ব্যাপক, অন্য দিকে অধিকতর সংকীর্ণ। আমরা বলি পুরুষজাতি, স্ত্রীজাতি, মনুষ্যজাতি, পশুজাতি ইত্যাদি। আবার ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদও জাতিভেদ। এমন স্থলে নেশনের প্রতিশব্দরূপে জাতি শব্দ ব্যবহার করিলে সেটা ঠিক হয় না। আমি নেশন শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার না করিয়া ইংরেজি শব্দটাই চালাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

ইংরেজি Nation, race, tribe, caste, genus, species— এই ছয়টা শব্দকেই আমরা জাতি শব্দ দিয়া তর্জমা করি। তাহাতে ভাষার শৈথিল্য ঘটে। আমি প্রতিশব্দের একটা খসড়া নিয়ে লিখিলাম— এ সম্বন্ধে বিচার প্রার্থনা করি।

Nation—অধিজাতি। National—আধিজাতিক। Nationalism —আধিজাত্য।

Race—প্রবংশ। Race preservation—প্রবংশ রক্ষা।

১ দ্রষ্টব্য: প্রতিশব্দ ১২

Tribe—জাতি সম্প্রদায়।

Caste—জাতি, বর্ণ।

Genus এবং speciesকে যথাক্রমে মহাজাতি ও উপজাতি নাম দেওয়া যাইতে পারে।

আষাঢ় ১৩২৬

২

প্রতিশব্দ সম্বন্ধে আষাঢ়ের শান্তিনিকেতনে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল সে সম্বন্ধে পাঠকদের কাছ হইতে আলোচনা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু এখনো কাহারো কাছ হইতে কোনো সাড়া মেলে নাই। কিন্তু এ-সব কাজ একতরফা হইলে কাঁচা থাকিয়া যায়। যে-সকল শব্দকে ভাষায় তুলিয়া লইতে হইবে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার ও সম্মতির প্রয়োজন।

আমি নিজেই বলিয়াছি নেশন কথাটাকে তর্জমা না করিয়া ব্যবহার করাই ভালো। ওটা নিতান্তই ইংরেজি, অর্থাৎ ওই শব্দের দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করা হয়, সে অর্থ ইহার আগে আমরা ব্যবহার করি নাই। এমন-কি, ইংরেজিতেও নেশনের সংজ্ঞা নির্ণয় করা শক্ত।

সেইজন্যই বাংলায় প্রচলিত কোনো শব্দ নেশনের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিলে কিছুতেই খাপ খাইবে না। "জাতি" কথাটা ওই অর্থে আজকাল আমরা ব্যবহার করি বটে কিন্তু তাহাতে ভাষার ঢিলামিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। বরঞ্চ সাহিত্য ইতিহাস সংগীত বিদ্যালয় প্রভৃতি শব্দ-সহযোগে যখন আমরা 'জাতীয়' বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া থাকি তখন তাহাতে কাজ চলিয়া যায়— কারণ ওই বিশেষণের অন্য কোনো কাজ নাই। সেইজন্যই 'জাতীয়' বিশেষণ শব্দটি ন্যাশনল শব্দের প্রতিশব্দরূপে এমনি শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে যে, উহাকে আর উৎপাটিত করিবার জো নাই। কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে যদি nation, race, tribe, clan শব্দের বিশেষত্ব নির্দেশ করার প্রয়োজন ঘটে তবে বিপদে পড়িতে হইবে। সুতরাং নেশন ও ন্যাশনাল কথাটা বাংলায় জাতে তুলিয়া লওয়া কর্তব্য মনে করি। এমন বিস্তর বিদেশী কথা বাংলায় চলিয়া গেছে।

এই 'জাতি' শব্দের প্রসঙ্গে আর-একটি শব্দ মনে পড়িতেছে যাহার একটা কিনারা করা আশু আবশ্যক। কোনো বিশেষকালে-জাত সমস্ত প্রজাকে ইংরেজিতে generation বলে। বর্তমান অতীত বা ভাবী জেনেরেশন সম্বন্ধে যখন বাংলায় আলোচনার দরকার হয় তখন আমরা পাশ কাটাইয়া যাই। কিন্তু বিঘ্ন দূর না করিয়া বিঘ্ন এড়াইয়া চলিলে ভাষার দুর্বলতা ঘোচে না।

বস্তুত বাংলায় 'প্রজা' কথার অন্য অর্থ যদি চলিত না থাকিত তবে ওই কথাটি ঠিক কাজে লাগিত। বর্তমানে যাহারা জাত তাহাদিগকে বর্তমান-কালের প্রজা, অতীতকালে যাহারা জাত তাহাদিগকে অতীত কালের প্রজা বলিলে কোনো গোল হইত না। কিন্তু এখন আর উপায় নাই।

'জন' কথাটারও ওই রকমেরই অর্থ। জন্ম শব্দের সঙ্গেই উহার যোগ। কিন্তু উহার প্রচলিত অর্থটি প্রবল, অন্য কোনো অর্থে উহাকে খাটানো চলিবে না।

অতএব প্রজা এবং জন এই কথার মাঝামাঝি একটা কথা যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে সেটা ব্যবহারে লাগানো যায়। যথা প্রজন। মনুতে স্ত্রীলোকের বর্ণনাস্থলে আছে 'প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।' অর্থাৎ প্রজনের জন্য স্ত্রীজাতি পূজনীয়া। ইংরেজি ভাষায় generation শব্দের অন্য যে-অর্থ আছে অর্থাৎ জন্মদান করা, এই প্রজনের সেই অর্থ। কিন্তু পূর্বকথিত অর্থে এই শব্দকে ব্যবহার করিলে কানে খারাপ লাগিবে না। প্রজন শব্দটা প্রথমে বুঝিতে হয়তো গোল ঠেকিবে, উহার বদলে যদি 'প্রজাত' শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝা যাইবে। এ সম্বন্ধে পাঠকদের মত জানিতে চাই।

আমার 'প্রতিশব্দ' প্রবন্ধ উপলক্ষে একটিমাত্র বিতর্ক উঠিয়াছে। সেটা 'মৌলীন্য' কথা লইয়া। Originality শব্দের যে প্রতিশব্দ আজকাল চলিতেছে সেটা 'মৌলিকতা'। সেটা কিছুতেই আমার ভালো লাগে নাই। কারণ 'মৌলিক' বলিলে সাধারণত বুঝায় মূলসম্বন্ধীয়— ইংরেজিতে radical বলিতে যাহা বুঝায়। যথা, radical change—মৌলিক পরিবর্তন। আপনাতেই যাহার মূল, তাহাকে মৌলিক বলিলে কেমন বেখাপ শোনায়। বরং নিজমূলক বলিলে চলে। কখনো কখনো আমি 'স্বকীয়তা' শব্দ Originality অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু সর্বত্র ইহা খাটে না। বিশেষ কাব্যকে স্বকীয় কাব্য

বলা চলে না। মৌলিক কাব্য বলিলেও যে সুশ্রাব্য হয় তাহা নহে, তবু চোখ কান বুজিয়া সেটাকে কণ্ঠস্থ করা যায়।

এইজন্যই কুলীন শব্দে যেমন কুলগৌরব প্রকাশ করে তেমনি মূলীন শব্দে মূল গৌরব প্রকাশ করিবে এই মনে করিয়াই ওই কথাটাকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছেন কুলীন শব্দ ব্যাকরণের যে-বিশেষ নিয়মে উৎপন্ন মূলীন শব্দে সে নিয়ম খাটে না। শুনিয়া ভয় পাইয়াছি। ভুল পুরাতন হইয়া গেলে বৈধ হইয়া উঠে, নূতন ভুলের কৌলীন্য নাই বলিয়াই ভাষায় তাহা পঙ্‌ক্তি পায় না। বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের ব্যভিচার অনেক চলিয়াছে ; কিন্তু আজকালকার দিনে পূর্বের চেয়ে পাহারা কড়াকড় হওয়ায় সে সম্ভাবনা আর নাই। অতএব জাতমাত্রই মৌলীন্য শব্দের অন্ত্যেষ্টি সংকার করা গেল।

ভাদ্র ১৩২৬

৩

বাংলায় 'অপূর্ব' শব্দ বিশেষ অর্থে প্রচলিত হইয়াছে।[১] 'অপূর্ব সৌন্দর্য' বলিতে আমরা original beauty বুঝি না। যদি বলা যায় কবিতাটি অপূর্ব তাহা হইলে আমরা বুঝি তাহার বিশেষ একটি রমণীয়তা আছে, কিন্তু তাহা যে original এরূপ বুঝি না। ইংরেজিতে যাঁহাকে original man বলা যায় তিনি চিন্তায় কর্মে বা আচরণে অন্য কাহারো অনুসরণ করেন না। বাংলায় যদি তাঁহাকে বলি 'লোকটি অপূর্ব' তাহা হইলে সেটা ঠাট্টার মতো শোনায়। বোধ হয় এরূপ প্রসঙ্গে স্বানুবর্তী ও স্বানুবর্তিতা কথাটা চলিতে পারে। কিন্তু রচনা বা কর্ম সম্বন্ধে ও কথাটা খাটিবে না। 'আদিম' শব্দটি বাংলায় যদি 'primitive' অর্থে না ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে ওই শব্দটির প্রয়োগ এরূপ স্থলে সংগত হইত। বিশেষ কবিতাটি আদিম বা তাহার মধ্যে আদিমতা আছে বলিলে ঠিক ভাবটি বোঝায়। বস্তুত, অপূর্ব=strange, আদিম= original। অপূর্ব সৌন্দর্য=strange beauty, আদিম সৌন্দর্য=original

১ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিশব্দ প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন পত্রে (ভাদ্র ১৩২৬) আলোচনা-প্রসঙ্গে originality-র প্রতিশব্দরূপে 'অপূর্বতা' শব্দের ব্যবহার প্রস্তাব করেন।

beauty, আদি গঙ্গা = the original Ganges। আদি বুদ্ধ = the original Buddha। আদি জ্যোতি = the original light। অপূর্ব জ্যোতি বলিলে বুঝাইবে, the strange light। আদি পুরুষ = the original ancestor, এরূপ স্থলে অপূর্ব পুরুষ বলাই চলে না।

ভাদ্র ১৩২৬

৪

ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাংলা করিবার চেষ্টা মাঝে মাঝে হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজিতে অনেক নিত্যপ্রচলিত সামান্য শব্দ আছে বাংলায় তাহার তর্জমা করিতে গেলে বাধিয়া যায়। ইংরেজি ক্লাসে বাংলায় ইংরেজি ব্যাখ্যা করিবার সময় পদে পদে ইহা অনুভব করি। ইহার একটা কারণ, তর্জমা করিবার সময় আমরা স্বভাবতই সাধু ভাষার সন্ধান করিয়া থাকি, চলিত ভাষায় যে-সকল কথা অত্যন্ত পরিচিত সেইগুলিই হঠাৎ আমাদের মনে আসে না। চলিত ভাষা লেখাপড়ার গণ্ডির মধ্যে একেবারেই চলিতে পারে না এই সংস্কারটি থাকাতেই আমাদের মনে এইরূপ বাধা ঘটিয়াছে। 'আমার পরে তাহার sympathy নাই' ইহার সহজ বাংলা 'আমার পরে তাহার দরদ্ নাই', কিন্তু চলিত বাংলাকে অপাঙ্‌ক্তেয় ঠিক করিয়াছি বলিয়া ক্লাসে বা সাহিত্যে উহার গতিবিধি বন্ধ। এইজন্য 'সহানুভূতি' বলিয়া একটা বিকট শব্দ জোর করিয়া বানাইতে হইয়াছে; এই গুরুভার শব্দটা ভীমের গদার মতো, ইহাকে লইয়া সর্বদা সাধারণ কাজে ব্যবহার করিতে গেলে বড়োই অসংগত হয়।[১]

দরদ কথাটা ঘর-গড়া নয়, ইহা সজীব, এইজন্য ইহার ব্যবহারের বৈচিত্র্য আছে। 'লোকটা দরদী' বলিলেই কথাটার ভাব বুঝিতে বিলম্ব হয় না— কিন্তু 'লোকটা সহানুভব' বলিলে কী যে বলা হইল বোঝাই যায় না, যদিচ মহানুভব কথাটা চলিত আছে। আমরা বলি, 'ওস্তাদজি দরদ দিয়া গান করেন', ইংরেজিতে এ স্থলে sympathy শব্দের ব্যবহার আছে কিন্তু 'সহানুভূতি দিয়া গান করেন' বলিলে মনে হয় যেন ওস্তাদজি গানের প্রতি বিষম একটা অত্যাচার করেন।

১ দ্রষ্টব্য : 'চিহ্নবিভ্রাট' এবং 'শব্দচয়ন' প্রবন্ধ।

আসল কথা, অনুভূতি শব্দটা বাংলায় নূতন আমদানি, এইজন্য উহার পরে আমাদের দরদ জন্মে নাই। এইজন্যই 'সহানুভূতি' শব্দটা শুনিলে আমাদের হৃদয় তখনি সাড়া দেয় না। এই কথাটা কাব্যে, এমন-কি, মেঘনাদবধের সমান ওজন কোনো মহাকাব্যেও, ব্যবহার করিতে পারেন এমন দুঃসাহসিক কেহ নাই। অনুভূতি কথাটা যেমন নূতন, বেদনা কথাটা তেমনি পুরাতন। এইজন্য সমবেদনা কথাটা কানে বাজে না। যেখানে দরদ শব্দটা খাপ খায় না সেখানে আমি 'সমবেদনা' শব্দ ব্যবহার করি, পারৎপক্ষে 'সহানুভূতি' ব্যবহার করি না।

তর্জমা করিবার সময় একটা জিনিস আমরা প্রায় ভুলিয়া যাই। প্রত্যেক ভাষায় এমন কোনো কোনো শব্দ থাকে যাহার নানা অর্থ আছে। আমাদের 'ভাব' কথাটা, কোথাও বা idea, কোথাও বা thought, কোথাও বা feeling, কোথাও বা suggestion, কোথাও বা gist। ভাব কথাটাকে ইংরেজিতে তর্জমা করিবার সময়ে সকল জায়গাতেই যদি idea শব্দ প্রয়োগ করি তবে তাহা অদ্ভুত হইবে। 'এই প্রস্তাবের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে' এরূপ বাক্য প্রয়োগ আমরা মাঝে মাঝে শুনিয়াছি। ইহা ইংরেজি ভাষা-ব্যবহারের নকল, কিন্তু বাংলায় ইহা অত্যন্ত অসংগত। এ স্থলে 'এই প্রস্তাবে আমাদের সম্মতি আছে' বলা যায়— কারণ, প্রস্তাবের অনুভূতি নাই, সুতরাং তাহার সহিত সহানুভূতি চলে না। অতএব একভাষায় যেখানে একশব্দের দ্বারা নানা অর্থ বোঝায় অন্য ভাষায় তাহার এক প্রতিশব্দ হইতেই পারে না।

গতবারের শান্তিনিকেতনে originality শব্দের আলোচনাস্থলে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। কোনো একজন মানুষের originality আছে এই ভাব ব্যক্ত করিবার সময়ে তাঁহার স্বানুবর্তিতা আছে বলা চলে না, সে স্থলে 'আদিমতা' আছে বলিলে ঠিক হয়; যে কবিতা হইতে আর-একটি কবিতা তর্জমা করা হইয়াছে সেই কবিতাকে মূল কবিতা বলিতে হইবে। যে কবিতায় বিশেষ অসামান্যতা আছে, তাহাকে অনন্যতন্ত্র কবিতা বলা চলে। ইহার উপযুক্ত সংস্কৃত কথাটি 'স্বতন্ত্র'— কিন্তু বাংলায় অন্য অর্থে তাহার ব্যবহার। বস্তুত আমার মনে হয়, কি মানুষ সম্বন্ধে, কি মানুষের রচনা সম্বন্ধে, উভয় স্থলেই অনন্যতন্ত্র শব্দের ব্যবহার চলিতে পারে।

একটি অত্যন্ত সহজ কথা লইয়া বাংলা ভাষায় আমাদিগকে প্রায় দুঃখ

পাইতে হয়— সে কথাটি feeling। Feeling-এর একটা অর্থ বোধশক্তি— ইহাকে আমরা 'অনুভূতি' শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। আর-একটি অর্থ হৃদয়বৃত্তি। কিন্তু হৃদয়বৃত্তি শব্দটা পারিভাষিক। সর্বদা ব্যবহারে ইহা চলিতে পারে না। অনেক সময়ে কেবলমাত্র 'হৃদয়' শব্দের দ্বারা কাজ চালানো যায়; যেখানে ইংরাজিতে বলে 'feeling উত্তেজিত হইয়াছে' সেখানে বাংলায় বলা চলে, 'হৃদয়' উত্তেজিত হইয়াছে। যে মানুষের feeling আছে তাহাকে সহৃদয় বলি। 'কবি এই কবিতায় যে feeling প্রকাশ করিয়াছে' এরূপ স্থলে feeling-এর প্রতিশব্দ স্বরূপে হৃদয়ভাব বলা যায়। শুধু 'ভাব'ও অনেক সময়ে feeling-এর প্রতিশব্দরূপে চলে। Emotion শব্দটি বাংলায় তর্জমা করিবার সময় আমি বরাবর 'আবেগ' ও 'হৃদয়াবেগ' শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে, সংস্কৃত ভাষায় পারিভাষিক ও সহজ অর্থে 'feeling' শব্দের কোন্ কোন্ প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়?

ইংরেজি culture শব্দের বাংলা লইয়া অনেক সময় ঠেকিতে হয়।[২] 'learning' এবং 'culture' শব্দের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা সংস্কৃত কোন্ শব্দের দ্বারা বোঝায় আমি ঠিক জানি না। 'বৈদগ্ধ্য' শব্দের অর্থ ঠিক culture বলিয়া আমার বোধ হয় না। Culture শব্দে যে ভাব প্রকাশ হয় তাহা বাংলায় ব্যবহার না করিলে একেবারেই চলিবে না। একটি বিশেষ স্থলে আমি প্রথমে 'চিত্তোৎকর্ষ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম; কারণ culture শব্দের মতোই 'উৎকর্ষ' শব্দের মধ্যে কর্ষণের ভাব আছে। পরে আমি 'চিত্তোৎকর্ষের' পরিবর্তে 'সমুৎকর্ষ' শব্দটি গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, শুধু 'উৎকর্ষ' শব্দ এই বিশেষ অর্থে চালানো যায় কি না। cultured mind-এর বাংলা করা যাইতে পারে 'প্রাপ্তোৎকর্ষ-চিত্ত'। ভালো শোনায় যে তাহা নহে। 'উৎকর্ষিত' চিত্ত বলা যাইতে পারে; মানুষ সম্বন্ধে ব্যবহারের বেলায় 'উৎকর্ষ-বান' লোক বলিলে ক্ষতি হয় না। উৎকৃষ্ট বিশেষণ শব্দটি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। যেমন 'learning' এবং 'culture' তেমনি 'knowlegde' এবং 'wisdom'-এর প্রভেদ আছে। কোন্ কোন্ শব্দের দ্বারা

২ দ্রষ্টব্য: 'কাল্‌চার ও সংস্কৃতি' প্রসঙ্গ।

সেই প্রভেদ নির্ণীত হইবে তাহার উত্তরের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

কিছুদিন হইল আর-একটি ইংরেজি কথা লইয়া আমাকে ভাবিতে হইয়াছিল। সেটি 'degeneracy', আমি তাহার বাংলা করিয়াছিলাম আপজাত্য। যাহার আপজাত্য ঘটিয়াছে সে অপজাত (degenerate)। প্রথমে জননাপকর্ষ কথাটা মনে আসিয়াছিল, কিন্তু সুবিধামত তাহাকে বিশেষণ করা যায় না বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইল। বিশেষত অপ উপসর্গই যখন অপকর্ষবাচক তখন কথাটাকে বড়ো করিয়া তোলা অনাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি genetics নামে যে নূতন বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে কি প্রজনতত্ত্ব নাম দেওয়া যাইতে পারে? আমি eugenics শব্দের বাংলা করিয়াছি সৌজাত্যবিদ্যা।

এই প্রজনতত্ত্বের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় heredity। বাংলায় ইহাকে বংশানুগতি এবং inherited শব্দকে বংশানুগত বলা চলে। কিন্তু inheritanceকে কী বলা যাইবে? বংশাধিকার অথবা উত্তরাধিকার? inheritable—বংশানুলোম্য।

Adaptation শব্দকে আমি অভিযোজন নাম দিয়াছি। নিজের surroundings-এর সহিত adaptation— নিজের পরিবেষ্টনের সহিত অভিযোজন। Adaptability—অভিযুজ্যতা। Adaptable—অভিযোজ্য। Adapted—অভিযোজিত।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬

৫

কয়েকটি ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ স্থির করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া একজন পত্র লিখিয়াছেন।

১ প্রশ্ন। I envy you your interest in art। এখানে interest শব্দের অর্থ কী?

উত্তর। বলা বাহুল্য interest শব্দের অনেকগুলি ভিন্ন অর্থ আছে। বাংলায় তাহাদের জন্য পৃথক শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। এখানে উক্ত ইংরেজি শব্দের স্থলে বাংলায় 'অনুরক্তি' শব্দ ব্যবহার করা চলে।

২ প্রশ্ন। Attention is either spontaneous or reflex। এখানে spontaneous ও reflex শব্দের প্রতিশব্দ কী হওয়া উচিত ?

উত্তর। Spontaneous—স্বতঃস্ফূত। Reflex—প্রতিক্ষিপ্ত।

৩ প্রশ্ন। Forethought-এর প্রতিশব্দ কী ?

উত্তর। প্রসমীক্ষা, প্রসমীক্ষণ, পূর্ব-বিচারণা।

৪ প্রশ্ন। 'By suggestion I can cure you'. 'The great power latent in this form of suggestiveness is wellknown'. Suggestion ও suggestiveness -এর প্রতিশব্দ কী ?

উত্তর। সাধারণত বাংলায় suggestion ও suggestiveness-এর প্রতিশব্দ ব্যঞ্জনা ও ব্যঞ্জনাশক্তি চলিয়া গিয়াছে। কোনো বিশেষ বাক্যপ্রয়োগে শব্দার্থের অপেক্ষা ভাবার্থের প্রাধান্যকে ব্যঞ্জনা বলা হয়। কিন্তু এখানে 'suggestion' শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে, আভাসের দ্বারা একটা চিন্তা ধরাইয়া দেওয়া। এ স্থলে 'সূচনা' ও 'সূচনাশক্তি' শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৫ প্রশ্ন। 'Instinct similar to the action inspired by suggestion' ইহার অনুবাদ কী ?

উত্তর। সূচনার দ্বারা প্রবর্তিত যে মানসিক ক্রিয়া তাহারই সমজাতীয় সহজ প্রবৃত্তি।

বলা বাহুল্য আমাদের পত্রে আমরা যে প্রতিশব্দের বিচার করি তাহা পাঠকদের নিকট হইতে তর্ক-উদ্দীপন করিবার জন্যই। সকল প্রতিশব্দের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষমতা আমাদের নাই।

অগ্রহায়ণ ১৩২৬

৬

কয়েকটি চিঠি পাইয়াছি তাহাতে পত্রলেখকগণ বিশেষ কতকগুলি ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ জানিতে চাহিয়াছেন। নূতন একটা শব্দ যখন বানানো যায় তখন অধিকাংশ লোকের কানে খট্‌কা লাগে। এইজন্য অনেকে দেখি রাগ করিয়া উঠেন। সেইজন্য বার বার বলিতেছি আমাদের যেমন শক্তিও অল্প অভিমানও তেমনি অল্প। কেহ যদি কোনো শব্দ না পছন্দ করেন দুঃখিত হইব

না। ভাষায় যে-সব ভাবপ্রকাশের দরকার আছে তাহাদের জন্য উপযুক্ত শব্দ ঠিক করিয়া দেওয়া একটা বড়ো কাজ। অনেকে চেষ্টা করিতে করিতে তবে ইহা সম্পন্ন হইবে। আমাদের চেষ্টা যদি এক দিকে ব্যর্থ হয় অন্য দিকে সার্থক হইবে। চেষ্টার দ্বারা চেষ্টাকে উত্তেজিত করা যায়, সেইটেই লাভ। এইজন্যই, কোনো ওস্তাদীর আড়ম্বর না করিয়া আমাদের সাধ্যমত পত্রলেখকদের প্রেরিত ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ভাবিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি।

পূর্ববারে লিখিয়াছি হিপ্নটিজ্‌ম্‌ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত suggestion শব্দের প্রতিশব্দ 'সূচনা'। আমরা ভাবিয়া দেখিলাম সূচনা শব্দের প্রচলিত ব্যবহারের সহিত ইহার ঠিক মিল হইবে না। তাই ইংরেজি suggestion-এর স্থলে 'অভিসংকেত' শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি। অভি উপসর্গ দ্বারা কোনো-কিছুর অভিমুখে শক্তি বা গতি বা ইচ্ছা প্রয়োগ করা বুঝায়; ইংরেজি towards-এর সহিত ইহার মিল। অভ্যর্থনা, অভিনন্দন, অভিযান, অভিপ্রায় প্রভৃতি শব্দ তাহার প্রমাণ। Auto-suggestion শব্দের প্রতিশব্দ স্বাভিসংকেত হইতে পারে। একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আমরা কথায় বলি 'তোমায় কয়েকটি উপায় suggest করতে পারি' এ ক্ষেত্রে বাংলায় কি বলিব?" একটা কথা মনে রাখা দরকার, কোনো টাট্‌কা তৈরি কথা চলিত কথাবার্তায় অদ্ভুত শোনায়। প্রথমে যখন সাহিত্যে খুব করিয়া চলিবে, তখন মুখের কথায় ধীরে ধীরে তাহার প্রবেশ ঘটিবে। 'অভিসংকেত' কথাটা যদি চলে তবে প্রথমে বইয়ে চলিবে। "কয়েকটি উপায় অভিসংকেত করা যাইতে পারে" লিখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

উক্ত লেখকই প্রশ্ন করিয়াছেন, "Adaptability-র বাংলা কী হইতে পারে? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 'অভিযুজ্যতা'। একজন সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক তাঁহার পত্রে জানাইয়াছেন, "উপযোগিতাই ভালো।" উপযোগিতা বলিতে suitability বুঝায়। যাহা উপযুক্ত তাহা স্বভাবতই উপযুক্ত হইতে পারে কিন্তু adapt করা চেষ্টাসাপেক্ষ। 'অভিযোজিত' বলিলে সহজেই বুঝায় একটা-কিছুর অভিমুখে যাহাকে যোজনা করা হইয়াছে; যাহা সহজেই যুক্ত তাহার সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ আছে। আর-একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন —'যোজিত' অপেক্ষা 'যুক্ত'ই ব্যাকরণসম্মত। আমরা ব্যাকরণ সামান্যই জানি কিন্তু আমাদের নজির আছে—

পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্তঃ
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।

প্রশ্ন : Paradox শব্দের বাংলা আছে কি ?

নাই বলিয়াই জানি। শব্দ বানাইতে হইবে, ব্যবহারের দ্বারাই তাহার অর্থ পাকা হইতে পারে। বিসংগত সত্য বা বিসংগত বাক্য এই অর্থে চালাইলে চলিতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করি।

Parody—ব্যঙ্গানুকরণ।

Amateur শব্দের একটা চলিত বাংলা 'অব্যবসায়ী'। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু যেন নিন্দার ভাব আছে। তাহা ছাড়া ইহাতে অভ্যস্ত দক্ষতার অভাবমাত্র বুঝায় কিন্তু অনুরাগ বুঝায় না। ইংরেজিতে কখনো কখনো সেইরূপ নিন্দার ভাবেও এই শব্দের ব্যবহার হয়, তখন অব্যবসায়ী কথা চলে। অন্য অর্থে শখ শব্দ বাংলায় চলে, যেমন শখের পাঁচালি, শখের যাত্রা। ব্যবহারের সময় আমরা বলি শৌখিন। যেমন শৌখিন গাইয়ে।

প্রশ্নকর্তা লিখিতেছেন, "Violet কথাটার বাংলা কী? নীলে সবুজে মিলিয়া বেগুনি, কিন্তু নীলে লালে মিলিয়া কী?"

আমার ধারণা ছিল নীলে লালে বেগুনি। ভুল হইতেও পারে। সংস্কৃতে violet শব্দের প্রতিশব্দ পাটল বলিয়া জানি।

পত্রলেখক romantic শব্দের বাংলা জানিতে চাহিয়াছেন। ইহার বাংলা নাই এবং হইতেও পারে না। ইংরেজিতে এই শব্দটি নানা সূক্ষ্মভাবে এমনি পাঁচরঙা যে ইহার প্রতিশব্দ বানাইবার চেষ্টা না করিয়া মূল শব্দটি গ্রহণ করা উচিত।

লেখক dilettante শব্দের বাংলা জানিতে চাহিয়াছেন। মোটামুটি পল্লবগ্রাহী বলা চলে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরো যে-সব ভাবের আভাস আছে বাংলা শব্দে তাহা পাওয়া যাইবে না। প্রত্যেক ভাষাতেই এমন বিস্তর শব্দ আছে যাহা তাহার মোটা অর্থের চেয়ে বেশি কিছু প্রকাশ করে। সেইরূপ ফরাসি অনেক শব্দের ইংরেজি একেবারেই নাই। আমার মনে আছে— একদা ভগিনী নিবেদিতা আমার নিম্নলিখিত গানের পদটি দুই ঘণ্টা ধরিয়া তর্জমা করিবার চেষ্টা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—

নিশিদিন ভরসা রাখিস,
ওরে মন, হবেই হবে।[১]

প্রথম বাধিল 'ভরসা' কথা লইয়া। ভরসা কথার সঙ্গে দুটো ভাব জড়ানো, confidence এবং courage। কিন্তু ইংরেজি কোনো এক শব্দে এই দুটো ভাব ঠিক এমন করিয়া মেলে না। Faith, trust, assurance কিছুতেই না। তার পরে 'হবেই হবে' কথাটাকে ঠিক অমন করিয়া একদিকে অস্পষ্ট রাখিয়া আর-এক দিকে খুব জোর দিয়া বলা ইংরেজিতে পারা যায় না। এ স্থলে ইংরেজিতে একটু ঘুরাইয়া বলা চলে—

Keep thy courage of Faith, my heart,
And thy dreams will surely come true.

পৌষ ১৩২৬

৭

…Two mindedness-কে দ্বৈমানসিকতা বললে কি রকম হয়? কিম্বা Two minded = দ্বৈতমনা, ও Two mindedness = দ্বৈতমানস।…[২]

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৮

মহান = Sublime
মহিমা = Sublimity

সৌন্দর্য ও মহিমা— এইটেই ভালো লাগ্‌চে। ভূমা শব্দের অসুবিধা অনেক। কারণ বিশেষ্য বিশেষণ একই হওয়া ব্যবহারের পক্ষে একেবারেই ভালো নয়।…[৩]

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

---

১ দ্রষ্টব্য চিহ্নবিভ্রাট, ভূমিকাংশ

২-৩ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র

৯

আমার শরীর ও মনের অটুট কুঁড়েমি শেষ নৈষ্কর্ম্য রাত্রির পূর্বসন্ধ্যা বলে ধরে নিতে পারো। এই নৈঃশব্দ্যের যুগে আমার কাছে শব্দসৃষ্টির প্রত্যাশা নিয়ে এসেছ, কুণ্ঠিত করেছ আমার লেখনীকে। রচনার প্রসঙ্গে পরিভাষা যখন আপনি এসে পড়ে তখন সেটা মাপসই মানানসই হয়। পা রইল এ পাড়ায় আর জুতো তৈরি হচ্ছে ও পাড়ায় ব্যবহারের পক্ষে এটা অনেক সময়েই পীড়াজনক ও ব্যর্থ হয়। অপর পক্ষে নতুন জুতো প্রথমটা পায়ে আঁট হলেও চলতে চলতে পা তাকে নিজের গরজে আপনার মাপের করে নেয়। পরিভাষা সম্বন্ধেও সেরকম প্রায়ই ঘটে।

Harmony—স্বরসংগম বা স্বরসংগতি।

Concord—স্বরৈক্য

Discord—বিস্বর

Symphony—ধ্বনিমিলন

Symphonic—সংধ্বনিক

সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় যেখানে সহজে সাড়া না দেয় সেখানে মূল শব্দের শরণ নিয়ো। ভাষায় ম্লেচ্ছ সংস্রবদোষ একদা গর্হিত ছিল। এখন সেদিন নেই— এখন ভাষার অগ্নিবাসে ফিরিঙ্গিতে বাঙালিতে ঘেঁষাঘেঁষি বসে।...[১]

২৪ নভেম্বর ১৯২৭

১০

...আমার মতে "স্বপ্নাঙ্কিত" কথাটা অন্তত এখনো চলনসই হয় নি— রোমাঞ্চিত কথাটার মানে, রোম carved হয়ে ওঠা— আমি তৃণাঙ্কিত কথা ব্যবহার করেচি— সেটা যদিও অচলিত তবু অচলনীয় নয়। মঞ্জীরকে "তিক্ত" বললে ভাষায় ফিরিঙ্গি গন্ধ লাগে। ইংরেজিতে bitter কথাটা রসনাকে ছাড়িয়ে হৃদয় পর্যন্ত প্রবেশ করে— বাংলায় "তীব্র" কথাটা স্বাদে এবং ভাবে আনাগোনা করে কিন্তু তিক্ত কথাটাকে অন্তত নূপুরের বিশেষণরূপে চালাবার

১ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র

পূর্বে তোমার কবিযশকে এখনো অনেক দূর সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরিব্যাপ্ত করতে হবে। "স্বীকৃতির" পরিবর্তে খ্যাতি বলাই ভালো। "সুগুপ্ত" কথাটা আমার কানে অত্যন্ত পীড়ন সঞ্চার করে। যেখানে গুপ্ত শব্দের সঙ্গে সু বিশেষণের সংগতি আছে সেখানে দোষ নেই। অনেকে খামকা সু-উচ্চ কথা ব্যবহার করে কিন্তু ওতে কেবল ছন্দোরক্ষার অনাচার প্রকাশ পায়।...[১]

৬ মে ১৯৩১

১১

The Voice কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ চাও। বাণী ছাড়া আর কোনো শব্দ মনে পড়ে না। আমাদের ভাষায় আকাশবাণী দৈববাণী প্রভৃতি কথার ব্যবহার আছে। শুধু "বাণী" কথাটিকে যদি যথেষ্ট মনে না কর তবে "মহাবাণী" ব্যবহার ক'রতে পারো।...[২]

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৮

১২

আমার মনে হয় নেশান, ন্যাশনাল প্রভৃতি শব্দ ইংরেজিতেই রাখা ভালো। যেমন অক্সিজেন হাইড্রোজেন। ওর প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। রাষ্ট্রজন কথাটা চালানো যেতে পারে। রাষ্ট্রজনিক এবং রাষ্ট্রজনিকতা শুনতে খারাপ হয় না। আমার মনে হয় রাষ্ট্রজনের চেয়ে রাষ্ট্রজাতি সহজ হয়। কারণ নেশন অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার বহুল পরিমাণে চ'লে গেছে। সেই কারণেই রাষ্ট্রজাতি কথাটা কানে অত্যন্ত নতুন ঠেকবে না।

Caste—জাত   Nation—রাষ্ট্রজাতি

Race—জাতি   People—জনসমূহ

Population—প্রজন[৩]

২২ জানুয়ারি ১৯৩২

১ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র

২ শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে লিখিত পত্র

৩ রেবতীমোহন বর্মনকে লিখিত পত্র

১৩

দুরূহ আপনার ফরমাস। Broadcastএর বাংলা চান। আমি কখনো কখনো ঠাট্টার সুরে বলি আকাশবাণী।[১] কিন্তু সেটা ঠাট্টার বাইরে চলবে না।…

সীরিয়াসভাবে যদি বলতে হয় তা হলে একটা নতুন শব্দ বানানো চলে। বলা বাহুল্য পারিভাষিক শব্দ পুরোনো জুতো বা পুরোনো ভৃত্যের মতো— ব্যবহার করতে করতে তার কাছ থেকে পুরো সেবা পাওয়া যায়।

"বাক্‌প্রসার" শব্দটা যদি পছন্দ হয় টুকে রাখবেন, পছন্দ যদি না হয় তা হলেও দুঃখিত হবো না। ওর চেয়ে ভালো কথা যদি পান তবে তার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।[২]

১ বৈশাখ ১৩৪২

১৪

শরীর ভালো ছিল না, ব্যস্ত ছিলাম, তার উপরে তোমার প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন, যে চারটে শব্দ তর্জমা করতে অনুরোধ করেছ সেগুলি যদি সশ্রম কারাদণ্ডে ব্যবহার করতে দিতে তা হলে তিন-চার মাসের মেয়াদ ভর্তি হতে পারত।

Intellectual friendship শব্দের ভাষান্তরে তোমাদের প্রস্তাব 'আধি-মানসিক মিত্রতাবোধ'। আপত্তি এই, মিত্রতা মানসিক হবে না তো আর কি হতে পারে? মানসিক শব্দের অর্থ intellectual-এর চেয়ে ব্যাপক— বস্তুত ওর ইংরেজী হচ্ছে mental। Intellect-কে বুদ্ধি বল্‌লে বোঝা সহজ হয় বুদ্ধিগত বা বুদ্ধিমূলক বা বুদ্ধিপ্রধান মৈত্রী অথবা মৈত্রীবোধ বল্‌লে কানে খটকা লাগবে না। ওর প্রতিকূল শব্দ হচ্ছে emotional অর্থাৎ ভাবপ্রধান বা হৃদয়-প্রধান।

Cultural self শব্দটাকে তর্জমা করা আরো দুঃসাধ্য। তোমাদের প্রস্তাব

১ 'ধরার আঙিনা হতে ঐ শোনো উঠিল আকাশবাণী' কবিতায় (৫ অগস্ট ১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথ শব্দটি ব্যবহার করেন। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার-প্রণীত 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' গ্রন্থে (১৮৭৯ শকাব্দ) "রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে কবিতাটি উদ্‌ধৃত ও রচনার প্রসঙ্গ আলোচিত।

২ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র

হচ্ছে 'আধি সাংস্কৃতিক'। এর ঠিক মানেটা আন্দাজ করা অসম্ভব বললেই হয়। প্রথমত culture শব্দের বাংলা একটি করতে হবে। আমি বলি মনঃপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষ বললে ভাবখানার একটা ইসারা পাওয়া যায়। Cultured লোককে বলা যেতে পারে প্রকৃষ্টচিত্ত বা প্রকৃষ্টমনা। যদি বলতে হয় অঙ্কশাস্ত্রে তিনি cultured তা হলে বাংলায় বলবে অঙ্কশাস্ত্রে তিনি প্রকর্ষপ্রাপ্ত। অমুক পরিবারে culture-এর atmosphere আছে বলতে হলে বলা যেতে পারে, অমুক পরিবারে মনঃপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষের আবহাওয়া আছে। কৃষ্টি কথাটা আমার কানে একটুও ভালো লাগে না। বরঞ্চ উৎকৃষ্টি[১] বললেও কোনোমতে চলত।

যা হোক আমার মতে cultural self-কে চিত্তপ্রকর্ষগত বা মনঃপ্রকর্ষগত সত্তা বা ব্যক্তিত্ব বলা যায়। আরো দুটো কথা দিয়েছ intellectual passion, intellectual self। সংরাগ শব্দকে আমি passion অর্থে ব্যবহার করি। অতএব আমার মতে intellectual passion-কে বুদ্ধিগত সংরাগ ও intellectual self-কে বুদ্ধিগত ব্যক্তিত্ব বললে ভাবটা বুঝতে বাধবে না।

যাই হোক বহুল ব্যবহার ছাড়া এ-সব শব্দ ভাষায় প্রাণবান হয়ে ওঠে না।

বলা বাহুল্য physical culture-কে বলতে হবে দেহপ্রকর্ষ চর্চা।[২]

৪ আষাঢ় ১৩৩৯

১৫

ভূতত্ত্বের পরিভাষা আলোচনা আমার পক্ষে অসাধ্য। Fossil শব্দকে শিলক ও Fossilized-কে শিলীকৃত বলা চলে। Sub-man-কে অবমানব বললেই ভালো হয়। প্রাতর্ ও প্রত্যুষ শব্দের যোগে যে শব্দ বানিয়েছ কানে অসংগত ঠেকে। প্রাতর্ শব্দের পরিবর্তে প্রথম বা প্রাক্ ব্যবহার করলে চলে না কি, Eolith = প্রাক্‌প্রস্তর। Eoanthropus = প্রাক্‌মানব। Eocene = প্রাগাধুনিক।

Proterozoic = পরাজৈবিক।[৩]

৭ কার্তিক ১৩৩৯

১ দ্রষ্টব্য 'কালচার ও সংস্কৃতি'

২ শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

৩ শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীরকে লিখিত পত্র

১৬

পরিভাষা সংকলনের কাজ আপনি যে নিয়মে চালাচ্ছেন সে আমার অনুমোদিত। আপনার কাজ শেষ হতে দীর্ঘকাল লাগবে। কিন্তু বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে অধিক দেরি করা চলবে না। বই যাঁরা লিখ্‌বেন তাঁদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিদের হাতেই পরিভাষার চরম নির্বাচন ও প্রচলন নির্ভর করে; উপস্থিত মতো যথাসম্ভব তাঁদের সাহায্য করবার কাজে আমরা প্রবৃত্ত হয়েছি। ভাষায় সব সময়ে যোগ্যতমের নির্বাচন নীতি খাটে না— অনেক সময়ে অনেক আকস্মিক কারণে অযোগ্য শব্দ টিকে যায়। সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে তাড়া— শেষ পর্যন্ত বিচার করবার সময় যখন পাওয়া যায় না তখন আপাতত কাজ সারার মতো শব্দগুলো চিরস্বত্ব দখল করে বসে। আমার মনে হয় যথাসম্ভব সত্বর কাজ করা উচিত— কাজ চলতে চলতে ভাষা গড়ে উঠবে— তখন পারিভাষিক শব্দগুলি অনেক স্থলে প্রথার জোরেই ব্যাকরণ ডিঙিয়ে আপন অর্থ স্থির করে নেবে।[১]

২১ আষাঢ় ১৩৪১

১৭

যখন কোনো ইংরেজি শব্দের নূতন প্রতিশব্দ রচনা করতে বসি তখন প্রায় ভুলে যাই যে অনেক সময়ে সে শব্দের ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। Background, ছবি সম্বন্ধে এক মানে, বিষয় সম্বন্ধে অন্য মানে, আবার কোনো কোনো জায়গায় ওই শব্দে বোঝায় প্রচ্ছন্ন বা অনাদৃত স্থান। পটভূমিকা শব্দটা আমিই প্রথমে যে জায়গায় ব্যবহার করেছিলেম সেখানে তার সার্থকতা ছিল। পশ্চাদ্ভূমিকা বা পৃষ্ঠাশ্রয় হয়তো অধিকাংশ স্থলে চলতে পারে। "শিশিরবাবুর নাটকে গানের অন্তভূমিকা বা পশ্চাদ্ভূমিকা" বললে অসংগত শোনায় না। বলা বাহুল্য নতুন তৈরি শব্দ নতুন জুতোর মতো ব্যবহার করতে করতে সহজ হয়ে আসে। "এই নভেলের ঐতিহাসিক পশ্চাদ্ভূমিকা" বললে অর্থবোধের বিঘ্ন হয় না। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে এ-সকল স্থানে ইংরেজির অবিকল অনুবাদের প্রয়োজন

১ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ীকে লিখিত পত্র

কী? এ স্থলে যদি বলা যায়— ঐতিহাসিক ভূমিকা বা ভিত্তি তা হলে তাতে কি নালিশ চলে— কোনোমতে ওই 'পশ্চাৎ' শব্দটা কি জুড়তেই হবে? আশ্রয় বা আশ্রয়বস্তু কথাটাও মন্দ নয়। ইংরেজিতেও অনেক সময়ে একই অর্থে foundation বললেও চলে, background বললেও চলে, support বললেও চলে।

"কায়াচিত্র"[১] Tableau-এর ভালো অনুবাদ সন্দেহ নেই।

Allusion এবং reference অধিকাংশ স্থলেই সমার্থক। বাংলা করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করতে হবে— যেমন সংকেত, লক্ষ্য, উদ্দেশ, উদাহরণ। বলা যেতে পারে, মল্লিনাথের টীকায় দিঙ্‌নাগাচার্যের সমুদ্দেশ পাওয়া যায়। Reference স্থলবিশেষে পরিচয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন certificate-এর সমর্থক reference।

"সুমেরিয় ইতিহাসে ইন্দ্র দেবতার allusion আছে," এখানে allusion যদি অস্পষ্ট হয় তবে সেটা ইঙ্গিত, যদি স্পষ্ট হয় তবে সেটা উদাহরণ। Alluding to his character— "তাঁর চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে।" মোটের উপর অভিনির্দেশ অভিসংকেত শব্দ দ্বারা reference-এর allusion-এর অর্থ বোঝানো যেতে পারে। রক্তকরবীর নন্দিনীকে লক্ষ্য ক'রে যদি 'art' শব্দ ব্যবহার করতে হয় তা হলে বলা উচিত 'কলারূপিণী'। Technical term-এর প্রচলিত বাংলা— পারিভাষিক শব্দ।[২]

৮ আষাঢ় ১৩৪৩

১৮

Relief শব্দের প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ উৎকীর্ণ-চিত্র— যদি অক্ষর হয় তবে উৎকীর্ণ লিপি।[৩]

১০।১।৩৭

১ পত্রলেখক -কর্তৃক প্রস্তাবিত ও রাজশেখর বসু -কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিশব্দ।

২ শ্রীক্ষিতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

৩ শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে লিখিত পত্র

১৯

Proximo ও Ultimo শব্দের সহজ প্রতিশব্দ গত মাসিক ও আগামী মাসিক।[১]

২৮ শ্রাবণ ১৩৪৪

২০

... Image কথাটার প্রতিশব্দ প্রতিমা— স্থান বিশেষে আর কিছুও হোতে পারে।[২]

?. ১. ৪০

১ শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র

২ শ্রীভবানীপ্রসাদ বাগচীকে লিখিত পত্র

প্রদোষ

১

আমার লেখায়[১] "প্রদোষ" শব্দের প্রয়োগে অর্থের ভুল ঘটেচে, সেই নিন্দা[২] ক্ষালনের জন্য তোমার পত্রিকায় কিছু প্রয়াস[৩] দেখা গেল। আমার প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা আছে জেনেই আমি বলচি এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। অজ্ঞতা ও অনবধানতায় স্বকৃত ও অন্যকৃত দোষে অনেক ভুল আমার লেখায় থেকে গেছে। মেনে নিতে কখনো কুণ্ঠিত হই নে। পাণ্ডিত্যের অভাব এবং অন্য অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও সমাদরের যোগ্য যদি কোনো গুণ আমার রচনায় উদ্‌বৃত্ত থাকে তবে সেইটের পরেই আমার একমাত্র ভরসা; নির্ভুলতার পরে নয়।

রাত্রির অল্পান্ধকার উপক্রমকেই বলে প্রদোষ, রাত্রির অল্পান্ধকার পরিশেষের বিশেষ কোনো শব্দ আমার জানা নেই। সেই কারণে প্রয়োজন উপস্থিত হলে ওই শব্দটাকে উভয় অর্থেই ব্যবহার করবার ইচ্ছা হয়। এমনি করেই প্রয়োজনের তাগিদে শব্দের অর্থবিস্তৃতি ভাষায় ঘটে থাকে। সংস্কৃত অভিধানে যে শব্দের যে অর্থ, বাংলা ভাষায় সর্বত্র তা বজায় থাকে নি। সেই ওজর করেই আলোচিত লেখাটিকে যখন গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করব তখন প্রদোষ কথাটার পরিবর্তন করব না এই রকম স্থির করেচি। সম্ভবত এই অর্থে এই শব্দটার প্রয়োগ আমার রচনায় অন্যত্রও আছে এবং ভাবীকালেও থাক্‌বে। রাত্রির আরম্ভে ও শেষে যে আলো-অন্ধকারের সংগম, তার রূপটি একই, এবং একই নামে তাকে ডাকবার দরকার ঘটে। সংস্কৃত ভাষায় সন্ধ্যা শব্দের দুই অর্থই আছে কিন্তু বাংলায় তা চল্‌বে না।

আমার লেখায় এর চেয়ে গুরুতর ভুল, ইস্কুলের নীচের ক্লাসে পড়চে এমন ছেলে চিঠি লিখে একবার আমাকে জানিয়েছিল। আমি মিথ্যা তর্ক করি নি; তাকে সাধুবাদ দিয়ে স্বীকার করে নিয়েচি।— অপবাদের ভাষা ও ভঙ্গি

১ 'পারস্য যাত্রা', প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৯; বর্তমানে 'পারস্য-যাত্রী' গ্রন্থ।

২ শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯

৩ বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৯

অনুসারে কোনো স্থলে স্বীকার করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু না করা ক্ষুদ্রতা। আমি পণ্ডিত নই, শোনা কথা বলচি ; কালিদাসের মতো কবির কাব্যেও শাব্দিক ত্রুটি ধরা পড়েচে। কিন্তু ভাবিক ত্রুটি নয় বলেই তার সংশোধনও হয় নি, মার্জনাও হয়েচে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে এবং চিত্রকলায় এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পুরাণে কথিত আছে, রাধিকার ঘটে ছিদ্র ছিল কিন্তু নিন্দুকেরাও সেটা লক্ষ্য করলে না যখন দেখা গেল তৎসত্ত্বেও জল আনা হয়েচে। সাহিত্যে চিত্রকলায় এই গল্পটির প্রয়োগ খাটে।

বুদ্ধির দোষে, শিক্ষার অভাবে এবং মনোযোগের দুর্বলতায় এমন অনেক ভুল করে থাকি যার স্বপক্ষে কোনো কথাই বলা চলে না। তাতে এইমাত্র প্রমাণ হয় আমি অভ্রান্ত নই। ত্রুটি যাঁরা মার্জনা করেন ঔদার্য তাঁদেরই, যাঁরা না করেন তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। অনতিকাল পূর্বে আমার একটি প্রবন্ধে 'ব্যঞ্জনান্ত' শব্দের স্থলে 'হলন্ত' শব্দ ব্যবহার করেছিলুম। প্রবোধচন্দ্র তাঁর পত্রে আমার এই ভুল স্মরণ করিয়ে দিয়েচেন কিন্তু উল্লাস বা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নি। আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ। সবুজপত্রে আমার লিখিত কোনো প্রবন্ধে ঠিক এই ভুলটিই দেখা যায় তার থেকে প্রমাণ হয় এটার কারণ অন্যমনস্কতা নয়, ব্যাকরণের পারিভাষিকে আমার অজ্ঞতা।[১]

২১ জুলাই ১৯৩২

২

...প্রত্যূষ শব্দটি কালব্যঞ্জক— অর্থাৎ দিনরাত্রির বিশেষ একটি সময়াংশকে বলে প্রত্যূষ। বাংলা ভাষায় 'সন্ধ্যা' শব্দটিও তেমনি। আলো অন্ধকারের সমবায়ের যে একটি সাধারণ ভাবরূপ আছে, যেটা ইংরেজি twilight শব্দে পাওয়া যায় সাহিত্যে অনেক সময় সেইটেরই বিশেষ প্রয়োজন হয়। প্রদোষ শব্দকে আমি সেই অর্থেই ইচ্ছাপূর্বক ব্যবহার করি।[২]

২৩ অগস্ট ১৯৩২

১ সুশীলচন্দ্র মিত্রকে লিখিত পত্র

২ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্র। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথকে লিখিত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের, পত্র বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৯

৩

…অমিয়র চিঠিতে তুমি লিখেচ, সকালবেলাকার আলো অন্ধকারের সময়কে প্রত্যূষ বলা হয়ে থাকে— সেই শব্দটাকে ব্যবহার করলে তার স্থলে প্রদোষ ব্যবহার করবার আভিধানিক দোষ কেটে যায়। প্রত্যূষ শব্দটা দিনরাত্রির একটি বিশেষ সময়কে নির্দেশ করে— অর্থাৎ যাকে বলে ভোরবেলা। ভোরে বা সন্ধ্যায় আলোকের অস্ফুটতায় যে একটি বিশেষ ভাব মনে আনে, প্রত্যূষ শব্দে সেটাকে প্রকাশ করা হয় না। প্রদোষ শব্দকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করি এবং করব। দোষ শব্দের অর্থ রাত্রি— প্র উপসর্গটা সামনের দিকে তর্জনী তোলে— অতএব ওই শব্দটাকে বিশ্লেষণ করে দুই অর্থই পাওয়া যেতে পারে— অর্থাৎ যে সময়টার সম্মুখে রাত্রি, অথবা রাত্রির সম্মুখে যে সময়। রাত্রির প্রবণতা যে দিকে। কিন্তু শব্দ বিশ্লেষণের দরকার নেই, দরকার আছে twilight শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়ার। প্রদোষ শব্দটা সাধারণত বেকার বসে থাকে তার দ্বারা আমি সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করব, যেহেতু অন্য কোনো শব্দ নেই।[১]

২৯ আশ্বিন ১৩৩৯

১ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

কালচার ও সংস্কৃতি

১

কাল্‌চার্‌ শব্দের একটা নতুন বাংলা কথা হঠাৎ দেখা দিয়েছে; চোখে পড়েছে কি? কৃষ্টি।[১] ইংরেজি শব্দটার অভিধানিক অর্থের বাধ্য অনুগত হয়ে ঐ কুশ্রী শব্দটাকে কি সহ্য করতেই হবে। এঁটেল পোকা পশুর গায়ে যেমন কাম্‌ড়ে ধরে ভাষার গায়ে ওটাও তেমনি কামড়ে ধরেছে। মাতৃভাষার প্রতি দয়া করবে না তোমরা?

অন্য প্রদেশে ভদ্রতা বোধ আছে। এই অর্থে সেখানে ব্যবহার 'সংস্কৃতি'। যে-মানুষের কালচার আছে তাকে বলা চলে সংস্কৃতিমান, শব্দটাকে বিশেষ্য করে যদি বলা যায় সংস্কৃতিমত্তা, ওজনে ভারি হয় বটে কিন্তু রোমহর্ষক হয় না। নিজের সম্বন্ধে অহংকার করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তবু আন্দাজে বলতে পারি, বন্ধুরা আমাকে কাল্‌চার্‌ড বলেই গণ্য করেন। কিন্তু যদি তাঁরা আমাকে সহসা কৃষ্টিমান উপাধি দেন বা আমার কৃষ্টিমত্তা সম্বন্ধে ভালোমন্দ কোনো কথার উত্থাপন করেন তবে বন্ধুবিচ্ছেদ হবে। অন্তত আমার মধ্যে কৃষ্টি আছে এ কথার প্রতিবাদ করাকে আমি আত্মলাঘব মনে করব না।

ইংরেজি ভাষায় চাষ এবং ভব্যতা একই শব্দে চলে গেছে ব'লে কি আমরাও বাংলা ভাষায় ফিরিঙ্গিয়ানা করব? ইংরেজিতে সুশিক্ষিত মানুষকে বলে কাল্‌টিভেটেড— আমরা কি সেইরকম উঁচুদরের মানুষকে চাষ করা মানুষ ব'লে সম্মান জানাব, অথবা বলব কেদারনাথ।

[সংস্কৃতভাষায় উৎকর্ষ প্রকর্ষ শব্দের ধাতুগত অর্থে চাষের ভাব আছে কিন্তু ব্যবহারে সে অর্থ কেটে গেছে। কৃষ্টিতে তা কাটে নি। সেইজন্যে তোমাদের সম্পাদকবর্গের কাছে আমার এই প্রশ্ন, চিৎপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষ বা চিত্তোৎকর্ষ শব্দটাকে কালচার অর্থে চালালে দোষ কি? কালচার্‌ড্‌ মানুষকে প্রকৃষ্টচিত্ত লোক বলা যেতে পারে। কালচার্‌ড্‌ ফ্যামিলিকে প্রকর্ষবান পরিবার বললে সে-পরিবার গৌরব বোধ করবে। কিন্তু কৃষ্টিমান বললে চন্দনের সাবান মেখে স্নান করতে ইচ্ছা হবে।][২]

৮ ডিসেম্বর ১৯৩২

১ দ্রষ্টব্য প্রতিশব্দ ১৪

২ ১৩৩৯ মাঘ সংখ্যা পরিচয় পত্রে চিহ্নবিভ্রাট নামে প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত

২

গত জ্যৈষ্ঠের (১৩৪২) 'প্রবাসী'তে একস্থানে ইংরেজি 'কাল্‌চার' শব্দের প্রতিশব্দ রূপে "কৃষ্টি" শব্দের ব্যবহার দেখে মনে খট্‌কা লাগল। বাংলা খবরের কাগজে একদিন হঠাৎ-ব্রণের মতো ওই শব্দটা চোখে পড়ল, তার পরে দেখলুম ওটা বেড়েই চলেছে। সংক্রামকতা খবরের কাগজের বস্তি ছাড়িয়ে উপর মহলেও ছড়িয়ে পড়ছে দেখে ভয় হয়। 'প্রবাসী' পত্রে ইংরেজি অভিধানের এই 'অবদান'টি সংস্কৃত ভাষার মুখোশ প'রে প্রবেশ করেছে, এটা নিঃসন্দেহ অনবধানতাবশত। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি বর্তমান বাংলা-সাহিত্যে 'অবদান' শব্দটির যে প্রয়োগ দেখতে দেখতে ব্যাপ্ত হল সংস্কৃত শব্দকোষে তা খুঁজে পাই নি।

এবারে সেই গোড়াকার কথাটায় ফেরা যাক। কৃষ্টি কথাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বাংলা ভাষার পায়ে বিঁধেছে। চিকিৎসা করা যদি সম্ভব না হয় অন্তত বেদনা জানাতে হবে। ঐ শব্দটা ইংরেজি শব্দের পায়ের মাপে বানানো। এতটা প্রণতি ভালো লাগে না।

ভাষায় কখনো কখনো দৈবক্রমে একই শব্দের দ্বারা দুই বিভিন্ন জাতীয় অর্থজ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, ইংরেজিতে কাল্‌চার কথাটা সেই শ্রেণীর। কিন্তু অনুবাদের সময়েও যদি অনুরূপ কৃপণতা করি তবে সেটা নিতান্তই অনুকরণ-প্রবণতার পরিচায়ক।

সংস্কৃত ভাষায় কর্ষণ বলতে বিশেষভাবে চাষ করাই বোঝায়। ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গযোগে মূল ধাতুটাকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবাচক করা যেতে পারে, সংস্কৃত ভাষার নিয়মই তাই। উপসর্গভেদে এক কৃ ধাতুর নানা অর্থ হয়, যেমন উপকার বিকার আকার। কিন্তু উপসর্গ না দিয়ে কৃতি শব্দকে আকৃতি প্রকৃতি বা বিকৃতি অর্থে প্রয়োগ করা যায় না। উৎ বা প্র উপসর্গযোগে কৃষ্টি শব্দকে মাটির থেকে মনের দিকে তুলে নেওয়া যায়, যেমন উৎকৃষ্টি, প্রকৃষ্টি। ইংরেজি ভাষার কাছে আমরা এমনি কী দাসখৎ লিখে দিয়েছি যে তার অবিকল অনুবর্তন করে ভৌতিক ও মানসিক দুই অসবর্ণ অর্থকে একই শব্দের পরিণয়-গ্রন্থিতে আবদ্ধ করব?

পত্রের শেষাংশ। বাংলা শব্দতত্ত্বের ১৩৫২ সংস্করণ অনুযায়ী পত্রের অংশ দুই অংশে স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবিষ্ট হইল। [ ]-বন্ধনী-ভুক্ত অংশ ঐ সংস্করণে বর্জিত।

বৈদিক সাহিত্যে সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, তাতে শিল্প সম্বন্ধেও সংস্কৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে। 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।' এ'কে ইংরেজি করা যেতে পারে, **Arts indeed are the culture of soul**। 'ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে'— এই-সকল শিল্পের দ্বারা যজমান আত্মার সংস্কৃতি সাধন করেন। সংস্কৃত ভাষা বলতে বোঝায় যে ভাষা বিশেষভাবে **cultured**, যে ভাষা **cultured** সম্প্রদায়ের। মারাঠি হিন্দী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটাই কাল্‌চার অর্থে স্বীকৃত হয়েছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাস (**cultural history**) কৈৃষ্টিক ইতিহাসের চেয়ে শোনায় ভালো। সংস্কৃত চিত্ত, সংস্কৃত বুদ্ধি **cultured mind, cultured intelligence** অর্থে কৃষ্টচিত্ত কৃষ্টবুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রয়োগ সন্দেহ নেই। যে মানুষ **cultured** তাকে কৃষ্টিমান বলার চেয়ে সংস্কৃতিমান বললে তার প্রতি সম্মান করা হবে।[১]

১ প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪২ সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে প্রবাসীর আশ্বিন সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই প্রসঙ্গে লেখেন—

"Culture of mind অর্থে কৃ-ষ্টি শব্দ প্রচলিত হয়েছে। গত ভাদ্রের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি তুলেছেন।

বোধ হয়, প্রথমে আমি কৃ-ষ্টি শব্দ প্রয়োগ করি। সে দশ-বার বৎসর পূর্বের কথা। আমি এখনও কৃ-ষ্টি লিখে থাকি। সং-স্কৃ-তি দেখেছি, কিন্তু আমার মনে লাগে নি। সং-স্কৃ-তি ও সং-স্কা-র অর্থে এক। সং-স্কা-র শব্দের নানা অর্থ আছে। মেদিনীকোষ তিনটি মূলার্থ দিয়েছেন —প্রতিযত্ন, অনুভব, মানসকর্ম। কৃ-ষ্টি শব্দের এত ব্যাপক অর্থ নাই।

অমরকোষে পণ্ডিত শব্দের বত্রিশটি সমার্থ শব্দ আছে। তন্মধ্যে কৃ-ষ্টি একটা। মেদিনীকোষ কৃ-ষ্টি শব্দের দুইটা অর্থ ই ধরেছেন, পুংলিঙ্গে 'বুধ', স্ত্রীলিঙ্গে 'আকর্ষ'। ভূমির কর্ষণ হয়, চিত্ত-ভূমিরও কর্ষণ হ'তে পারে। রামপ্রসাদ তার সাক্ষী।

পশ্চিমদেশের সংস্পর্শে সে দেশের নানা সংস্কার আসছে, নূতন নূতন শব্দও রচিত হচ্ছে। ভাগ্যক্রমে কৃ-ষ্টি নব-রচিত নয়, কিন্তু অর্থে অবিকল culture।"

বিদ্যানিধি মহাশয় মেদিনীকোষ ও অমরকোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন, এইসূত্রে, মনিয়ার বিলিয়ম্‌সের অভিধান হইতে সংস্কৃতি, কৃষ্টি প্রভৃতি শব্দের যে-সকল প্রতিশব্দ রবীন্দ্রনাথ উদ্‌ধৃত করেন, এই আলোচনার তৃতীয় নিবন্ধরূপে তাহা মুদ্রিত হইল।

প্রবন্ধটি "কালচার" নামে প্রবাসী ১৩৪২ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহার অংশবিশেষ বাংলা শব্দতত্ত্বের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে (অগ্রহায়ণ ১৩৪২) 'ভাষার খেয়াল' নামে এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে সংকলিত

৩

মনিয়র বিলিয়মসের অভিধানে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ও তার আনুষঙ্গিক শব্দের ইংরেজি কয়েকটি প্রতিশব্দ নিম্নে উদ্‌ধৃত করা গেল। বর্তমান আলোচ্য প্রসঙ্গে যেগুলি অনাবশ্যক সেগুলি বাদ দিয়েছি।

কৃষ্ট—ploughed or tilled, cultivated ground।

কৃষ্টি—men, races of men, learned man or pandit, ploughing or cultivating the soil।

সংস্কার—making perfect, accomplishment, embellishment।

সংস্কৃত—perfected, refined, adorned, polished, a learned man।

সংস্কৃতি—perfection।

কার্তিক ১৩৪২

প্রতিশব্দ-প্রসঙ্গ

১

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ।
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ॥...

'প্রৈতি' শব্দটির প্রতি আমরা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বাংলা ভাষায় এই শব্দটির অভাব আছে। যেখানে বেগপ্রাপ্তি বুঝাইতে ইংরেজিতে impulse শব্দের ব্যবহার হয় আমাদের বিবেচনায় বাংলায় সেই স্থলে প্রৈতি শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।"[১]

২

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন।... প্রবন্ধে যে দু-একটি পারিভাষিক শব্দ আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাংলায় এভোল্যুশন্ থিওরি-র অনেকগুলি প্রতিশব্দ চলিয়াছে। লেখক মহাশয় তাহার মধ্যে হইতে ক্রমবিকাশতত্ত্ব বাছিয়া লইয়াছেন। পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এরূপ স্থলে অভিব্যক্তিবাদ শব্দ ব্যবহার করেন। অভিব্যক্তি শব্দটি সংক্ষিপ্ত; ক্রমে ব্যক্ত হইবার দিকে অভিমুখভাব অভি উপসর্গযোগে সুস্পষ্ট; এবং শব্দটিকে অভিব্যক্ত বলিয়া বিশেষণে পরিণত করা সহজ। তা ছাড়া ব্যক্ত হওয়া শব্দটির মধ্যে ভালোমন্দ উন্নতি-অবনতির কোনো বিচার নাই; বিকাশ শব্দের মধ্যে একটি উৎকর্ষ অর্থের আভাস আছে। লেখক মহাশয় natural selection-কে বাংলায় নৈসর্গিক মনোনয়ন বলিয়াছেন। এই সিলেক্‌শন্ শব্দের চলিত বাংলা 'বাছাই করা'। বাছাই কার্য যন্ত্রযোগেও হইতে পারে; বলিতে পারি চা-বাছাই করিবার যন্ত্র, কিন্তু চা মনোনীত করিবার যন্ত্র বলিতে পারি না। মন শব্দের সম্পর্কে মনোনয়ন কথাটার মধ্যে ইচ্ছা-অভিরুচির ভাব আসে। কিন্তু প্রাকৃতিক সিলেক্‌শন্ যন্ত্রবৎ নিয়মের কার্য, তাহার মধ্যে ইচ্ছার অভাবনীয় লীলা নাই। অতএব বাছাই শব্দ এখানে সংগত। বাংলায় বাছাই শব্দের সাধু প্রয়োগ নির্বাচন। 'নৈসর্গিক নির্বাচন' শব্দে কোনো

১ সাধনা, ৪র্থ বর্ষ ১ম ভাগ, পৃ ১৯০ পাদটীকা

আপত্তির কারণ আছে কি না জানিতে ইচ্ছুক আছি। Fossil শব্দের সংক্ষেপে 'শিলাবিকার' বলিলে কিরূপ হয়?[১] Fossilized শব্দকে বাংলায় শিলাবিকৃত অথবা শিলীভূত বলা যাইতে পারে।[২]

১৩০৮

৩

'চরিত্র নীতি' প্রবন্ধটির লেখক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র।... ইংরেজি ethics শব্দকে তিনি বাংলায় চরিত্রনীতি নাম দিয়াছেন। অনেকে ইহাকে নীতি ও নীতিশাস্ত্র বলেন — সেটাকে লেখক পরিত্যাগ করিয়া ভালোই করিয়াছেন; কারণ নীতি শব্দের অর্থ সকল সময় ধর্মানুকূল নহে।

প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহৃত্যাপি প্রিয়োত্তরম্।
অপিচাস্য শিরশ্ছিত্ত্বা রুদ্যাৎ শোচেৎ তথাপি চ॥

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট,
মারিয়া কহিবে আরো।
মাথাটা কাটিয়া কাঁদিয়া উঠিবে
যতটা উচ্চে পারো।

ইহাও এক শ্রেণীর নীতি, কিন্তু এথিক্‌স্ নহে। সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম বলিতে মুখ্যত এথিক্‌স্ বুঝায়, কিন্তু ধর্মের মধ্যে আরো অনেক গৌণ পদার্থ আছে। মৌনী হইয়া ভোজন করিবে, ইহা ব্রাহ্মণের ধর্ম হইতে পারে কিন্তু ইহা এথিক্‌স্ নহে। অতএব চরিত্রনীতি শব্দটি উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে আর-একটু সংহত করিয়া 'চারিত্র' বলিলে ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক হয়। চরিত্রনীতিশিক্ষা, চরিত্রনীতিবোধ, চরিত্রনৈতিক উন্নতি অপেক্ষা 'চারিত্রশিক্ষা', 'চারিত্রবোধ', 'চারিত্রোন্নতি' আমাদের কাছে সংগত বোধ হয়।... আর-একটি কথা জিজ্ঞাস্য, metaphysics শব্দের বাংলা কি 'তত্ত্ববিদ্যা' নহে।[৩]

১ দ্রষ্টব্য : 'প্রতিশব্দ-প্রসঙ্গ' ৫

২ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ ৬২-৬৩

৩ সাহিত্যপ্রসঙ্গ, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ ৬৩

৪

লেখক মহাশয় [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী] সেন্‌ট্রিপীটাল ও সেন্‌ট্রিফ্যুগাল ফোর্স-কে কেন্দ্রাভিসারিণী ও কেন্দ্রাপগামিনী শক্তি বলিয়াছেন— কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি আমাদের মতে সংক্ষিপ্ত ও সংগত।[১]

১৩০৮

৫

লেখক মহাশয় ইংরেজি ফসিল্‌ শব্দের বাংলা করিয়াছেন 'প্রস্তরীভূত কঙ্কাল'। কিন্তু উদ্‌ভিদ পদার্থের ফসিল্‌ সম্বন্ধে কঙ্কাল শব্দের প্রয়োগ কেমন করিয়া হইবে। 'পাতার কঙ্কাল' ঠিক বাংলা হয় না।··· ফসিলের প্রতিশব্দ শিলাবিকার হইতে পারে, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু মহলানবিশ মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি 'শিলাবিকার' metamorphosed rock-এর উপযুক্ত ভাষান্তর হয়, এবং জীবশিলা শব্দ ফসিলের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।[২]

১৩০৮

৬

বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির হয় নাই, অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা কর্তব্য, কিন্তু বিবাদ করা অসংগত। ইংরেজি মিটিয়রলজির বাংলা-প্রতিশব্দ এখনো প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং জগদানন্দবাবু যদি আপ্তের সংস্কৃত অভিধানের দৃষ্টান্তে 'বায়ুনভোবিদ্যা' ব্যবহার করিয়া কাজ চালাইয়া থাকেন, তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। যোগেশবাবু 'আবহ' শব্দ কোনো প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ ভূবায়ু। কিন্তু এই ভূবায়ু বলিতে প্রাচীনেরা কী বুঝিতেন, এবং তাহা আধুনিক অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার শব্দের প্রতিশব্দ কি না, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে— এক কথায় ইহার মীমাংসা হয় না। অগ্রে সেই প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। শকুন্তলার সপ্তম অঙ্কে দুষ্মন্ত যখন স্বর্গলোক হইতে মর্ত্যে অবতরণ করিতেছেন, তখন মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমরা কোন্‌ বায়ুর অধিকারে আসিয়াছি।" মাতলি

---

১ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ ৬৫

২ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮, পৃ ১৭৭

উত্তর করিলেন, "গগনবর্তিনী মন্দাকিনী যেখানে বহমানা, চক্রবিভক্তরশ্মি জ্যোতিষ্কলোক যেখানে বর্তমান, বামনবেশধারী হরির দ্বিতীয় চরণপাতে পবিত্র এই স্থান ধূলিশূন্য প্রবহবায়ুর মার্গ।" দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকালে 'প্রবহ' প্রভৃতি বায়ুর নাম তৎকালীন একটি কাল্পনিক বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে প্রচলিত ছিল— সেগুলি একটি বিশেষ শাস্ত্রের পারিভাষিক প্রয়োগ। দেবীপুরাণে দেখা যায়:

প্রাবাহো নিবহশ্চৈব উদ্বহঃ সংবহস্তথা
বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবাহস্তথৈব চ
অন্তরীক্ষে চ বাহ্যে তে পৃথঙ্‌মার্গবিচারিণঃ।

এই-সকল বায়ুর নাম কি আধুনিক মিটিয়রলজির পরিভাষার মধ্যে স্থান পাইতে পারে। বিশেষ শাস্ত্রের বিশেষ মত ও সংজ্ঞার দ্বারা তাহার পরিভাষাগুলির অর্থ সীমাবদ্ধ, তাহাদিগকে নির্বিচারে অন্যত্র প্রয়োগ করা যায় না। অপর পক্ষে নভঃ শব্দ পারিভাষিক নহে, তাহার অর্থ আকাশ, এবং সে-আকাশ বিশেষরূপে মেঘের সহিত সম্বন্ধযুক্ত— সেইজন্য নভঃ ও নভস্য শব্দে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস বুঝায়। কিন্তু নভঃ শব্দের সহিত পুনশ্চ বায়ু শব্দ যোগ করিবার প্রয়োজন নাই, এ কথা স্বীকার করি। আপ্তেও তাঁহার অভিধানে তাহা করেন নাই; তাঁহার আভিধানিক সংকেত অনুসারে নভোবায়ু-বিদ্যা বলিতে নভোবিদ্যা বা বায়ুবিদ্যা বুঝাইতেছে। 'নভোবিদ্যা' মিটিয়রলজির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইলে সাধারণের সহজে বোধগম্য হইতে পারে।

১৩০৮

৭

প্রতিষ্ঠান কথাটা আমাকে বানাইতে হইল। ইংরেজি কথাটা institution। ইহার কোনো বাংলা প্রচলিত প্রতিশব্দ পাইলাম না। যে প্রথা কোনো-একটা বিশেষ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করা যায়, তাহাকে প্রতিষ্ঠান বলিতে দোষ দেখি না। Ceremony শব্দের বাংলা অনুষ্ঠান এবং institution শব্দের বাংলা প্রতিষ্ঠান করা যাইতে পারে।[২]

১৩১২

১ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮, পৃ ১৪৫-৪৬

২ ভাণ্ডার, বৈশাখ ১৩১২, পৃ ৫২

অনুবাদ-চর্চা

শান্তিনিকেতন পত্রের পাঠকদের নিকট হইতে একটি ইংরেজি অনুবাদের বাংলা তরজমা চাহিয়াছিলাম। কতকগুলির উত্তর পাইয়াছিলাম। সকল উত্তরের সমালোচনা করি এমন স্থান আমাদের নাই। ইহার মধ্যে যেটা হাতে ঠেকিল সেইটেরই বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম বাক্যটি এই: **At every stage of their growth our forest and orchard trees are subject to the attacks of hordes of insect enemies, which, if unchecked, would soon utterly destroy them**। একজন তরজমা পাঠাইয়াছেন: "বৃদ্ধির প্রথম সোপানেই আমাদের আরণ্য ও উদ্যানস্থ ফল বৃক্ষ সমূহ কীটশত্রু সম্প্রদায় কর্তৃক আক্রমণের বিষয়ীভূত হয়, যাহারা প্রশমিত না হইলে অচিরেই তাহাদের সর্বতোভাবে বিনাশসাধন করিত।"

ইংরেজি বাক্য বাংলায় তরজমা করিবার সময় অনেকেই সংস্কৃত শব্দের ঘটা করিয়া থাকেন। বাংলা ভাষাকে ফাঁকি দিবার এই একটা উপায়। কারণ, এই শব্দগুলির পর্দার আড়ালে বাংলা ভাষারীতির বিরুদ্ধাচরণ অনেকটা ঢাকা পড়ে। বাংলা ভাষায় 'যাহারা' সর্বনামটি গণেশের মতো বাক্যের সর্বপ্রথম পূজা পাইয়া থাকে। 'দস্যুদল পুলিসের হাতে ধরা পড়িল যাহারা গ্রাম লুটিয়াছিল' বাংলায় এরূপ বলি না, আমরা বলি, 'যাহারা গ্রাম লুটিয়াছিল সেই দস্যুদল পুলিসের হাতে ধরা পড়িল।' **The pilgrims took shelter in the temple, most of whom were starving**— ইংরেজিতে এই '**whom**' অসংগত নহে। কিন্তু বাংলায় ঐ বাক্যটি তরজমা করিবার বেলা যদি লিখি, 'যাত্রীরা মন্দিরে আশ্রয় লইল যাহাদের অধিকাংশ উপবাস করিতেছিল' তবে তাহা ঠিক শোনায় না। এরূপ স্থলে আমরা 'যাহারা' সর্বনামের বদলে 'তাহারা'-সর্বনাম ব্যবহার করি। আমরা বলি 'যাত্রীরা মন্দিরে আশ্রয় লইল, তাহারা অনেকেই উপবাসী ছিল'। অতএব আমাদের আলোচ্য ইংরেজি প্যারাগ্রাফে যেখানে '**which**' আছে সেখানে 'যাহারা' না হইয়া 'তাহারা' হইবে।

'যে' সর্বনাম সম্বন্ধে যে নিয়মের আলোচনা করিলাম তাহার ব্যতিক্রম আছে এখানে তাহার উল্লেখ থাকা আবশ্যক। 'এমন' সর্বনাম শব্দানুগত বাক্যাংশ বিকল্পে 'যে' সর্বনামের পূর্বে বসে। যথা: 'এমন গরিব আছে যাহার ঘরে

হাঁড়ি চড়ে না।' ইহাকে উল্টাইয়া বলা চলে 'যাহার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না এমন গরিবও আছে।' 'এমন জলচর জীব আছে যাহারা স্তন্যপায়ী এবং ভাসিয়া উঠিয়া যাহাদিগকে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়'। এই 'এমন' শব্দ না থাকিলে বাক্যের শেষভাগে 'যাহাদিগকে' শব্দ ব্যবহার করা যায় না। যেমন, 'তিমি জাতীয় স্তন্যপায়ী জলে বাস করে, ভাসিয়া উঠিয়া যাহাদিগকে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়'— ইহা ইংরেজি রীতি; বাংলা রীতিতে 'যাহাদিগকে' না বলিয়া 'তাহাদিগকে' বলিতে হইবে।

ইংরেজিতে subject শব্দের অনেকগুলি অর্থ আছে তাহার মধ্যে একটি অর্থ, আলোচ্য প্রসঙ্গ। ইহাকেই আমরা বিষয় বলি। Subject of conversation, subject of discussion ইত্যাদির বাংলা— আলাপের বিষয়, তর্কের বিষয়। কিন্তু subject to cold 'সর্দির বিষয়' নহে। এরূপ স্থলে সংস্কৃত ভাষায় আস্পদ, পাত্র, ভাজন, অধীন, বশীভূত প্রভৃতির প্রয়োগ চলে। রোগাস্পদ, আক্রমণের পাত্র, মৃত্যুর বশীভূত ইত্যাদি প্রয়োগ চলিতে পারে।

আমাদের অনেক পত্রলেখকই subject কথাটাকে এড়াইয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন কীটশত্রু 'গাছগুলিকে আক্রমণ করে'। ইহাতে আক্রমণ ব্যাপারকে নিত্য ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু subject to attack বলিলে বুঝায় এখনো আক্রমণ না হইলেও গাছগুলি আক্রমণের লক্ষ্য বটে।

ইংরেজি বাক্যটিকে আমি এইরূপ তরজমা করিয়াছি: 'আমাদের বনের এবং ফলবাগানের গাছগুলি আপন বৃদ্ধিকালের প্রত্যেক পর্বে দলে দলে শত্রুকীটের আক্রমণভাজন হইয়া থাকে; ইহারা বাধা না পাইলে শীঘ্রই গাছগুলিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিত।'

'What the loss our forest and shade trees would mean to us can better be imagined than described.' পত্রলেখকের তরজমা: 'বন্য ও ছায়াপাদপের ক্ষতি বলিতে কতটা ক্ষতি আমাদের বোধগম্য হয় তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা আমাদের অধিক উপলব্ধির বিষয়।'

'বর্ণনা করা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধির বিষয়' এরূপ প্রয়োগ চলে না। একটা কিছু 'করার' সঙ্গে আর-একটা কিছু 'করার তুলনা চাই। 'বর্ণনা করা অপেক্ষা উপলব্ধি করা সহজ' বলিলে ভাষায় বাধিত না বটে কিন্তু উপলব্ধি করা এবং imagine করা এক নহে।

আমাদের তরজমা : 'আমাদের বন-বৃক্ষ এবং ছায়াতরুগুলির বিনাশ বলিতে যে কতটা বুঝায় তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা কল্পনা করা সহজ।'

'Wood enters into so many products, that it is difficult to think of civilised man without it, while the fruits of the orchards are of the greatest importance.'

পত্রলেখকের তরজমা : 'কাষ্ঠ হইতে এত দ্রব্য উৎপন্ন হয় যে, সভ্য মানবের পক্ষে উহাকে পরিহার করিবার চিন্তা অত্যন্ত কঠিন, এদিকে আমাদের উদ্যানজাত ফলসমূহও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।'

কাষ্ঠ হইতে দ্রব্য নির্মিত হয়, উৎপন্ন হয় না। এখানে 'উহাকে' শব্দের 'কে' বিভক্তিচিহ্ন চলিতে পারে না। 'ফল সমূহ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়' বলিলে অত্যুক্তি করা হয়। ইংরেজিতে 'are of the greatest importance' বলিতে এই বুঝায় যে পৃথিবীতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা যে-সকল জিনিসের আছে, ফলও তাহার মধ্যে একটি। 'সভ্য মানুষের পক্ষে উহাকে পরিহার করিবার চিন্তা অত্যন্ত কঠিন' ইহা মূলের অনুগত হয় নাই।

আমাদের তরজমা : 'কাঠ আমাদের এতপ্রকার সামগ্রীতে লাগে যে ইহাকে বাদ দিয়া সভ্য মানুষের অবস্থা চিন্তা করা কঠিন; এদিকে ফলবাগানের ফলও আমাদের যার-পর-নাই প্রয়োজনীয়।'

বলা বাহুল্য 'যার-পর-নাই' কথাটা শুনিতে যত একান্ত বড়ো, ব্যবহারে ইহার অর্থ তত বড়ো নহে।

'Fortunately, the insect foes of trees are not without their own persistent enemies, and among them are many species of birds, whose equipment and habits specially fit them to deal with insects and whose entire lives are spent in pursuit of them.'

পত্রলেখকের তরজমা : 'সৌভাগ্যক্রমে বৃক্ষের কীট-অরিগণও নিজেরা তাহাদের স্থায়ী শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত নয়, এবং তাহাদের মধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী আছে, যাহাদিগকে তাহাদের অভ্যাস ও দৈহিক উপকরণগুলি বিশেষভাবে কীটদিগের সহিত সংগ্রামে উপযোগী করিয়াছে এবং যাহাদিগের সমস্ত জীবন তাহাদিগকে অনুধাবন করিতে ব্যয়িত হয়।'

'যে' সর্বনাম শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে পূর্বেই আমাদের বক্তব্য জানাইয়াছি।

আমাদের তরজমা: 'ভাগ্যক্রমে বৃক্ষের শত্রু-কীট-সকলেরও নিজেদের নিত্যশত্রুর অভাব নাই; এই শত্রুদের মধ্যে এমন অনেক জাতীয় পাখি আছে যাহাদের যুদ্ধোপকরণ এবং অভ্যাস সকল কীট-আক্রমণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং যাহারা কীট শিকারেই সমস্ত জীবন যাপন করে।'

ইংরেজিতে persistent কথাটি নিতান্ত সহজ। কথ্য বাংলায় আমরা বলি নাছোড়বান্দা। কিন্তু লেখায় সব জায়গায় ইহা চলে না। আমাদের একজন পত্রলেখক 'দৃঢ়াগ্রহ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু 'আগ্রহ' শব্দে, অন্তত বাংলায়, প্রধানত একটি মনোধর্ম বুঝায়। নিষ্ঠা শব্দেও সেইরূপ। Persistent শব্দের অর্থ, যাহা নিরন্তর লাগিয়াই আছে। 'নির্বন্ধ' শব্দটিতে সেই লাগিয়া থাকা অর্থ আছে; 'দৃঢ়নির্বন্ধ' কথাটা বড়ো বেশি অপরিচিত। এখানে কেবল মাত্র 'নিত্য' বিশেষণ যোগে ইংরেজি শব্দের ভাব স্পষ্ট হইতে পারে।

আমাদের আলোচ্য ইংরেজি প্যারাগ্রাফে একটি বাক্য আছে 'among them are many species of birds'; আমাদের একজন ছাত্র এই species শব্দকে 'উপজাতি' প্রতিশব্দ দ্বারা তরজমা করিয়াছে। গতবারে 'প্রতিশব্দ' প্রবন্ধে[১] আমরাই speciesএর বাংলা 'উপজাতি' স্থির করিয়াছিলাম অথচ আমরাই এবারে কেন many 'species of birds'কে 'নানাজাতীয় পক্ষী' বলিলাম তাহার কৈফিয়ত আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে এখানে ইংরেজিতে species পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই। এখানে কোনো বিশেষ একটি মহাজাতীয় পক্ষীরই উপজাতিকে লক্ষ্য করিয়া species কথা বলা হয় নাই। বস্তুত কীটের যে-সব শত্রু আছে তাহারা নানা জাতিরই পক্ষী— কাকও হইতে পারে শালিকও হইতে পারে, শুধু কেবল কাক এবং দাঁড়কাক শালিক এবং গাঙশালিক নহে। বস্তুত সাধারণ ব্যবহারে অনেক শব্দ আপন মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া চলে, কেহ তাহাতে আপত্তি করে না, কিন্তু পারিভাষিক ব্যবহারে কঠোরভাবে নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। যেমন বন্ধুর নিমন্ত্রণক্ষেত্রে মানুষ নিয়মের দিকে দৃষ্টি রাখে না, সামাজিক নিমন্ত্রণে তাহাকে নিয়ম বাঁচাইয়া চলিতে হয়— এও সেইরূপ।

১ দ্রষ্টব্য: প্রতিশব্দ ১, পৃ. ১৮৩-১৮৫

আমাদের তরজমায় আমরা অর্থ স্পষ্ট করিবার খাতিরে দুই-একটা বাড়তি শব্দ বসাইয়াছি। যেমন শেষ বাক্যে মূলে যেখানে আছে, 'and among them are many species of birds', আমরা লিখিয়াছি 'এই শত্রুদের মধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী আছে'— অবিকল অনুবাদ করিলে লিখিতে হইত 'এবং তাহাদের মধ্যে ইত্যাদি'। ইংরেজিতে একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, সর্বনাম শব্দ তাহার পূর্ববর্তী নিকটতম বিশেষ্য শব্দের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। এ স্থলে them সর্বনামের অনতিপূর্বেই আছে enemies, এইজন্য এখানে 'তাহাদের' বলিলেই শত্রুদের বুঝাইবে। বাংলায় এ নিয়ম পাকা নহে, এইজন্য, 'তাহাদের মধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী আছে' বলিলে যদি কেহ হঠাৎ বুঝিয়া বসেন, 'গাছেদের মধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী আছে, অর্থাৎ পক্ষী বাসা বাঁধিয়া থাকে' তবে তাঁহাকে খুব দোষী করা যাইবে না।

ইংরেজিতে 'and', আর বাংলায় এবং শব্দের প্রয়োগ-ভেদ আছে। সেটা এখানে বলিয়া লই। 'তাঁহার একদল নিন্দুক শত্রু আছে এবং তাহারা খবরের কাগজে তাঁহার নিন্দা করে' এই বাক্যটা ইংরেজি ছাঁচের হইল। এ স্থলে আমরা 'এবং' ব্যবহার করি না। 'তাঁহার একদল নিন্দুক শত্রু আছে এবং তাহারা সরকারের বেতনভোগী'। এখানেও 'এবং' বাংলায় চলে না। 'তাঁহার একদল নিন্দুক শত্রু আছে এবং তিনি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না' এরূপ স্থলে হয় 'এবং' বাদ দিই অথবা 'কিন্তু' বসাই। তাহার কারণ, 'আছে'র সঙ্গে 'আছে', 'করে'র সঙ্গে 'করে', 'হয়'-এর সঙ্গে 'হয়', মেলে, 'আছে'র সঙ্গে 'করে', 'করে'র সঙ্গে 'হয়' মেলে না। 'তাঁহার শত্রু আছে এবং তাঁহার তিনটে মোটর গাড়ি আছে'— এই দুটি অসংশ্লিষ্ট সংবাদের মাঝখানেও 'এবং' চলে কিন্তু তাঁহার শত্রু আছে এবং তিনি শৌখিন লোক' এরূপ স্থলে 'এবং' চলে না, কেননা 'তাঁর আছে' এবং 'তিনি হন' এ দুটো বাক্যের মধ্যে ভাষার গতি দুই দিকে। এগুলো যেন ভাষার অসবর্ণ বিবাহ, ইংরেজিতে চলে বাংলায় চলে না। ইংরেজির সঙ্গে বাংলার এই সূক্ষ্ম প্রভেদগুলি অনেক সময় অসতর্ক হইয়া আমরা ভুলিয়া যাই।

And শব্দযুক্ত ইংরেজি বাক্যে তরজমা করিতে গিয়া বারবার দেখিয়াছি তাহার অনেক স্থলেই বাংলায় 'এবং' শব্দ খাটে না। তখন আমার এই মনে হইয়াছে 'এবং' শব্দটা লিখিত বাংলায় পণ্ডিতদের কর্তৃক নূতন আমদানী, ইহার মানে 'এইরূপ'। 'আর' শব্দ 'অপর' শব্দ হইতে উৎপন্ন, তাহার মানে 'অন্যরূপ'।

'তাঁহার ধন আছে এবং মান আছে' বলিলে বুঝায় তাঁহার যেমন ধন আছে সেইরূপ মানও আছে। 'তিনি প'ড়ে গেলেন, আর, একটা গাড়ি তাঁর পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল'— এখানে পড়িয়া যাওয়া একটা ঘটনা, অন্য ঘটনাটা অপর প্রকারের, সেইজন্য 'আর' শব্দটা খাটে। 'তিনি পড়িয়া গেলেন এবং আঘাত পাইলেন' এখানে দুইটি ঘটনার প্রকৃত যোগ আছে। 'তিনি পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার পায়ের উপর দিয়া গাড়ি চলিয়া গেল', এখানে 'এবং' শব্দটা বেখাপ। এরূপ বেখাপ প্রয়োগ কেহ করেন না বা আমি করি না এমন কথা বলি না কিন্তু ইহা যে বেখাপ তাহার উদাহরণ গতবারের শান্তিনিকেতন পত্রে কিছু কিছু দিয়াছি। He has enemies and they are paid by the Government ইহার বাংলা, 'তাঁর শত্রু আছে; তারা সরকারের বেতন খায়'। এখানে 'এবং' কথাটা অচল। তাহার কারণ, এখানে দুই ঘটনা দুইরূপ। 'তাঁহার পুত্র আছে এবং কন্যা আছে।' 'তাঁহার গাড়ি আছে এবং ঘোড়া আছে'। এ-সব জায়গায় 'এবং' জোরে আপন আসন দখল করে।

আশ্বিন-কার্তিকের সংখ্যার শান্তিনিকেতনে বলিয়াছিলাম যে 'এবং' শব্দ দিয়া যোজিত দুই বাক্যাংশের মধ্যে ক্রিয়াপদের রূপের মিল থাকা চাই। যেমন 'সে দরিদ্র এবং সে মূর্খ' 'সে চরকা কাটে এবং ধান ভানে'—প্রথম বাক্যটির দুই অংশই অস্তিত্ববাচক, শেষের বাক্যটির দুই অংশই কর্তৃত্ববাচক। 'সে দরিদ্র এবং সে ধান ভানিয়া খায়' আমার মতে এটা খাঁটি নহে। আমরা এরূপ স্থলে 'এবং' ব্যবহারই করি না, বলি, 'সে দরিদ্র, ধান ভানিয়া খায়'। অথচ ইংরেজিতে অনায়াসে বলা চলে, She is poor and lives on husking rice।

'রাম ধনী এবং তার বাড়ি তিনতলা' এরূপ প্রয়োগ আমরা সহজে করি না। আমরা বলি, 'রাম ধনী, তার বাড়ি তিন তলা।'

'যার জমি আছে এবং সেই জমি যে চাষ করে এমন গৃহস্থ এই গ্রামে নেই'— এরূপ বাক্য বাংলায় চলে। বস্তুত এখানে 'এবং' উহ্য রাখিলে চলেই না। পূর্বোক্ত বাক্যে 'এমন' শব্দটি তৎপূর্ববর্তী সমস্ত শব্দগুলিকে জমাট করিয়া দিয়াছে। এমন, কেমন? না, 'যার-জমি-আছে-এবং-সেই-জমি-যে-নিজে-চাষ-করে' সমস্তটাই গৃহস্থ শব্দের এক বিশেষণ পদ। কিন্তু 'তিনি স্কুল মাস্টার এবং তাঁর একটি খোঁড়া কুকুর আছে' বাংলায় এখানে 'এবং' খাটে না, তার কারণ এখানে দুই বাক্যাংশ পৃথক, তাহাদের মধ্যে রূপের ও ভাবের ঘনিষ্ঠতা নাই।

আমরা বলি, 'তিনি স্কুল মাস্টার, তাঁর একটি খোঁড়া কুকুর আছে।' কিন্তু ইংরেজিতে বলা চলে, **He is a school master and he has a lame dog** ।

সংস্কৃত ভাষায় যে-সব জায়গায় দ্বন্দ্ব সমাস খাটে, চলিত বাংলায় আমরা সেখানে যোজক শব্দ ব্যবহার করি না। আমরা বলি, 'হাতি ঘোড়া লোক লশকর নিয়ে রাজা চলেছেন' 'চৌকি টেবিল আলনা আলমারিতে ঘরটি ভরা।' ইংরেজিতে উভয় স্থলেই একটা **and** না বসাইয়া চলে না। যথা **'The king marches with his elephants, horses and soldiers', 'The room is full of chairs, tables. clothes. racks and almirahs।'**

বাংলায় আর-একটি নূতন আমদানি যোজক শব্দ 'ও'। লিখিত বাংলায় পণ্ডিতেরা ইহাকে **'and'** শব্দের প্রতিশব্দরূপে গায়ের জোরে চালাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মুখের ভাষায় কখনোই এরূপ ব্যবহার খাটে না। আমরা বলি 'রাজা চলেছেন, তাঁর সৈন্যও চলেছে'। 'রাজা চলিয়াছেন ও তাঁহার সৈন্যদল চলিয়াছে' ইহা ফোর্ট উইলিয়মের গোরাদের আদেশে পণ্ডিতদের বানানো বাংলা। এখন 'ও' শব্দের এইরূপ বিকৃত ব্যবহার বাংলা লিখিত ভাষায় এমনি শিকড় গাড়িয়াছে যে তাহাকে উৎপাটিত করা আর চলিবে না। মাঝে হইতে খাঁটি বাংলা যোজক 'আর' শব্দকে পণ্ডিতেরা বিনা অপরাধে লিখিত বাংলা হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন। আমরা মুখে বলিবার বেলা বলি 'সে চলেছে, আর কুকুরটি পিছন পিছন চলেছে' অথবা 'সে চলেছে, তার কুকুরটিও পিছন পিছন চলেছে' কিন্তু লিখিবার বেলা লিখি 'সে চলিয়াছে ও (কিংবা এবং) তাহার কুকুরটি তাহার অনুসরণ করিতেছে।' 'আর' শব্দটিকে কি আর-একবার তার স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিবার সময় হয় নাই? একটা সুখের কথা এই যে, পণ্ডিতদের আশীর্বাদ সত্ত্বেও 'এবং' শব্দটা বাংলা কবিতার মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই।

১৩২৬

বাংলা কথ্যভাষা

বাংলা শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রচলিত উচ্চারণগুলির তুলনা আবশ্যক। অনেক বাংলা শব্দের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কৃতকার্য হওয়া যায় না। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উচ্চারিত শব্দগুলি মিলাইয়া দেখিলে সেই মূল ধরিতে পারা সহজ হইতে পারে। তাহা ছাড়া উচ্চারণতত্ত্বটি শব্দতত্ত্বের একটি প্রধান অঙ্গ। স্বর ও ব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির কী নিয়মে বিকার ঘটে তাহা ভাষাতত্ত্বের বিচার্য। এজন্যও ভিন্ন জেলার উচ্চারণের তুলনা আবশ্যক। বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলা হইতেই আমাদের আশ্রমে ছাত্রসমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের সাহায্যে বাংলা ধাতুরূপ ও শব্দরূপের তুলনা-তালিকা আমরা বাহির করিতে চাই। নীচে আমরা যে তালিকা দিতেছি তাহার অবলম্বন কলিকাতা বিভাগের বাংলা। পাঠকগণ ইহা অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ প্রদেশের উচ্চারণ-অনুযায়ী শব্দতালিকা পাঠাইলে আমাদের উপকার হইবে।

কলিকাতা বিভাগের শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা আবশ্যক। যখন 'বালক' পত্র প্রকাশ করিতাম সে অনেক দিনের কথা। তখন সেই পত্রে বাংলা শব্দোচ্চারণের কতকগুলি নিয়ম লইয়া অলোচনা করিয়াছিলাম।[১] আমার সেই আলোচিত উচ্চারণপদ্ধতি কলিকাতা বিভাগের। স্থলবিশেষে বাংলায় অকারের উচ্চারণ ওকার-ঘেঁষা হইয়া যায় ইহা আমার বিচারের বিষয় ছিল। 'করা' শব্দের ক্-সংলগ্ন অকারের উচ্চারণ এবং 'করি' শব্দের ক্-সংলগ্ন অকারের উচ্চারণ তুলনা করিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে—এ উচ্চারণ কলিকাতা বিভাগের সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কলিকাতার উচ্চারণে 'মসী' শব্দস্থিত অকার এবং 'দোষী' শব্দস্থিত ওকারের উচ্চারণ একই। 'বোল্‌তা' এবং 'বলব'ও সেইরূপ। বাংলা উচ্চারণে কোনো ওকার দীর্ঘ কোনো ওকার হ্রস্ব; হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী ওকার দীর্ঘ এবং স্বরান্ত শব্দের পূর্ববর্তী ওকার হ্রস্ব। 'ঘোর' এবং 'ঘোড়া' শব্দের উচ্চারণ-পার্থক্য লক্ষ করিলেই ইহা ধরা পড়িবে। কিন্তু যেহেতু বাংলায় দীর্ঘ-ও হ্রস্ব-ও একই ওকার চিহ্নের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে সেইজন্য নিম্নের তালিকায় এই-সকল সূক্ষ্ম প্রভেদগুলি বিশেষ চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিলাম না।

১ "বাংলা উচ্চারণ", বালক, আশ্বিন ১২৯২। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ।

আমরা প্রথমে ক্রিয়াপদের তালিকা দিতেছি। বাংলায় একবচনে ও বহুবচনে ক্রিয়ার প্রকৃতির কোনো পার্থক্য ঘটে না বলিয়াই জানি, এইজন্য নীচের তালিকায় বহুবচনের উল্লেখ নাই। যদি কোনো জেলায় বহুবচনের বিশেষ রূপ থাকে তবে তাহা নির্দেশ করা আবশ্যক।

এইখানে হসন্ত উচ্চারণ সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার। বাংলায় সাধারণত শব্দের শেষবর্ণস্থিত অকারের উচ্চারণ হয় না। যেখানে উচ্চারণ হয় সেখানে তাহা ওকারের মতো হইয়া যায়। যেমন 'বন', 'মন', এ শব্দগুলি হসন্ত। 'ঘন' শব্দটি হসন্ত নহে। কিন্তু উচ্চারণ হিসাবে লিখিতে হইলে লেখা উচিত, ঘনো। 'কত'=কতো। 'বড়'=বড়ো। 'ছোট'=ছোটো। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি বাংলায় দুই অক্ষরের বিশেষণমাত্রই এইরূপ স্বরান্ত। বাংলায় হসন্তের আর-একটি নিয়ম আছে। বাংলায় যে অসংযুক্ত শব্দের পূর্বে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে সে শব্দ নিজের অকার বর্জন করে। 'পাগল্' শব্দের গ আপন অকার রক্ষা করে যেহেতু পরবর্তী ল-এ কোনো স্বর নাই। কিন্তু 'পাগ্‌লা' বা 'পাগ্‌লী' শব্দে গ অকার বর্জন করে। এইরূপ— আপন—আপ্‌নি, ঘটক —ঘট্‌কী, গরম—গর্‌মি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, অনতিপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দে এ নিয়ম খাটে না, যেমন ঘোটক—ঘোটকী। এইপ্রকার হসন্ত সম্বন্ধে বাংলায় সাধারণ নিয়মের যখন প্রায় ব্যতিক্রম দেখা যায় না তখন আমরা এরূপ স্থলে বিশেষভাবে হসন্তচিহ্ন দিব না— যেমন 'করেন্' না লিখিয়া 'করেন' লিখিব, 'কোর্‌চেন্' না লিখিয়া 'কোরচেন' লিখিব।

আমি কোরি	তুই কোরিস	আমি কোরচি	তুই কোরচিস
তুমি করো	সে করে	তুমি কোরচ	সে কোরচে
আপনি করেন	তিনি করেন	আপনি কোরচেন	তিনি কোরচেন

আমি কোরলুম (কোরলেম)	তুই করলি
তুমি কোরলে	সে কোরল (কোরলে)
আপনি কোরলেন	তিনি কোরলেন

আমি কোরেচি	তুই কোরেচিস	আমি কোরেছিলুম (করেছিলেম)
তুমি কোরেচ	সে কোরেচে	তুমি কোরেছিলে
আপনি কোরেচেন	তিনি কোরেচেন	আপনি কোরেছিলেন

আমি কোরছিলুম (কোরছিলেম) তুই কোরছিলি
তুমি কোরেছিলে সে কোরেছিল
আপনি কোরছিলেন তিনি কোরেছিলেন

আমি কোরতুম (কোরতেম) তুই কোরতিস
তুমি কোরতে সে কোরত
আপনি কোরতেন তিনি কোরতেন

করা যাক্ তুমি করো তুই কর তিনি কোরুন
করা হোক্ আপনি করুন সে করুক

আমি কোরব তুই কোরবি
তুমি কোরবে সে কোরবে
আপনি কোরবেন তিনি কোরবেন

করা হয়, করা যায়, কোরে থাকে, কোরতে থাকে, করা চাই, কোরতে হবে, কোরলোই বা (কোরলেই বা), নাই কোরলো (নাই কোরলে), কোরলেও হয়, কোরলেই হয়, কোরলেই হোলো, করানো, কোরে কোরে, কোরতে কোরতে।

হোয়ে পড়া, হোয়ে ওঠা, হোয়ে যাওয়া, কোরে ফেলা, কোরে ওঠা, কোরে তোলা, কোরে বসা, কোরে দেওয়া, কোরে নেওয়া, কোরে যাওয়া, করানো।

কেঁদে ওঠা, হেসে ওঠা, বোলে ওঠা, চেঁচিয়ে ওঠা, আঁৎকে ওঠা, ফস্‌কে যাওয়া, এড়িয়ে যাওয়া, চম্‌কে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, সেরে যাওয়া, সোরে যাওয়া, মোরে যাওয়া।

কর্তৃকারক

একবচন— রাম হাসে, বাঘে মানুষ খায়, ঘোড়ায় লাথি মারে, গোরুতে ধান খায়।

এইখানে একটা কথা পরিষ্কার করা দরকার। 'রাম হাসে' এই বাক্যে 'রাম' শব্দ কর্তৃকারক সন্দেহ নাই। কিন্তু 'বাঘে মানুষ খায়', 'ঘোড়ায় লাথি মারে', 'গোরুতে ধান খায়', বাক্যে 'বাঘে' 'ঘোড়ায়' 'গোরুতে' শব্দগুলি কর্তৃকারক এবং করণকারকের খিচুড়ি। 'বাছুরে জন্মায় বা বাছুরে মরে' এমন বাক্য বৈধ নহে, 'বাছুরে তাকে চেটেচে', চলে— অর্থাৎ এরূপ স্থলে কর্তার সঙ্গে কর্ম চাই।

'ঘোড়ায় লাথি মারে' বলি কিন্তু 'ঘোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে' বলি না। 'লোকে নিন্দে করে' বলি, কিন্তু 'লোকে জমেচে' না বলিয়া 'লোক জমেচে' বলি। আরো একটি কথা বিবেচ্য, বাংলায় কর্তৃকারকের এই প্রকার করণঘেঁষা রূপ কেবল একবচনেই চলে, আমরা বলি না 'লোকগুলোতে নিন্দে করে'। তার কারণ, লোকে, বাঘে, ঘোড়ায় প্রভৃতি প্রয়োগ একবচনও নহে বহুবচনও নহে, ইহাকে সামান্যবচন বলা যাইতে পারে। ইহার প্রকৃত অর্থ, লোকসাধারণ, ব্যাঘ্রসাধারণ, ঘোটকসাধারণ। যখন বলা হয় 'রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব', তখন 'রাম ও রাবণ' ব্যক্তিবিশেষের অর্থত্যাগ করিয়া জাতিবিশেষের অর্থ ধারণ করে।

কর্তৃকারক বহুবচন = রাখালেরা চরাচ্চে, গাছগুলি নড়চে, লোকসব চলেচে।

কর্ম— ভাত খাই, গাছ কাটি, ছেলেটাকে মারি।

এইখানে একটু বক্তব্য আছে। কর্মকারকে সাধারণত প্রাণীপদার্থ সম্বন্ধেই 'কে' বিভক্তি প্রয়োগ হয়। কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম আছে। যেমন, 'এই টেবিলটাকে নড়াতে পারচি নে' 'সন্ন্যাসী লোহাকে সোনা করতে পারে' 'জিয়োমেট্রির এই প্রব্লেমটাকে কায়দা করতে হবে' ইত্যাদি। অথচ 'এই প্রব্লেমকে কষো, এই লোহাকে আনো, টেবিলকে তৈরি করো' এরূপ চলে না। অতএব দেখিতেছি, অপ্রাণীবাচক শব্দের উত্তরে 'টা বা 'টি' যোগ করিলে কর্মকারক তদুত্তরে 'কে' বিভক্তি হয়, যেমন 'চৌকিটাকে সোরিয়ে দাও' ('চৌকিকে সোরিয়ে দাও' হয় না) 'গাছটাকে কাটো' ('গাছকে কাটো' হয় না)। ইহাতে বুঝা যাইতেছে 'টি' বা টা' যোগ করিলে শব্দবিশেষের অর্থ এমন একটা সুনির্দিষ্টতার জোর পায় যে তাহা যেন কতকটা প্রাণের গৌরব লাভ করে। 'লোহাকে সোনা করা যায়', বাক্যে 'লোহা' সেইরূপ যেন ব্যক্তিবিশেষের ভাব ধারণ করিয়াছে।

করণ— ছড়ি দিয়ে মারে, মাঠ দিয়ে যায়, হাত দিয়ে খায়, ঘোলে দুধের সাধ মেটে না, কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কানে শোনে না।

অপাদান— রামের চেয়ে (চাইতে) শ্যাম বড়ো, এ গাছের থেকে ও গাছটা বড়ো, তোমা হোতেই এটা ঘটল, ঘর থেকে বেরোও।

সম্বন্ধ— গাছের পাতা, আজকের কথা, সেদিনকার ছেলে।

অধিকরণ— নদীতে জল, লতায় ফুল, পকেটে টাকা।

বাংলায় কর্তৃকারক ছাড়া অপর কারকে বহুবচনসূচক কোনো চিহ্ন নাই।

সর্বনাম

কর্তা— আমি আমরা, তুমি তোমরা, আপনি আপনারা, সে তারা, তিনি তাঁরা, এ এরা, ইনি এঁরা, ও ওরা, উনি ওঁরা, কে কারা, যে যারা, কি কিসব কোন্‌গুলো, যা যা'সব যেগুলো, তা সেইসব সেইগুলো।

কর্ম— আমাকে আমাদের, তোমাকে তোমাদের (দিগকে), আপনাকে আপনাদের, তাকে তাদের, তাঁকে তাঁদের, একে এদের, এঁকে এঁদের, ওঁকে ওঁদের, কাকে কাদের, কোন্‌টাকে কোন্‌গুলোকে, যাকে যাদের, যেটাকে যেগুলোকে, সেটাকে সেগুলোকে।

করণ— আমাকে দিয়ে, তাকে দিয়ে, কোন্‌টাকে দিয়ে, ইত্যাদি। কেন, কিসে, কিসে কোরে, কি দিয়ে; যাতে, যাতে কোরে, যা দিয়ে; তাতে, তাতে কোরে, তা দিয়ে ইত্যাদি।

অপাদান — আমার চেয়ে এটা ভালো, আমা হতে এ হবে না, আমার থেকে ও বড়ো, এটার চেয়ে, ওটা থেকে ইত্যাদি।

সম্বন্ধ— আমার তোমার তার এগুলোর ওগুলোর ইত্যাদি।

অধিকরণ— আমাতে তোমাতে, এটাতে ওটাতে, আমায় তোমায়, আমাদের মধ্যে, এগুলোতে ইত্যাদি। এখন তখন যখন কখন, এমন তেমন কেমন যেমন অমন, অত তত যত, এখানে যেখানে সেখানে।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬

২

বাংলায় কথার ভাষা আর লেখার ভাষা নিয়ে যে তর্ক কিছুকাল চলছে আপনি আমাকে সেই তর্কে যোগ দিতে ডেকেছেন। আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত

বলে এ কাজে আমি উৎসাহ বোধ করছি নে। সংক্ষেপে দুই-একটা কথা বলব।

কর্ণ অর্জুন উভয়ে সহোদর ভাই হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যখন জাতিভেদ ঘটেছিল, একজন রইল ক্ষত্রিয় আর-একজন হ'ল সূত, তখনি দুই পক্ষে ঘোর বিরোধ বেধে গেল। বাংলা লেখায় আর কথায় আজ সেই দ্বন্দ্ব বেধে গেছে। এরা সহোদর অথচ এদের মধ্যে ঘটেছে শ্রেণীভেদ; একটি হলেন সাধু, আর-একটি হলেন অসাধু। এই শ্রেণীভেদের কারণ ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সে কথাটা খুলে বলি।

এক সময়ে বাংলায় পদ্য সাহিত্যই একা ছিল; গদ্য ছিল মুখে; লেখায় স্থান পায় নি। পদ্যের ভাষা কোনো এক সময়কার মুখের ভাষার কাছ-ঘেঁষা ছিল সন্দেহ নেই— তার মধ্যে 'করিতেছিলাম' বা 'আমারদিগের' 'এবং' 'কিম্বা' 'অথবা' 'অথচ' 'পরন্তু'র ভিড় ছিল না। এমন-কি, 'মুই' 'করলুঁ' 'হৈনু' 'মোসবার' প্রভৃতি শব্দ পদ্য ভাষায় অপভাষা বলে গণ্য হয় নি। বলা বাহুল্য, এ-সকল কথা কোনো এক সময়ের চলতি কথা ছিল। হিন্দী সাহিত্যেও দেখি কবীর প্রভৃতি কবিদের ভাষা মুখের কথায় গাঁথা। হিন্দীতে আর-একদল কবি আছেন, যাঁরা ছন্দে ভাষায় অলংকারে সংস্কৃত ছাঁদকেই আশ্রয় করেচেন। পণ্ডিতদের কাছে এঁরাই বেশি বাহবা পান। ইংরেজিতে যাকে snobbishness বলে এ জিনিসটা তাই। হিন্দী প্রাকৃত যথাসম্ভব সংস্কৃত ছদ্মবেশে আপন প্রাকৃতরূপ ঢাকা দিয়ে সাধুত্বের বড়াই করতে গিয়েচে। তাতে তার যতই মান বাড়ুক-না কেন, মথুরার রাজদণ্ডের ভিতর ফুঁ দিয়ে সে বৃন্দাবনের বাঁশি বাজাতে পারে নি।

যা হোক, যখন বাংলা ভাষায় গদ্যসাহিত্যের অবতারণা হল তার ভার নিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। দেশের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে প্রতিদিন যে গদ্য বাণী প্রবাহিত হচ্চে তাকে বহুদূরে রেখে সংস্কৃত সরোবর থেকে তাঁরা নালা কেটে যে ভাষার ধারা আনলেন তাকেই নাম দিলেন সাধুভাষা। বাংলা গদ্য সাহিত্যিক ভাষাটা বাঙালির প্রাণের ভিতর থেকে স্বভাবের নিয়মে গড়ে ওঠে নি, এটা ফর-মাসে গড়া। বাঙালির রসময় রসনাকে ধিক্কার দিয়ে পণ্ডিতের লেখনী বলে উঠল গদ্য আমি সৃষ্টি করব। তলব দিলে অমরকোষকে, মুগ্ধবোধকে। সে হল একটা অনাসৃষ্টি। তার পর থেকে ক্রমাগতই চেষ্টা চলচে কি ক'রে ভাষার ভিতরকার

এই একটা বিদ্‌ঘুটে অসামঞ্জস্যটাকে মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যাসাগর তাকে কিছু পরিমাণে মোলায়েম ক'রে আনলেন— কিন্তু বঙ্গবাণী তবু বললেন "এহ বাহ্য।" তার পরে এলেন বঙ্কিম। তিনি ভাষার সাধুতার চেয়ে সত্যতার প্রতি বেশি ঝোঁক দেওয়াতে তখনকার কালের পণ্ডিতেরা দুই হাত তুলে বোপদেব অমরের দোহাই পেড়েছিলেন। সেই বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাও আজ প্রায় মরা গাঙের ভাষা হয়ে এসেচে— এখনকার সাহিত্যে ঠিক সে ভাষার স্রোত চলচে না। অর্থাৎ বাংলা গদ্যসাহিত্যের গোড়ায় যে একটা original sin ঘটেছে কেবলি সেটাকে ক্ষালন করতে হচ্চে। কৌলীন্যের অভিমানে যে একটা হঠাৎ সাধুভাষা সর্বসাধারণের ভাষার সঙ্গে জল-চল বন্ধ ক'রে কোণ-ঘেঁষা হয়ে বসেছিল, অল্প অল্প ক'রে তার পঙ্‌ক্তিভেদ ভেঙে দেওয়া হচ্চে। তার জাত যায়-যায়। উভয় ভাষায় কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে অসবর্ণ বিবাহ হতে শুরু হয়েচে। এখন আমরা চলিত কথায় অনায়াসে বলতে পারি 'ম্যালেরিয়ায় কুইনীন ব্যবহার করলে সদ্য ফল পাওয়া যায়।' পঞ্চাশ বছর আগে লোকের সঙ্গে ব্যাভার ছাড়া ব্যবহার কথাটা অন্য কোনো প্রসঙ্গেই ব্যবহার করতুম না। তখন বলতুম, 'ম্যালেরিয়ায় কুইনীনটা খুব খাটে।' আমার মনে আছে, আমার বাল্যকালে আমাদের একজন চাকরের মুখে 'অপেক্ষা' কথাটা শুনে আমাদের গুরুজনরা খুব হেসেছিলেন। কেননা, কেউ অপেক্ষা করচেন, এ কথাটা তাঁরাও বলতেন না— তাঁরা বলতেন 'অমুক লোক তোমার জন্যে বসে আছেন।' আবার এখনকার লেখার ভাষাতেও এমনি করেই মুখের ভাষার ছাঁদ কেবলি এগিয়ে চলছে। এক ভাষার দুই অঙ্গের মধ্যে অতি বেশি প্রভেদ থাকলে সেই অস্বাভাবিক পার্থক্য মিটিয়ে দেবার জন্যে পরস্পরের মধ্যে কেবলি রফা চলতে থাকে।

এ কথা সত্য ইংরেজিতেও মুখের ভাষায় এবং লেখার ভাষায় একেবারে ষোলো-আনা মিল নেই। কিন্তু মিলটা এতই কাছাকাছি যে পরস্পরের জায়গা অদলবদল করতে হলে মস্ত একটা লাফ দিতে হয় না। কিন্তু বাংলায় চলতি ভাষা আর কেতাবী ভাষা একেবারে এপার ওপার— ইংরেজিতে সেটা ডান হাত বাঁ হাত মাত্র— একটাতে দক্ষতা বেশি আর-একটাতে কিছু কম— উভয়ে একত্র মিলে কাজ করলে বেমানান হয় না। আমি কোনো কোনো বিখ্যাত ইংরেজ লেখকের ডিনার-টেবিলের আলাপ শুনেছি, লিখে নিলে ঠিক তাঁদের বইয়ের ভাষাটাকেই

পাওয়া যেত, অতি সামান্যই বদল করতে হত। এই জাতিভেদের অভাবে ভাষার শক্তিবৃদ্ধি হয় আমার তো এই মত। অবশ্য মুখের ব্যবহারে ভাষার যে ভাঙচুর অপরিচ্ছন্নতা ঘটা অনিবার্য সেটাও যে লেখার ভাষায় গ্রহণ করতে হবে আমি তা মানি না। ঘরে যে ধুতি পরি সেই ধুতিই সভায় পরা চলে কিন্তু কুঁচিয়ে নিতে একটু যত্নের প্রয়োজন হয়, আর সেটা ময়লা হলে সৌজন্য রক্ষা হয় না। ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা।[১]

বৈশাখ ১৩৫০

---

১ বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্র।

প্রবাসী ১৩৫০ বৈশাখ সংখ্যায় কালিদাস নাগের নিম্নলিখিত মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয়: "...চিঠি যে 'সবুজ-পত্র' যুগে লেখা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও এই মূল্যবান চিঠিখানি তারিখ বর্জিত।"

বাদানুবাদ

১

গতবারকার শান্তিনিকেতন পত্রের "বাংলা কথ্যভাষা" ও "অনুবাদ-চর্চা"র দুইটি অংশের প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত পত্রটি পাঠাইয়াছেন।

"আশ্বিনের শান্তিনিকেতনে 'বাংলা কথ্য-ভাষা' নামক প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন 'বাংলায় দুই অক্ষরের বিশেষণমাত্রেই স্বরান্ত।' কিন্তু ইহার ব্যত্যয় আছে যথা— বদ, সব, লাল, নীল, পীত, টক, বেশ, শেষ, মূল, ভুল, খুব ইত্যাদি।

"হসন্ত সম্বন্ধে পাগল্-পাগলা, আপন-আপ্‌নি ইত্যাদি নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে; যথা দরদ্-দরদী, এ কথাটা পারসী কিন্তু হজম্-হজ্‌মিও পারসী। তার পর "দরদী" কথাটা ত আর পারসী নয়—ওটা যখন বাংলা তখন বাংলার নিয়মে এর উচ্চারণ হওয়া উচিত ছিল।

" 'অনুবাদচর্চা' প্রবন্ধের 'এবং' শব্দের ব্যবহারনির্দেশক নিয়ম সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে। 'তাঁর অনেক শত্রু আছে এবং তারা সকলেই শক্তিশালী' আমার ত মনে হয় এরূপ প্রয়োগ বাংলায় বেমানান হয় না। তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, যে-বাক্যটির অনুবাদ আলোচনা করিতে গিয়া লেখক 'এবং'-এর নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন তার লেখককৃত তর্জমাতেই ইহার ব্যতিক্রম আছে—যথা 'এমন অনেক জাতীয় পাখী আছে যাহাদের যুদ্ধোপকরণ এবং অভ্যাস সকল কীট আক্রমণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং যাহারা কীট শিকারেই সমস্ত জীবন যাপন করে', এখানে শেষের এবংটি 'হয়' ও 'করে' এই দুই ভিন্ন ক্রিয়াকে যোগ করিতেছে।"

এই প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে লিখিলাম।

দুই অক্ষরের বিশেষণ শব্দ কোনো কোনো স্থলে স্বরান্ত হয় না তাহা আমি মানি— কিন্তু আমাদের ভাষায় তাহার সংখ্যা অতি অল্প। লেখক তাহার উদাহরণে 'পীত' শব্দ ধরিয়া দিয়াছেন। প্রথমত, ঐ শব্দ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয়ত যেখানে হইয়াছে সেখানে উহা হসন্ত নহে। যেমন 'পীত ধড়া'। কখনোই 'পীৎ-ধড়া' বলা হয় না। 'পীৎ-বর্ণ', কেহ কেহ বলেন, কিন্তু 'পীত-বর্ণ'ই বেশির ভাগ লোকে বলিয়া থাকেন। লেখক যে-কয়টি শব্দের তালিকা

দিয়াছেন তাহা ছাড়া, বোধ করি কেবল নিম্নলিখিত শব্দগুলিই নিয়মের বাহিরে পড়ে : বীর, ধীর, স্থির, সৎ, ঠিক, গোল, কাৎ, চিৎ, আড়। সংখ্যাবাচক এক, তিন, চার প্রভৃতি শব্দকে যদি বিশেষণ বলিয়া গণ্য করিতে হয় তবে এগুলি অনিয়মের ফর্দটাকে খুব মোটা করিয়া তুলিবে। এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা দরকার 'এক' যেখানে বিশেষভাবে বিশেষণরূপ ধারণ করিয়াছে সেখানে তাহা 'একা' হইয়াছে।

"তিন অক্ষরের বাংলা শব্দ স্বরান্ত হইলে মাঝের অক্ষর আপন অকার বর্জন করে," লেখক এই নিয়মের একটিমাত্র ব্যতিক্রমের উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, 'দরদী'। শব্দটির উচ্চারণ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। 'হম্‌-দর্দী' কথায় 'র'য়ের অকার লুপ্ত। যাহাই হউক এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে বৈকি। যথা, সজনি, বচসা, গরবী, করলা (ফল)। উপসর্গ-বিশিষ্ট শব্দেও এ নিয়ম খাটে না। যেমন, বে-তরো, দো-মনা, অ-ফলা। বলা বাহুল্য, খাঁটি সংস্কৃত বাংলায় চলিত থাকিলেও এ নিয়ম মানে না ; যেমন, মালতী, রমণী, চপলা ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বাংলার উচ্চারণ-বিকারের একটা নিয়ম উল্লেখ করা যাইতেছে। অনেক স্থলে তিন অক্ষরের স্বরান্ত শব্দে মধ্য অক্ষরের অকার লুপ্ত না হইয়া উকার হইয়া যায়। কাঁদন কাঁদুনে, আট-পহর আটপহুরে (আটপৌরে), শহর শহুরে, পাথর পাথুরে, কোঁদল কুঁদুলে ইত্যাদি।...

অগ্রহায়ণ ১৩২৬

২

অনধিকারচর্চায় অব্যবসায়ীর যে বিপদ ঘটে আমারও তাই ঘটিয়াছে। গত আশ্বিন-কার্তিকের শান্তিনিকেতন পত্রে 'বাংলা কথ্যভাষা' 'অনুবাদ-চর্চা' প্রভৃতি কয়েকটা প্রবন্ধে নিতান্তই প্রসঙ্গক্রমে বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। প্রবাসী তাহা উদ্‌ধৃত করিয়া দেওয়াতে আমার অজ্ঞানকৃত ও অসাবধানকৃত কতকগুলি ভুল বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এই উপলক্ষে সেগুলি সংশোধন হইবার সুযোগ হইল বলিয়া আমি কৃতজ্ঞ আছি। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাংলা ভাষার ব্যবহারে সাহিত্যরসিক। আবার তাহার নাড়ী-পরিচয়ে বৈজ্ঞানিক ; এইজন্য, তিনি আমার যে ত্রুটি ধরিয়াছেন

সাধারণের কাছে তাহা প্রকাশ করা উচিত।

বিজয়বাবু বলেন, 'কর্তৃকারকের' 'এ' কর্তা ও করণের খিচুড়ি হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয় না। এক সময়ে প্রাকৃত ভাষার গ্রন্থে সকল কর্তৃকারকের পদ-ই 'এ' দিয়া চিহ্নিত পাই; 'মহাবীর বলিলেন' এইরূপ কথাতে 'মহাবীরে' পাই। এই প্রাকৃতের পূর্ববর্তী প্রাকৃতে দেখিতে পাই যে একবচনে বেশির ভাগ ওকার চলিয়াছে; ও অল্প পরেই আবার ওকার ও আকার এই উভয় স্থলেই এক একার পাই, ও এই একারটি শেষে কেবল একবচনেই ব্যবহৃত হইয়াছে। উন্নতিশীল বা পরিবর্তনশীল মধ্যবাংলায় ভাষার যত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দূরপ্রদেশে ততটা ঘটে নাই; এখনো রংপুরের প্রাদেশিক ভাষায় কর্তৃকারকে সর্বত্রই একার ব্যবহৃত হয়, আসামের ভাষাতেও উহা রহিয়াছে। একটা প্রাচীন প্রাকৃত হইতেই বাংলা ও ওড়িয়ার জন্ম; ওড়িয়া ভাষায় এখনো সুনির্দিষ্ট একজন লোকের নাম কর্তৃকারকে একার আছে; একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিত বলিলেন যে তিনি আসিতে পারিবেন না, এ কথায় ওড়িয়াতে 'পণ্ডিতে কহিলে' ইত্যাদি চলিয়া থাকে। একজন নির্দিষ্ট গোয়ালাকে লক্ষ্মণ আংটির বিনিময়ে দুধ চাহিয়াছিলেন, সেই গোয়ালা যেভাবে তাহার অসম্মতি জানাইয়াছিল, তাহা পুঁথিতে এইরূপে লিখিত আছে— "গউড়ে বইলে গছে মুদি ফলি থাএ।"

বিজয়বাবু কর্তৃকারকের এ চিহ্ন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমি স্বীকার করিয়া লইলাম। আমার পূর্ব মন্তব্যের বিরুদ্ধ কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। যথা "তার অদ্ভুত ব্যবহারে লোকে হাসে" এখানে হাসে ক্রিয়া অকর্মক। "সবায় (সবাই) কোমর বেঁধে দাঁড়াল" ইহাও অকর্মক। এই সবায় বা সবাই শব্দ প্রাচীন পুঁথিতে 'সভাএ' লিখিত হয়, বস্তুত ইহা এ-যুক্ত কর্তৃকারকেরই দৃষ্টান্ত।

হর্নলি প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিৎ কর্তৃকারকের একার-যুক্ত রূপকে তির্যক্‌রূপ (oblique form) বলেন। অর্থাৎ ইহাতে শব্দটিকে কেমন যেন আড় করিয়া ধরা হয়। বাংলায় সম্বন্ধ কারকের 'র' চিহ্ন অনেক স্থলেই বিশেষ্য পদের এই তির্যক্‌রূপের সহিত যুক্ত হয়, যথা, রামের, কানাই-এর; বহুবচনের 'রা' চিহ্ন সম্বন্ধেও সেই নিয়ম, যথা, রামেরা, ভাইএরা ইত্যাদি।

আমি লিখিয়াছিলাম, কর্মকারকে অপ্রাণীবাচক শব্দের উত্তর টা টি যোগ না করিলে তাহার সঙ্গে 'কে'-চিহ্ন বসে না। বিজয়বাবু তাহার ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত

দিয়াছেন—"গাছকে ওড়িশায় গছ বলে"; "অনেক লোকে আকাশকে চাঁদোয়ার মত পদার্থ মনে করে।"

প্রবাসীর একজন কবিরাজ পাঠক 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে আমার একটি বাক্য-ত্রুটি নির্দেশ করিয়াছেন। আমি লিখিয়াছিলাম "বাংলায় যে অসংযুক্ত শব্দের পূর্বে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে সে শব্দ নিজের অকার বর্জন করে।" এই বাক্যে অনেকগুলি অদ্ভুত ভুল রহিয়া গিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়ের নির্দেশ-মত আমি তাহা সংশোধন করিলাম— "বাংলায় তিন অক্ষরের শব্দের অন্ত অক্ষরের সহিত যদি স্বর থাকে তবে মধ্যবর্তী বর্ণের অকার বর্জিত হয়, যেমন, পাগ্‌লা গর্‌মি ইত্যাদি। কবিরাজ মহাশয় "বচসা, জটলা, দরজা, থামকা, ঝরকা" ইত্যাদি কয়েকটি ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। অগ্রহায়ণের শান্তিনিকেতন পত্রে আমরাও এরূপ দৃষ্টান্ত কয়েকটি দিয়াছি।

কবিরাজ মহাশয় বলেন যে, যদিচ আমরা বলি না, "লোকগুলাতে নিন্দা করে" কিন্তু "সব লোকে নিন্দা করে" বলা চলে। অতএব কর্তৃকারকে একার প্রয়োগ কেবল একবচনেই চলে এমন কথা জোর দিয়া বলা ঠিক নয়।

কর্মকারকে অপ্রাণীবাচক শব্দের উত্তর সাধারণত "কে" চিহ্ন বসে না, কিন্তু পরে 'টা' বা 'টি' থাকিলে বসে, আমি এই নিয়মের উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার ভাষাপ্রয়োগের দোষে কবিরাজ মহাশয় মনে করিয়াছেন যে আমার মতে 'টা' 'টি' বিশিষ্ট শব্দ কর্মকারকে নির্বিশেষে 'কে' চিহ্ন গ্রহণ করে। এইজন্য তিনি কয়েকটি বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যথা, "আগুনের তেজটা দেখ" "তরকারিটা খাওয়া গেল না" ইত্যাদি।

কবিরাজ মহাশয় আমার বাক্যরচনায় যে শৈথিল্য নির্দেশ করিয়াছেন আমি কৃতজ্ঞতার সহিত সেই ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

কয়েকটি প্রতিশব্দ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন তাহা চিন্তার যোগ্য। "যে রোগ পিতামাতা হইতে পুত্রপৌত্রে যায়" তাহাকে আয়ুর্বেদে 'সঞ্চারিরোগ' বলে। Heredity কুলসঞ্চারিতা, inherited কুলসঞ্চারী বলিলে হয় না? আয়ুর্বেদে নাছোড়বান্দার একটি ঠিক সংস্কৃত প্রতিশব্দ আছে—'অনুষঙ্গী'।

পৌষ ১৩২৬

চলতি ভাষার রূপ

নানা জেলায় ভাষার নানা রূপ। এক জেলার ভিন্ন অংশেও ভাষার বৈচিত্র্য আছে। এমন অবস্থায় কোথাকার ভাষা সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করবে তা কোনো কৃত্রিম শাসনে স্থির হয় না, স্বতই সে আপনার স্থান আপনি করে। কলকাতা সমগ্র বাংলার রাজধানী। এখানে নানা উপলক্ষে সকল জেলার লোকের সমাবেশ ঘটে আসচে। তাই কলকাতার ভাষা কোনো বিশেষ জেলার নয়। স্বভাবতই এই অঞ্চলের ভাষাই সাহিত্য দখল করে বসেচে। যেটাকে লেখ্য ভাষা বলি সেটা কৃত্রিম, তাতে প্রাণপদার্থের অভাব, তার চলৎশক্তি আড়ষ্ট, সে বদ্ধ জলের মতো, সে ধারা জল নয়। তাতে কাজ চলে বটে কিন্তু সাহিত্য শুধু কাজ চলবার জন্যে নয়, তাতে মন আপনার বিচিত্র লীলার বাহন চায়। এই লীলা-বৈচিত্র্য বাঁধা ভাষায় সম্ভব হয় না। এইজন্যেই কলকাতা অঞ্চলের চলতি ভাষাই সাহিত্যের আশ্রয় হয়ে উঠেচে। একদা যখন সাধু ভাষার একাধিপত্য ছিল তখনো যে কোনো জেলার লেখক নাটক প্রভৃতিতে কলকাতার কথাবার্তা ব্যবহার করেচেন, কখনোই পূর্ব বা উত্তর বঙ্গের উপভাষা ব্যবহার করেন নি— স্বভাবতই কলকাতার চলতি ভাষা তাঁরা গ্রহণ করেচেন। এর থেকে বুঝবে সাহিত্য স্বভাবতই কোন্ প্রণালী অবলম্বন করেচে।[১]

৬ কার্তিক ১৩৩৮

১ শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

বিবিধ

১

এ কথা আর অস্বীকার করা চলে না যে বাংলা সাহিত্যের ভাষা কলকাতার চলিত ভাষাকে আশ্রয় করেছে। শিশুকাল হতে বাংলার সকল প্রদেশের লোকেরই এই ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। নইলে সাহিত্যে ব্যবহারের সময় বাধা পেতে হবে।

য়ুরোপের সকল দেশেই প্রদেশভেদে উপভাষা প্রচলিত আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে-সকল দেশে ভদ্রসাধারণের কথিত ভাষায় প্রভেদ নেই। এবং সেই ভদ্রসমাজের কথিত ভাষার সঙ্গে সে-সকল দেশের সাহিত্যের ভাষা মোটের উপর অভিন্ন। আমাদের দেশেও ভাষার মধ্যে যথাসম্ভব এইরকম মিল প্রার্থনীয়। বাংলা ভাষা স্বভাবতই দ্রুতবেগে এই মিলের দিকে চলেচে।

কলকাতার কথিত ভাষার মধ্যেও সম্পূর্ণ ঐক্য নেই। লণ্ডনেও ভাষার একটা নিম্নস্বর আছে তাকে বলে ককনি। সেটা সাহিত্যভাষা থেকে দূরবর্তী।

আমাদের চলিত ভাষামূলক আধুনিক সাহিত্য ভাষার আদর্শ এখনো পাকা হয় নি বলে লেখকদের রুচি ও অভ্যাস -ভেদবশত শব্দব্যবহার সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার আছে। আরো কিছুকাল পরে তবে এর নির্মাণকার্য সমাধা হবে।

তবু আপাতত আমি নিজের মনে একটা নিয়ম অনুসরণ করি। আমার কানে যেটা অপভাষা বলে ঠেকে সেটাকে আমি বর্জন করি। "ভিতর" এবং "ভেতর" "উপর" এবং "ওপর" "ঘুমতে" এবং "ঘুমুতে" এই দুইরকমেরই ব্যবহার কলকাতায় আছে কিন্তু শেষোক্তগুলিকে আমি অপভাষা বলি। "দুয়োর" কথার জায়গায় "দোর" কথা ব্যবহার করতে আমার কলমে ঠেকে। কলকাতায় "ভাইয়ের বিয়ে" না বলে কেউ কেউ "ভেয়ের বে" কিংবা "করলুম"-এর জায়গায় "কল্লু" বলে, কিন্তু এগুলিকে সাহিত্যে স্বীকার করতে পারি নে। গুচ্ছুতে, রেতের বেলা প্রভৃতি ব্যবহার আজকাল দেখি, কিন্তু এগুলিকে স্বীকার করে নিতে পারি নে।[১]

১ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা।

দ্রষ্টব্য : অনুরূপ আলোচনা 'বাংলাভাষা পরিচয়', অধ্যায় ১০ ও ১২।

২

প্রণামের শ্রেণীভেদ আছে। ১ নম্বর সহজ প্রণাম হচ্চে গ্রীবা বাঁকিয়ে জোড় হাত কপালে ঠেকানো। যখন বলি গড় করি তোমার পায়ে তখন বোঝায় এমন কোনো ভঙ্গী করা যেটা বিনম্রতার চূড়ান্ত। গড় শব্দে একটা বিশেষ নম্রতার ভঙ্গী বোঝায় তার প্রমাণ তার সঙ্গে 'করা' ক্রিয়াপদের যোগ। সেইরকম ভঙ্গী করে প্রণাম করাই গড় করে প্রণাম করা। নমস্কার হই বলি নে, নমস্কার করি বলি— গড় করি সেই পর্যায়ের শব্দ। গড়াই গড়াগড়ি দিই শব্দে বুঝতে হবে শরীরকে একটা বিশেষ অবস্থাপন্ন করি, এর সংসর্গে 'হই' ক্রিয়াপদ আসতেই পারে না। বস্তুত গড় করে প্রণাম করা হচ্চে পায়ের কাছে গড়িয়ে প্রণাম করা। এই প্রণামে সেই ভঙ্গীটা কৃত হয়।[১]

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

১ শ্রীগিরিজাকুমার বসুকে লিখিত পত্র।

এই পত্রের উপরে ডান দিকে লেখা আছে 'গডীকরণ' 'নমস্করণ' 'নতীকরণ'

প্রাকৃত ও সংস্কৃত

শ্রীনাথবাবু তাঁহার 'ভাষাতত্ত্ব'-সমালোচনার প্রতিবাদে[1] প্রাচীন বাংলাসাহিত্য হইতে যে-সকল উদাহরণ[2] উদ্‌ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়াছে, জনসাধারণ্যে প্রচলিত ভাষা 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত হইত। মারাঠি ভাষায় এখনো প্রাকৃত শব্দের সেইরূপ ব্যবহার দেখা যায়।

কিন্তু প্রাকৃত শব্দের এই প্রয়োগ আধুনিক বাংলায় চলে নাই, চলা প্রার্থনীয় কি না সন্দেহ।

পুরাকালে যখন গ্রন্থের ভাষা, পণ্ডিতদের ভাষা, সাধারণ-কথিত ভাষা হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল তখন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুই পৃথক নামের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন যাহা সংস্কৃত ছিল এবং তখন যাহা প্রাকৃত ছিল তাহাই বিশেষরূপে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দে বাচ্য।

এখনো বাংলায় লিখিত ভাষা কথিত ভাষা হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ আকার ধারণ করিতেছে। আমরা যদি ধাতুগত অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণ-কথিত বাংলাকে প্রাকৃত বলি তাহা হইলে লিখিত গ্রন্থের বাংলাকে সংস্কৃত বলিতে হয়। বস্তুত এখনকার কালের প্রাকৃত ও সংস্কৃত ইহাই। কিন্তু এরূপ হইলে বিপাকে পড়িতে হইবে।

কালিদাস প্রভৃতি কবিদের নাটকে যে-প্রাকৃত ব্যবহার হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের সময়ের চলিত ভাষা নহে। চলিত ভাষা প্রদেশভেদে ভিন্ন হয়, অথচ সাহিত্যের প্রাকৃত একই এবং সে-প্রাকৃতের এক ব্যাকরণ। ইহা হইতে অনুমান করা অন্যায় হয় না যে, বিশেষ সময়ের ও বিশেষ দেশের চলিত ভাষা অভিধানে প্রাকৃত শব্দে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়া গেছে; অন্য দেশকালের প্রাকৃতকে 'প্রাকৃত' বলিতে গেলে কেঁচোকেও উদ্ভিদ বলা যাইতে পারে।

যদি প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ বাংলা শব্দের পূর্বে বিশেষণরূপে জুড়িয়া ব্যবহার

১ শ্রীনাথ সেন-প্রণীত ভাষাতত্ত্ব গ্রন্থের চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনার (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮) গ্রন্থকারকৃত প্রতিবাদ (আলোচনা গ: বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮)।

২ "৫০।৬০ বৎসর পূর্বে যে-সকল বাংলা পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পর্যন্ত বাংলাকে প্রাকৃত বলা হইয়াছে। যথা—

করা হয়, যদি লিখিত বাংলাকে 'সংস্কৃত বাংলা' ও কথিত বাংলাকে 'প্রাকৃত বাংলা' বলা যায়, তাহা হইলে আমরা আপত্তি করিতে পারি না। কিন্তু সংস্কৃতভাষা ও প্রাকৃত ভাষা অন্তরূপ। প্রাকৃত ভাষা বাংলা ভাষা নহে, বররুচি তাহার সাক্ষ্য দিবেন।

আষাঢ় ১৩০৮

শনির মাহাত্ম্য আছে স্কন্দ-পুরাণেতে,
'পরাকৃত' বিনে কেহ না পারে বুঝিতে।
অতএব পয়ার প্রবন্ধে তাহা বলি,
একচিত্তে শুন সবে শনির পাঁচালী।

—পূর্ববঙ্গে প্রচলিত 'শনির পাঁচালী'

বাবু দীনেশচন্দ্র সেনও তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "পূর্বে ভারতের কথিত ভাষামাত্রই, বোধ হয়, প্রাকৃত-সংজ্ঞায় অভিহিত হইত, এবং এই বাংলা-ভাষাকেও প্রাকৃত বলিত। যথা—

ভারতের পুণ্যকথা শ্রদ্ধা দুর নহে।
'পরাকৃত' পদবন্ধে রাজেন্দ্রদাসে কহে।

(২০০ দুইশত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত সঞ্জয়কৃত মহাভারত।)"

—ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা, শ্রীনাথ সেন, বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮, পৃ ১৩৫।

একদিন ছিল যখন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বিরোধ ছিল। এর প্রতি কিছু অবজ্ঞাও তখন করা হয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃতের আলয় থেকে বাংলা তখন যথোচিত সম্মান পায় নি তার কারণও হয়তো ছিল। তখন বাংলা ছিল অপরিণত, সাহিত্যের অনুপযোগী। এর দৈন্যকে উপেক্ষা করা সহজ ছিল। কিন্তু যে শক্তি তখন এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে শক্তি এ কোথা থেকে পেয়েছে? সংস্কৃত ভাষারই অমৃত উৎস থেকে। সেই কারণেই তার পরিণতিও চলেছে, কোথাও বাধা পায় নি। বাইরে থেকে যে-সকল বিদ্যা আমরা লাভ করেছি, তা আমাদের ভাষায় রক্ষা করা সম্ভব হল, কারণ বাংলার দৈন্য ও অভাব আজ আর বেশি নেই। পারিভাষিকের কিছু দারিদ্র্য আছে বটে, কিন্তু সে দারিদ্র্য পূর্ণ করবার উপায় আছে সংস্কৃতের মধ্যে।

একদিন ছিল ভারতবর্ষে ভাষা-বোধের একটা প্রতিভা। ভারতবর্ষ পাণিনির জন্মভূমি। তখনকার দিনে প্রাকৃতকে যাঁরা বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন পরম পণ্ডিত। অথচ প্রাকৃতের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা ছিল না। সংস্কৃত ব্যাকরণের চাপে তাঁরা প্রাকৃতকে লুপ্তপ্রায় করেন নি। তার কারণ ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের ছিল সহজ বোধশক্তি। আমরা আজকাল সংস্কৃত শিখে ভুলে যাই যে বাংলার একটি স্বকীয়তা আছে। অবশ্য সংস্কৃত থেকেই সে শব্দ-সম্পদ পাবে, কিন্তু তার নিজের দৈহিক প্রকৃতি সংস্কৃত দ্বারা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা অসংগত। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কখনো সে চেষ্টা করেন নি। আমি সেকালের পণ্ডিতদের বাংলায় লেখা অনেক পুরানো পুঁথি দেখেছি। তার বানান তাঁরা বাংলা ভাষাকে প্রাকৃত জেনেই করেছিলেন। তাঁদের যত্ব ণত্ব জ্ঞান ছিল না, এ কথা বলা চলে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলেও এখনকার নব পণ্ডিতদের মতো যত্ব ণত্ব নিয়ে মাতামাতি করা হয় নি। তা করলে "শ্রবণ" থেকে উদ্ভূত "শোনা" কখনোই মূর্ধন্য ণ-এর অত্যাচার ঠেকাতে পারত না। যাঁরা মনে করেছেন বাইরে থেকে বাংলাকে সংস্কৃতের অনুগামী করে শুদ্ধিদান করবেন, তাঁরা সেই দোষ করছেন যা ভারতে ছিল না। এ দোষ পশ্চিমের। ইংরেজিতে শব্দ ধ্বনির অনুযায়ী নয়। ল্যাটিন ও গ্রীক থেকে উদ্ভূত শব্দে বানানের সঙ্গে ধ্বনির বিরোধ হলেও তাঁরা মূল বানান রক্ষা করেন। এই প্রণালীতে তাঁরা ইতিহাসের স্মৃতি বেঁধে রাখতে চান। কিন্তু

ইতিহাসকে রক্ষা করা যদি অবশ্যকর্তব্য হয় তবে ডারউইন-কথিত আমাদের পূর্বপুরুষদের যে অঙ্গটি খসে গেছে সেটিকে আবার সংযোজিত করা উচিত হবে। প্রসঙ্গক্রমে আধুনিক পণ্ডিতদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাঁদের মতে 'বানান' শব্দে কোন্ ন লাগবে?

বাংলাকে বাংলা বলে স্বীকার করেও এ কথা মানতে হবে যে সংস্কৃতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় চিত্তের যে আভিজাত্য, যে তপস্যা আছে, বাংলা ভাষায় তাকে যদি গ্রহণ না করি তবে আমাদের সাহিত্য ক্ষীণপ্রাণ ও ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হবে।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে য়ুরোপীয় বিদ্যার যোগে নতুন বাংলা সাহিত্য, এমন-কি, কিয়ৎ পরিমাণে ভাষাও তৈরি হয়ে উঠেছে, বর্তমান কালের ভাব ও মনন -ধারা বহন করে এই যোগ যেমন আমাদের উদ্‌বোধনের সহায় হয়েছে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের নিরন্তর সম্বন্ধও আমাদের তেমনি সহায়। য়ুরোপীয় চিত্তের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তবে তাতে করে আমাদের যে দৈন্য ঘটবে সে আমাদের পক্ষে শোচনীয়, তেমনি সংস্কৃতের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় চিত্তের যোগপ্রবাহ যদি ক্ষীণ বা অবরুদ্ধ হয়, তবে তাতেও বাংলা ভাষার স্রোতস্বিনী বিশুদ্ধতা ও গভীরতা হারাবে। ভাবের দিকের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, শব্দের দিক থেকে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের কাছে নিরন্তর আনুকূল্যের অপেক্ষা না করে থাকতে পারে না।

বাংলায় লিখতে গিয়ে আমাকে প্রতি পদে নতুন কথা উদ্‌ভাবন করতে হয়েছে। তার কারণ বাংলা ভাষা একদিন শুদ্ধমাত্র ঘরের ভাষা ছিল। সেজন্য এর দৈন্য বা অভাব যথেষ্ট রয়ে গেছে। সে দৈন্য পূরণের সুযোগ আমাদের দেশেই আছে। জাপানী ভাষার মধ্যে অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জাপানী ভাষায় তত্ত্বঘটিত শব্দরচনা সহজ নয়। জাপানীর সঙ্গে সেজন্যে চীনে ভাষার যোগ রয়ে গেছে। যুদ্ধের দ্বারা সেদিনও জাপান চীনকে অসম্মান করেছে, অপমান করেছে। কিন্তু ভাষার মধ্যে সে চীনকে সম্মান করতে বাধ্য। তাই জাপানী অক্ষরের মধ্যে চৈনিক অক্ষরও অপরিহার্য। ঘরের কথা জাপানী ভাষায় চলে হয়তো, কিন্তু চীনে ভাষা সঙ্গে না থাকলে বড়ো কোনো জ্ঞান বা উপলব্ধির প্রকাশ অসম্ভব হয়। অনুরূপ কারণেই বাংলাকে সংস্কৃত ভাষার দানসত্র ও অন্নসত্র থেকে দূরে নিয়ে এলে তাতে গুরুতর ক্ষতি ঘটবে।

আমাকে যে উপাধিতে আপনারা ভূষিত করলেন, তার জন্যে আবার আপনাদের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কিন্তু এও বলি যে, অযোগ্য পাত্রে যদি সম্মান অর্পিত হয়ে থাকে সে দায়িত্ব আপনাদের। আমার কিছুই গোপন নেই। সংস্কৃত ভাষায় আমার অধিকার সংকীর্ণ। তথাপি যখন আপনারা আমাকে এই পুরস্কার দিলেন এর জন্যে কাউকে যদি নিন্দাভাগী হতে হয় তো সে আপনাদের।[১]

কার্তিক ১৩৩৮

১ সংস্কৃত কলেজ কর্তৃক "কবি সার্বভৌম" উপাধিদান ও অভিনন্দনের উত্তরে কথিত।

ভাষার খেয়াল

ভাষা যে সব সময়ে যোগ্যতম শব্দের বাছাই করে কিংবা যোগ্যতম শব্দকে বাঁচিয়ে রাখে তার প্রমাণ পাই নে। ভাষায় চলিত একটা শব্দ মনে পড়ছে 'জিজ্ঞাসা করা'। এ রকম বিশেষ্য-জোড়া ওজনে ভারী ক্রিয়াপদে ভাষার অপটুত্ব জানায়। প্রশ্ন করা ব্যাপারটা আপামর সাধারণের নিত্যব্যবহার্য অথচ ওটা প্রকাশ করবার কোনো সহজ ধাতুপদ বাংলায় দুর্লভ এ কথা মানতে সংকোচ লাগে। বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপকে ক্রিয়ার রূপে বানিয়ে তোলা বাংলায় নেই যে তা নয়। তার উদাহরণ যথা—ঠ্যাঙানো, কিলোনো, ঘুষোনো, গুঁতোনো, চড়ানো, লাথানো, জুতোনো। এগুলো মারাত্মক শব্দ সন্দেহ নেই, এর থেকে দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট উত্তেজিত হলে বাংলায় 'আনো' প্রত্যয় সময়ে সময়ে এই পথে আপন কর্তব্য স্মরণ করে। অপেক্ষাকৃত নিরীহ শব্দও আছে, যেমন আগল থেকে আগলানো; ফল থেকে ফলানো, হাত থেকে হাতানো, চমক থেকে চম্‌কানো। বিশেষণ শব্দ থেকে, যেমন উলটা থেকে উলটানো, খোঁড়া থেকে খোঁড়ানো, বাঁকা থেকে বাঁকানো, রাঙা থেকে রাঙানো।

বিদ্যাপতির পদে আছে 'সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়'। যদি তার বদলে—'কি জিজ্ঞাসা করই অনুভব মোয়' ব্যবহারটাই 'বাধ্যতামূলক' হত কবি তা হলে ওর উল্লেখই বন্ধ করে দিতেন।[১] অথচ প্রশ্ন করা অর্থে শুধানো শব্দটা শুধু যে কবিতায় দেখি তা নয় অনেক জায়গায় গ্রামের লোকের মুখেও ওই কথার চল আছে। বাংলা ভাষার ইতিহাসে যাঁরা প্রবীণ তাঁদের আমি শুধাই, জিজ্ঞাসা করা শব্দটি বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে বা লোকসাহিত্যে তাঁরা কোথাও পেয়েছেন কিনা।

১ 'বাধ্যতামূলক' নামে যে একটা বর্বর শব্দ বাংলাভাষাকে অধিকার করতে উদ্যত, তার সম্বন্ধে কি সাবধান হওয়া উচিত হয় না? কম্পল্‌সরি এডুকেশনে বাধ্যতা ব'লে বালাই যদি কোথাও থাকে সে তার মূলে নয় সে তার পিঠের দিকে বা কাঁধের উপর, অর্থাৎ ওই এডুকেশনটা বাধ্যতাগ্রস্ত বা বাধ্যতাচালিত। যদি বলতে হয় 'পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা কম্পল্‌সরি নয়' তা হলে কি বলা চলবে 'পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা বাধ্যতামূলক নয়।' সৌভাগ্যক্রমে 'আবশ্যিক' শব্দটা উক্ত অর্থে কোথাও কোথাও চলতে আরম্ভ করেছে।

ভাবপ্রকাশের কাজে শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে কাব্যের বোধশক্তি গদ্যের চেয়ে সূক্ষ্মতর এ কথা মানতে হবে। লক্ষিয়া, সজ্জিয়া, বন্দিনু, স্পর্শিল, হর্ষিল শব্দগুলো বাংলা কবিতায় অসংকোচে চালানো হয়েছে। এ সম্বন্ধে এমন নালিশ চলবে না যে ওগুলো কৃত্রিম, যেহেতু চলতি ভাষায় ওদের ব্যবহার নেই। আসল কথা, ওদের ব্যবহার থাকাই উচিত ছিল; বাংলা কাব্যের মুখ দিয়ে বাংলা ভাষা এই ত্রুটি কবুল করেছে। ('কব্‌লেছে' প্রয়োগ বাংলায় চলে কিন্তু অনভ্যস্ত কলমে বেধে গেল!) 'দর্শন লাগি ক্ষুধিল আমার আঁখি' বা 'তিয়াষিল মোর প্রাণ'— কাব্যে শুনলে রসজ্ঞ পাঠক বাহবা দিতে পারে, কেননা, ক্ষুধাতৃষ্ণাবাচক ক্রিয়াপদ বাংলায় থাকা অত্যন্তই উচিত ছিল, তারই অভাব মোচনের সুখ পাওয়া গেল। কিন্তু গদ্য ব্যবহারে যদি বলি 'যতই বেলা যাচ্ছে ততই ক্ষুধোচ্ছি অথবা তেষ্টাচ্ছি' তা হলে শ্রোতা কোনো অনিষ্ট যদি না করে অন্তত এটাকে প্রশংসনীয় বলবে না।

বিশেষ্য-জোড়া ক্রিয়াপদের জোড় মিলিয়ে এক করার কাজে মাইকেল ছিলেন দুঃসাহসিক। কবির অধিকারকে তিনি প্রশস্ত রেখেছেন, ভাষার সংকীর্ণ দেউড়ির পাহারা তিনি কেয়ার করেন নি। এ নিয়ে তখনকার ব্যঙ্গ রসিকেরা বিস্তর হেসেছিল। কিন্তু ঠেলা মেরে দরজা তিনি অনেকখানি ফাঁক ক'রে দিয়েছেন। 'অপেক্ষা করিতেছে' না ব'লে 'অপেক্ষিছে', 'প্রকাশ করিলাম' না ব'লে 'প্রকাশিলাম' বা 'উদ্‌ঘাটন করিল'-র জায়গায় 'উদ্‌ঘাটিল' বলতে কোনো কবি আজ প্রমাদ গণে না। কিন্তু গদ্যটা যেহেতু চলতি কথার বাহন ওর ডিমক্রাটিক বেড়া অল্প একটু ফাঁক করাও কঠিন। 'ত্রাস' শব্দটাকে 'ত্রাসিল' ক্রিয়ার রূপ দিতে কোনো কবির দ্বিধা নেই কিন্তু 'ভয়' শব্দটাকে 'ভয়িল' করতে ভয় পায় না এমন কবি আজও দেখি নি। তার কারণ ত্রাস শব্দটা চলতি ভাষার সামগ্রী নয়, এইজন্যে ওর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসামাজিকতা ডিমক্রাসিও খাতির করে। কিন্তু 'ভয়' কথাটা সংস্কৃত হলেও প্রাকৃত বাংলা ওকে দখল করে বসেছে। এইজন্যে ভয় সম্বন্ধে যে প্রত্যয়টার ব্যবহার বাংলায় নেই তার দরজা বন্ধ। কোন্ এক সময়ে 'জিতিল' 'হাঁকিল' 'বাঁকিল' শব্দ চলে গেছে, 'ভয়িল' চলে নি— এ ছাড়া আর-কোনো কৈফিয়ৎ নেই।

বাংলা ভাষা একান্ত আচারনিষ্ঠ। সংস্কৃত বা ইংরেজি ভাষায় প্রত্যয়গুলিতে নিয়মই প্রধান, ব্যতিক্রম অল্প। বাংলা ভাষার প্রত্যয়ে আচারই প্রধান; নিয়ম

ক্ষীণ।— ইংরেজিতে 'ঘামছি' বলতে am perspiring বলে থাকি, 'লিখছি' বলতে am penning বলা দোষের হয় না। বাংলায় ঘামছি বললে লোকে কর্ণপাত করে কিন্তু কল্‌মাচ্চি বললে সইতে পারে না। প্রত্যয়ের দোহাই পাড়লে আচারের দোহাই পাড়বে। এই কারণেই নূতন ক্রিয়াপদ বাংলায় বানানো দুঃসাধ্য, ইংরেজিতে সহজ। ওই ভাষায় টেলিফোন কথাটার নূতন আমদানি, তবু হাতে হাতে ওটাকে ক্রিয়াপদে ফলিয়ে তুলতে কোনো মুশকিল ঘটে নি। ডানপিটে বাঙালি ছেলের মুখ দিয়েও বের হবে না 'টেলিফোনিয়েছি' বা 'সাইক্লিয়েছি'। বাংলা গদ্যের অটুট শাসন কালক্রমে কিছু কিছু হয়তো বা বেড়ি আল্‌গা করে আচার ডিঙোতে দেবে। বাংলায় কাব্য-সাহিত্যই পুরাতন, এই-জন্যেই প্রকাশের তাগিদে কবিতায় ভাষার পথ অনেক বেশি প্রশস্ত হয়েছে। গদ্য-সাহিত্য নূতন, এইজন্যে শব্দসৃষ্টির কাজে তার আড়ষ্টতা যায় নি। তবু ক্রমশ তার নমনীয়তা বাড়বে আশা করি। এমন-কি, আজই যদি কোনো তরুণ লেখক লেখেন, 'মাইকেল বাংলা-সাহিত্যে নূতন সম্পদের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিলেন' তা নিয়ে প্রবীণরা খুব বেশি উত্তেজিত না হতে পারেন। ভাবীকালে আধুনিকেরা কতদূর পর্যন্ত স্পর্ধিয়ে উঠবেন বলতে পারি নে কিন্তু অন্তত এখনি তাঁরা 'জিজ্ঞাসা করিলেন'-এর জায়গায় যদি 'জিজ্ঞাসিলেন' চালিয়ে দেন তা হলে বাংলা ভাষা কৃতজ্ঞ হবে।

'লজ্জা করবার কারণ নেই' এটা আমরা লিখে থাকি। 'লজ্জাবার কারণ নেই' লেখাটা নির্লজ্জতা। এমন স্থলে ওই জোড়া ক্রিয়াপদটা বর্জন করাই শ্রেয় মনে করি। লিখলেই হয় 'লজ্জার কারণ নেই'। 'প্রুফ সংশোধন করবার বেলায়' কথাটা সংশোধনীয়, বলা ভালো 'সংশোধনের বেলায়'। সহজ ব'লেই গদ্যে আমরা পুরো মন দিই নে, বাহুল্য শব্দ বিনা বাধায় যেখানে সেখানে ঢুকে পড়ে। আমার রচনায় তার ব্যতিক্রম আছে এমন অহংকার আমার পক্ষে অত্যুক্তি হবে।

ভাষার খেয়াল সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত আমার প্রায় মনে পড়ে। ভালো বিশেষণ ও বাসা ক্রিয়াপদ জুড়ে ভালোবাসা শব্দটার উৎপত্তি। কিন্তু ও-দুটো শব্দ একটা অখণ্ড ক্রিয়াপদ রূপে দাঁড়িয়ে গেছে। পূর্বকালে ওই 'বাসা' শব্দটা হৃদয়াবেগসূচক বিশেষ্যপদকে ক্রিয়াপদে মিলিয়ে নিত। যেমন ভয় বাসা, লাজ বাসা। এখন হওয়া করা পাওয়া ক্রিয়াপদ জুড়ে ওই কাজ চালাই। 'বাসা'

শব্দটা একমাত্র হৃদয়বোধসূচক ; হওয়া পাওয়া করা তা নয়। এই কারণে 'বাসা' কথাটা যদি ছুটি না নিয়ে আপন পূর্ব কাজে বহাল থাকত তা হলে ভাবপ্রকাশে জোর লাগাত। 'এ কথায় তার মন ধিক্কার বাস্‌ল' প্রয়োগটা আমার মতে 'ধিক্কার পেল'র চেয়ে জোরালো।

ভাদ্র ১৩৪২

শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক

শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য শব্দতত্ত্বঘটিত তাঁর এক প্রবন্ধে 'গান গা'ব' বাক্যের 'গা'ব' শব্দটিকে অশুদ্ধ প্রয়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টান্তটি আমারই কোনো রচনা থেকে উদ্‌ধৃত।

স্বীকার করি, এরূপ প্রয়োগ আমি করে থাকি। এটা আমার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব কি না তারই সন্ধান করতে গিয়ে আমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখরকে জিজ্ঞাসা করলেম যে যদি বলি, 'আজ সভায় আমি গান গা'ব না গা'বেন বসন্তবাবু, এখানে গান গা'বার আরো অনেক লোক আছে' তাতে কোনো দোষ হবে কি না— প্রশ্ন শুনে তিনি বিস্মিত হলেন, বললেন তাঁর কানে কোথাও ত্রুটি ঠেকছে না। বাংলা শব্দকোষকার পণ্ডিত হরিচরণকেও অনুরূপ প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন তিনি স্বয়ং এই রকমই প্রয়োগ ক'রে থাকেন।

বিজনবিহারীর সঙ্গেও আলোচনা করেছি। তিনি বাংলা শব্দতত্ত্বের একটি নিয়মের উল্লেখ করে বললেন, বাংলা গাওয়া শব্দটার মূলধাতু 'গাহ্'— যে ইকার এই হ্ ধ্বনির সঙ্গে মিলিত, তার বৈধব্য ঘটলেও বিনাশ হয় না, হ্ লোপ হলেও ই টি'কে থাকে। অতএব গাওয়া থেকে গাইব হয়, গা'ব হ'তে পারে না, সহমরণের প্রথা এ স্থলে প্রচলিত নেই।

আমাকে চিন্তা করতে হল। শব্দের ব্যবহারটা কী, আগে স্থির হলে তবে তার নিয়ম পরে স্থির হতে পারে। বলা বাহুল্য, বাংলার যে ভূভাগের ভাষা প্রাকৃত বাংলা বলে আজকালকার সাহিত্যে চলেছে সেইখানেই অনুসন্ধান করতে হবে।

এখানে হ্ ধ্বনিযুক্ত ক্রিয়াপদের তালিকা দেওয়া যাক।—

কহ্, গাহ্, চাহ্, নাহ্, সহ্, বহ্, বাহ্, রহ্, দোহ্।

দেখা যায় অধিকাংশ স্থলেই এই-সকল ক্রিয়াপদে ভবিষ্যৎ কারকে বিকল্পে ই থাকে এবং লোপ পায়।

'কথা কইবে'ও হয় 'কথা ক'বে'ও, যথা, 'গেলে কথা ক'বে না সে নব ভূপতি।'

ভিক্ষে চা'ব না বললেও হয়, ভিক্ষে চাইব বললেও হয়। 'তোমার কাছে শান্তি চা'ব না' গানের পদটি আমারই রচনা বটে, কিন্তু কারো কানে এ পর্যন্ত খটকা লাগে নি।

'এ অপমান স'বে না' কিংবা 'দুঃখের দিন র'বে না' বললে কেউ বিদেশী বলে সন্দেহ করে না।

যদি বলি 'গঙ্গায় না'বে, না তোলা জলে' তা হলে ভাষার দোষ ধরে শ্রোতা আপত্তি করবে না।

কেবল বহা ও বাহা ক্রিয়াপদে 'ব'বে' 'বা'বে' ব্যবহার শোনা যায় না তার কারণ পাশাপাশি দুটো 'ব'-কে ওষ্ঠ পরিত্যাগ করতে চায়।

হ ধ্বনি বর্জিত এই জাতীয় ক্রিয়াপদে প্রাকৃত প্রয়োগে নিঃসংশয়ে ই স্বর লুপ্ত হয়। কথ্য ভাষায় কখনোই বলি নে খাইব, যাইব, পাইব।

'দোহা' ক্রিয়াপদের আরম্ভে ওকার আছে, তারই জোরে ই থেকে যায়— বলি 'গোরু দুইবে'। কিন্তু একেবারেই ই লোপ হ'তে পারে না ব'লে আশঙ্কা করি নে। 'রুগ্‌ণ গোরু কখনোই দোবে না' বাক্যটা অকথ্য নয়।

'পোহা' অর্থাৎ প্রভাত হওয়া ক্রিয়াপদের ধাতুরূপ 'পোহা'— পোহাইবে বা পোহাইল শব্দে লিখিত ভাষায় ই চলে কিন্তু কথিত ভাষায় চলে না। সন্দেহ হচ্ছে 'কখন রাত পুইবে' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ 'পোয়াবে' এবং 'পুইবে' দুইই হয়।

শ্রাবণ ১৩৪৩

বিবিধ

১

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে 'জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মমত চলিতে উত্তেজনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নচেৎ আদর্শের ঐক্য থাকে না। তিনি বলেন, "কেন চট্টগ্রামবাসী নবদ্বীপবাসীর ব্যবহৃত অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে।" আমরা বলি, কেহ তো জবরদস্তি করিয়া বাধ্য করিতেছে না, স্বভাবের নিয়মে চট্টগ্রামবাসী আপনি বাধ্য হইতেছে। নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার কাব্যে চট্টগ্রামের প্রাদেশিক প্রয়োগ ব্যবহার না করিয়া নবদ্বীপের প্রাদেশিক প্রয়োগ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার বিপরীত করিবার স্বাধীনতা তাঁহার ছিল। কিন্তু নিশ্চয় কাব্যের ক্ষতি আশঙ্কা করিয়া সেই স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সকল দেশেই প্রাদেশিক প্রয়োগের বৈচিত্র্য আছে, তথাপি এক-একটি বিশেষ প্রদেশ ভাষাসম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। ইংরেজি ভাষা লাটিন নিয়মে আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করে না। যদি করিত, তবে এ ভাষা এত প্রবল, এত বিচিত্র, এত মহৎ হইত না। ভাষা সোনা-রুপার মতো জড়পদার্থ নহে যে, তাহাকে ছাঁচে ঢালিব। তাহা সজীব — তাহা, নিজের অনির্বচনীয় জীবনীশক্তির নিয়মে গ্রহণ ও বর্জন করিতে থাকে। সমাজে শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচারকে প্রাধান্য দেয়। লোকাচারের অসুবিধা অনেক, তাহাতে এক দেশের আচারকে অন্য দেশের আচার হইতে তফাত করিয়া দেয়; তা হউক, তবু লোকাচারকে ঠেকাইবে কে। লোককে না মারিয়া ফেলিলে লোকাচারের নিত্য পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য কেহ দূর করিতে পারে না। কৃত্রিম গাছের সব শাখাই এক মাপের করা যায়, সজীব গাছের করা যায় না। ভাষারও লোকাচার শাস্ত্রের অপেক্ষা বড়ো। সেইজন্যই আমরা 'ক্ষান্ত' দেওয়া বলিতে লজ্জা পাই না। সেইজন্যই ব্যাকরণ যেখানে 'আবশ্যকতা' ব্যবহার করিতে বলে, আমরা সেখানে 'আবশ্যক' ব্যবহার করি। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ যদি চোখ রাঙাইয়া আসে, লোকাচারের হুকুম দেখাইয়া আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি।[১]

বৈশাখ ১৩০৮

১ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ ৬৫

২

একটা ছোটো কথা বলিয়া লই। 'অনুবাদিত' কথাটা বাংলায় চলিয়া গেছে— আজকাল পণ্ডিতেরা অনূদিত লিখিতে শুরু করিয়াছেন। ভয় হয় পাছে তাঁহারা সৃজন কথার জায়গায় 'সর্জন' চালাইয়া বসেন।[১]

বৈশাখ ১৩০৮

৩

আপনার গ্রন্থের নামটি[২] যত ভয়ানক বস্তুটি তত ভয়ংকর নয়। কিন্তু তবুও বোপদেব লোহারাম যখন ভ্রূকুটি করেন তখন হৃৎকম্প হয় না বাংলালেখকদের মধ্যে এমন কয়জন আছে, তবে কি না প্রবাদ আছে দুই কানকাটা গ্রামের মাঝখান দিয়াই অসংকোচে চলে। অনেক লিখিয়াছি সুতরাং আমার অপরাধের অন্ত নাই এখন আর লজ্জা করিয়া কী হইবে।

বাংলা ভাষার মুশকিল হইয়াছে এই যে ইহাকে একভাষা বলিয়া গণ্য করিলে চলে না। বাংলা শিখিতে হইলে সংস্কৃতও শিখিতে হইবে। সেও সকলে পারিয়া উঠে না— মাতৃভাষা বলিয়া নির্ভয়ে আবদার করিতে যায়, শেষকালে মাতামহীর কোপে পড়িয়া বিপন্ন হয়। মাতা ও মাতামহীর চাল স্বতন্ত্র, এক ব্যাকরণে তাঁহাদের কুলায় না। এ অবস্থায় হতভাগ্য বাঙালির চলে কি করিয়া, পরম পণ্ডিত না হইলে সে কি নিজের ভাষা ব্যবহার করিতেও পারিবে না।

আর একদিকে দেখুন। বাঙালির ছেলেকে ছেলেবেলা হইতে ইংরেজি শিখিতেই হইবে। অল্প বয়স হইতে যে পরিমাণ বাংলার চর্চা করিলে সে অনায়াসে বাংলায় আপনার ভাব প্রকাশ করিতে পারিত সে তাহার ঘটিয়া উঠে না। ইহাদের যদি বলা যায় তোমরা বাংলা লিখিতে পারিবে না তবে কয়জন লোকে বাংলা লিখিবে।

কারণ, ইহাও সত্য, এখন আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া অন্য শিক্ষা

১ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮ পৃ ৬১

২ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' গ্রন্থ

নাই। সেই শিক্ষিত ব্যক্তির পনেরো-আনা যদি বাংলা লিখিতে না পায় তবে সম্ভবত ভাষা অত্যন্ত বিশুদ্ধ হইবে কিন্তু সে ভাষার প্রয়োজন থাকিবে না।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যটাকে গড়িয়া তুলিতেছেন যাঁহারা, তাঁহারা ইংরেজিনবিশ। তাঁহাদের পেটে কথা জমিয়াছে বলিয়াই তাঁহারা লিখিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণে পণ্ডিত তাঁহারা বাংলা ভাষার প্রতি মন দেন নাই সে তো জানা কথা। এখনো বাংলা যাঁহারা লেখেন তাঁহাদের অতি অল্প সংখ্যাই সংস্কৃত ভালো করিয়া জানেন।··· যাঁহারা ইংরাজি জানেন না কেবল মাত্র সংস্কৃত জানেন তাঁহারা কেহ কেহ বাংলা লেখেন, তাহার ভাষা বিশুদ্ধ কিন্তু বাজারে তাহা চলে না। অনেক লেখক লিখিতে লিখিতে ক্রমে সংস্কৃত শিখিতে থাকেন— কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় যখন প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন তখন তিনি সংস্কৃতে পাকা ছিলেন না, তাঁহার লেখায় তাহার প্রমাণ আছে কাজেই সাহিত্যে এমন অনেক জিনিস জমিয়া উঠিতে থাকে— ব্যাকরণের সূত্র যাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ পায় না।

বাংলা লেখকের পুরস্কার যে খুব বেশি তাহা নয়, ইহার উপরে তাহার লেখনী চালনার পথ যদি অত্যন্ত দুর্গম করা হয় তবে সীতা পাইবার আশা পরিত্যাগ করিয়াও লোককে ধনুক ভাঙিতে ডাকা হয়। তাই বলিয়াই যে ভাষার উপরে যে যেমন খুশি দৌরাত্ম্য করিবে তাহাও সহ্য করা যায় না। অতএব একটা রফা নিষ্পত্তির পথ ধরিতেই হয়। কিন্তু সে পথটা কেহ বাঁধিয়া দিতে পারে না-- নদীর মতো ভাষা আপনিই স্বল্পতম বাধার পথ হাতড়াইয়া চলে। আপনি সে কথাও বলিয়াছেন। আপনার বই পড়িয়াই আমার মনে বিশেষ করিয়া এই চিন্তার উদয় হইল— বাংলা সাহিত্যের খেয়া পার হইতে হইলে তিন ঘাটে তাহার মাশুল দিতে হয়, বাংলা ইংরেজি এবং সংস্কৃত। বাংলা ও ইংরেজির পারানির কড়ি কোনো প্রকারে সংগ্রহ হয়, সংস্কৃতের বেলায় ঠেকে, কেননা তাহার জন্য দূরে ঘোরাঘুরি করিতে হয়— সকলের সামর্থ্যে ও সময়ে কুলায় না— এইজন্য সংস্কৃতের ক্ষুত্তঘাটায় যাহারা ফাঁকি দেয় তাহাদের প্রতি দণ্ডবিধি কঠোর করিলে খেয়া একেবারে বন্ধ করিতে হয়। এটা আমি নিজের প্রাণের ভয়ে বলিলাম বটে কিন্তু সাহিত্যের প্রতি মমতা রাখি বলিয়াও বলিতে হইল। চিঠিখানা বড়ো হইয়া গেল সুতরাং ইহার মধ্যে পাণিনি-পীড়ন নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে— আর অপরাধ বাড়াইবার স্থান নাই অতএব যদি ক্ষমা করেন, তবে বিলাতি কায়দায়

আপনার পাণি-নিপীড়ন করিয়া বিদায় গ্রহণ করি।[১]

২০ শ্রাবণ ১৩১৮

৪

...আমার চিঠিতে ইংরেজিটাকেও যে বাংলার সঙ্গে জড়াইয়াছি তাহা ভাষা বা ব্যাকরণের দিক হইতে নহে। আমাদের ভাষায় গদ্য সাহিত্যের কোনো একটা পুরাতন আদর্শ নাই। কাদম্বরী বাসবদত্তার আদর্শ আমাদের কাজে লাগে না। রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত যে-কেহ বাংলা গদ্য সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার কাজে লাগিয়াছেন সকলেই ইংরেজিশিক্ষিত। ইংরেজি যাঁহারা একেবারেই জানেন না তাঁহারা কেহ কেহ বাংলা ভাষায় সংস্কৃত দর্শন পুরাণ প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছেন অন্য দিকে তাঁহাদের কলম খেলে নাই। নৈনিতাল আলু বাংলা দেশের ক্ষেতেও প্রচুর উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রতি বৎসরে তাহার বীজ নৈনিতাল হইতে আনাইতে হয়— হয়তো ক্রমে একদিন এখানকার ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন বীজে কাজ চলিবে। দেখা যাইতেছে ইংরেজির সম্বন্ধেও আমাদের সেই দশা। ইংরেজি সাহিত্যের বীজ বাংলা সাহিত্যে বেশ প্রচুর পরিমাণে ফলিতেছে —তাহাতে আমাদের এ দেশী মাছের ঝোল প্রভৃতিও দিব্য রাঁধা চলিতেছে কিন্তু বীজের আমদানি আজও সেইখান হইতেই হয়। ক্রমে তাহার তেমন প্রয়োজন হইবে না বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে যাঁহারা বাংলায় ভালো লেখেন তাঁহারা ইংরেজি জানেন। এই ইংরেজি জানার সঙ্গে বাংলা লেখার যে সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে সেটাকে কাকতালীয় ন্যায়ের দৃষ্টান্তে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বরঞ্চ দেখা গিয়াছে সংস্কৃত জানা নাই বা অল্পই জানা আছে এমন লোক বাংলা সাহিত্যে নাম করিয়াছেন কিন্তু ইংরেজি জানা নাই এমন লোকের নাম তো মনে পড়ে না। সেইজন্য বলিতেছি বাংলা সাহিত্যে যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন ইংরেজি শিক্ষার পাথেয় সংগ্রহ করিতে না পারিলে তিনি অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন না— ঘাটতলা ছাড়াইয়া আরো কিছুদূর যাইতে পারেন কিন্তু খুব বেশি দূর নহে। আমার এই কথাটা শুনিতে

১ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

কটু এবং বলিতেও যে রসনা রসসিক্ত হইয়া উঠে তাহা নহে কিন্তু তবু সত্য।

ভাব এবং ছাঁদ এ দুটো আমরা অনেকটা ইংরেজি সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করি —সকল ক্ষেত্রে চুরি করি বা নকল করি তাহা নহে— ইংরেজি শিক্ষার সাহায্য না পাইলে সে ভাব সে ছাঁদ আমাদের সাহিত্যের মন হইতে উৎপন্ন হইত না— আমাদের সাহিত্যের ধরন ধারণ ভাবগতিক অন্য প্রকার হইত। কিন্তু যে কারণেই হউক, যে উপায়েই হউক এখন যে ছাঁদটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহাকে একেবারে ঠেলিয়া দেওয়া চলিবে না। ইচ্ছা করিলেও কেহ পারিবে না। মৃত্যুঞ্জয় শর্মা প্রভৃতিরা একদিন বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সংস্কৃত ভিতের উপর গড়িতে শুরু করিয়াছিলেন। আজ তাহার ধ্বংসাবশেষও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার পরে ইংরেজিনবিশ বঙ্কিমচন্দ্রের দল যখন কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন তখন তাঁহাদের যত্বণত্ব লইয়া সংস্কৃত কেল্লা হইতে অনেক গোলাগুলি চলিয়াছিল কিন্তু তাঁহাদের কীর্তি আজও দুষ্ট ব্যাকরণের কলঙ্ক গায়ে মাখিয়াও উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে। আজ কলঙ্ক-ভঞ্জনের চেষ্টা হইতেছে। ঘটে যে ছিদ্র আছে সে কথা কেহ অস্বীকার করিতেছে না কিন্তু তবু সে ঘট পূর্ণ হইয়া আছে। কলঙ্ক সত্ত্বেও গৌরবহানি হইতেছে না। জল তোলা চলিতেছে বটে কিন্তু কোডাক্ ক্যামেরার দ্বারা ধরা পড়িয়াছে ছিদ্র আছে; সেটা একেবারে সপ্রমাণ হইয়া গেছে, জল পড়ুক না পড়ুক মাথা হেঁট করিতেই হইবে— কিন্তু আমি বলিতেছি ছিদ্র সারিবে না, তবু কলঙ্ক মোচন হইবে। সাহিত্য লীলার ভিতরে যিনি আছেন তিনি সমস্তই আপনার গূঢ় শক্তিতে সারিয়া লইবেন— ব্যাকরণের সূত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা যতই ভয় করি তিনি ততই হাসিতে থাকেন। সকল দেশেই তিনি এইরূপ ফুটাফাটা লইয়াই চালাইয়া আসিয়াছেন— ক্ষুদ্র যাহারা তাহারাই নিখুঁতের কারবার করে, তিনি খুঁতকে ভয় করেন না ভাষায় ভাষায় সাহিত্যে সাহিত্যে তাহার প্রমাণ আছে।[১]

২৫ শ্রাবণ ১৩১৮

৫

ব্যাকরণিকা বাংলা শেখানোর পক্ষে উপযোগী হয়েছে। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে।

১ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

এককালে সমাসদর্পণ ও লোহারামের ব্যাকরণ আমাদের পড়তে হয়েছে, সেটাতে সংস্কৃত শিক্ষার ভূমিকা হয়েছিল। তাতে খাঁটি বাংলা ভাষাকে যথোচিত স্বীকার করা হয় নি। আমার নিজের মত এই যে, পারিভাষিক ব্যাকরণের অনেক অংশই, বাংলা সাহিত্য পরিচয় অগ্রসর হলে, তার পরে আলোচ্য। ভাষাটা মোটামুটি আয়ত্ত হলে তার পরে বিশ্লেষণের দ্বারা পরিচয় পাকা করবার সময়। বস্তুত বাংলার যে অংশটা সংস্কৃতের অনুবর্তী, যেমন সন্ধি তদ্ধিতপ্রত্যয় সমাস, সেইগুলোই গোড়া থেকে জানা চাই। বাংলায় তৎসম শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার কিছুপরিমাণ সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে সম্ভবপর হয়। যে বাংলা শিশুকাল থেকে আমাদের অভ্যস্ত তার ব্যাকরণ, ভাষাপরিচয়ের জন্য, আবশ্যক নয়, ভাষাতত্ত্ব জানবার জন্যেই সে উপযোগী। কিন্তু শিশুদের জন্যে, বাংলা ক্লাসে বাংলা ব্যাকরণ পড়ানোর বিধি যদি প্রবর্তিত হয়ে থাকে তা হলে এই ব্যাকরণ যথোপযুক্ত হয়েছে বলে বিশ্বাস করি।

সংস্কৃত ভাষার পরিভাষা বাংলায় সর্বত্র খাটে কি না সন্দেহ করি।[১]

২১ নবেম্বর ১৯৩৩

১ শ্রীজগৎমোহন সেনকে লিখিত পত্র

বাংলা বানান

আমাদের এই যে দেশকে মুসলমানেরা বাঙ্গালা বলিতেন তাহার নামটি বর্তমানে আমরা কিরূপ বানান করিয়া লিখিব শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় [১৩২২] চৈত্রের প্রবাসীতে তার আলোচনা করিয়াছেন।

আমি মনে করি এর জবাবদিহি আমার। কেননা, আমিই প্রথমে বাংলা এই বানান ব্যবহার করিয়াছিলাম।

আমার কোনো কোনো পদ্যরচনায় যুক্ত অক্ষরকে যখন দুই মাত্রা হিসাবে গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখনই প্রথম বানান সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক হইতে হইয়াছিল। 'ঙ্গ' অক্ষরটি যুক্ত অক্ষর— উহার পুরা আওয়াজটি আদায় করিতে হইলে এক মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। সেটা আমার ছন্দের পক্ষে যদি আবশ্যক হয় তো ভালোই, যদি না হয় তবে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

এক-একটি অক্ষর প্রধানত এক-একটি আওয়াজের পরিচয়, শব্দতত্ত্বের নহে। সেটা বিশেষ করিয়া অনুভব করা যায় ছন্দরচনায়। শব্দতত্ত্ব অনুসারে লিখিব এক, আর ব্যবহার অনুসারে উচ্চারণ করিব আর, এটা ছন্দ পড়িবার পক্ষে বড়ো অসুবিধা। যেখানে যুক্ত অক্ষরেই ছন্দের আকাঙ্ক্ষা সেখানে যুক্ত অক্ষর লিখিলে পড়িবার সময় পাঠকের কোনো সংশয় থাকে না। যদি লেখা যায়—

বাঙ্গলা দেশে জন্মেছ বলে
বাঙ্গালী নহ তুমি;
সন্তান হইতে সাধনা করিলে
লভিবে জন্মভূমি—

তবে আমি পাঠকের নিকট 'ঙ্গ' যুক্ত-অক্ষরের পুরা আওয়াজ দাবি করিব। অর্থাৎ এখানে মাত্রাগণনায় বাঙ্গলা শব্দ হইতে চার মাত্রার হিসাব চাই। কিন্তু যখন লিখিব, 'বাংলার মাটি বাংলার জল' তখন উক্ত বানানের দ্বারা কবির এই প্রার্থনা প্রকাশ পায় যে 'বাংলা' শব্দের উপর পাঠক যেন তিন মাত্রার অতিরিক্ত নিশ্বাস খরচ না করেন। 'বাঙ্গলার মাটি' যথারীতি পড়িলে এইখানে ছন্দ মাটি হয়।

ঝিঙা না ভাজিয়া ভাজিলে ঝিঙ্গা
ছন্দ তখনি ফুঁকিবে শিঙ্গা।

এই গেল ছন্দব্যবসায়ী কবির কৈফিয়ত।

কিন্তু শুধু কেবল কাব্যক্ষেত্রে ডিক্রি পাইয়াই আমি সন্তুষ্ট থাকিব না, আমার আরো কিছু বলিবার আছে। বীরেশ্বরবাবুর মতে মূল শব্দের সহিত তদ্ভব শব্দের বানানের সাদৃশ্য থাকা উচিত। যদি তাঁর কথা মানিতে হয় তবে বাংলার বানান-মহালে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। এই আইন অনুসারে কিরূপ পরিবর্তন হয় তার গোটাকতক নমুনা দেখা যাক। শাঁখ—শাঙ্খ্। আঁক—আঙ্ক্। চাঁদ—চান্দ্। রাখ—রাক্ষ। আমি—আহ্মি।

হয়তো বীরেশ্বরবাবু বলিবেন, হাঁ এইরূপ হওয়াই উচিত। তাঁর পক্ষে ভালো নজিরও আছে। ইংরেজিতে বানানে-উচ্চারণে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক, পরস্পরের মাঝখানে প্রাচীন শব্দতত্ত্বের লম্বা ঘোমটা। ইংরেজিতে লিখি ট্রেআস্যুরে (treasure) পড়ি ট্রেজার; লিখি কৃনৌলেডগে (knowledge) পড়ি নলেজ্; লিখি রিঘ্টেওউস (righteous) পড়ি রাইটিয়স। অতএব যদি লিখি পক্ষী অথচ পড়ি পাখী, লিখি বিদ্যুলি পড়ি বিজুলি, লিখি শ্রবণিয়াছিলাম পড়ি শুনিয়াছিলাম, বিলাতিমতে তাহাতে দোষ হয় না।

কিন্তু আমাদের দেশের নজির উল্‌টা। প্রাকৃত ও পালি, বানানের দ্বারা নির্ভয়ে নিজের শব্দেরই পরিচয় দিয়াছে, পূর্বপুরুষের শব্দতত্ত্বের নহে। কেননা, বানানটা ব্যবহারের জিনিস, শব্দতত্ত্বের নয়। পুরাতত্ত্বের বোঝা মিউজিয়ম বহন করিতে পারে, হাটে বাজারে তাহাকে যথাসাধ্য বর্জন করিতে হয়। এইজন্যই লিখিবার বেলায় আমরা 'নুন' লিখি, পণ্ডিতই জানেন উহার মূল শব্দে একটা মূর্ধন্য ণ ছিল। এইজন্যই লিখিবার বেলা গাম্ভ্লা না লিখিয়া আমরা গাম্‌লা লিখি, পণ্ডিতই অনুমান করেন উহার মূল শব্দ ছিল কুম্ভ। আমরা লিখিয়া থাকি আঁতুর ঘর, তাহাতে আমাদের কাজের কোনো ক্ষতি হয় না— পাণ্ডিত্যের দোহাই মানিয়া যদি অন্ত্র-ক্রট্ ঘর বানান করিয়া আঁতুর ঘর পড়িতে হইত তবে যে-শব্দ প্রাচীনের গর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে তাহাকে পুনশ্চ গর্ভবেদনা সহিতে হইত।

প্রাচীন বাঙালি, বানান সম্বন্ধে নির্ভীক ছিলেন, পুরানো বাংলা পুঁথি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। আমরা হঠাৎ ভাষার উপর পুরাতত্ত্বের শাসন চালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। এই শাসন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি অন্যান্য নানা উপসর্গের মতো চিরদিনের মতো বাঙালির ছেলের আয়ুক্ষয় করিতে থাকিবে। কোনো অভ্যাসকে একবার পুরানো হইতে দিলেই তাহা স্বভাবের চেয়েও প্রবল হইয়া ওঠে। অতএব

এখনো সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত। সংস্কৃত শব্দ বাংলায় অনেক আছে, এবং চিরদিন থাকিবেই— সেখানে সংস্কৃতের রূপ ও প্রকৃতি আমাদের মানিতেই হইবে— কিন্তু যেখানে বাংলা শব্দ বাংলাই সেখানেও সংস্কৃতের শাসন যদি টানিয়া আনি, তবে রাস্তায় যে পুলিস আছে ঘরের ব্যবস্থার জন্যও তাহার গুঁতা ডাকিয়া আনার মতো হয়। সংস্কৃতে কর্ণ লিখিবার বেলা মূর্ধন্য ণ ব্যবহার করিতে আমরা বাধ্য, কিন্তু কান লিখিবার বেলাও যদি সংস্কৃত অভিধানের কানমলা খাইতে হয় তবে এ পীড়ন সহিবে কেন?

যে সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম হইতে বাংলা দেশ শাসন শুরু হইয়াছিল সেই সময়ে বাংলা ভাষার শাসন সেই কেল্লা হইতেই আরম্ভ হয়। তখন পণ্ডিতে-ফৌজে মিলিয়া বাংলার বানান বাঁধিয়া দিয়াছিল। আমাদের ভাষায় সেই ফোর্ট উইলিয়ামের বিভীষিকা এখনো তাই গৌড়সন্তানের চোখের জলকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য যেখানে আমাদের পিতামহেরা 'সোনা' লিখিয়া সুখী ছিলেন সেখানে আমরা সোণা লেখাইবার জন্য বেত ধরিয়া বসিয়া আছি।

কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ামের বর্তমান দণ্ডধারীদের জিজ্ঞাসা করি— সংস্কৃত নিয়মমতেও কি সোণা কাণ বিশুদ্ধ বানান? বর্ণন হইতে যদি বানান হয়, তবে কর্ণ হইতে কি কাণ হইবে? রেফ লোপ হইলেও কি মূর্ধন্য ণ তার সঙিন খাড়া করিয়া থাকিতে পারে?

বৈশাখ ১৩২৩

বাংলার বানান-সমস্যা

বিদেশী রাজার হুকুমে পণ্ডিতেরা মিলে পুঁথিতে আধুনিক গদ্য-বাংলা পাকা করে গড়েছে। অথচ গদ্যভাষা যে-সর্বসাধারণের ভাষা, তার মধ্যে অপণ্ডিতের ভাগই বেশি। পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালাই করলেন সেটা হল অত্যন্ত আড়ষ্ট। বিশুদ্ধভাবে সমস্ত তার বাঁধাবাঁধি— সেই বাঁধন তার নিজের নিয়ম-সংগত নয়— তার ষত্ব ণত্ব সমস্তই সংস্কৃত ভাষার ফরমাসে। সে হঠাৎ বাবুর মতো প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজেকে বনেদী বংশের বলে প্রমাণ করতে। যারা এই কাজ করে তারা অনেক সময়েই প্রহসন অভিনয় করতে বাধ্য হয়। কর্নেলে গবর্নরে পণ্ডিতি করে মূর্ধন্য ণ লাগায়, সোনা পান চুনে তো কথাই নেই।

এমন সময়ে সাহিত্যে সর্বসাধারণের অকৃত্রিম গদ্য দেখা দিল। তার শব্দ প্রভৃতির মধ্যে যে অংশ সংস্কৃত সে অংশে সংস্কৃত অভিধান-ব্যাকরণের প্রভুত্ব মেনে নিতে হয়েছে— বাকি সমস্তটা তার প্রাকৃত, সেখানে বানান প্রভৃতি সম্বন্ধে পাকা নিয়ম গড়ে ওঠে নি। হতে হতে ক্রমে সেটা গড়ে উঠবে সন্দেহ নেই। হিন্দী ভাষায় গড়ে উঠেছে— কেননা, এখানে পণ্ডিতির উৎপাত ঘটে নি, সেইজন্যেই হিন্দী পুঁথিতে 'শুনি' অনায়াসেই 'সুনি' মূর্তি ধরে লজ্জিত হয় নি। কিন্তু শুনছি বাংলার দেখাদেখি সম্প্রতি সেখানেও লজ্জা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, ওরাও জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে বসেছে আর কি! প্রাচীনকালে যে পণ্ডিতেরা প্রাকৃত ভাষা লিপিবদ্ধ করেছিলেন ভাষার প্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে বাঙালিদের মতো তাঁদের এমন লজ্জাবোধ ছিল না।

এখন এ সম্বন্ধে বাংলায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম চলছে— নানা লেখকে মিলে ঠেলাঠেলি করতে করতে একটা কিছু দাঁড়িয়ে যাবে, আশা করা যায়। অন্তত এ কাজটা আমাদের নয়, এ সুনীতিকুমারের দলের। বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে স্বীকার করে তার স্বভাবসংগত নিয়মগুলি তাঁরাই উদ্‌ভাবন করে দিন। যেহেতু সম্প্রতি বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নেবার প্রস্তাব হয়েছে সেই কারণে টেক্‌স্‌টবুক প্রভৃতির যোগে বাংলার বানান ও শব্দপ্রয়োগরীতির সংগত নিয়ম স্থির করে দেবার সময় হয়েছে। এখন স্থির করে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবে সাধারণের মধ্যে সেটা চলে যাবে। নইলে কেন্দ্রস্থলে কোনো শাসন না থাকলে ব্যক্তিবিশেষের যথেচ্ছাচারকে কেউ

সংযত করতে পারবে না। আজকাল অনেকেই লেখেন 'ভেতর' 'ওপর' 'চিবুতে' 'ঘুমুতে', আমি লিখি নে, কিন্তু কার বিধানমতে চলতে হবে। কেউ কেউ বলেন প্রাকৃত বাংলা ব্যবহারে যখন এত উচ্ছৃঙ্খলতা তখন ওটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পণ্ডিতি বাংলার শরণ নেওয়াই নিরাপদ। তার অর্থ এই যে, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করার চেয়ে কাঠের পুতুলের সঙ্গে ব্যবহারে আপদ কম। কিন্তু এমন ভীরু তর্কে সাহিত্য থেকে আজ প্রাকৃতবাংলার ধারাকে নিবৃত্ত করার সাধ্য কারো নেই। সোনার সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্রের সংসার চলে নি। নিকষ এবং তৌলদণ্ডের যোগে সেই সীতার মূল্য পাকা করে বেঁধে দেওয়া সহজ, কিন্তু সজীব সীতার মূল্য সজীব রামচন্দ্রই বুঝতেন, তাঁর রাজসভার প্রধান স্বর্ণকার বুঝতেন না, কোষাধ্যক্ষও নয়। আমাদের প্রাকৃত বাংলার যে মূল্য, সে সজীব প্রাণের মূল্য, তার মর্মগত তত্ত্বগুলি বাঁধা নিয়ম আকারে ভালো করে আজও ধরা দেয় নি বলেই তাকে দুয়োরানীর মতো প্রাসাদ ছেড়ে গোয়ালঘরে পাঠাতে হবে, আর তার ছেলেগুলোকে পুঁতে ফেলতে হবে মাটির তলায়, এমন দণ্ড প্রবর্তন করার শক্তি কারো নেই। অবশ্য যথেচ্ছাচার না ঘটে, সেটা চিন্তা করবার সময় হয়েছে সে কথা স্বীকার করি। আমি একসময় সুনীতিকুমারকে প্রাকৃত বাংলার অভিধান বানাতে অনুরোধ করেছিলুম, সেই উপলক্ষে শব্দবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসরণ করে বানান যদি বেঁধে দেন তবে বিষয়টাকে মীমাংসার পথে আনা যেতে পারে। এ কাজে হাত লাগাবার সময় হয়েছে সন্দেহ নেই।[১]

৬ শ্রাবণ ১৩৩৯

১ বিমলনারায়ণ চৌধুরীর পত্রের উত্তর

বাংলা বানান : ২

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানানের যে নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে তার একটা অংশ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে— এইখানে সেটা উত্থাপিত করি। যথোচিত আলোচনা দ্বারা তার চরম মীমাংসা প্রার্থনীয়।

হ-ধাতু খা-ধাতু দি-ধাতু ও শু-ধাতুর অনুজ্ঞায় তাঁরা নিম্নলিখিত ধাতুরূপের নির্দেশ করেছেন— হও, হয়ো। খাও, খেও। দাও, দিও। শোও, শুয়ো।

দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র আকারযুক্ত খা- এবং ইকারযুক্ত দি- ধাতুতে ভবিষ্যৎবাচক অনুজ্ঞায় তাঁরা প্রচলিত খেয়ো এবং দিয়ো বানানের পরিবর্তে খেও এবং দিও বানান আদেশ করেছেন। অথচ হয়ো এবং শুয়ো-র বেলায় তাঁদের অন্যমত।

একদা হয় খায় প্রভৃতি ক্রিয়াপদের বানান ছিল হএ, খাএ। 'করে' 'চলে' যে নিয়মে একারান্ত সেই নিয়মে হয় খায়ও একারান্ত হবার কথা— পূর্বে তাই ছিল। তখন খা, গা, চা, দি, ধা প্রভৃতি একাক্ষরের ধাতুপদের পরে য়-র প্রচলন ছিল না। তদনুসারে ভবিষ্যৎবাচক অনুজ্ঞায় য়-বিযুক্ত 'ও' ব্যবহৃত হত।

এ নিয়মের পরিবর্তন হবার উচ্চারণগত কারণ আছে। বাংলায় স্বরবর্ণের উচ্চারণ সাধারণত হ্রস্ব, যথা খাএ, খাও। কিন্তু অসমাপিকায় যখন বলি খেএ (খেয়ে) বা ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় যখন বলি খেও (খেয়ো) তখন এই স্বরবর্ণের উচ্চারণ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়। খাও এবং খেও শব্দে ওকারের উচ্চারণে প্রভেদ আছে। সন্দেহ নেই এ-সকল স্থলে শব্দের অন্তস্বর আপন দীর্ঘত্ব রক্ষার জন্য য়-কে আশ্রয় করে।

একদা করিয়া খাইয়া শব্দের বানান ছিল, করিআ, খাইআ। কিন্তু পূর্ব স্বরের অনুবর্তী দীর্ঘ স্বর য়-যোজকের অপেক্ষা রাখে। তাই স্বভাবতই আধুনিক বানান উচ্চারণের অনুসরণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শুয়ো হয়ো শব্দে এ কথা স্বীকার করেছেন, অন্যত্র করেন নি। আমার বিশ্বাস এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

আমরা যাকে সাধু ভাষা বলে থাকি বিশ্ববিদ্যালয় বোধ করি তার প্রচলিত বানানের রীতিতে অত্যন্ত বেশি হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক নন। নতুবা খাইয়া যাইয়া প্রভৃতি শব্দেও তাঁরা প্রাচীন বিধি অনুসারে পরিবর্তন আদেশ করতেন।

আমার বক্তব্য এই যে, যে-কারণে সাধুভাষায় করিয়া হইয়া বলিয়ো খাইয়ো চাহিয়ো বানান স্বীকৃত হয়েছে সেই কারণ চলিত ভাষাতেও আছে। দিয়েছে শব্দে তাঁরা যদি 'এ' স্বরের বাহনরূপে য়-কে স্বীকার করেন তবে দিয়ো শব্দে কেন য়-কে উপেক্ষা করবেন? কেবলমাত্র দি- এবং খা- ধাতুর য় অপহরণ আমার মতে তাদের প্রতি অবিচার করা।

কার্তিক ১৩৪৩

বাংলা বানান : ৩

ধ্বনিসংগত বানান এক আছে সংস্কৃত ভাষায় এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায়। আর কোনো ভাষায় আছে কিংবা ছিল কি না জানি নে। ইংরেজি ভাষায় যে নেই অনেক দুঃখে তার আমরা পরিচয় পেয়েছি। আজও তার এলেকায় ক্ষণে ক্ষণে কলম হুঁচট খেয়ে থমকে যায়। বাংলা ভাষা শব্দ সংগ্রহ করে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে, কিন্তু ধ্বনিটা তার স্বকীয়। ধ্বনিবিকারেই অপভ্রংশের উৎপত্তি। বানানের জোরেই বাংলা আপন অপভ্রংশত্ব চাপা দিতে চায়। এই কারণে বাংলা ভাষার অধিকাংশ বানানই নিজের ধ্বনিবিদ্রোহী ভুল বানান। আভিজাত্যের ভান করে বানান আপন স্বধর্ম লঙ্ঘনের চেষ্টা করাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেটা পরম দুঃখকর হয়েছে। যে রাস্তা রেল-পাতা রাস্তা, তার উপর দিয়ে যাতায়াত করার সময় যদি বুক ফুলিয়ে জেদ করে বলি আমার গোরুর গাড়িটা রেলগাড়িই, তা হলে পথ-যাত্রাটা অচল না হতে পারে, কিন্তু সুবিধাজনক হয় না। শিশুদের পড়ানোয় যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন বাংলা পাঠশিক্ষার প্রবেশ-পথ কি রকম দুর্গম। এক যানের রাস্তায় আর-এক যানকে চালাবার দুশ্চেষ্টাবশত সেটা ঘটেছে। বাঙালি শিশুপালের দুঃখ নিবৃত্তি চিন্তায় অনেকবার কোনো-এক জন বানান-সংস্কারক কেমাল পাশার অভ্যুদয় কামনা করেছি। দূরে যাবারই বা দরকার কী, সেকালের প্রাকৃত ভাষার কাত্যায়নকে পেলেও চলে যেত।

একদা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রাকৃতজনের বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখেই দেখেছিলেন। সেই অবজ্ঞার অপমান দুঃখ আজও দেশের লোকের মনের মধ্যে রয়ে গেছে। আমাদের সাহিত্যভাষার বানানে তার পরিচয় পাই। বাংলা ভাষাকে যে হরিজন পঙ্‌ক্তিতে বসানো চলে না তার প্রমাণ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক কুলজির থেকেই আহরণ করা যথেষ্ট হয় নি। বর্ণপ্রলেপের যোগে সবর্ণত্ব প্রমাণ করে দেবার চেষ্টা ক্রমাগতই চলছে। ইংরেজ ও বাঙালি মূলত একই আর্যবংশোদ্ভব বলে যাঁরা যথেষ্ট সান্ত্বনা পান নি তাঁরা হ্যাটকোট প'রে যথাসম্ভব চাক্ষুষ বৈষম্য ঘোচাবার চেষ্টা করেছেন এমন উদাহরণ আমাদের দেশে দুর্লভ নয়। বাংলা সাহিত্যের বানানে সেই চাক্ষুষ ভেদ ঘোচাবার চেষ্টা যে প্রবল তার হাস্যকর দৃষ্টান্ত দেখা যায় সম্প্রতি কানপুর শব্দে মূর্ধন্য ণয়ের আরোপ থেকে। ভয় হচ্ছে কখন কানাইয়ের মাথায় মূর্ধন্য ণ সঙিনের খোঁচা মারে।

যায়। বাংলা ভাষা শব্দ সংগ্রহ করে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে, কিন্তু
ধ্বনিটা তার স্বকীয়। ধ্বনি বিকারেই অপভ্রংশের উৎপত্তি।
বানানের জোরেই বাংলা এখন অপভ্রংশত্ব চাপা দিতে চায়।
এই কারণে বাংলা ভাষার অধিকাংশ বানানই ~~[illegible]~~ ধ্বনিবিদ্রোহী
ভুল বানান। আভিজাত্যের ভান করে বানান আপন স্বধর্ম গোপন
করাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে পরম দুঃখকর হচ্ছে। যে রাস্তা
রেল পাতা রাস্তা তার উপর দিয়ে যাতায়াত করবার সময়
যদি বুক ফুলিয়ে ~~[illegible]~~ জেদ করে বলি আমার গোরুর গাড়িটা
রেলগাড়িই তাহলে পথযাত্রীর ~~[illegible]~~ অচল না হতে
পারে কিন্তু সুবিধা-জনক হয় না। শিশুদের পড়ানোয় যাঁদের
অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন বাংলা পাঠশিক্ষার প্রবেশ-
পথ কী রকম দুর্গম। সেও এক যানের রাস্তায় আর এক যানকে
চালাবার দুশ্চেষ্টা বশত।

"বাংলা বানান : ৩" প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

বাংলা ভাষা উচ্চারণকালে সংস্কৃতের সঙ্গে তার ধ্বনির ভেদ ঘোচানো অসম্ভব কিন্তু লেখবার সময় অক্ষরের মধ্যে চোখের ভেদ ঘোচানো সহজ। অর্থাৎ লিখব এক পড়ব আর, বাল্যকাল থেকে দণ্ডপ্রয়োগের জোরে এই কৃচ্ছ্রসাধন সাহিত্যিক সমাজপতিরা অনায়াসেই চালাতে পেরেছেন। সেকালে পণ্ডিতেরা সংস্কৃত জানতেন এই সংবাদটা ঘোষণা করবার জন্যে তাঁদের চিঠিপত্র প্রভৃতিতে বাংলা শব্দে বানানের বিপর্যয় ঘটানো আবশ্যক বোধ করেন নি। কেবল যত্ব ণত্ব নয়, হ্রস্ব ও দীর্ঘ ইকার ব্যবহার সম্বন্ধেও তাঁরা মাতৃভাষার কৌলীন্য লক্ষণ সাবধানে বজায় রাখতেন না। আমরা বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের দাবি করে থাকি কৃত্রিম দলিলের জোরে। বাংলায় সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ-বিকার ঘটে নি এমন দৃষ্টান্ত অত্যন্ত দুর্লভ। 'জল' বা 'ফল', 'সৌন্দর্য' বা 'অরুণ্‌' যে তৎসম শব্দ সেটা কেবল অক্ষর সাজানো থেকেই চোখে ঠেকে, ওটা কিন্তু বাঙালির হ্যাটকোটপরা সাহেবিরই সমতুল্য।

উচ্চারণের বৈষম্য সত্ত্বেও শব্দের পুরাতত্ত্বঘটিত প্রমাণ রক্ষা করা বানানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য এমন কথা অনেকে বলেন। আধুনিক ক্ষাত্রবংশীয়রা ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করেছে তবু দেহাবরণে ক্ষাত্র-ইতিহাস রক্ষার জন্যে বর্ম প'রে বেড়ানো তাদের কর্তব্য এ উপদেশ নিশ্চয়ই পালনীয় নয়। দেহাবরণে বর্তমান ইতিহাসকে উপেক্ষা করে প্রাচীন ইতিহাসকেই বহন করতে চেষ্টা করার দ্বারা অনুপযোগিতাকে সর্বাঙ্গে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু এ-সকল তর্ক সংগত হোক অসংগত হোক কোনো কাজে লাগবে না। কৃত্রিম বানান একবার চলে গেলে তার পরে আচারের দোহাই অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওঠে। যাকে আমরা সাধু ভাষা বলে থাকি সেই ভাষার বানান একেবারে পাকা হয়ে গেছে। কেবল দন্ত্য ন-য়ের স্থলে মূর্ধন্য ণ-য়ের প্রভাব একটা আকস্মিক ও আধুনিক সংক্রামকতারূপে দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সেটারও মীমাংসা করে দিয়েছেন, এখন থেকে কর্নওয়ালিসের কর্ণে মূর্ধন্য ণ-য়ের খোঁচা নিষিদ্ধ।

প্রাকৃত বাংলা আমাদের সাহিত্যে অল্প দিন হল অধিকার বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে। তার বানান এখনো আছে কাঁচা। এখনি ঠিক করবার সময়, এর বানান উচ্চারণ-ঘেঁষা হবে, অথবা হবে সংস্কৃত অভিধান ঘেঁষা।

যেমনি হোক, কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা একটা কোনো আদর্শ স্থির করে দেওয়া দরকার। তার পরে বিনা বিতর্কে সেটাকে গ্রহণ করে স্বেচ্ছাচারিতার

হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারবে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে কাজ করে দিয়েছেন— ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনায় ব্যাপারটাকে অনিশ্চিত করে রাখা অনাবশ্যক।

বাংলা ক্রিয়াপদে য়-র যোগে স্বরবর্ণ প্রয়োগ প্রচলিত হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিসভা কোথাও বা য় রক্ষা করেছেন কোথাও বা করেন নি। সে স্থলে সর্বত্রই য়-রক্ষার আমি পক্ষপাতী এই কথা আমি জানিয়েছিলেম। আমার মতে এ ক্ষেত্রে বানানভেদের প্রয়োজন নেই বলেছি বটে, কিন্তু বিদ্রোহ করতে চাই নে। যেটা স্থির হয়েছে সেটাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি তবু চিরাভ্যাসকে বর্জন করবার পূর্বে তার তরফের আবেদন জানাবার ঝোঁক সামলাতে পারি নি। এইবার কথাটাকে শেষ করে দেব।

ই-কারের পরে যখন কোনো স্বরবর্ণের আগম হয়, তখন উভয়ে মিলে য় ধ্বনির উদ্ভব হয় এটা জানা কথা। সেই নিয়ম অনুসারে একদা খায়্যা পায়্যা প্রভৃতি বানান প্রচলিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই কেতাবী সাধু-বাংলায় হইয়া করিয়া প্রভৃতি বানানের উৎপত্তি। ওটা অনবধানবশত হয় নি এইটে আমার বক্তব্য।

হয় ক্রিয়াপদে হঅ বানান চলে নি। এখানে হয়-এর 'য়' একটি লুপ্ত এ-কার বহন করছে। ব্যাকরণ-বিধি অনুসারে হএ বানান চলতে পারত। চলে নি যে, তার কারণ বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে শব্দের শেষবর্ণ যদি স্বরবর্ণ হয় তবে দীর্ঘস্বর হলেও তার উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। হ্রস্ব এ এবং য়-র উচ্চারণে ভেদ নেই। এই অন্ত্য এ স্বরবর্ণের উচ্চারণকে যদি দীর্ঘ করতে হত তা হলে য় যোগ করা অনিবার্য হত। তা হলে লিখতে হত হয়ে, হএ লিখে হয়ে উচ্চারণ চলে না।

তেমনি খাও শব্দের ও হ্রস্বস্বর, কিন্তু খেও শব্দের ও হ্রস্ব নয়— সেইজন্যে দীর্ঘ ওকারের আশ্রয় স্বরূপে য়-র প্রয়োজন হয়।

কিন্তু এ তর্কও অবান্তর। আসল কথাটা এই যে ই-কারের পরবর্তী স্বরবর্ণের যোগে য়-র উদ্ভব স্বরসন্ধির নিয়মানুযায়ী। বেআইন বেআড়া বেআক্কেল বানান সুসংগত কারণ এ-কারের সঙ্গে অন্য স্বরবর্ণের মিলনে ঘটক দরকার করে না। বানান অনুসারে খেও এবং খেয়ো উচ্চারণের ভেদ নেই এ কথা মানা শক্ত। এখানে মনে রাখা দরকার খেয়ো (খাইয়ো) শব্দের মাঝখানে একটা লুপ্ত ই-কার

আছে। কিন্তু উচ্চারণে তার প্রভাব লুপ্ত হয় নি। লুপ্ত ই-কার অন্যত্রও উচ্চারণ-মহলে আপন প্রভাব রক্ষা করে থাকে সে কথার আলোচনা আমার বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে[১] পূর্বেই করেছি।

পৌষ ১৩৪৩

১ 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

বানান-বিধি

কিছুদিন পূর্বে ইংরেজি বানান সংস্কার সম্বন্ধে গিলবর্ট মারের একটি পত্র কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ইংরেজি ভাষায় যেমন ক্রমশ পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি মাঝে মাঝে তার বানান সংস্কার ঘটেছে। সচল ভাষার অচল বানান অস্বাভাবিক। আধুনিক ইংরেজিতে আর-একবার বানান শোধনের প্রয়োজন হয়েছে এই তাঁর মত। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা একটি সভাও স্থাপন করেন।

ঠিক যে সময়ে বাংলা ভাষায় এই রকম চেষ্টার প্রবর্তন সেই সময়েই গিলবর্ট মারের এই চিঠিখানি পড়ে আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছে। বস্তুত ভাবনা অনেক দিন থেকেই আমাকে পেয়ে বসেছিল, এই চিঠিতে আরো যেন একটু ধাক্কা দিল।

সুদীর্ঘকালের সাহিত্যিক ব্যবহারে ইংরেজি ভাষা পাকা হয়ে উঠেছে। এই ভাষায় বহুলক্ষ বই ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা ছাড়া ইস্কুলে য়ুনিভর্সিটিতে বক্তৃতামঞ্চে এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত নেই। উচ্চারণের অবস্থা যাই হোক সর্বত্রই এর বানানের সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত। যে ভাষার লিখিত মূর্তি দেশে কালে এমন পরিব্যাপ্ত তাকে অল্পমাত্র নাড়া দেওয়াও সহজ নয়, ghost শব্দের gost বানানের প্রস্তাবে নানা সমুদ্রের নানা তীর বাদে প্রতিবাদে কী রকম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতে পারে সে কথা কল্পনা করলে দুঃসাহসিকের মন স্তম্ভিত হয়। কিন্তু ও দেশে বাধা যেমন দূরব্যাপী, সাহসও তেমনি প্রবল। বস্তুত আমেরিকায় ইংরেজি ভাষার বানানে যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে তাতে কম স্পর্ধা প্রকাশ পায় নি।

মার্কিন দেশীয় বানানে through শব্দ থেকে তিনটে বেকার অক্ষর বর্জন করে বর্ণবিন্যাসে যে পাগলামির উপশম করা হল আমাদের রাজত্বে সেটা গ্রহণ করবার যদি বাধা না থাকত তা হলে সেইসঙ্গে বাঙালির ছেলের অজীর্ণ রোগের সেই পরিমাণ উপশম হতে পারত। কিন্তু ইংরেজ আচারনিষ্ঠ, বাঙালির কথা বলাই বাহুল্য। নইলে মাপ ও ওজন সম্বন্ধে যে দাশমিক মাত্রা য়ুরোপের অন্যত্র স্বীকৃত হওয়াতে ভূরি পরিমাণ পরিশ্রম ও হিসাবের জটিলতা কমে গিয়েছে ইংলণ্ডেই তা গ্রাহ্য হয় নি, কেবলমাত্র সেখানেই তাপ পরিমাপে সেন্টিগ্রেডের স্থলে ফারেনহাইট অচল হয়ে আছে। কাজ সহজ করবার অভিপ্রায়ে আচারের

পরিবর্তন ঘটাতে গেলে অভ্যাসে আসক্ত মনের আরামে যেটুকু হস্তক্ষেপ করা হয় সেটুকু ওরা সহ্য করতে পারে না। এই সম্বন্ধে রাজায় প্রজায় মনোভাবের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

যা হোক, তবুও ও দেশে অযথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বুদ্ধির উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায়। গিলবর্ট মারের মতো মনস্বীর প্রচেষ্টা তারই লক্ষণ।

সংস্কৃত বাংলা অর্থাৎ যাকে আমরা সাধুভাষা বলে থাকি তার মধ্যে তৎসম শব্দের চলন খুবই বেশি। তা ছাড়া সেই-সব শব্দের সঙ্গে ভঙ্গির মিল করে অল্প কিছুকাল মাত্র পূর্বে গড়-উইলিয়মের গোরাদের উৎসাহে পণ্ডিতেরা যে কৃত্রিম গদ্য বানিয়ে তুলেছেন তাতে বাংলার ক্রিয়াপদগুলিকে আড়ষ্ট করে দিয়ে তাকে যেন একটা ক্লাসিকাল মুখোশ পরিয়ে সান্ত্বনা পেয়েছেন; বলতে পেরেছেন, এটা সংস্কৃত নয় বটে, কিন্তু তেমনি প্রাকৃতও নয়। যা হোক, ওই ভাষা নিতান্ত অল্প-বয়স্ক হলেও হঠাৎ সাধু উপাধি নিয়ে প্রবীণের গদিতে অচল হয়ে বসেছেন। অন্ধভক্তির দেশে উপাধির মূল্য আছে।

সৌভাগ্যক্রমে কিছুকাল থেকে প্রাকৃত বাংলা আচারনিষ্ঠদের পাহারা পার হয়ে গিয়ে সাহিত্যের সভায় নিজের স্বাভাবিক আসন নিতে পেরেছে। সেই আসনের পরিসর প্রতিদিন বাড়ছে, অবশেষে— থাক্, যা অনিবার্য তা তো ঘটবেই, সকল দেশেই ঘটেছে, আগেভাগে সনাতনপন্থীদের বিচলিত করে লাভ নেই।

এই হচ্ছে সময় যখন উচ্চারণের সঙ্গে মিল করে প্রাকৃত বাংলার বানান অপেক্ষাকৃত নিরাপদে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। আমাদের দেশের পূর্বতন আদর্শ খুব বিশুদ্ধ। বানানের এমন খাঁটি নিয়ম পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় আছে বলে জানি নে। সংস্কৃত ভাষা খুব সূক্ষ্ম বিচার করে উচ্চারণের প্রতি বানানের সদ্‌ব্যবহার রক্ষা করেছেন। একেই বলা যায় honesty, যথার্থ সাধুতা। বাংলা সাধুভাষাকে honest ভাষা বলা চলে না, মাতৃভাষাকে সে প্রবঞ্চনা করেছে।

প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যখন লিপিবদ্ধ হয়েছে তখন সে যে ছদ্মবেশে সংস্কৃত ভাষা, পণ্ডিতেরা এমন অভিমান রাখেন নি; তাঁদের যথার্থ পাণ্ডিত্য প্রমাণ হয়েছে বানানের যাথার্থ্যে।

সেই সনাতন সদ্দৃষ্টান্ত গ্রহণ করবার উপযুক্ত সময় এসেছে। এখনো প্রাকৃত বাংলায় বানানের পাকা দলিল তৈরি হয় নি। এই সময়ে যদি উচ্চারণের প্রতি

সম্পূর্ণ সম্মান রক্ষা করে বানানের ব্যবস্থা হতে পারত তা হলেও কোনো পক্ষ থেকেই নালিশ-ফরিয়াদের যে কোনো আশঙ্কা থাকত না তা বলি নে, কিন্তু তার ধাক্কা হত অনেক কম।

চিঠিপত্রে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার কিছুকাল পূর্বেও ছিল না, কিন্তু আমি যতটা প্রমাণ পেয়েছি তাতে বলতে পারি যে আজকাল এই ভাষা ব্যবহারের ব্যতিক্রম প্রায় নেই বললেই হয়। মেয়েদের চিঠি যা পেয়ে থাকি তাতে দেখতে পাই যে, উচ্চারণ রক্ষা করে বানান করাকে অপরাধের কোঠায় গণ্য করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁদের হুঁশ নেই। আমি সাধারণ মেয়েদের কথাই বলছি, বাংলায় যাঁরা এম্. এ. পরীক্ষার্থিনী তাঁদের চিঠি আমি খুব বেশি পাই নি। একটি মেয়ের চিঠিতে যখন কোলকাতা বানান দেখলুম তখন মনে ভারি আনন্দ হল। এই রকম মেয়েদের কাউকে বানান সংস্কার সমিতিতে রাখা উচিত ছিল। কেননা প্রাকৃত বাংলা বানান বিচারে পুরুষদেরই প্রাধান্য এ কথা আমি স্বীকার করি নে। এ পর্যন্ত অলিখিত প্রাকৃত বাংলা ভাষায় রস জুগিয়ে এসেছে মেয়েরাই, ছেলেবেলায় যখন রূপকথা শুনেছি তখন তার প্রমাণ পেয়েছি প্রতি সন্ধ্যাবেলায়। ব্রতকথার বাংলা ভাষার প্রতি লক্ষ করলেও আমার কথা স্পষ্ট হবে। এটা জানা যাবে প্রাকৃত বাংলা যেটুকু সাহিত্যরূপ নিয়েছে সে অনেকটাই মেয়েদের মুখে। অবশেষে সত্যের অনুরোধে ময়মনসিংহগীতিকা উপলক্ষে পুরুষের জয় ঘোষণা করতে হবে। এমন অকৃত্রিম ভাবরসে ভরা কাব্য বাংলা ভাষায় বিরল।

যে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্প্রতি সাহিত্যে হরিজন -বর্গ থেকে উপরের পঙ্‌ক্তিতে উঠেছে, তার উচ্চারণ ওকার-বহুল এ কথা মানতে হবে। অনেক মেয়েদের চিঠিতে দেখেছি তাঁদের ওকার-ভীতি একেবারেই নেই। তাঁরা মুখে বলেন 'হোলো', লেখাতেও লেখেন তাই। কোরচি, কোরবো, লিখতে তাঁদের কলম কাঁপে না। ওকারের স্থলে অর্ধকুণ্ডলী ইলেকচিহ্ন ব্যবহার করে তাঁরা ওই নিরপরাধ স্বরবর্ণটার চেহারা চাপা দিতে চান না। বাংলা প্রাকৃতের বিশেষত্ব ঘোষণার প্রধান নকিব হল ওই ওকার, ইলেকচিহ্নে বা অচিহ্নে ওর মুখ চাপা দেবার ষড়যন্ত্র আমার কাছে সংগত বোধ হয় না। বাঙালির ওকার-ভীতির একটা প্রমাণ পাই ভৌগলিক ও পৌরহিত্য শব্দ ব্যবহারে।

সেদিন নতুন বানান-বিধি অনুসারে লিখিত কোনো বইয়ে যখন 'কাল' শব্দ চোখে পড়ল তখন অতি অল্প একটু সময়ের জন্য আমার খট্‌কা লাগল। পরক্ষণেই

বুঝতে পারলুম লেখক বলতে চান কালো। লিখতে চান কাল। কর্তৃপক্ষের অনুশাসন আমি নম্রভাবে মেনে নিতে পারতুম কিন্তু কালো উচ্চারণের ওকার প্রাকৃত বাংলার একটি মূল তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। তত্ত্বটি এই যে দুই অক্ষরবিশিষ্ট বিশেষণ পদ এই ভাষায় প্রায়ই স্বরান্ত হয়ে থাকে। তার কোনো ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় অতি অল্প। সেই ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যতগুলি আমার মনে পড়ল আগে তার তালিকা লিখে দিচ্ছি। রঙ বোঝায় এমন বিশেষণ, যেমন 'লাল' ('নীল' তৎসম শব্দ)। স্বাদ বোঝায় যে শব্দে, যেমন টক, ঝাল। তার পরে সংখ্যাবাচক শব্দ, এক থেকে দশ, ও তার পরে বিশ, ত্রিশ ও ষাট। এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। আমাদের ভাষায় এই সংখ্যাবাচক শব্দ কেবলমাত্র সমাসে চলে, যেমন একজন, দশঘর, দুইমুখো, তিনহপ্তা। কিন্তু বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে জোড়া না লাগিয়ে ব্যবহার করতে হলেই আমরা সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে টি বা টা, খানা বা খানি যোগ করি, এর অন্যথা হয় না। কখনো কখনো ই স্বর যোগ করতে হয়, যেমন একই লোক, দুইই বোকা। কখনো কখনো সংখ্যাবাচক শব্দে বাক্যের শেষে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়, যেমন হরি ও হর এক। এখানে 'এক' বিশেষ্যপদ, তার অর্থ, এক-সত্তা, এক হরিহর নয়। আরো দুটো সংখ্যাসূচক শব্দ আছে যেমন, আধ এবং দেড়। কিন্তু এরাও সমাসের সঙ্গী, যেমন, আধখানা, দেড়খানা। ওই দুটো শব্দ যখন স্বাতন্ত্র্য পায় তখন ওরা হয় আধা, দেড়া। আর-একটা সমাসসংশ্লিষ্ট শব্দের দৃষ্টান্ত দেখাই, যেমন জোড়, সমাসে ব্যবহার করি জোড়হাত ; সমাসবন্ধন ছুটিয়ে দিলে ওটা হয় জোড়া হাত। 'হেঁট' বিশেষণ শব্দটির ব্যবহার খুব সংকীর্ণ। এক হল হেঁটমুণ্ড, সেখানে ওটা সমাসের অঙ্গ। তা ছাড়া, হেঁট হওয়া হেঁট করা। কিন্তু সাধারণ বিশেষণরূপে ওকে আমরা ব্যবহার করি নে, যেমন আমরা বলি নে, হেঁট মানুষ। বস্তুত হেঁট হওয়া, হেঁট করা জোড়া ক্রিয়াপদ, জুড়ে লেখাই উচিত। 'মাঝ' শব্দটাও এই জাতের, বলি মাঝখানে, মাঝদরিয়া, এ হল সমাস, আর বলি মাঝ থেকে, সেটা হল প্রত্যয়যুক্ত, 'থেকে' প্রত্যয়টি ছাড়িয়ে নিয়ে কাজে লাগাতে পারি নে ; বলা যায় না, মাঝ গোরু বা মাঝ ঘর। আর-একটা ফার্সি শব্দ মনে পড়ছে 'সাফ্'। অধিকাংশ স্থলে বিশেষণ মাত্রই সমাসের অন্তর্গত, যেমন সাফ কাপড়, কিন্তু ওটা যে স্বাতন্ত্র্যবান বিশেষণ শব্দ তার প্রমাণ হয়, যখন বলা যায় কাপড়টা সাফ। কিন্তু বলা যায় না 'কথা এক', বলতে হয়, 'কথা একটা', কিংবা, 'কথা

একই'। বলি, 'মোট কথা এই', কিন্তু বলি নে 'এই কথাটাই মোট'। যাই হোক, দুই অক্ষরের হসন্ত বাংলা বিশেষণ হয়তো ভেবে ভেবে আরো মনে আনা যেতে পারে, কিন্তু যথেষ্টই ভাবতে হয়।

অপর পক্ষে বেশি খুঁজতে হয় না যথা, বড়ো, ছোটো, মেঝো, সেজো, ভালো, কালো, ধলো, রাঙা, সাদা, ফিকে, খাটো, রোগা, মোটা, বেঁটে, কুঁজো, ত্যাড়া, বাঁকা, সিধে, কানা, খোঁড়া, বোঁচা, নুলো, ন্যাকা, হাঁদা, খাঁদা, টেরা, কটা, গ্যাটা, গোটা, ভোঁদা, ন্যাড়া, ক্ষ্যাপা, মিঠে, ডাঁসা, কষা, খাসা, তোফা, কাঁচা, পাকা, সোঁদা, বোদা, খাঁটি, মেকি, কড়া, মিঠে, চোখা, রোখা, আঁটা, ফাটা, পোড়া, ভিজে, হাজা, শুকো, গুঁড়ো, বুড়ো, ছোঁড়া, গোঁড়া, ওঁচা, খেলো, ছ্যাদা, ঝুঁটো, ভীতু, আগা, গোড়া, উঁচু, নিচু ইত্যাদি। মত শব্দটা বিশেষ্য, ওইটে থেকে বিশেষণ জন্ম নিতেই সে হল মতো।

কেন আমি বাংলা দুই অক্ষরের বিশেষণ পদ থেকে তার অন্তস্বর লোপ করতে পারব না তার কৈফিয়ত আমার এইখানেই রইল।

বাংলা শব্দে কতকগুলি মুদ্রাভঙ্গি আছে। ভঙ্গিসংকেত যেমন অঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছেদে যুক্ত এগুলিও তেমনি। যে মানুষ রেগেছে তার হাত থেকে ছুরিটা নেওয়া চলে, কিন্তু ভ্রূর থেকে ভ্রূকুটি নেওয়া যায় না। যেমনি, তখনি, আমারো, কারো, কোনো, কখনো শব্দে ইকার এবং ওকার কেবলমাত্র ঝোঁক দেবার জন্যে, ওরা শব্দের অনুবর্তী না হয়ে, যথাসম্ভব তার অঙ্গীভূত থাকাই ভালো। যথাসম্ভব বলতে হল এইজন্যে যে স্বরান্ত শব্দে সংকেত স্বরগুলি অগত্যা সঙ্গে থাকে, মিলে থাকে না, যেমন তোমরাও, আমরাই। কিন্তু যেখানে উচ্চারণের মধ্যে মিলনের বাধা নেই, সেখানে আমি ওদের মিলিয়ে রাখব। কেন আমি বিশেষ-ভাবে মিলনের পক্ষপাতী একটা ছড়া দিয়ে বুঝিয়ে দেব।

যেমনি যখনি দেখা দিই তার ঘরে
অমনি তখনি মিথ্যা কলহ করে।
কোনো কোনো দিন কহে সে নোলক নাড়ি
কারো কারো সাথে জন্মের মতো আড়ি॥

যদি বানান করি যেমনই, যখনই, অমনই, তখনই, কোনও, কারও, দৃষ্টিকটুত্বের নালিশ হয়তো গ্রাহ্য না হতে পারে। কিন্তু 'যখনই' বানানের স্বাভাবিক যে উচ্চারণ, ছন্দের অনুরোধে সেটা রক্ষা করতে চায় এমন কবি হয়তো জন্মাতেও

পারে, কেননা কাল নিরবধি এবং বিপুলা চ পৃথ্বী। যথা :

যখনই দেখা হয় তখনই হাসে,
হয়তো সে হাসি তার খুসি পরকাশে।
কখনও ভাবি, ওগো শ্রীমতী নবীনা,
কোনও কারণে এটা বিদ্রূপ কিনা॥

আপাতত জানিয়ে রাখছি কেবল পদ্যে নয়, গদ্যেও আমি উচ্চারণ অনুগত করে কোনো, কখনো, যখনি, তখনি লিখব। এইখানে একটা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, 'কখনই আমি যাব না' এবং তখনি আমি গিয়েছিলেম এ দুই জায়গায় কি একই বানান থাকা সংগত ?

উপসংহারে এই কথাটি বলতে চাই বানানের বিধিপালনে আপাতত হয়তো মোটের উপরে আমরা 'বাধ্যতামূলক' নীতি অনুসরণ করে একান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে যোগ দেব। কিন্তু এই দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যপথে ব্যাপারটা থামবে না। অচিরে এমন সাহসিকের সমাগম হবে যাঁরা নিঃসংকোচে বানানকে দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবেই উচ্চারণের সত্য রক্ষা করবেন।

বানান সংস্কার ব্যাপারে বিশেষভাবে একটা বিষয়ে কর্তৃপক্ষেরা যে সাহস দেখিয়েছেন সেজন্যে আমি তাঁদের ভূরি ভূরি সাধুবাদ দিই। কী কারণে জানি নে, হয়তো উড়িষ্যার হাওয়া লেগে আধুনিক বাঙালি অকস্মাৎ মূর্ধন্য ণয়ের প্রতি অহেতুক অনুরাগ প্রকাশ করছেন। আমি এমন চিঠি পাই যাতে লেখক শনিবার এবং শূন্য শব্দ মূর্ধন্য ণ দিয়ে লেখেন। এটাতে ব্যাধির সংক্রামকতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কর্নেল, গবর্নর, জর্নাল প্রভৃতি বিদেশী শব্দে তাঁরা দেবভাষার ণত্ববিধি প্রয়োগ করে তার শুদ্ধিতা সাধন করেন। তাতে বোপদেবের সম্মতি থাকতেও পারে। কিন্তু আজকাল যখন খবরের কাগজে দেখতে পাই কানপুরে মূর্ধন্য ণ চড়েছে তখন বোপদেবের মতো বৈয়াকরণিককে তো দায়ী করতে পারি নে। কানপুরের কান শব্দের দুটো ব্যুৎপত্তি থাকতে পারে, এক কর্ণ শব্দ থেকে। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে রেফের সংসর্গে নয়ের মূর্ধন্যতা ঘটে। কর্ণ শব্দের 'র' গেলেই মূর্ধন্যতার অস্তিত্বের কৈফিয়ত যায় চলে। কানপুরের কান শব্দ হয়তো কানাই শব্দের অপভ্রংশ। কৃষ্ণ থেকে কান ও কানাই শব্দের আগমন। কৃষ্ণ শব্দে ঋফলার পরে মূর্ধন্য ষ, ও উভয়ের প্রভাবে শেষের ন মূর্ধন্য হয়েছে। আধুনিক প্রাকৃত থেকে সেই ঋফলা হয়েছে উৎপাটিত। তখন থেকে বোধ

করি ভারতের সকল ভাষা হতেই কানাই শব্দে মূর্ধন্যের আক্রমণের আশঙ্কা চলে গেছে। কিন্তু নতুন উপক্রমণিকা-পড়া বাঙালি হয়তো কোন্ দিন কানাই শব্দে মূর্ধন্য ণ চালিয়ে তৃপ্তিবোধ করবেন। এই রকম দুটো-একটা শব্দ তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। স্বর্ণের রেফহীন অপভ্রংশ সোনায় তাঁরা মূর্ধন্য ণ আঁকড়িয়ে আছেন, অথচ শ্রবণের অপভ্রংশ শোনা তাঁদের মূর্ধন্যপক্ষপাতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ব্যাকরণের তর্ক থাক্, ওটাতে চিরদিন আমার দুর্বল অধিকার। কৃষ্ণ শব্দের অপভ্রংশে কোনো প্রাকৃতে কাণ্হ বা কাণ থাকতেও পারে, যদি থাকে সেখানে সেটা উচ্চারণের অনুগত। সেখানে কেবল লেখবার বেলা কাণ্হ এবং বলবার বেলা কান্হ কখনই আদিষ্ট হয় নি। কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় তো মূর্ধন্য ণয়ের সাড়া নেই কোথাও। মুদ্রাযন্ত্রকে দিয়ে সবই ছাপানো যায় কিন্তু রসনাকে দিয়ে তো সবই বলানো যায় না। কিন্তু যে মূর্ধন্য ণয়ের উচ্চারণ প্রাকৃত বাংলায় একেবারেই নেই, গায়ে পড়ে তার আনুগত্য স্বীকার করতে যাব কেন? এই পাণ্ডিত্যের অভিমানে শিশুপালদের প্রতি যে অত্যাচার করা যায় সেটা মার্জনীয় নয়। প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধন্য ণয়ের স্থান কোনোখানেই নেই এমন কথা যে-সাহসে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করতে পেরেছেন সেই সাহস এখনো আরো কতক দূর তাঁদের ব্যবহার করতে হবে। এখনো শেষ হয় নি কাজ।[১]

আষাঢ় ১৩৪৪

১ আমি "প্রাকৃত বাংলা" শব্দটি ব্যবহার করে আসছি। সেদিন এর একটা পুরাতন নজির পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি বুলবুল নামক পত্রে। যথা— "দেসি ভাসে পদবন্ধে গাহি পরকৃতে।"

প্রবন্ধটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত একটি সংশোধিত প্রুফ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। বর্তমান সংস্করণে ওই সংশোধন অনুযায়ী পাঠ গৃহীত।

বানান-বিধি

১

...বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলুম। তার কারণ এই যে, প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার সাহিত্যে অবাধে প্রচলিত হয়ে চলেছে কিন্তু এর বানান সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে দেখে চিন্তিত হয়েছিলুম। এ সম্বন্ধে আমার আচরণেও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় সে আমি জানি, এবং তার জন্য আমি প্রশ্রয় দাবি করি নে। এ রকম অব্যবস্থা দূর করবার একমাত্র উপায় শিক্ষা-বিভাগের প্রধান নিয়ন্তাদের হাতে বানান সম্বন্ধে চরম শাসনের ভার সমর্পণ করা।

বাংলা ভাষায় উচ্চারণে তৎসম শব্দের মর্যাদা রক্ষা হয় বলে আমি জানি নে। কেবলমাত্র অক্ষর বিন্যাসেই তৎসমতার ভান করা হয় মাত্র, সেটা সহজ কাজ। বাংলা লেখায় অক্ষর বানানের নির্জীব বাহন— কিন্তু রসনা নির্জীব নয়— অক্ষর যাই লিখুক, রসনা আপন সংস্কারমতই উচ্চারণ করে চলে। সে দিকে লক্ষ করে দেখলে বলতেই হবে যে, অক্ষরের দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি, সেই সকল শব্দের প্রায় ষোলো আনাই অপভ্রংশ। যদি প্রাচীন ব্যাকরণকর্তাদের সাহস ও অধিকার আমার থাকত, এই ছদ্মবেশীদের উপাধি লোপ করে দিয়ে সত্য বানানে এদের স্বরূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে পারতুম। প্রাকৃত বাংলা ব্যাকরণের কেমাল পাশা হবার দুরাশা আমার নেই কিন্তু কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ। উক্ত পাশা এ দেশেও দেহান্তর গ্রহণ করতে পারেন।

এমন-কি, যে-সকল অবিসংবাদিত তদ্‌ভব শব্দ অনেকখানি তৎসম-ঘেঁষা, তাদের প্রতি হস্তক্ষেপ করতে গেলেও পদে পদে গৃহবিচ্ছেদের আশঙ্কা আছে। এরা উচ্চারণে প্রাকৃত কিন্তু লেখনে সংস্কৃত আইনের দাবি করে। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সমিতি কতকটা পরিমাণে সাহস দেখিয়েছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁদের মনেও ভয় ডর আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাকৃত বাংলায় তদ্‌ভব শব্দ বিভাগে উচ্চারণের সম্পূর্ণ আনুগত্য যেন চলে এই আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যদি নিতান্তই সম্পূর্ণ সেই ভিত্তিতে বানানের প্রতিষ্ঠা নাও হয় তবু এমন একটা অনুশাসনের দরকার যাতে প্রাকৃত

বাংলার লিখনে বানানের সাম্য সর্বত্র রক্ষিত হতে পারে। সংস্কৃত এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা ছাড়া সভ্য জগতের অন্য কোনো ভাষারই লিখনব্যবহারে বোধ করি উচ্চারণ ও বানানের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই কিন্তু নানা অসংগতিদোষ থাকা সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে একটা অমোঘ শাসন দাঁড়িয়ে গেছে। কাজ চলবার পক্ষে সেটার দরকার আছে। বাংলা লেখনেও সেই কাজ চালাবার উপযুক্ত নির্দিষ্ট বিধির প্রয়োজন মানি, আমরা প্রত্যেকেই বিধানকর্তা হয়ে উঠলে ব্যাপারটা প্রত্যেক ব্যক্তির ঘড়িকে তার স্বনিয়মিত সময় রাখবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেবার মতো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতির বিধানকর্তা হবার মতো জোর আছে— এই ক্ষেত্রে যুক্তির জোরের চেয়ে সেই জোরেরই জোর বেশি এ কথা আমরা মানতে বাধ্য।

রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা নিয়ে বেশি তর্ক করবার দরকার আছে বলে মনে করি নে। যাঁরা নিয়মে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিতের নাম দেখেছি। আপনি যদি মনে করেন তাঁরা অন্যায় করেছেন তবুও তাঁদের পক্ষভুক্ত হওয়াই আমি নিরাপদ মনে করি। অন্তত তৎসম শব্দের ব্যবহারে তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার করতে কোনো ভয় নেই, লজ্জাও নেই। শুনেছি 'সৃজন' শব্দটা ব্যাকরণের বিধি অতিক্রম করেছে, কিন্তু যখন বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত কথাটা চালিয়েছেন তখন দায় তাঁরই, আমার কোনো ভাবনা নেই। অনেক পণ্ডিত 'ইতিমধ্যে' কথাটা চালিয়ে এসেছেন, 'ইতোমধ্যে' কথাটার ওকালতি উপলক্ষে আইনের বই ঘাঁটবার প্রয়োজন দেখি নে— অর্থাৎ এখন ওই 'ইতিমধ্যে' শব্দটার ব্যবহার সম্বন্ধে দায়িত্ব-বিচারের দিন আমাদের হাত থেকে চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়-বানান-সমিতিতে তৎসম শব্দ সম্বন্ধে যাঁরা বিধান দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন, এ নিয়ে দ্বিধা করবার দায়িত্বভার থেকে তাঁরা আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন থেকে কার্ত্তিক কর্ত্তা প্রভৃতি দুই ত-ওয়ালা শব্দ থেকে এক ত আমরা নিশ্চিন্ত মনে ছেদন করে নিতে পারি, সেটা সাংঘাতিক হবে না। হাতের লেখায় অভ্যাস ছাড়তে পারব বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না, কিন্তু ছাপার অক্ষরে পারব। এখন থেকে ভট্টাচার্য্য শব্দের থেকে য-ফলা লোপ করতে নির্বিকার চিত্তে নির্মম হতে পারব, কারণ নব্য বানান-বিধাতাদের মধ্যে তিন জন বড়ো বড়ো ভট্টাচার্য্যবংশীয় তাঁদের উপাধিকে য-ফলা বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন। এখন থেকে আর্য্য এবং অনার্য্য উভয়েই অপক্ষপাতে য-ফলা

মোচন করতে পারবেন, যেমন আধুনিক মাঞ্চু ও চীনা উভয়েরই বেণী গেছে কাটা।

তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নমস্তদের নমস্কার জানাব। কিন্তু তদ্‌ভব শব্দে অপণ্ডিতের অধিকারই প্রবল, অতএব এখানে আমার মতো মানুষেরও কথা চলবে —কিছু কিছু চালাচ্ছিও। যেখানে মতে মিলছি নে সেখানে আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানছি। কেননা, অক্ষরকৃত অসত্যভাষণের দ্বারা তাদের মন মোহগ্রস্ত হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সমিতির চেয়েও তাদের কথার প্রামাণিকতা যে কম তা আমি বলব না— এমন-কি, হয়তো— থাক্ আর কাজ নেই।

তা হোক, উপায় নেই। আমি হয়তো একগুঁয়েমি করে কোনো কোনো বানানে নিজের মত চালাব। অবশেষে হার মানতে হবে তাও জানি। কেননা, শুধু যে তাঁরা আইন সৃষ্টি করেন তা নয়, আইন মানাবার উপায়ও তাঁদের হাতে আছে। সেটা থাকাই ভালো, নইলে কথা বেড়ে যায়, কাজ বন্ধ থাকে। অতএব তাঁদেরই জয় হোক, আমি তো কেবল তর্কই করতে পারব, তাঁরা পারবেন ব্যবস্থা করতে। মুদ্রাযন্ত্র-বিভাগে ও শিক্ষা-বিভাগে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে সেই ব্যবস্থার দৃঢ়তা নিতান্ত আবশ্যক।

আমি এখানে স্বপ্রদেশ থেকে দূরে এসে বিশ্রামচর্চার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফল সর্বত্রই অনুসরণ করে। আমার যেটুকু কৈফিয়ত দেবার সেটা না দিয়ে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু এই যে দুঃখ স্বীকার করলুম এর ফল কেবল একলা আপনাকে নিবেদন করলে বিশ্রামের অপব্যয়টা অনেক পরিমাণেই অনর্থক হবে। অতএব এই পত্রখানি আমি প্রকাশ করতে পাঠালুম। কেননা, এই বানান-বিধি ব্যাপারে যাঁরা অসন্তুষ্ট তাঁরা আমাকে কতটা পরিমাণে দায়ী করতে পারেন সে তাঁদের জানা আবশ্যক। আমি পণ্ডিত নই, অতএব বিধানে যেখানে পাণ্ডিত্য আছে সেখানে নম্রভাবেই অনুসরণের পথ গ্রহণ করব, যে অংশটা পাণ্ডিত্যবর্জিত দেশে পড়ে সে অংশে যতটা শক্তি বাচালতা করব কিন্তু নিশ্চিত জানব, যে একদা "অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।"

আলমোড়া

১২।৬।৩৭

২

…আমি পূর্বেই কবুল করেছি যে, কী সংস্কৃত ভাষায় কী ইংরেজিতে আমি ব্যাকরণে কাঁচা। অতএব প্রাকৃত বাংলায় তৎসম শব্দের বানান নিয়ে তর্ক করবার অধিকার আমার নেই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই বানানের বিচার আমার মতের অপেক্ষা করে না। কেবল আমার মতো অনভিজ্ঞ ও নতুন পোড়োদের পক্ষ থেকে পণ্ডিতদের কাছে আমি এই আবেদন করে থাকি যে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয় সেখানে সেটা করাই কর্তব্য তাতে জীবে দয়ার প্রমাণ হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবীণদের অভ্যাস ও আচারনিষ্ঠতার প্রতি সম্মান করতে যাওয়া দুর্বলতা। যেখানে তাঁদের অবিসংবাদিত অধিকার সেখানে তাঁদের অধিনায়কত্ব স্বীকার করতেই হবে। অন্যত্র নয়। বানান-সংস্কার-সমিতি বোপদেবের তিরস্কার বাঁচিয়েও রেফের পর দ্বিত্ব বর্জনের যে বিধান দিয়েছেন সেজন্য নবজাত ও অজাত প্রজাবর্গের হয়ে তাঁদের কাছে আমার নমস্কার নিবেদন করি।

বিশেষজ্ঞতা সকল ক্ষেত্রেই দুর্লভ। ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা খুবই কম এ কথা মানতেই হবে। অথচ তাঁদের অনেকেরই অন্য এমন গুণ থাকতে পারে যাতে একোহি দোষো গুণসন্নিপাতের জন্য সাহিত্যব্যবহার থেকে তাঁদের নির্বাসন দেওয়া চলবে না। এঁদের জন্যেই কোনো একটি প্রামাণ্য শাসনকেন্দ্র থেকে সাহিত্যে বানান প্রভৃতি সম্বন্ধে কার্যবিধি প্রবর্তনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার। আইন বানাবার অধিকার তাঁদেরই আছে আইন মানাবার ক্ষমতা আছে যাঁদের হাতে। আইনবিদ্যায় যাঁদের জুড়ি কেউ নেই ঘরে বসে তাঁরা আইনকর্তাদের 'পরে কটাক্ষপাত করতে পারেন কিন্তু কর্তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আইন তাঁরা চালাতে পারবেন না। এই কথাটা চিন্তা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের কাছে বানানবিধি পাকা করে দেবার জন্যে দরখাস্ত জানিয়েছিলেম। অনেক দিন ধরে বানান সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার নিজেও করেছি অন্যকেও করতে দেখেছি। কিন্তু অপরাধ করবার অবাধ স্বাধীনতাকে অপরাধীও মনে মনে নিন্দা করে, আমিও করে এসেছি। সর্বসাধারণের হয়ে এর প্রতিবিধানভার ব্যক্তিবিশেষের উপর দেওয়া চলে না— সেইজন্যেই পীড়িত চিত্তে মহতের শরণাপন্ন হতে হল। আপনার চিঠির ভাষার ইঙ্গিত থেকে বোঝা গেল যে বানান-সংস্কার-সমিতির 'হোমরাচোমরা' 'পণ্ডিত'দের প্রতি আপনার যথেষ্ট শ্রদ্ধা নেই। এই অশ্রদ্ধা আপনাকেই

সাজে কিন্তু আমাকে তো সাজে না, আর আমার মতো বিপুলসংখ্যক অভাজনদেরও সাজে না। নিজে হাল ধরতে শিখি নি, কর্ণধারকে খুঁজি— যে-সে এসে নিজেকে কর্ণধার বলে ঘোষণা করলেও তাদের হাতে হাল ছেড়ে দিতে সাহস হয় না, কেননা, এতে প্রাণের দায় আছে।

এমন সন্দেহ আপনার মনে হতেও পারে যে সমিতির সকল সদস্যই সকল বিধিরই যে অনুমোদন করেন তা সত্য নয়। না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু আপসে নিষ্পত্তি করেছেন। তাঁদের সম্মিলিত স্বাক্ষরের দ্বারা এই কথারই প্রমাণ হয় যে এতে তাঁদের সম্মিলিত সমর্থন আছে। যৌথ কারবারের অধিনেতারা সকলেই সকল বিষয়েই একমত কি না, এবং তাঁরা কেউ কেউ কর্তব্যে ঔদাস্য করেছেন কি না সে খুঁটিনাটি সাধারণে জানেও না জানতে পারেও না। তারা এইটুকুই জানে যে স্বাক্ষরদাতা ডিরেক্টরদের প্রত্যেকেরই সম্মিলিত দায়িত্ব আছে। (বশিত্ব কৃতিত্ব প্রভৃতি ইন্‌ভাগান্ত শব্দে যদি হ্রস্ব ইকার প্রয়োগই বিধিসম্মত হয় তবে দায়িত্ব শব্দেও ইকার খাটতে পারে বলে আমি অনুমান করি)। আমরাও বানান-সমিতিকে এক বলে গণ্য করছি এবং তাঁদের বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত হচ্ছি। যেখানে স্বস্বপ্রধান দেবতা অনেক আছে সেখানে কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। অতএব বাংলা তৎসম শব্দের বানানে রেফের পরে দ্বিত্ববর্জনের যে বিধান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্বীকৃত হয়েছে সেটা সবিনয়ে আমিও স্বীকার করে নেব।

কিন্তু যে-প্রস্তাবটি ছিল বানান-সমিতি স্থাপনের মূলে, সেটা প্রধানত তৎসম শব্দসম্পর্কীয় নয়। প্রাকৃত বাংলা যখন থেকেই সাহিত্যে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করল তখন থেকেই তার বানানসাম্য নির্দিষ্ট করে দেবার সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রাকৃত বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই— যাঁরা সতর্ক হতে চান হাতের কাছে একটা নির্ভরযোগ্য অভিধান রাখলেই তাঁরা বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন। কিন্তু প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয় নি, কেননা, আজও তার প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাই হতে পারে নি। কিন্তু এই বানানের ভিত পাকা করার কাজ শুরু করবার সময় এসেছে। এত দিন এই নিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই কাটিয়েছি। তখনো কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রাধান্য লাভ করে নি। এই কারণে সুনীতিকেই এই ভার নেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেম। তিনি মোটামুটি একটা আইনের খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয়

পুলিসেরও জোর। সেইজন্যে তিনি দ্বিধা ঘোচাতে পারলেন না। এমন-কি, আমার নিজের ব্যবহারে শৈথিল্য পূর্বের মতোই চলল। আমার সংস্কার, প্রুফ-শোধকের সংস্কার, কপিকারকের সংস্কার, কম্পোজিটরের সংস্কার, এবং যে-সব পত্রিকায় লেখা পাঠানো যেত তার সম্পাদকদের সংস্কার এই-সব মিলে পাঁচ ভূতের কীর্তন চলত। উপরওয়ালা যদি কেউ থাকেন এবং তিনিই যদি নিয়ামক হন, এবং দণ্ডপুরস্কারের দ্বারা তাঁর নিয়ন্তৃত্ব যদি বল পায় তা হলেই বানানের রাজ্যে একটা শৃঙ্খলা হতে পারে। নইলে ব্যক্তিগত ভাবে আপনাদের মতো বিচক্ষণ লোকের দ্বারে দ্বারে মত সংগ্রহ করে বেড়ানো শিক্ষার পক্ষে যতই উপযোগী হোক কাজের পক্ষে হয় না।

কেন যে মুশকিল হয় তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। বর্ণন শব্দে আপনি যখন মূর্ধন্য ণ লাগান তখন সেটাকে যে মেনে নিই সে আপনার খাতিরে নয়, সংস্কৃত শব্দের বানান প্রতিষ্ঠিত স্বে মহিম্নি— নিজের মহিমায়। কিন্তু আপনি যখন বানান শব্দের মাঝখানটাতে মূর্ধন্য ণ চড়িয়ে দেন তখন ওটাকে আমি মানতে বাধ্য নই। প্রথমত এই বানানে আপনার বিধানকর্তা আপনি নিজেই। দ্বিতীয়ত আপনি কখনো বলেন প্রচলিত বানান মেনে নেওয়াই ভালো, আবার যখন দেখি মূর্ধন্য ণ-লোলুপ 'নয়া' বাংলা বানান-বিধিতে আপনার ব্যক্তিগত আসক্তিকে সমর্থনের বেলায় আপনি দীর্ঘকাল-প্রচলিত বানানকে উপেক্ষা করে উক্ত শব্দের বুকের উপর নবাগত মূর্ধন্য ণয়ের জয়ধ্বজা তুলে দিয়েছেন তখন বুঝতে পারি নে আপনি কোন্ মতে চলেন। জানি নে 'কানপুর' শব্দের কানের উপর আপনার ব্যবহার নব্য মতে বা পুরাতন মতে। আমি এই সহজ কথাটা বুঝি যে প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধন্য ণয়ের স্থান কোথাও নেই, নির্জীব ও নিরর্থক অক্ষরের সাহায্যে ওই অক্ষরের বহুল আমদানি করে আপনাদের পাণ্ডিত্য কাকে সন্তুষ্ট করছে, বোপদেবকে না কাত্যায়নকে? দুর্ভাগ্যক্রমে বানান-সমিতিরও যদি ণ-এর প্রতি অহৈতুক অনুরাগ থাকত তা হলে দণ্ডবিধির জোরে সেই বানানবিধি আমিও মেনে নিতুম। কেননা, আমি জানি আমি চিরকাল বাঁচব না কিন্তু পাঠ্য-পুস্তকের ভিতর দিয়ে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানে শিক্ষালাভ করবে তাদের আয়ু আমার জীবনের মেয়াদকে ছাড়িয়ে যাবে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়েছিল। তিনি প্রাকৃত বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র রূপ স্বীকার

করবার পক্ষপাতী ছিলেন এ কথা বোধ হয় সকলের জানা আছে। সেকালকার যে-সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁদের কারো কারো হাতের লেখা বাংলা বানান আমার দেখা আছে। বানান-সমিতির কাজ সহজ হত তাঁরা যদি উপস্থিত থাকতেন। সংস্কৃত ভাষা ভালো করে জানা না থাকলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা থাকবেই না, ভাষাকে এই অস্বাভাবিক অত্যাচারে বাধ্য করা পাণ্ডিত্যাভিমানী বাঙালির এক নূতন কীর্তি। যত শীঘ্র পারা যায় এই কঠোর বন্ধন শিথিল করে দেওয়া উচিত। বস্তুত একেই বলে ভূতের বোঝা বওয়া। এত কাল ধরে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য না নিয়ে যে বহুকোটি বাঙালি প্রতিদিন মাতৃভাষা ব্যবহার করে এসেছে এতকাল পরে আজ তাদের সেই ভাষাই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। এইজন্য তাদের সেই খাঁটি বাংলার প্রকৃত বানান নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে। এক কালে প্রাচীন ভারতের কোনো কোনো ধর্মসম্প্রদায় যখন প্রাকৃত ভাষায় পালি ভাষায় আপন আপন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন ঠিক এই সমস্যাই উঠেছিল। যাঁরা সমাধান করেছিলেন তাঁরা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; তাঁদের পাণ্ডিত্য তাঁরা বোঝার মতো চাপিয়ে যান নি জনসাধারণের 'পরে। যে অসংখ্য পাঠক ও লেখক পণ্ডিত নয় তাদের পথ তাঁরা অকৃত্রিম সত্যপন্থায় সরল করেই দিয়েছিলেন। নিজের পাণ্ডিত্য তাঁরা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিপাক করেছিলেন বলেই এমনটি ঘটা সম্ভব হয়েছিল।

আপনার চিঠিতে ইংরেজি ফরাসি প্রভৃতি ভাষার নজির দেখিয়ে আপনি বলেন ওই-সকল ভাষায় উচ্চারণে বানানে সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু এই নজিরের সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি নে। ওই-সকল ভাষার লিখিত রূপ অতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, এই পরিণতির মুখে কালে কালে যে-সকল অসংগতি ঘটেছে হঠাৎ তার সংশোধন দুঃসাধ্য। প্রাকৃত বাংলা ছাপার অক্ষরের এলেকায় এই সম্প্রতি পাসপোর্ট পেয়েছে। এখন ওর বানান নির্ধারণে একটা কোনো নীতি অবলম্বন করতে হবে তো। কালে কালে পুরোনো বাড়ির মতো বৃষ্টিতে রৌদ্রে তাতে নানা রকম দাগ ধরবে, সেই দাগগুলি সনাতনত্বের কৌলীন্য দাবি করতেও পারে। কিন্তু রাজমিস্ত্রি কি গোড়াতেই নানা লোকের নানা অভিমত ও অভিরুচি অনুসরণ করে ইমারতে পুরাতন দাগের নকল করতে থাকবে। য়ুরোপীয় ভাষাগুলি যখন প্রথম লিখিত হচ্ছিল তখন কাজটা কী রকম করে আরম্ভ হয়েছিল

তার ইতিহাস আমি জানি নে। আন্দাজ করছি কতকগুলি খামখেয়ালি লোকে মিলে এ কাজ করেন নি, যথাসম্ভব কানের সঙ্গে কলমের যোগ রক্ষা করেই শুরু করেছিলেন। তাও খুব সহজ নয়, এর মধ্যেও কারো কারো স্বেচ্ছাচার যে চলে নি তা বলতে পারি নে। কিন্তু স্বেচ্ছাচারকে তো আদর্শ বলে ধরে নেওয়া যায় না— অতএব ব্যক্তিগত অভিরুচির অতীত কোনো নীতিকে যদি স্বীকার করা কর্তব্য মনে করি তবে উচ্চারণকেই সামনে রেখে বানানকে গড়ে তোলা ভালো। প্রাচীন ব্যাকরণকর্তারা সেই কাজ করেছেন, তাঁরা অন্য কোনো ভাষার নজির মিলিয়ে কর্তব্য সহজ করেন নি।

এ প্রশ্ন করতে পারেন বানান-বিধিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারকে মেনে নেওয়াকেই যদি আমি শ্রেয় মনে করি তা হলে মাঝে প্রতিবাদ করি কেন? প্রতিবাদ করি বিচারকদের সহায়তা করবার জন্যেই, বিদ্রোহ করবার জন্যে নয়। এখনো সংস্কার-কাজের গাঁথনি কাঁচা রয়েছে, এখনো পরিবর্তন চলবে, কিন্তু পরিবর্তন তাঁরাই করবেন আমি করব না। তাঁরা আমার কথা যদি কিছু মেনে নেবার যোগ্য মনে করেন সে ভালোই, যদি না মনে করেন তবে তাঁদের বিচারই আমি মেনে নেব। আমি সাধারণ ভাবে তাঁদের কাছে কেবল এই কথাটি জানিয়ে রাখব যে প্রাকৃত ভাষার স্বভাবকে পীড়িত করে তার উপরে সংস্কৃত ব্যাকরণের মোচড় দেওয়াকে যথার্থ পাণ্ডিত্য বলে না। একটা তুচ্ছ দৃষ্টান্ত দেব। প্রচলিত উচ্চারণে আমরা বলি কোলকাতা, কলিকাতাও যদি কেউ বলতে ইচ্ছা করেন বলতে পারেন, যদিও তাতে কিঞ্চিৎ হাসির উদ্রেক করবে। কিন্তু ইংরেজ এই শহরটাকে উচ্চারণ করে ক্যালক্যাটা এবং লেখেও সেই অনুসারে। আপনিও বোধ হয় ইংরেজিতে এই শহরের ঠিকানা লেখবার সময় ক্যালক্যাটাই লেখেন, অথবা ক্যালক্যাটা লিখে কলিকাতা উচ্চারণ করেন না— অর্থাৎ যে জোরে প্রাকৃত বাংলায় আপনারা যত্ব ণত্ব মেশিনগান চালাতে চেষ্টা করেন, সে জোর এখানে প্রয়োগ করেন না। আপনি বোধ করি ইংরেজিতে চিটাগংকে চট্টগ্রাম সিলোনকে সিংহল বানান করে বানান ও উচ্চারণে গঙ্গাজলের ছিটে দেন না। ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করবামাত্রই যশোরকে আপনারা জেসোর বলেন, এমন-কি, মিত্রকে মিটার লেখার মধ্যে অশুচিতা অনুভব করেন না। অতএব চোখে অঞ্জন দিলে কেউ নিন্দে করবে না, মুখে দিলে করবে। প্রাকৃত বাংলায় যা শুচি, সংস্কৃত ভাষায় তাই অশুচি।

আপনি আমার একটি কথা নিয়ে কিছু হাস্য করেছেন কিন্তু হাসি তো যুক্তি নয়। আমি বলেছিলেম বর্তমান সাধু বাংলা গদ্য ভাষার ক্রিয়াপদগুলি গড় উইলিয়মের পণ্ডিতদের হাতে ক্ল্যাসিক ভঙ্গির কাঠিন্য নিয়েছে। আপনি বলতে চান তা সত্য নয়। কিন্তু আপনার এই উক্তি তো সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্তর্গত নয় অতএব আপনার কথায় আমি যদি সংশয় প্রকাশ করি রাগ করবেন না। বিষয়টা আলোচনার যোগ্য। এক কালে প্রাচীন বাংলা আমি মন দিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গেই পড়েছিলুম। সেই সাহিত্যে সাধু বাংলায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের অভাব লক্ষ্য করেছিলুম। হয়তো ভুল করেছিলুম। দয়া করে দৃষ্টান্ত দেখাবেন। একটা কথা মনে রাখবেন ছাপাখানা চলন হবার পরে প্রাচীন গ্রন্থের উপর দিয়ে যে শুদ্ধির প্রক্রিয়া চলে এসেছে সেটা বাঁচিয়ে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করবেন।

আর একটি কথা। ইলেক। আপনি বলেন লুপ্ত স্বরের চিহ্ন বলে ওটা স্বীকার্য কেননা ইংরেজিতে তার নজির আছে। 'করিয়া' শব্দ থেকে ইকার বিদায় নিয়েছে অতএব তার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে ইলেকের স্থাপনা। ইকারে আকারে মিলে একার হয়— সেই নিয়মে ইকার আকারের যোগে 'করিয়া' থেকে 'কোরে' হয়েছে। প্রথম বর্ণের ওকারটিও পরবর্তী ইকারের দ্বারা প্রভাবিত। যেখানে যথার্থই কোনো স্বর লুপ্ত হয়েছে অথচ অন্য স্বরের রূপান্তর ঘটায় নি এমন দৃষ্টান্তও আছে, যেমন ডাহিন দিক থেকে ডান দিক, বহিন থেকে বোন, বৈশাখ থেকে বোশেখ। এখনো এই-সব লুপ্ত স্বরের স্মরণচিহ্ন ব্যবহার ঘটে নি। গোধূম থেকে গম হয়েছে এখানেও লুপ্ত উকারের শোকচিহ্ন দেখি নে। যে-সকল শব্দে, স্বরবর্ণ কেন, গোটা ব্যঞ্জনবর্ণ অন্তর্ধান করেছে সেখানেও চিহ্নের উপদ্রব নেই। মুখোপাধ্যায়ের পা-শব্দটি দৌড় দিয়ে নিজের অর্থরক্ষা করেছে, পদচিহ্নমাত্র পিছনে ফেলে রাখে নি— এই-সমস্ত তিরোভাবকে চিহ্নিত করবার জন্যে সমুদ্রপার থেকে চিহ্নের আমদানি করার প্রয়োজন আছে কি। ইলেক না দিলে ওকার ব্যবহার করতে হয়, নইলে অসমাপিকার সূচনা হয় না। তাতে দোষ কী আছে।

পুনর্বার বলি আমি উকিল মাত্র, জজ নই। যুক্তি দেবার কাজ আমি করব, রায় দেবার পদ আমি পাই নি। রায় দেবার ভার যাঁরা পেয়েছেন আমার মতে তাঁরা শ্রদ্ধেয়।

বোধ হচ্ছে আর একটিমাত্র কথা বাকি আছে। এখনি তখনি আমারো তোমারো শব্দের ইকার ওকারকে ঝোঁক দেবার কাজে একটা ইঙ্গিতের মধ্যে গণ্য করে ও দুটোকে শব্দের অন্তভু ক্ত করবার প্রস্তাব করেছিলেম। তার প্রতিবাদে আপনি পরিহাসের স্বরে বলেছেন, তবে কি বলতে হবে, আমরা ভাতি খাই রুটি খাই নে। দুটো প্রয়োগের মধ্যে যে প্রভেদ আছে সেটা আপনি ধরতে পারেন নি। শব্দের উপরে ঝোঁক দেবার ভার কোনো-না-কোনো স্বরবর্ণ গ্রহণ করে। যখন আমরা বলতে চাই বাঙালি ভাতই খায় তখন ঝোঁকটা পড়ে আকারের পরে, ইকারের পরে নয়। সেই ঝোঁকবিশিষ্ট আকারটা শব্দের ভিতরেই আছে স্বতন্ত্র নেই। এমন নিয়ম করা যেতে পারত যাতে ভাত শব্দের ভা-এর পরে একটা হাইফেন স্বতন্ত্র চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হত— যথা বাঙালি ভা-তই খায়। ইকার এখানে হয়তো অন্য কাজ করছে, কিন্তু ঝোঁক দেবার কাজ তার নয়। তেমনি 'খুবই' শব্দ, এর ঝোঁকটা উকারের উপর। যদি 'তীর' শব্দের উপর ঝোঁক দিতে হয়, যদি বলতে চাই বুকে তীরই বিঁধেছে, তা হলে ওই দীর্ঘ ঈকারটাই হবে ঝোঁকের বাহন। দুধটাই ভালো কিংবা তেলটাই খারাপ এর ঝোঁকগুলো শব্দের প্রথম স্বরবর্ণেই। সুতরাং ঝোঁকের চিহ্ন অন্য স্বরবর্ণে দিলে বেখাপ হবে। অতএব ভাতি খাব বানান লিখে আমার প্রতি লক্ষ্য করে যে-হাসিটা হেসেছেন সেটা প্রত্যাহরণ করবেন। ওটা ভুল বানান, এবং আমার বানান নয়। বলা বাহুল্য 'এখনি' শব্দের ঝোঁক ইকারেরি পরে, খ-এর অকারের উপরে নয়।

এখনি তখনি শব্দের বানান সম্বন্ধে আরো একটি কথা বলবার আছে। যখন বলি কখনই যাব না, আর যখন বলি এখনি যাব দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তা ভিন্ন বানানে নির্দেশ করা উচিত। কারো শব্দের বানান সম্বন্ধেও ভাববার বিষয় আছে। 'কারো কারো মতে শুক্রবারে শুভকর্ম প্রশস্ত' অথবা 'শুক্রবারে বিবাহে কারোই মত নেই' এই দুইটি বাক্যে ওকারকে কোথায় স্থাপন করা উচিত? এখানে কি বানান করতে হবে, কারও কারও, এবং কারওই?

আপনার চিঠির একটা জায়গায় ভাষার ভঙ্গিতে মনে হল ক-এ দীর্ঘ ঈকার যোগে যে কী আমি ব্যবহার করে থাকি সে আপনার অনুমোদিত নয়। আমার বক্তব্য এই যে, অব্যয় শব্দ 'কি' এবং সর্বনাম শব্দ 'কী' এই দুইটি শব্দের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের ভিন্ন বানান না থাকলে অনেক স্থলেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে। এমন-কি, প্রসঙ্গ বিচার করেও বাধা দূর হয় না। 'তুমি কি জানো

সে আমার কত প্রিয়' আর 'তুমি কী জানো সে আমার কত প্রিয়', এই দুই বাক্যের একটাতে জানা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হচ্ছে আর একটাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে জানার প্রকৃতি বা পরিমাণ সম্বন্ধে, এখানে বানানের তফাত না থাকলে ভাবের তফাত নিশ্চিতরূপে আন্দাজ করা যায় না।[১]

শ্রাবণ ১৩৪৪

১ এই পত্র দুইখানি শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত

চিহ্নবিভ্রাট

'সঞ্চয়িতা'র মুদ্রণভার ছিল যাঁর' পরে,[১] প্রুফ দেখার কালে চিহ্ন ব্যবহার নিয়ে তাঁর খটকা বাধে। সেই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার যে-চিঠি চলেছিল সেটা প্রকাশ করবার যোগ্য বলে মনে করি। আমার মতই যে সকলে গ্রহণ করবেন এমন স্পর্ধা মনে রাখি নে। আমিও যে সব জায়গায় সম্পূর্ণ নিজের মতে চলব এত বড়ো সাহস আমার নেই। আমি সাধারণত যে-সাহিত্য নিয়ে কারবার করি পাঠকের মনোরঞ্জনের উপর তার সফলতা নির্ভর করে। পাঠকের অভ্যাসকে পীড়ন করলে তার মন বিগড়ে দেওয়া হয়, সেটা রসগ্রহণের পক্ষে অনুকূল অবস্থা নয়। তাই চল্‌তি রীতিকে বাঁচিয়ে চলাই মোটের উপর নিরাপদ। তবুও 'সঞ্চয়িতা'র প্রুফে যতটা আমার প্রভাব খাটাতে পেরেছি ততটা চিহ্ন ব্যবহার সম্বন্ধে আমার মত বজায় রাখবার চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। মতটা কী, দুখানা পত্রেই তা বোঝা যাবে। এই মত সাধারণের ব্যবহারে লাগবে এমন আশা করি নে কিন্তু এই নিয়ে উক্তি প্রত্যুক্তি হয়তো উপাদেয় হতে পারে। এখানে 'উপাদেয়' শব্দটা ব্যবহার করলুম ইণ্টারেস্টিং শব্দের পরিবর্তে। এই জায়গাটাতে খাটল কিন্তু সর্বত্রই-যে খাটবে এমন আশা করা অন্যায়। 'মানুষটি উপাদেয়' বললে ব্যাঘ্রজাতির সম্পর্কে এ-বাক্যের সার্থকতা মনে আসতে পারে। এ স্থলে ভাষায় বলি, লোকটি মজার, কিংবা চমৎকার, কিংবা দিব্যি। তাতেও অনেক সময়ে কুলোয় না, তখন নতুন শব্দ বানাবার দরকার হয়। বলি, বিষয়টি আকর্ষক, কিংবা লোকটি আকর্ষক। 'আগ্রহক' শব্দও চালানো যেতে পারে। বলা বাহুল্য, নতুন তৈরি শব্দ নতুন নাগরা জুতোর মতোই কিছুদিন অস্বস্তি ঘটায়। মনোগ্রাহী শব্দও যথাযোগ্য স্থানে চলে— কিন্তু সাধারণত ইণ্টারেস্টিং বিশেষণের চেয়ে এ বিশেষণের মূল্য কিছু বেশি। কেননা, অনেক সময়ে ইণ্টারেস্টিং শব্দ দিয়ে দাম চোকানো, পারা-মাখানো আধলা পয়সা দিয়ে বিদায় করার মতো। বাঙালির গান শুনে ইংরেজ যখন বলে 'হাউ ইণ্টারেস্টিং' তখন উৎফুল্ল হয়ে ওঠা মূঢ়তা। যে-শব্দের এত ভিন্নরকমের দাম অন্য ভাষার ট্যাঁকশালে তার প্রতিশব্দ দাবি করা চলে না। সকল ভাষার মধ্যেই গৃহিণীপনা

১ জীবনময় রায়। পরিচয় ১৩৩৯ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধের পাঠ দ্রষ্টব্য

আছে। সব সময়ে প্রত্যেক শব্দ সুনির্দিষ্ট একটিমমাত্র অর্থই যে বহন করে তা নয়। সুতরাং অন্য ভাষায় তার একটিমাত্র প্রতিশব্দ খাড়া করবার চেষ্টা বিপত্তিজনক। 'ভরসা' শব্দের একটা ইংরেজি প্রতিশব্দ courage, আর-একটা expectation। আবার কোনো কোনো জায়গায় দুটো অর্থই একত্রে মেলে, যেমন—

নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে।

এখানে courage বটে hopeও বটে। সুতরাং এটাকে ইংরেজিতে তরজমা করতে হলে ও দুটোর একটাও চলবে না। তখন বলতে হবে—

Keep firm the faith, my heart,
it must come to happen.

উল্‌টে বাংলায় তরজমা করতে হলে 'বিশ্বাস' শব্দের ব্যবহারে কাজ চলে বটে কিন্তু 'ভরসা' শব্দের মধ্যে যে একটা তাল ঠোকার আওয়াজ পাওয়া যায় সেটা থেমে যায়।

ইংরেজি শব্দের তরজমায় আমাদের দাসভাব প্রকাশ পায়, যখন একই শব্দের একই প্রতিশব্দ খাড়া করি। যথা 'সিম্প্যাথির' প্রতিশব্দে সহানুভূতি ব্যবহার। ইংরেজিতে সিম্প্যাথি কোথাও বা হৃদয়গত কোথাও বা বুদ্ধিগত। কিন্তু সহানুভূতি দিয়েই দুই কাজ চালিয়ে নেওয়া কৃপণতাও বটে হাস্যকরতাও বটে। 'এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমার সহানুভূতি আছে' বললে মানতে হয় যে প্রস্তাবের অনুভূতি আছে। ইংরেজি শব্দটাকে সেলাম করব কিন্তু অতটা দূর পর্যন্ত তার তাঁবেদারি করতে পারব না। আমি বলব 'তোমার প্রস্তাবের সমর্থন করি'।

এক কথা থেকে আর-এক কথা উঠে পড়ল। তাতে কী ক্ষতি আছে। যাকে ইংরেজিতে বলে essay, আমরা বলি প্রবন্ধ, তাকে এমনতরো অবন্ধ করলে সেটা আরামের হয় বলে আমার ধারণা। নিরামিষ-ভোজীকে গৃহস্থ পরিবেশন করবার সময় ঝোল আর কাঁচকলা দিয়ে মাছটা গোপন করতে চেয়েছিল, হঠাৎ সেটা গড়িয়ে আসবার উপক্রম করতেই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে গেল, নিরামিষ পঙ্‌ক্তি-বাসী ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল 'যো আপসে আতা উসকো আনে দেও।'

তোমাদের কোনো কোনো লেখায় এই রকম আপ্‌সে আনেওয়ালাদের

নির্বিচারে পাতে পড়তে দিয়ো, নিশ্চিত হবে উপাদেয়, অর্থাৎ ইণ্টারেস্টিং। এবার পত্র ছুটোর প্রতি মন দেও। এইখানে বলে রাখি, ইংরেজিতে, যে-চিহ্নকে অ্যাপসট্রফির চিহ্ন বলে কেউ কেউ বাংলা পারিভাষিকে তাকে বলে 'ইলেক', এ আমার নতুন শিক্ষা। এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি দায়িক নই। এই পত্রে উক্ত শব্দের ব্যবহার আছে।[১]

৮ ডিসেম্বর ১৯৩২

১

একদা আমার মনে তর্ক উঠেছিল যে, চিহ্নগুলো ভাষার বাইরের জিনিস, সেগুলোকে অগত্যার বাইরে ব্যবহার করলে ভাষার অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। যেমন, লাঠিতে ভর ক'রে চললে পায়ের 'পরে নির্ভর কমে। প্রাচীন পুঁথিতে দাঁড়ি ছাড়া আর-কোনো উপসর্গ ছিল না, ভাষা নিজেরই বাক্যগত ভঙ্গিদ্বারাই নিজের সমস্ত প্রয়োজনসিদ্ধি করত। এখন তার এত বেশি নোকর চাকর কেন। ইংরেজের ছেলে যখন দেশে থাকে তখন একটিমাত্র দাসীতেই তার সব কাজ চলে যায়, ভারতবর্ষে এলেই তার চাপরাসী হরকরা বেহারা বাট্‌লার চোপদার জমাদার মালী মেথর ইত্যাদি কত কী। আমাদের লিখিত ভাষাকেও এইরকম হাকিমী সাহেবিয়ানায় পেয়ে বসেছে। 'কে হে তুমি' বাক্যটাই নিজের প্রশ্নত্ব হাঁকিয়ে চলেছে তবে কেন ওর পিছনে আবার একটা কুঁজ-ওয়ালা সহিস। সব চেয়ে আমার খারাপ লাগে বিস্ময়ের চিহ্ন। কেননা বিস্ময় হচ্ছে একটা হৃদয়ভাব— লেখকের ভাষায় যদি সেটা স্বতই প্রকাশিত না হয়ে থাকে তা হলে একটা চিহ্ন ভাড়া করে এনে দৈন্য ঢাকবে না। ও যেন আত্মীয়ের মৃত্যুতে পেশাদার শোক-ওয়ালির বুক-চাপড়ানি। 'অহো, হিমালয়ের কী অপূর্ব গাম্ভীর্য'। এর পরে কি ওই ফোঁটা-সওয়ারি দাঁড়িটার আকাশে তর্জনী-নির্দেশের দরকার আছে— (রোসো, প্রশ্নচিহ্নটা এখানে না দিলে কি তোমার ধাঁধা লাগবে?)। কে, কি, কেন, কার, কিসে, কিসের, কত প্রভৃতি এক ঝাঁক অব্যয় শব্দ তো আছেই তবে চিহ্নের খোশামুদি করা কেন। 'তুমি তো আচ্ছা লোক' এখানে 'তো'—

১ সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত পত্র

ইঙ্গিতের পিছনে আরো একটা চিহ্নের ধাক্কা দিয়ে পাঠককে ডব্‌ল্‌ চমক খাওয়ানোর দরকার আছে কি। পাঠক কি আফিমখোর। 'রোজ রোজ যে দেরি করে আসো' এই বাক্যবিন্যাসেই কি নালিশের যথেষ্ট জোর পৌঁছল না। যদি মনে কর অর্থটা স্পষ্ট হল না তা হলে শব্দযোগে অভাব পূরণ করলে ভাষাকে বৃথা ঋণী করা হয় না— যথা, 'রোজ রোজ বড়ো-যে দেরি করে আস'। মুশকিল এই যে, পাঠককে এমনি চিহ্ন-মৌতাতে পেয়ে বসেছে, ওগুলো না দেখলে তার চোখের তার থাকে না। লঙ্কাবাটা দিয়ে তরকারি তো তৈরি হয়েছেই কিন্তু সেইসঙ্গে একটা আস্ত লঙ্কা দৃশ্যমান না হলে চোখের ঝাল জিভের ঝালে মিলনা-ভাবে ঝাঁঝটা ফিকে বোধ হয়।

ছেদ চিহ্নগুলো আর-এক জাতের। অর্থাৎ যতি-সংকেতে পূর্বে ছিল দণ্ডহাতে একাধিপত্য-গর্বিত সিধে দাঁড়ি— কখনো-বা একলা কখনো দোকলা। যেন শিবের তপোবনদ্বারে নন্দীর তর্জনী। এখন তার সঙ্গে জুটে গেছে বাঁকা বাঁকা ক্ষুদে ক্ষুদে অনুচর। কুকুরবিহীন সংকুচিত লেজের মতো। যখন ছিল না তখন পাঠকের আন্দাজ ছিল পাকা, বাক্যপথে কোথায় কোথায় বাঁক তা সহজেই বুঝে নিত। এখন কুঁড়েমির তাগিদে বুঝেও বোঝে না। সংস্কৃত নাটকে দেখেছ রাজার আগে আগে প্রতিহারী চলে— চিরাভ্যস্ত অন্তঃপুরের পথেও ক্ষণে ক্ষণে হেঁকে ওঠে, 'এই দিকে' 'এই দিকে'। কমা সেমিকোলনগুলো অনেকটা তাই।

একদিন চিহ্নপ্রয়োগে মিতব্যয়ের বুদ্ধি যখন আমাকে পেয়ে বসেছিল তখনই আমার কাব্যের পুনঃসংস্করণকালে বিস্ময়সংকেত ও প্রশ্নসংকেত লোপ করতে বসেছিলুম। প্রৌঢ় যতিচিহ্ন সেমিকোলনকে জবাব দিতে কুণ্ঠিত হই নি। কিশোর কমা-কে ক্ষমা করেছিলুম, কারণ, নেহাত খিড়কির দরজায় দাঁড়ির জমাদারী মানানসই হয় না। লেখায় দুই জাতের যতিই যথেষ্ট, একটা বড়ো একটা ছোটো। সূক্ষ্ম বিচার করে আরো একটা যদি আনো তা হলে অতি সূক্ষ্ম বিচার করে ভাগ আরো অনেক বাড়বে না কেন।

চিহ্নের উপর বেশি নির্ভর যদি না করি তবে ভাষা সম্বন্ধে অনেকটা সতর্ক হতে হয়। মনে করো কথাটা এই : 'তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ।' এখানে বাবুয়ানার উপর ঠেস দিলে কথাটা প্রশ্নসূচক হয়— ওটা একটা ভাঙা প্রশ্ন— পুরিয়ে দিলে দাঁড়ায় এই, 'তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ তার মানেটা কী বলো দেখি।' 'যে' অব্যয় পদের পরে ঠেস দিলে বিস্ময় প্রকাশ পায়। 'তুমি যে বাবুয়ানা শুরু

করেছ'। প্রথমটাতে প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়টাতে বিস্ময়চিহ্ন দিয়ে কাজ সারা যায়। কিন্তু যদি চিহ্ন দুটো না থাকে তা হলে ভাষাটাকেই নিঃসন্দিগ্ধ করে তুলতে হয়। তা হলে বিস্ময়সূচক বাক্যটাকে গুধরিয়ে বলতে হয়— 'যে-বাবুয়ানা তুমি শুরু করেছ'।

এইখানে আর-একটা আলোচ্য কথা আছে। প্রশ্নসূচক অব্যয় 'কি' এবং প্রশ্নবাচক সর্বনাম 'কি' উভয়ের কি এক বানান থাকা উচিত। আমার মতে বানানের ভেদ থাকা আবশ্যক। একটাতে হ্রস্ব ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ ঈ দিলে উভয়ের ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বোঝবার সুবিধা হয়। 'তুমি কি রাঁধছ' 'তুমি কী রাঁধছ'— বলা বাহুল্য এ দুটো বাক্যের ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র। তুমি রাঁধছ কিনা, এবং তুমি কোন্ জিনিস রাঁধছ, এ দুটো প্রশ্ন একই নয়, অথচ এক বানানে দুই প্রয়োজন সারতে গেলে বানানের খরচ বাঁচিয়ে প্রয়োজনের বিঘ্ন ঘটানো হবে। যদি দুই 'কি'-এর জন্যে দুই ইকারের বরাদ্দ করতে নিতান্তই নারাজ থাক তা হলে হাইফেন ছাড়া উপায় নেই। দৃষ্টান্ত: 'তুমি কি রাঁধ্ছ' এবং তুমি কি-রাঁধ্ছ'।* এই পর্যন্ত থাক্।[১]

৫ নবেম্বর ১৯৩১

২

আমার প্রুফ-সংশোধনপ্রণালী দেখলেই বুঝতে পারবে আমি নিরঞ্জনের উপাসক— চিহ্নের অকারণ উৎপাত সইতে পারি নে। কেউ কেউ যাকে ইলেক বলে (কোন্ ভাষা থেকে পেলে জানি নে) তার ঔদ্ধত্য হাস্যকর অথচ দুঃসহ। অসমাপিকা ক'রে ব'লে প্রভৃতিতে দরকার হ'তে পারে কিন্তু 'হেসে' 'কেঁদে'-তে একেবারেই দরকার নেই। 'করেছে বলেছে'-তে ইলেক চড়িয়ে পাঠকের চোখে খোঁচা দিয়ে কী পুণ্য অর্জন করবে জানি নে। করবে চলবে প্রভৃতি স্বতঃসম্পূর্ণ শব্দগুলো কী অপরাধ করেছে যে, ইলেককে শিরোধার্য করতে তারা বাধ্য হবে। 'যার'-

* পরে দেখা গেছে, কি এবং কী-এর বিশেষ প্রয়োগ পুরোনো বাংলা পুঁথিতেও প্রচলিত আছে।

১. জীবনময় রায়কে লিখিত পত্রের পরিমার্জিত রূপ।

'তার' উপর ইলেক চড়াও নি ব'লে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পাছে হল (লাঙল) এবং হল (হইল) শব্দে অর্থ নিয়ে ফৌজদারি হয় সেজন্যে ইলেকের বাঁকা বুড়ো আঙুল না দেখিয়ে অকপটচিত্তে হোলো লিখতে দোষ কী। এ ক্ষেত্রে ওই ইলেকের ইশারাটার কী মানে তা সকলের তো জানা নেই। হোলো শব্দে দুটো ওকার ধ্বনি আছে— এক ইলেক কি ওই দুটো অবলাকেই অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠিত করেছেন। হতে ক্রিয়াপদ যে-অর্থ স্বভাবতই বহন করে তা ছাড়া আর কোনো অর্থ তার পরে আরোপ করা বঙ্গভাষায় সম্ভব কি না জানি নে অথচ ওই ভালোমানুষ দাগীরূপে চিহ্নিত করা ওর কোন্ নিয়তির নির্দেশে। স্তম্ভপরে পালঙ্কপরে প্রভৃতি শব্দ কানে শোনবার সময় কোনো বাঙালির ছেলে ইলেকের অভাবে বিপন্ন হয় না, পড়বার সময়েও স্তম্ভ পালঙ্ক প্রভৃতি শব্দকে দিন মুহূর্ত প্রভৃতি কালার্থক শব্দ বলে কোনো প্রকৃতিস্থ লোকের ভুল করবার আশঙ্কা নেই। 'চলবার' 'বলবার' 'মরবার' 'ধরবার' শব্দগুলি বিকল্পে দ্বিতীয় কোনো অর্থ নিয়ে কারবার করে না তবু তাদের সাধুত্ব রক্ষার জন্যে লেজগুটোনো ফোঁটার ছাপ কেন। তোমার প্রুফে দেখলুম 'হয়ে' শব্দটা বিনা চিহ্নে সমাজে চলে গেল অথচ 'ল'য়ে' কথাটাকে ইলেক দিয়ে লজ্জিত করেছ। পাছে সংগীতের লয় শব্দটার অধিকারভেদ নিয়ে মামলা বাধে এইজন্যে। কিন্তু সে রকম সুদূর সম্ভাবনা আছে কি। লাখে যদি একটা সম্ভাবনা থাকে তারি জন্যে কি হাজার হাজার নিরপরাধকে দাগা দেবে। কোন্ জায়গায় এরকম বিপদ ঘটতে পারে তার নমুনা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। যেখানে যুক্ত ক্রিয়াপদে অসমাপিকা থাকে সেখানে তার অসমাপ্তি সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না। যেমন, বলে ফেল, করে দাও ইত্যাদি। অবশ্য করে দাও মানে হাতে দাও হতেও পারে কিন্তু সমগ্র বাক্যের যোগে সে রকম অর্থবিকল্প হয় না— যেমন কাজ করে দাও। 'বলে ফেল' কথাটাকে খণ্ডিত করে দেখলে আর-একটা মানে কল্পনা করা যায়, কেউ-একজন বলে, 'ফেলো'। কিন্তু আমরা তো সব প্রথমভাগ বর্ণপরিচয়ের টুকরো কথার ব্যবসায়ী নই। 'তুমি বলে যাও' কথাটা স্বতই স্পষ্ট, কেবল দুর্দৈবক্রমে, তুমি বল্ নাচে যাও এমন মানে হতেও পারে— সেই কচিৎ দুর্যোগ এড়াবার জন্যে eternal punishment কি দয়া কিংবা ন্যায়ের পরিচায়ক। 'দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন'— সমস্ত বাংলা দেশে যত পাঠশালায় যত ছেলে আছে পরীক্ষা করে দেখো একজনেরও ইলেকের দরকার হয় কি না, তবে কেন তুমি না-হক মুদ্রাকরকে

পীড়িত করলে। তোমার প্রুফে তুমি ক্ষুদে ক্ষুদে চিহ্নের ঝাঁকে আমার কাব্যকে এমনি আচ্ছন্ন করেছ যে তাদের জন্য মশারি ফেলতে ইচ্ছে হয়। আমার প্রুফে আমি এর একটাও ব্যবহার করি নি— কেননা, জানি বুঝতে কানাকড়ি পরিমাণেও বাধে না। জানি আমার বইয়ে নানা বানানে চিহ্নপ্রয়োগের নানা বৈচিত্র্য ঘটেছে —তা নিয়েও আমি মাথা বকাই নে— যেখানে দেখি অর্থবোধে বিপত্তি ঘটে সেখানে ছাড়া এইদিকে আমি দৃক্‌পাতও করি নে। প্রুফে যত অনাবশ্যক সংশোধন বাড়াবে ভুলের সম্ভাবনা ততই বাড়বে— সময় নষ্ট হবে, তার বদলে লাভ কিছুই হবে না। ততো যতো শব্দে ওকার নিতান্ত অসংগত। মতো সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা। মোটের উপর আমার বক্তব্য এই— পাঠককে গোড়াতেই পাগল নির্বোধ কিংবা আহেলা-বেলাত্তি বলে ধরে নিয়ো না— যেখানে তাদের ভুল করবার কোনো সম্ভাবনা নেই সেখানে কেবলি তাদের চোখে আঙুল দিয়ো না— চাণক্যের মতো চিহ্নের কুশাঙ্কুরগুলো উৎপাটিত কোরো তা হলে বানানভীরু শিশুদের যিনি বিধাতা তাঁর আশীর্বাদ লাভ করবে।

আমি যে নির্বিচারে চিহ্নস্থয়যজ্ঞের জনমেজয়গিরি করতে বসেছি তা মনে কোরো না। কোনো কোনো স্থলে হাইফেন চিহ্নটার প্রয়োজন স্বীকার করি। অব্যয় 'যে' এবং সর্বনাম 'যে' শব্দের প্রয়োগভেদ বোঝাবার জন্যে আমি হাইফেনের শরণাপন্ন হই। 'তুমি যে কাজে লেগেছ' বলতে বোঝায় তুমি অকর্মণ্য নও, এখানে 'যে' অব্যয়। 'তুমি যে কাজে লেগেছ' এখানে কাজকে নির্দিষ্ট করবার জন্য 'যে' সর্বনাম বিশেষণ। প্রথম 'যে' শব্দে হাইফেন দিয়ে 'তুমি'-র সঙ্গে ও দ্বিতীয় 'যে'-কে 'কাজ' শব্দের সঙ্গে যুক্ত করলে অর্থ স্পষ্ট হয়। অন্যত্র দেখো— 'তিনি বললেন যে আপিসে যাও, সেখানে ডাক পড়েছে'। এখানে 'যে' অব্যয়। অথবা তিনি বললেন 'যে আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েছে।' এখানে 'যে' সর্বনাম, আপিসের বিশেষণ। হাইফেন চিহ্নে অর্থভেদ স্পষ্ট করা যায়। যথা, 'তিনি বললেন-যে আপিসে যাও, সেখানে ডাক পড়েছে।' এবং 'তিনি বললেন যে-আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েছে।'[১]

১৯৩১

১. জীবনময় রায়কে লিখিত পত্রের পরিমার্জিত রূপ।

বানান-প্রসঙ্গ

১

পত্রিকায়[১] চণ্ডিদাসের যে নূতন পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে তাহা বহুমূল্যবান।... সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুঁথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন। প্রাচীন গ্রন্থসকলের যে-সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতে বানান-সংশোধকগণ কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃত বানানকে বাংলা বানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলা বানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। বর্তমান সাহিত্যের বাংলা বহুলপরিমাণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উদ্‌ভাবিত বলিয়া বাংলা বানান, এমন-কি, বাংলাপদবিন্যাস প্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে স্বপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আধুনিক বাংলার আদর্শে যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি সংশোধন করিতে থাকেন তাঁহারা পরম অনিষ্ট করেন।[২]

১৩০৫

২

বানান লইয়া কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। রাঙা ভাঙা ডাঙা আঙুল প্রভৃতি শব্দ ঙ্গ-অক্ষরযোগে লেখা নিতান্তই ধ্বনিসংগতিবিরুদ্ধ। গঙ্গা শব্দের সহিত রাঙা, তুঙ্গ শব্দের সহিত ঢ্যাঙা তুলনা করিলে এ কথা স্পষ্ট হইবে। মূল শব্দটিকে স্মরণ করাইবার জন্য ধ্বনির সহিত বানানের বিরোধ ঘটানো কর্তব্য নহে। সে নিয়ম মানিতে হইলে চাঁদকে চান্দ, পাঁককে পঙ্ক, কুমারকে কুম্ভার লিখিতে হয়। অনেকে মূলশব্দের সাদৃশ্যরক্ষার জন্য সোনাকে সোণা, কানকে

১. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৫, তৃতীয় সংখ্যা

২. 'সাময়িক সাহিত্য,' ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫, পৃ. ৭৬২

কাণ বানান করেন, অথচ শ্রবণশব্দজ শোনাকে শোণা লেখেন না। যে-সকল সংস্কৃত শব্দ অপভ্রংশের নিয়মে পুরা বাংলা হইয়া গেছে সেগুলির ধ্বনি অনুযায়িক বানান হওয়া উচিত। প্রাকৃতভাষার বানান ইহার উদাহরণস্থল। জোড়া, জোয়ান, জাঁতা, কাজ প্রভৃতি শব্দে আমরা স্বাভাবিক বানান গ্রহণ করিয়াছি, অথচ অন্য অনেক স্থলে করি নাই। [সাহিত্য-পরিষৎ] পত্রিকা-সম্পাদকমহাশয় বাংলা বানানের নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব।[১]

১৩০৮

৩

টেক্‌সট্‌বুক্‌ কমিটি ক্ষকারকে বাংলা বর্ণমালা হইতে নির্বাসন দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ অনেক পুরাতন নজির দেখাইয়া ক্ষকারের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দলে ক্ষ কেমন করিয়া প্রথমে প্রবেশ করিয়াছিল জানি না। কিন্তু সে সময়ে দ্বাররক্ষক যে সতর্ক ছিল, তাহা বলিতে পারি না। আধুনিক ভারতবর্ষীয় আর্যভাষায় মূর্ধন্য ষ-এর উচ্চারণ খ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং ক্ষকারে মূর্ধন্য ষ-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ছিল না। না থাকিলেও উহা যুক্ত অক্ষর এবং উহার উচ্চারণ ক্‌খ। শব্দের আরম্ভে অনেক যুক্ত অক্ষরের যুক্ত উচ্চারণ থাকে না, যেমন জ্ঞান শব্দের জ্ঞ; কিন্তু অজ্ঞ শব্দে উহার যুক্ত উচ্চারণ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। ক্ষকারও সেইরূপ— ক্ষয় এবং অক্ষয় শব্দের উচ্চারণে তাহা প্রমাণ হইবে। অতএব অসংযুক্ত বর্ণমালায় ক্ষকার দলভ্রষ্ট একঘরে; তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই ব্যঞ্জনপঙ্‌ক্তির মধ্যে উহার অনুরূপ সংকরবর্ণ আর একটিও নাই। দীর্ঘকালের দখল প্রমাণ হইলেও তাহাকে আরো দীর্ঘকাল অন্যায় অধিকার রক্ষা করিতে দেওয়া উচিত কি।[২]

১৩০৮

১. মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ. ৩৪

২. মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮, পৃ. ১৪৩

৪

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলনে আপনারা বানানের যে রীতি বেঁধে দিয়েছেন আমি তাহার সমর্থন করি। ব্যবহারকালে নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্তন অনিবার্য হতে পারে। এইজন্যে বছর দুয়েক পরে পুনঃসংশোধন প্রয়োজন হবে বলে মনে করি।

য়ুরোপীয় লিখিত ভাষা থেকে লিপ্যন্তরকালে অকারবর্গীয় স্বরবর্ণের বাংলারূপ নিয়ে আপনারা আলোচনা করেছেন। বিশেষ চিহ্নযোগ না করে সকল স্থানে এই উচ্চারণ বিশুদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। বক্র আ বোঝাবার জন্যে আপনারা বিশেষ চিহ্ন স্বীকার করেছেন কিন্তু বাংলায় অপ্রচলিত বিকৃত অকারের কোনো চিহ্ন স্বীকার করেন নি। Love শব্দকে লভ্ লিখলে হাস্যোদ্রেক করবে, লাভ লিখলেও যথাযথ হবে না। apathy, recur, such প্রভৃতি শব্দের চিহ্নিত ধ্বনিগুলিকে কি বাংলা অকার দিয়ে ব্যবহার করা চলবে। অপথি এবং অপথিকরি কি একই বানানে চালানো যাবে এবং অক্ষরের কোন্ প্রতিলিপি আপনারা স্থির করেছেন জানি নে। আমার মতে অন্ত্যস্থ ব, এবং অন্ত্যস্থ ভ। award এবং averse বানানে দুই পৃথক অক্ষরের প্রয়োজন। সম্ভবত আপনারা এ-সমস্তই আলোচনা করে স্থির করে দিয়েছেন।

কিন্তু প্রবাসী পত্রিকায় আপনি যে প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন তার মধ্যে আমি একটি গুরুতর অভাব দেখলেম। বর্তমান বাংলাসাহিত্যে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার ব্যাপকভাবেই চলেছে আমার এই চিঠিখানি তার একটি প্রমাণ। অন্তত চিঠিলেখায় সংস্কৃত বাংলা প্রায় উঠে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস। বাংলা গদ্যসাহিত্যে এই প্রাকৃত ভাষার ব্যাপ্তি অনেকের কাছে রুচিকর না হতে পারে কিন্তু একে উপেক্ষা করা চলবে না। এর বানানরীতি নির্দিষ্ট করে দেবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেকদিন আমি অনুরোধ করেছি। প্রাচীনকালে যখন প্রাকৃত ভাষা সাহিত্যে গৃহীত হল তখন তার বানানে বা ব্যাকরণে যথেচ্ছাচার অনুমোদিত হয় নি, হলে এ ভাষার সাহিত্য গড়তে পারত না। সিটি কলেজের বাংলা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য কিছুকালের জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশক্রমে বাংলাভাষাসংক্রান্ত গবেষণা নিয়ে আমার এখানে কাজ করতেন। ভিন্ন ভিন্ন বাংলা গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন লেখক প্রাকৃত বাংলারচনায় বানানের যেরকম নানা বিচিত্র বিসদৃশ ব্যবহার করেছেন তার তালিকা প্রস্তুত

করতে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেম। আমার ইচ্ছা ছিল এই তালিকা অবলম্বন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাকৃত বাংলা বানানের নিয়ম বেঁধে দেবেন। সকলেই জানেন প্রাকৃত বাংলায় সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার বানান আজকাল উচ্ছৃঙ্খলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে— আমিও এ সম্বন্ধে অপরাধী। অপেক্ষা করে আছি প্রাকৃত বাংলার এই বানান ব্যাপারে আমার মতো পথহারাদের জন্যে বিদ্যাবিধানের কর্তৃপক্ষ পাকা রাস্তা বেঁধে দেবেন। এ সম্বন্ধে আর তাঁরা উদাসীন থাকতে পারেন না যেহেতু বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে প্রাকৃত বাংলার প্রবেশ তাঁরা নিষেধ করতে পারবেন না। প্রশ্নপত্রের উত্তরে পরীক্ষার্থীরা প্রাকৃত বাংলা অবলম্বন করতে পারে এমন অধিকার তাঁরা দিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক নিজেদের বিশেষ রুচি ও অভ্যাস -অনুসারে ছাত্রদের বানান প্রভৃতির যদি বিচার করেন তবে পরীক্ষার্থীদের প্রতি গুরুতর অবিচারের আশঙ্কা আছে— নির্বিচারে যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়াও চলবে না।

এই গুরুতর বিষয় প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার উপযোগী আমার শরীরের অবস্থা নয়। সংক্ষেপে আমার বক্তব্যের আভাসমাত্র দিলেম।[১]

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

৫

প্রাকৃত বাংলার বানান সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো চরম অভ্যাসে আসতে পারি নি। তাড়াতাড়িতে অমনোযোগ তার একটি কারণ। তা ছাড়া বই ছাপবার সময় প্রুফ দেখার সম্যক ভার নিজে নেবার মতো ধৈর্য বা শক্তি বা সময় নেই— কাজেই আমার ছাপা বইগুলিতে বানান সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য দাবি করেছিলুম। তাঁরা দশে মিলে যেটা স্থির করে দেবেন সেটা নিয়ে আর দ্বিধা করব না।[২]

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

১. চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র

২. শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র

৬

আমাদের সাহিত্যে প্রাকৃত বাংলার প্রচলন প্রতিদিন বেড়ে উঠেছে। সেই বাংলায় বানান সম্বন্ধে কোনো আইন নেই, তাই স্বেচ্ছাচারের অরাজকতা চলেছে। যাঁরা হবেন প্রথম আইনকর্তা তাঁদের বিধান অনিন্দনীয় হতেই পারে না, তবু উচ্ছৃঙ্খলতার বাঁধ বেঁধে দেবার কাজ তো শুরু করতেই হবে। সেইজন্যে বিশ্ববিদ্যালয়েরই শরণ নিতে হল। কালক্রমে তাঁদের নিয়মের অনেক পরিবর্তন ঘটবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই পরিবর্তনের গতি একটা সুচিন্তিত পথ অনুসরণ যদি না করে তা হলে অব্যবস্থার অন্ত থাকবে না। নদীর তট বাঁধা আছে তবু তার বাঁক পরিবর্তন হয়, কিন্তু তট না থাকলে তার নদীত্বই ঘুচবে, সে হবে জলা।

আমার প্রদেশের নাম আমি লিখি বাংলা। হসন্ত ঙ-র চিহ্ন ং। যেমন হসন্ত ত-য়ের চিহ্ন ৎ। "বাঙ্গলা" মুখে বলি নে লিখতেও চাই নে। যুক্তবর্ণ ঙ্গ-এ হসন্ত চিহ্ন নিরর্থক। ঙ-র সঙ্গে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া চলে, কিন্তু দরকার কী, হসন্ত চিহ্ন যুক্ত ঙ-র স্বকীয়রূপ তো বর্ণমালায় আছে— সেই অনুস্বরকে আমি মেনে নিয়ে থাকি।[১]

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

৭

শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে লেখায় চিহ্ন বর্জন সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করেছি। নিত্যব্যবহারে আমার এ মত চলবে না তা জানি। এটা একটা আলোচনার বিষয় মাত্র। চিহ্নগুলোর প্রতি অতিমাত্র নির্ভরপরতা অভ্যস্ত হলে ভাষায় আলস্যজনিত দুর্বলতা প্রবেশ করে এই আমার বিশ্বাস। চিহ্নসংকেতের সহায়তা পাওয়া যাবে না এ কথা যদি জানি তবে ভাষার আপন সংকেতের দ্বারাতেই তাকে প্রকাশবান করতে সতর্ক হতে পারি; অন্তত আজকাল ইংরেজির অনুকরণে, লিখিত ভাষাগত ইঙ্গিতের জন্যে চিহ্নসংকেতের অকারণ বাড়াবাড়ি সংযত হতে পারে। এই চিহ্নের প্রশ্রয় পেয়ে পাঠসম্বন্ধে পাঠকদেরও মন পঙ্গু হয় প্রকাশসম্বন্ধে লেখকদেরও তদ্রূপ। কোনো কোনো মানুষ আছে কথাবার্তায় যাদের

১. শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

অঙ্গভঙ্গি অত্যন্ত বেশি। সেটাকে মুদ্রাদোষ বলা যায়। বোঝা যায় লোকটার মধ্যে সহজ ভাবপ্রকাশের ভাষাদৈন্য আছে। কিন্তু কথার সঙ্গে ভঙ্গি একেবারে চলবে না এ কথা বলা অসংগত তেমনি লেখার সঙ্গে চিহ্ন সর্বত্রই বর্জনীয় এমন অনুশাসনও লোকে মানবে না।[১]

৩।৩।৩৭

৮

প্রাকৃত বাংলার বানান সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য আছে। ইংরেজি ভাষার লিখিত শব্দগুলি তাদের ইতিহাসের খোলস ছাড়তে চায় না— তাতে করে তাদের ধ্বনিরূপ আচ্ছন্ন। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাকৃত এ পথের অনুসরণ করে নি। তার বানানের মধ্যে অবঞ্চনা আছে, সে যে প্রাকৃত, এ পরিচয় সে গোপন করে নি। বাংলা ভাষায় ষত্বণত্বের বৈচিত্র্য ধ্বনির মধ্যে নেই বললেই হয়। সেই কারণে প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পুঁথিতে লোকভাষা লেখবার সময় দীর্ঘহ্রস্ব ও ষত্বণত্বকে সরল করে এনেছিলেন। তাঁদের ভয় ছিল না পাছে সেজন্য তাঁদের কেউ মূর্খ অপবাদ দেয়। আজ আমরা ভারতের রীতি ত্যাগ করে বিদেশীর অনুকরণে বানানের বিড়ম্বনায় শিশুদের চিত্তকে অনাবশ্যক ভারগ্রস্ত করতে বসেছি।

ভেবে দেখলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই। যাকে তৎসম শব্দ বলি উচ্চারণের বিকারে তাও অপভ্রংশ পদবীতে পড়ে। সংস্কৃত নিয়মে লিখি সত্য কিন্তু বলি শোত্তো। মন শব্দ যে কেবল বিসর্গ বিসর্জন করেছে তা নয় তার ধ্বনিরূপ বদলে সে হয়েছে মোন্। এই যুক্তি অনুসারে বাংলা বানানকে আগাগোড়া ধ্বনি-অনুসারী করব এমন সাহস আমার নেই— যদি বাংলায় কেমাল পাশার পদ পেতুম তা হলে হয়তো এই কীর্তি করতুম— এবং সেই পুণ্যে ভাবীকালের অগণ্য শিশুদের কৃতজ্ঞতাভাজন হতুম। অন্তত তদ্ভব শব্দে যিনি সাহস দেখিয়ে ষত্বণত্ব ও দীর্ঘহ্রস্বের পণ্ডপাণ্ডিত্য ঘুচিয়ে শব্দের ধ্বনিস্বরূপকে শ্রদ্ধা করতে প্রবৃত্ত হবেন তাঁর আমি জয়জয়কার করব। যে পণ্ডিতমূর্খরা "গভর্ণমেন্ট্" বানান প্রচার করতে লজ্জা পান নি তাঁদেরই প্রেতাত্মার দল আজও

১. শ্রীশ্যামাদাস লাহিড়ীকে লিখিত পত্র

বাংলা বানানকে শাসন করছেন— এই প্রেতের বিভীষিকা ঘুচবে কবে? কান হোলো সজীব বানান, আর কাণ হোলো প্রেতের বানান এ কথা মানবেন তো? বানান সম্বন্ধে আমিও অপরাধ করি অতএব আমার নজীর কোনো হিসাবে প্রামাণ্য নয়।[১]

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

৯

নীচ শব্দ সংস্কৃত, তাহার অর্থ Mean। বাংলায় যে "নিচে" কথা আছে তাহা ক্রিয়ার বিশেষণ। সংস্কৃত ভাষায় নীচ শব্দের ক্রিয়ার বিশেষণ রূপ নাই। সংস্কৃতে নিম্নতা বুঝাইবার জন্য নীচ কথার প্রয়োগ আছে কিনা জানি না। হয়তো উচ্চ নীচ যুগ্মশব্দে এরূপ অর্থ চলিতে পারে— কিন্তু সে স্থলেও যথার্থত নীচ শব্দের তাৎপর্য Moral তাহা Physical নহে। অন্তত আমার সেই ধারণা। সংস্কৃতে নীচ ও নিম্ন দুই ভিন্নবর্গের শব্দ— উহাদিগকে একার্থক করা যায় না। এইজন্য বাংলায় নীচে বানান করিলে below না বুঝাইয়া to the mean বুঝানোই সংগত হয়। আমি সেইজন্য "নিচে" শব্দটিকে সম্পূর্ণ প্রাকৃত বাংলা বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকি। প্রাচীন প্রাকৃতে বানানে যে রীতি আছে আমার মতে তাহাই শুদ্ধরীতি; ছদ্মবেশে মর্যাদাভিক্ষা অশ্রদ্ধেয়। প্রাচীন বাংলায় পণ্ডিতেরাও সেই নীতি রক্ষা করিতেন, নব্য পণ্ডিতদের হাতে বাংলা আত্মবিস্মৃত হইয়াছে।

"পুঁথি" শব্দের চন্দ্রবিন্দুর লোপে পূর্ববঙ্গের প্রভাব দেখিতেছি, উহাতে আমার সম্মতি নাই। "লুকাচুরি" শব্দের বানান "লুকোচুরি" হওয়াই সংগত; উহার স্বভাব নষ্ট করিয়া উহার মধ্যে কৃত্রিম ভদ্রভাব চালাইবার চেষ্টা সাধু নহে।[২]

৯ অক্টোবর ১৯৩৪

১. রাজশেখর বসুকে লিখিত পত্র

২. শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বেদান্তশাস্ত্রীকে লিখিত পত্র

১০

বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-বিধির সম্বন্ধে দুটিমাত্র আপত্তি। কখনো কোনো আমারি তোমারি আজো প্রভৃতি শব্দে অন্তস্বর যুক্ত থাকিবে। দ্বিতীয়, ছোটো বড়ো কালো ভালো প্রভৃতি বিশেষণ পদের অন্তস্বর লোপ করা অবৈধ হবে বলে মনে করি।[১]

৪।৬।৩৭

১১

হইয়ো, করিয়োতে 'য়' লাগিয়ো। রানীতে ঈ। গয়লানী প্রভৃতি শব্দে আমি দীর্ঘ ঈ দিই নে তার কারণ এ প্রত্যয় সংস্কৃত প্রত্যয় নয়। এক হিসাবে প্রাকৃত বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয় নেই। আমরা বিড়ালীও বলি নে বেড়ালনীও বলি নে, কুকুরীও বাংলা নয়, কুকুরনীও নয়। বাঘিনী বলি, উটনী বলি নে। বাঘিনী সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে শুদ্ধ নয়। বামনী বলি কিন্তু বদ্যিনী বলি নে, কায়েৎনী বলি। বস্তুত বাঘিনী ছাড়া কোনো জন্তু-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বাংলায় দুর্লভ। পাঁঠী আছে, ভেড়ী বলে কিনা জানি নে; হাঁস, কাক, পায়রা (মুরগী আছে) কোকিল দোয়েলে স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় বর্জিত। বাংলায় যদি সাধারণ কোনো প্রত্যয় থাকত তা হলে সর্বত্রই খাটত। এইজন্যে আমি বাংলা স্ত্রীজাতিসূচক কথাগুলিকে খাস বাংলা নিয়মেই ব্যবহার করতে চাই— খাস বাংলা হচ্ছে হ্রস্ব ই। সংস্কৃত ইন্‌প্রত্যয়ের যেখানে নকল করি সেখানেও আমার মন সায় দেয় না; যেমন ইংরেজি, ফারসি ইত্যাদি। তৎসম শব্দে দীর্ঘ ঈ দিতে আমরা বাধ্য— কিন্তু তদ্ভব শব্দে আমাদের স্বরাজ খাটবে না কেন ?[১]

১৩।৬।৩৭

১. কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখিত পত্র

মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা

বৈশাখের [১৩৩৯] প্রবাসীতে মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা প্রবন্ধটি পড়ে দেখলুম। আমি মূল পুস্তক পড়ি নি, ধরে নিচ্ছি প্রবন্ধ-লেখক যথোচিত প্রমাণের উপর নির্ভর করেই লিখেছেন। সাম্প্রদায়িক বিবাদে মানুষ যে কতদূর ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে ভারতবর্ষে আজকাল প্রতিদিনই তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, কিন্তু হাস্যকর হওয়াও যে অসম্ভব নয় তার দৃষ্টান্ত এই দেখা গেল। এটাও ভাবনার কথা হতে পারত, কিন্তু সুবিধা এই যে এরকম প্রহসন নিজেকেই নিজে বিদ্রূপ করে মারে।

ভাষা মাত্রের মধ্যে একটা প্রাণধর্ম আছে। তার সেই প্রাণের নিয়ম রক্ষা করে তবেই লেখকেরা তাকে নূতন নূতন পথে চালিত করতে পারে। এ কথা মনে করলে চলবে না যে, যেমন করে হোক জোড়াতাড়া দিয়ে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদল করা চলে। মনে করা যাক, বাংলা দেশটা মগের মুল্লুক এবং মগ রাজারা বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের নাক-চোখের চেহারা কোনোমতে সহ্য করতে পারছে না, মনে করছে ওটাতে তাদের অমর্যাদা, তা হলে তাদের বাদশাহী বুদ্ধির কাছে একটিমাত্র অপেক্ষাকৃত সম্ভবপর পন্থা থাকতে পারে সে হচ্ছে মগ ছাড়া আর-সব জাতকে একেবারে লোপ করে দেওয়া। নতুবা বাঙালিকে বাঙালি রেখে তার নাক মুখ চোখে ছুঁচ সুতো ও শিরীষ আঠার যোগে মগের চেহারা আরোপ করবার চেষ্টা ঘোরতর দুর্দাম মগের বিচারেও সম্ভবপর বলে ঠেকতে পারে না।

এমন কোনো সভ্য ভাষা নেই যে নানা জাতির সঙ্গে নানা ব্যবহারের ফলে বিদেশী শব্দ কিছু-না-কিছু আত্মসাৎ করে নি। বহুকাল মুসলমানের সংস্রবে থাকাতে বাংলা ভাষাও অনেক পারসী শব্দ এবং কিছু কিছু আরবীও স্বভাবতই গ্রহণ করেছে। বস্তুত বাংলা ভাষা যে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আপন তার স্বাভাবিক প্রমাণ ভাষার মধ্যে প্রচুর রয়েছে। যত বড়ো নিষ্ঠাবান হিন্দুই হোক-না কেন ঘোরতর রাগারাগির দিনেও প্রতিদিনের ব্যবহারে রাশি রাশি তৎসম ও তদ্ভব মুসলমানী শব্দ উচ্চারণ করতে তাদের কোনো সংকোচ বোধ হয় না। এমন-কি, সে-সকল শব্দের জায়গায় যদি সংস্কৃত প্রতিশব্দ চালানো যায় তা হলে পণ্ডিতী করা হচ্ছে বলে লোকে হাসবে। বাজারে এসে সহস্র টাকার নোট ভাঙানোর চেয়ে হাজার টাকার নোট ভাঙানো সহজ। সমনজারি শব্দের অর্ধেক অংশ ইংরেজি, অর্ধেক পারসী, এর জায়গায় 'আহ্বান প্রচার'

শব্দ সাধু সাহিত্যেও ব্যবহার করবার মতো সাহস কোনো বিদ্যাভূষণেরও হবে না। কেননা, নেহাত বেয়াড়া স্বভাবের না হলে মানুষ মার খেতে তত ভয় করে না যেমন ভয় করে লোক হাসাতে। 'মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে', এ কথা সহজেই মুখ দিয়ে বেরোয় কিন্তু যাবনিক সংসর্গ বাঁচিয়ে যদি বলতে চাই মনের গতিকটা বিকল কিংবা বিমর্ষ বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে আছে তবে আত্মীয়দের মনে নিশ্চিত খটকা লাগবে। যদি দেখা যায় অত্যন্ত নির্জলা খাঁটি পণ্ডিতমশায় ছেলেটার ষত্ব-ণত্ব শুদ্ধ করবার জন্যে তাকে বেদম মারছেন, তা হলে বলে থাকি, 'আহা বেচারাকে মারবেন না।' যদি বলি 'নিরুপায় বা নিঃসহায়কে মারবেন না' তা হলে পণ্ডিতমশায়ের মনেও করুণরসের বদলে হাস্যরসের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। নেশাখোরকে যদি মাদকসেবী বলে বসি তা হলে খামকা তার নেশা ছুটে যেতে পারে, এমন-কি, সে মনে করতে পারে তাকে একটা উচ্চ উপাধি দেওয়া হল। বদমায়েসকে দুর্বৃত্ত বললে তার চোট তেমন বেশি লাগবে না। এই শব্দগুলো যে এত জোর পেয়েছে তার কারণ বাংলা ভাষার প্রাণের সঙ্গে এদের সহজে যোগ হয়েছে।

শিশুপাঠ্য বাংলা কেতাবে গায়ের জোরে আরবীআনা পারসীআনা করাটাকেই আচারনিষ্ঠ মুসলমান যদি সাধুতা বলে জ্ঞান করেন তবে ইংরেজি স্কুলপাঠ্যের ভাষাকেও মাঝে মাঝে পারসী বা আরবী ছিটিয়ে শোধন না করেন কেন? আমিই একটা নমুনা দিতে পারি। কীট্সের হাইপীরিয়ন নামক কবিতাটির বিষয়টি গ্রীসীয় পৌরাণিক, তথাপি মুসলমান ছাত্রের পক্ষে সেটা যদি বর্জনীয় না হয় তবে তাতে পারসী-মিশোল করলে তার কিরকম শ্রীবৃদ্ধি হয় দেখা যাক—

> Deep in the *Saya-i-ghamagin* of a vale,
> Far sunken from the *nafas-i-hayat afza-i*-morn,
> Far from the *atshin* noon and eve's one star,
> Sat *bamoo-i-safid* Saturn *Khamush* as a *Sang*.[১]

১. পারসী ভাষায় আমার অল্পবিস্তর পাণ্ডিত্য আছে এমন অমূলক ভ্রমের সৃষ্টি করে গর্ব করতে চাই নে। ধরা পড়বার পূর্বে কবুল করছি যে পরের সাহায্য নিয়েছি। মক্তবে ব্যবহার্য যে পাঠ্যপুস্তকের নমুনা প্রবাসীতে দেখা গেল তা রচনা করতে হলে অনেক মুসলমান

জানি কোনো মৌলবী ছাহাব প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ইংরেজি সাহিত্যিক ভাষার এ রকম মুসলমানীকরণের চেষ্টা করবেন না। করলেও ইংরেজি যাঁদের মাতৃভাষা এ দেশের বিদ্যালয়ে তাঁদের ভাষার এ রকম ব্যঙ্গীকরণে উচ্চাসন থেকে তাঁদের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হবে। আপসে যখন কথাবার্তা চালাই তখন আমাদের নিজের ভাষার সঙ্গে ইংরেজি বুলির হাস্যকর সংঘটন সর্বদাই করে থাকি; কিন্তু সে প্রহসন সাহিত্যের ভাষায় চলতি হবার কোনো আশঙ্কা নেই। জানি বাংলা দেশের গোঁড়া মক্তবেও ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে এ রকম অপঘাত ঘটবে না; ইংরেজের অসন্তুষ্টিই তার একমাত্র কারণ নয়। শিক্ষক জানেন পাঠ্যপুস্তকে ইংরেজিকে বিকৃতি করার অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিলে ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষায় গলদ ঘটবে, তারা ওই ভাষা সম্যকরূপে ব্যবহার করতে পারবে না। এমন অবস্থায় কীট্‌সের হাইপীরিয়নকে বরঞ্চ আগাগোড়াই ফারসীতে তর্জমা করিয়ে পড়ানো ভালো তবু তার ইংরেজিটিকে নিজের সমাজের খাতিরেও দো-আঁশলা করাটা কোনো কারণেই ভালো নয়। সেই একই কারণে ছাত্রদের নিজের খাতিরেই বাংলাটাকে খাঁটি বাংলারূপে বজায় রেখেই তাদের শেখানো দরকার। মৌলবী ছাহাব বলতে পারেন আমরা ঘরে যে বাংলা বলি সেটা ফারসী আরবী জড়ানো, সেইটাকেই মুসলমান ছেলেদের বাংলা বলে আমরা চালাব। আধুনিক ইংরেজি ভাষায় যাঁদের অ্যাংলোইণ্ডিয়ান বলে, তাঁরা ঘরে যে ইংরেজি বলেন, সকলেই জানেন সেটা আন্‌ডিফাইল্‌ড আদর্শ ইংরেজি নয়— স্বসম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতবশত তাঁরা যদি বলেন যে, তাঁদের ছেলেদের জন্যে সেই অ্যাংলোইণ্ডিয়ানী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা না করলে তাঁদের অসম্মান হবে, তবে সে কথাটা বিনা হাস্যে গম্ভীরভাবে নেওয়া চলবে না। বরঞ্চ এই ইংরেজি তাঁদের ছেলেদের জন্যে প্রবর্তন করলে সেইটেতেই তাঁদের অসম্মান এই কথাটাই তাঁদের অবশ্য বোঝানো দরকার হবে। হিন্দু বাঙালির সূর্যই সূর্য আর মুসলমান বাঙালির সূর্য তাম্বু, এমনতর বিদ্রূপেও যদি মনে সংকোচ না জন্মে, এতকাল একত্রবাসের

লেখককেই পরের সাহায্য নিতে হবে। আমি এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে কিছু কিছু পারসীর আলোচনা করি। তিনি যে-পারসী ভাষা জানেন তা ভারতে প্রচলিত বিকৃত পারসী নয়, এ ভাষা যাদের মাতৃভাষা, ভারতবর্ষের বাইরে তাদের কাছ থেকে তাঁর পারসীর বিদ্যা অর্জিত ও মার্জিত, কিন্তু তিনিও সূর্য অর্থে তাম্বু শব্দের প্রয়োগ জানেন না।*

পরেও প্রতিবেশীর আড়াআড়ি ধরাতলে মাথা-ভাঙাভাঙি ছাড়িয়ে যদি অবশেষে চন্দ্রসূর্যের ভাষাগত অধিকার নিয়ে অভ্রভেদী হয়ে ওঠে, তবে আমাদের স্থাশনাল ভাগ্যকে কি কৌতুকপ্রিয় বলব, না বলব পাড়া-কুঁদুলে। পৃথিবীতে আমাদের সেই ভাগ্যগ্রহের যাঁরা প্রতিনিধি তাঁরা মুখ টিপে হাসছেন; আমরাও হাসতে চেষ্টা করি কিন্তু হাসি বুকের কাছে এসে বেধে যায়। পৃথিবীতে কম্যুনাল বিরোধ অনেক দেশে অনেক রকম চেহারা ধরেছে, কিন্তু বাংলা দেশে সেটা এই যে কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধরল তাতে আর মান থাকে না।

ভাদ্র ১৩৩৯

ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা[1]

সর্বপ্রথমে বলে রাখি আমার স্বভাবে এবং ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশেরই অগৌরব বলে মনে করে থাকি।

ভাষামাত্রেরই একটা মজ্জাগত স্বভাব আছে, তাকে না মানলে চলে না। স্কটল্যাণ্ডের ও ওয়েল্‌সের লোকে সাধারণত আপন স্বজন-পরিজনের মধ্যে সর্বদাই যে-সব শব্দ ব্যবহার করে থাকে তাকে তারা ইংরেজি ভাষার মধ্যে চালাবার চেষ্টা-মাত্র করে না। তারা এই সহজ কথাটি মেনে নিয়েছে যে, যদি তারা নিজেদের অভ্যস্ত প্রাদেশিকতা ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে চালাতে চায় তা হলে ভাষাকে বিকৃত ও সাহিত্যকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলবে। কখনো কখনো কোনো স্কচ লেখক স্কচ ভাষায় কবিতা প্রভৃতি লিখেছেন কিন্তু সেটাকে স্পষ্টত স্কচ ভাষারই নমুনা স্বরূপে স্বীকার করেছেন। অথচ স্কচ ও ওয়েল্‌স ইংরেজের সঙ্গে এক নেশনের অন্তর্গত।

আয়রল্যাণ্ডে আইরিশে-ব্রিটিশে ব্ল্যাক অ্যাণ্ড ট্যান নামক বীভৎস খুনোখুনি ব্যাপার চলেছিল কিন্তু সেই হিংস্রতার উত্তেজনা ইংরেজি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে নি। সেদিনও আইরিশ কবি ও লেখকেরা যে ইংরেজি ব্যবহার করেছেন সে অবিমিশ্র ইংরেজিই।

ইংরেজিতে সহজেই বিস্তর ভারতীয় ভাষার শব্দ চলে গেছে। একটা দৃষ্টান্ত jungle— সেই অজুহাতে বলা চলে না, তবে কেন অরণ্য শব্দ চালাব না! ভাষা খামখেয়ালি, তার শব্দ-নির্বাচন নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা বৃথা।

বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসী আরবী শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু যে-সব পারসী আরবী শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা হয়তো কোনো-এক শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায়

১ প্রথম পত্রটি প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪১ সংখ্যায় 'মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা' নামে প্রকাশিত হয়।

সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলে নি, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল।

উর্দু ভাষায় পারসী ও আরবী শব্দের সঙ্গে হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দের মিশল চলেছে— কিন্তু স্বভাবতই তার একটা সীমা আছে। ঘোরতর পণ্ডিতও উর্দু লেখার কালে উর্দু'ই লেখেন, তার মধ্যে যদি তিনি 'অপ্রতিহত প্রভাবে' শব্দ চালাতে চান তা হলে সেটা হাস্যকর বা শোকাবহ হবেই।

আমাদের গণশ্রেণীর মধ্যে য়ুরেশীয়েরাও গণ্য। তাঁদের মধ্যে বাংলা লেখায় যদি কেউ প্রবৃত্ত হন এবং বাবা মা শব্দের বদলে পাপা মামা ব্যবহার করতে চান এবং তর্ক করেন ঘরে আমরা ওই কথাই ব্যবহার করে থাকি তবে সে তর্ককে কি যুক্তিসংগত বলব? অথচ তাঁদেরকেও অর্থাৎ বাঙালি য়ুরেশীয়কে আমরা দূরে রাখা অন্যায় বোধ করি। খুশি হব তাঁরা বাংলা ব্যবহার করলে কিন্তু সেটা যদি য়ুরেশীয় বাংলা হয়ে ওঠে তা হলে ধিক্‌কার দেব নিজের ভাগ্যকে। আমাদের ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে ওঠে তবে এর অভিসম্পাত আমাদের সভ্যতার মূলে আঘাত করবে।[১]

১১ চৈত্র ১৩৪০

২

আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা চলছে তার মতো বর্বরতা আর হতে পারে না। এ যেন ভাইয়ের উপর রাগ করে পারিবারিক বাস্তুঘরে আগুন লাগানো। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের দেশ-ভাষাকে পীড়িত করবার উদ্যোগ কোনো সভ্য দেশে দেখা যায় নি। এমনতর নির্মম অন্ধতা বাংলা প্রদেশেই এত বড়ো স্পর্ধার সঙ্গে আজ দেখা দিয়েছে বলে আমি লজ্জা বোধ করি। বাংলা দেশের মুসলমানকে যদি বাঙালি বলে গণ্য না করতুম তবে সাহিত্যিক এই অদ্ভুত কদাচার সম্বন্ধে তাঁদের কঠিন নিন্দা ঘোষণা করে সান্ত্বনা পেতে পারতুম। কিন্তু জগতের মধ্যে একমাত্র বাংলা-

১ এম. এ. আজানকে লিখিত পত্র

দেশপ্রসূত এই মূঢ়তার গ্লানি নিজে স্বীকার না ক'রে উপায় কি ? বেলজিয়মে জনসাধারণের মধ্যে এক দল বলে ফ্লেমিশ, অন্য দল ফরাসি ; কিন্তু ফ্লেমিশভাষী লেখক সাহিত্যে যখন ফরাসি ভাষা ব্যবহার করে, তখন ফ্লেমিশ শব্দ মিশিয়ে ফরাসি ভাষাকে আবিল করে তোলবার কথা কল্পনাও করে না। অথচ সেখানকার দুই সমাজের মধ্যে বিপক্ষতা যথেষ্ট আছে। উত্তর-পশ্চিমে, সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব নেই। সে-সকল প্রদেশে অনেক হিন্দু উর্দু ব্যবহার করে থাকেন, তাঁরা আড়াআড়ি করে উর্দুভাষায় সংস্কৃত শব্দ অসংগতভাবে মিশল করতে থাকবেন, তাঁদের কাছ থেকে এমনতর প্রমত্ততা প্রত্যাশা করতে পারি নে। এ রকম অদ্ভুত আচরণ কেবলই কি ঘটতে পারবে বিশ্বজগতের মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশে ? আমাদের রক্তে এই মোহ মিশ্রিত হতে পারল কোথা থেকে ? হতভাগ্য এই দেশ, যেখানে ভ্রাতৃবিদ্রোহ দেশবিদ্রোহে পরিণত হয়ে সর্বসাধারণের সম্পদকে নষ্ট করতে কুণ্ঠিত হয় না। নিজের সুবুদ্ধিকে কলঙ্কিত করার মধ্যে যে আত্মাবমাননা আছে দুর্দিনে সে কথাও মানুষ যখন ভোলে তখন সাংঘাতিক দুর্গতি থেকে কে বাঁচাবে ?'

১৭ বৈশাখ ১৩৪১

৩

ভাষাব্যবহার সম্বন্ধে আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আচারের পার্থক্য ও মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব অনুবর্তন না করলে ভাষার সার্থকতাই থাকে না। তথাপি ভাষার নমনীয়তার একটা সীমা আছে। ভাষার যেটা মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকূলতা করলে ভাব প্রকাশের বাহনকে অকর্মণ্য করে ফেলা হয়। প্রয়োজনের তাগিদে ভাষা বহুকাল থেকে বিস্তর নতুন কথার আমদানি করে এসেছে। বাংলা ভাষায় পারসী আরবী শব্দের সংখ্যা কম নয় কিন্তু তারা সহজেই স্থান পেয়েছে। প্রতিদিন একটা দুটো করে ইংরেজি শব্দও আমাদের ব্যবহারের মধ্যে প্রবেশ করছে। ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে একটা বিধান আছে যার দ্বারা

আলতাফ চৌধুরীকে লিখিত পত্র

নূতন শব্দের যাচাই হতে থাকে, গায়ের জোরে এই বিধান না মানলে জারজ শব্দ কিছুতেই জাতে ওঠে না। ইংরেজি ভাষার দিকে তাকিয়ে দেখলে আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন। ওয়েল্‌স্‌ আইরিশ স্কচ ভাষা ইংরেজি ভাষার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, ব্রিটেনের ওই-সকল উপজাতিরা আপন আত্মীয়মহলে ওই-সকল উপভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে স্বভাবতই ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু যে সাধারণ ইংরেজি ভাষা তাঁদের সাহিত্যের ভাষা ওই শব্দগুলি তার আসরে জবরদস্তি করতে পারে না। এইজন্যেই ওই সাধারণ ভাষা আপনি নিত্য আদর্শ রক্ষা করে চলতে পেরেছে। নইলে ব্যক্তিগত খেয়াল অনুসারে নিয়ত তার বিকার ঘটত। খুনখারাবি শব্দটা ভাষা সহজেই মেনে নিয়েছে, আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে ভাষা স্বীকার করে নি, কোনো বিশেষ পরিবারে বা সম্প্রদায়ে ওই অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে তবু সাধারণ বাংলা ভাষায় ওই অর্থ চালাতে গেলে ভাষা বিমুখ হবে। শক্তিমান মুসলমান লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেন নি, এ অভাব সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব। এই জীবনযাত্রার যথোচিত পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই পরিচয় দেবার উপলক্ষে মুসলমান সমাজের নিত্যব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতই প্রবেশলাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না, বরং বলবৃদ্ধি হবে, বাংলা ভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে··· ।[১]

৬।৯।৪০

১ আবুল ফজলকে লিখিত পত্র

সংযোজন

অনেক সময় দেখা যায় সংস্কৃত শব্দ বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে এক প্রকার বিকৃত ভাব প্রকাশ করে। কেমন একরকম ইতর বর্বর আকার ধারণ করে। 'ঘৃণা' শব্দের মধ্যে একটা মানসিক ভাব আছে। Aversion, indignation, contempt প্রভৃতি ইংরাজি শব্দ বিভিন্ন স্থল অনুসারে 'ঘৃণার' প্রতিশব্দ স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু 'ঘেন্না' বললেই নাকের কাছে একটা দুর্গন্ধ, চোখের সামনে একটা বীভৎস দৃশ্য, গায়ের কাছাকাছি একটা মলিন অস্পৃশ্য বস্তু কল্পনায় উদিত হয়। সংস্কৃত 'প্রীতি' শব্দের মধ্যে একটা বিমল উদার মানসিক ভাব নিহিত আছে। কিন্তু বাংলা 'পিরিতি' শব্দের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভাবটুকু নাই। বাংলায় 'স্বামী' 'স্ত্রী'র সাধারণ প্রচলিত প্রতিশব্দ ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। 'ভর্তা' এবং তাহার বাংলা রূপান্তর তুলনা করিয়া দেখিলেই এ কথা স্পষ্ট হইবে। আমার বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় 'লজ্জা' বলিলে যতটা ভাব প্রকাশ করে, বাংলায় 'লজ্জা' ততটা করে না। বাংলায় 'লজ্জা' এক প্রকার প্রথাগত বাহ্য লজ্জা, তাহা modesty নহে। তাহা হ্রী নহে। লজ্জার সহিত শ্রীর সহিত একটা যোগ আছে, বাংলা ভাষায় তাহা নাই। সৌন্দর্যের প্রতি স্বাভাবিক লক্ষ্য থাকিলে আচারে ব্যবহারে, ভাবভঙ্গিতে ভাষায় কণ্ঠস্বরে সাজসজ্জায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযম আসিয়া পড়ে। বাংলায় লজ্জা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাতে বরঞ্চ আচার-ব্যবহারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে, একটা বাড়াবাড়ি আসিয়া সৌন্দর্যের ব্যাঘাত করে। তাহা শরীর-মনের সুশোভন সংযম নহে, তাহার অনেকটা কেবলমাত্র শারীরিক অভিভূতি।

গল্প আছে— বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন উলোয় শিব গড়িতে বাঁদর হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি বাংলার মাটির বাঁদর গড়িবার দিকে একটু বিশেষ প্রবণতা আছে। লক্ষ্য শিব এবং পরিণাম বাঁদর ইহা অনেক স্থলেই দেখা যায়। উদার প্রেমের ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম বাংলাদেশে দেখিতে দেখিতে কেমন হইয়া দাঁড়াইল। একটা বৃহৎ ভাবকে জন্ম দিতে যেমন প্রবল মানসিক বীর্যের আবশ্যক, তাহাকে পোষণ করিয়া রাখিতেও সেইরূপ বীর্যের আবশ্যক। আলস্য এবং জড়তা যেখানে জাতীয় স্বভাব, সেখানে বৃহৎ ভাব দেখিতে দেখিতে বিকৃত হইয়া যায়। তাহাকে বুঝিবার, তাহাকে রক্ষা করিবার এবং তাহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া

দিবার উদ্যম নাই।

আমাদের দেশে সকল জিনিসই যেন এক প্রকার slang হইয়া আসে। আমার তাই এক-একবার ভয় হয় পাছে ইংরাজদের বড়ো ভাব বড়ো কথা আমাদের দেশে ক্রমে সেইরূপ অনার্য ভাব ধারণ করে। দেখিয়াছি বাংলায় অনেকগুলি গানের সুর কেমন দেখিতে দেখিতে ইতর হইয়া যায়। আমার বোধ হয় সভ্যদেশে যে যে সুর সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত, তাহার মধ্যে একটা গভীরতা আছে, তাহা তাহাদের national air, তাহাতে তাহাদের জাতীয় আবেগ পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়। যথা Home Sweet Home, Auld lang Syne—বাংলাদেশে সেরূপ সুর কোথায়? এখানকার সাধারণ-প্রচলিত সুরের মধ্যে গাম্ভীর্য নাই, স্থায়িত্ব নাই, ব্যাপকত্ব নাই। সেইজন্য তাহার কোনোটাকেই national air বলা যায় না। হিন্দুস্থানীতে যে-সকল খাম্বাজ ঝিঁঝিট কাফি প্রভৃতি রাগিণীতে শোভন ভদ্রভাব লক্ষিত হয়, বাংলায় সেই রাগিণীই কেমন কুৎসিত আকার ধারণ করিয়া 'বড় লজ্জা করে পাড়ায় যেতে' 'কেন বল সখি বিধুমুখী' 'একে অবলা সরলা' প্রভৃতি গানে পরিণত হইয়াছে।

কেবল তাহাই নহে, আমাদের এক-একবার মনে হয় হিন্দুস্থানী এবং বাংলার উচ্চারণের মধ্যে এই ভদ্র এবং বর্বর ভাবের প্রভেদ লক্ষিত হয়। হিন্দুস্থানী গান বাংলায় ভাঙিতে গেলেই তাহা ধরা পড়ে। সুর তাল অবিকল রক্ষিত হইয়াও অনেক সময় বাংলা গান কেমন 'রোখো' রকম শুনিতে হয়। হিন্দুস্থানীর polite 'আ' উচ্চারণ বাংলায় vulgar 'অ' উচ্চারণে পরিণত হইয়া এই ভাবান্তর সংঘটন করে। 'আ' উচ্চারণের মধ্যে একটি বেশ নির্লিপ্ত ভদ্র suggestive ভাব আছে, আর 'অ' উচ্চারণ নিতান্ত গা-ঘেঁষা সংকীর্ণ এবং দরিদ্র। কাশীর সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিলে এই প্রভেদ সহজেই উপলব্ধি হয়।

উপরের প্যারাগ্রাফে এক স্থলে commonplace শব্দ বাংলায় ব্যক্ত করিতে গিয়া 'রোখো' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু উক্ত শব্দ ব্যবহার করিতে কেমন কুণ্ঠিত বোধ করিতেছিলাম। সকল ভাষাতেই গ্রাম্য ইতর শব্দ আছে। কিন্তু দেখিয়াছি বাংলায় বিশেষ ভাবপ্রকাশক শব্দ মাত্রই গ্রাম্য। তাহাতে ভাব ছবির মতো ব্যক্ত করে বটে কিন্তু সেইসঙ্গে আরো একটা কী করে যাহা সংকোচজনক। Smile শব্দ বাংলায় ব্যক্ত করিতে হইলে হয় 'মুচ্‌কে হাসি' নয় 'ঈষদ্ধাস্য' বলিতে হইবে। কিন্তু 'মুচ্‌কে হাসি' সাধারণত মনের মধ্যে যে ছবি

আনয়ন করে তাহা বিশুদ্ধ smile নহে, ঈষদ্ধাস্য কোনো ছবি আনয়ন করে কি না সন্দেহ। Peep শব্দকে বাংলায় 'উঁকিমারা' বলিতে হয়। Creep শব্দকে 'গুঁড়িমারা' বলিতে হয়। কিন্তু 'উঁকিমারা' 'গুঁড়িমারা' শব্দ ভাবপ্রকাশক হইলেও সর্বত্র ব্যবহারযোগ্য নহে। কারণ উক্ত শব্দগুলিতে আমাদের মনে এমন-সকল ছবি আনয়ন করে যাহার সহিত কোনো মহৎ বর্ণনার যোগসাধন করিতে পারা যায় না।

হিন্দুস্থানী বা মুসলমানদের মধ্যে একটা আদব-কায়দা আছে। একজন হিন্দুস্থানী বা মুসলমান ভৃত্য দিনের মধ্যে প্রভুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইবামাত্রই যে সেলাম অথবা নমস্কার করে তাহার কারণ এমন নহে যে, তাহাদের মনে বাঙালি ভৃত্যের অপেক্ষা অধিক দাস্যভাব আছে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, সভ্যসমাজের সহস্রবিধ সম্বন্ধের ইতিকর্তব্যতা বিষয়ে তাহারা নিরলস ও সতর্ক। প্রভুর নিকটে তাহারা পরিচ্ছন্ন পরিপাটি থাকিবে, মাথায় পাগ্‌ড়ি পরিবে, বিনীত ভাব রক্ষা করিবে। স্বাভাবিক ভাবে থাকা অপেক্ষা ইহাতে অনেক আয়াস ও শিক্ষা আবশ্যক। আমরা অনেক সময়ে যাহাকে স্বাধীন ভাব মনে করি তাহা অশিক্ষিত অসভ্য ভাব। অনেক সময়ে আমাদের এই অশিক্ষিত ও বর্বর ভাব দেখিয়াই ইংরাজেরা আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, অথচ আমরা মনে মনে গর্ব করি যেন প্রভুকে যথাযোগ্য সম্মান না দেখাইয়া আমরা ভারি একটা কেল্লা ফতে করিয়া আসিলাম। এই অশিক্ষা ও অনাচারবশত আমাদের দৈনিক ভাষা ও কাজের মধ্যে একটি সুমার্জিত সুষমা একটি শ্রী লক্ষিত হয় না। আমরা কেমন যেন 'আট-পৌরে' 'গায়েপড়া' 'ফেলাছড়া' 'ঢিলেঢালা' 'নড়বোড়ে' রকমের জাত, পৃথিবীর কাজেও লাগি না, পৃথিবীর শোভাও সাধন করি না।

২২ কার্তিক ১৮৮৮

প্রকাশ : বৈশাখ ১৩০২

২

বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করিতে গিয়া একটি প্রধান ব্যাঘাত এই দেখিতে পাই, বাংলা ভাষায় ছবি আঁকা শব্দ অতি অল্প। কেবল উপ্‌রি-উপ্‌রি মোটামুটি একটা বর্ণনা করা যায় মাত্র, কিন্তু একটা জাজ্বল্যমান মূর্তি ফুটাইয়া তুলা যায়

না। লেখকের ক্ষমতার অভাব তাহার একমাত্র কারণ নহে। দৃষ্টান্ত— এক 'চলা' শব্দ ইংরাজিতে কত রকমে ব্যক্ত করা যায়— walk, step, move, creep, sweep, totter, waddle, এমন আরো অনেক শব্দ আছে। উহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন ছবি রচনা করে, কেবলমাত্র ঘটনার উল্লেখ করে না। ইহা ছাড়া গঠন-বৈচিত্র্য, বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ইংরাজিতে বিচিত্র শব্দ আছে। আমরা কখনো প্রকৃতিকে স্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করি নাই। আমাদের চিত্রশিল্প নাই; আমাদের চিত্রে এবং কবিতায় প্রকৃতির অতি-বর্ণনাই অধিক। আমরা যেন চক্ষে কিছুই দেখি না— অলস কল্পনার মধ্যে প্রকৃতি বিকৃতাকার ধারণ করিয়া উদিত হয়। আমাদের শরীর-বর্ণনা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মানবদেহের এরূপ সামঞ্জস্যহীন অনৈসর্গিক বর্ণনা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। আমরা মোটামুটি একটা তুলনার দ্রব্য পাইলেই অমনি তাহার সাহায্যে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করি। পরিষ্কার ছবি ব্যক্ত করিবার ঔদাসীন্য থাকাতে আমাদের ছবির ভাষা নাই। বিরহিনীর বিরহাবস্থা বর্ণনায় আমাদের অতি-কল্পনা ও স্বভাবের প্রতি মনোযোগহীনতা প্রকাশ পায়। আমরা আলস্যবশত চোখে যেটুকু কম দেখি, কোণে বসিয়া মনে মনে একটা চার্ট গড়িয়া সেটুকু পূরণ করিয়া লই। আমরা অল্পস্বল্প দেখি, অথচ খুব বিস্তৃত করিয়া generalize করি। তাড়াতাড়ি একটা প্রকাণ্ড system বাঁধিয়া লই, কিন্তু অগাধ কল্পনার ভাণ্ডার হইতে তাহার সরঞ্জাম সঞ্চয় করি। আমাদের অপরিমিত কল্পনা আমাদের নিরীক্ষণ-শক্তির আগে আগে ছুটিয়া চলে, একটু দেখিবা মাত্র তাহার কল্পনা মস্ত হইয়া উঠে। এইজন্য জগৎ স্পষ্ট দেখা হইল না— অথচ সকল বিষয়ে মস্ত মস্ত তন্ত্র বাঁধা হইল। পৃথিবীর এটুকখানি দেখিয়াই অমনি সমস্ত পৃথিবীর একটি বিস্তৃত ভূগোল বিবরণ রচনা করা হইয়াছে, এমন আরো দৃষ্টান্ত আছে।

৬।১১।৮৮

জাতীয় সাহিত্য

আমরা 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধের নামকরণে ইংরাজি 'ন্যাশনাল' শব্দের স্থলে 'জাতীয়' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয় আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্লেষকটাক্ষপাত করিয়াছেন।

প্রথমত, অনুবাদটি আমাদের কৃত নহে; এই শব্দ বহুকাল হইতে বাংলা সাহিত্যে ন্যাশনাল-শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়ত, ভাষার পরিণতি সহকারে স্বাভাবিক নিয়মে অনেকগুলি শব্দের অর্থ বিস্তৃতি লাভ করে। 'সাহিত্য' শব্দটি তাহার উদাহরণস্থল। সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ও 'সাহিত্য' শব্দটিকে ইংরাজি 'লিটারেচর' অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সম্পাদক মহাশয় সংস্কৃতজ্ঞ, ইহা তাঁহার অবিদিত নাই যে, 'লিটারেচর' শব্দের অর্থ যতদূর ব্যাপক, সাহিত্য শব্দের অর্থ ততদূর পৌঁছে না। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে 'মনুষ্যকৃতশ্লোকময়গ্রন্থবিশেষঃ। স তু ভট্টি-রঘুকুমারসম্ভবমাঘভারবিমেঘদূতবিদগ্ধমুখমণ্ডনশান্তিশতকপ্রভৃতয়ঃ।' এমন-কি, রামায়ণ মহাভারতও সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হয় নাই, তাহা ইতিহাসরূপে খ্যাত ছিল। এইজন্য মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় 'সাহিত্য' শব্দের পরিবর্তে 'বাঙ্ময়' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে ২৭শ শ্লোকে আছে—

লিপের্যথাবদ্‌গ্রহণেন বাঙ্ময়ং
নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশৎ।

অর্থাৎ রঘু লিপিরূপ নদীপথ দিয়া বাঙ্ময়রূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন।

'জাতি' শব্দ এবং 'নেশন্‌' শব্দ উভয়েরই মূল ধাতুগত অর্থ এক। জন্মগত ঐক্য নির্দেশ করিবার জন্য উভয় শব্দের উৎপত্তি। আমরা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণকে জন্মগত ঐক্যবশত জাতি বলি, আবার বাঙালি প্রভৃতি প্রজাবর্গকেও সেই কারণেই জাতি বলিয়া থাকি। জাতি শব্দের শেষোক্ত প্রয়োগের স্থলে ইংরাজিতে 'নেশন্‌' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা, বাঙালি জাতি = বেঙ্গলি নেশন্‌। এরূপ স্থলে 'ন্যাশনাল' শব্দের প্রতিশব্দরূপে 'জাতীয়' শব্দ ব্যবহার করাতে বিশেষ দোষের কারণ দেখা যায় না। আমরাও তাহাই করিয়াছি। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় অকস্মাৎ অকারণে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে আমরা 'জাতীয় সাহিত্য' শব্দে 'ভর্ন্যাক্যুলর লিটরেচর্‌' শব্দের অপূর্ব তর্জমা করিয়াছি! বিনীতভাবে জানাইতেছি

আমরা এমন কাজ করি নাই। সাহিত্য যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আমোদ বা শিক্ষাসাধক নহে, তাহা যে সমস্ত জাতির ‘জাতীয়’ বন্ধন দৃঢ়তর করে, বাংলা সাহিত্য, যে, বাঙালি জাতির ভূত ভবিষ্যৎকে এক সজীব সচেতন নাড়ি-বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বৃহত্তর এবং ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিবে— আমাদের প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের বিশেষরূপ অবতারণা ছিল বলিয়া, আমরা বাংলা সাহিত্যকে, ব্যক্তিগত রসসম্ভোগের হিসাবে নহে, পরন্তু জাতীয় উপযোগিতার হিসাবে আলোচনা করিয়াছিলাম বলিয়াই তাহাকে বিশেষ করিয়া জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দিয়াছিলাম। সভাস্থলে বক্তৃতা পাঠ করিতে হইলে শ্রোতৃসাধারণের দ্রুত অবগতির জন্য বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে— আমরাও বক্তৃতার বিষয় যথোচিত বিস্তৃত করিয়া বলিয়া কেবল সম্পাদক মহাশয়ের নিন্দাভাজন হইলাম কিন্তু তথাপিও তিনি আমাদের বক্তব্য-বিষয়টিকে সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিলেন না ইহাতে আমাদের দ্বিগুণ দুঃখ রহিয়া গেল।

আষাঢ় ১৩০২

নামের পদবী

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন বাঙালি মেয়ের পদবী প্রসঙ্গে আমাকে যে চিঠিখানি লিখেছেন[১] তার উত্তরে আমার যা বলবার আছে বলে নিই, যদিও ফলের আশা রাখি নে।

বাংলা দেশে সামাজিক ব্যবহারে পরস্পরের সম্মানের তারতম্য জাতের সঙ্গে বাঁধা ছিল। দেখাসাক্ষাৎ হলে জাতের খবরটা আগে না জানতে পারলে অভিবাদন অভ্যর্থনা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকত। পাকা পরিচয় পেলে তবে একপক্ষ পায়ের ধুলো দেবে, আর-একপক্ষ নেবে, আর বাকি যারা তারা পরস্পরকে নমস্কার করবে কিম্বা কিছুই করবে না এই ছিল বিধান। সামাজিক ব্যবহারের বাইরে লৌকিক ব্যবহারে যে-একটা সাধারণ শিষ্টতার নিয়ম প্রায় সকল দেশেই আছে— আমাদের দেশে অনতিকালপূর্বেও তা ছিল না। যেখানে স্বার্থের গরজ ছিল এমন কোনো কোনো স্থলে এ নিয়ে মুশকিল ঘটত। উচ্চপদস্থ বা ধনশালী লোকের কাছে উমেদারি করবার বেলা নতিস্বীকার করে তুষ্ট করা প্রার্থীর পক্ষে অত্যাবশ্যক কিন্তু জাতে-বাঁধা রীতি ছাড়া আর কোনো রীতি না থাকাতে কিছুদিন পূর্বে এই রকম সংকটের স্থলে সম্মানের একটা কৃপণ প্রথা দায়ে পড়ে উদ্‌ভাবিত হয়েছিল। সে হচ্ছে ডান হাতে মুঠো বেঁধে দ্রুতবেগে নিজের নাসাগ্র আঘাত করা, সেটা দেখতে হত নিজেকে ধিক্‌কার দেওয়ার মতো। এই রকম সংশয়কুণ্ঠিত অনিচ্ছুক অশোভন বিনয়াচার এখন আর দেখতে পাই নে।

তার প্রধান কারণ, বাঙালিসমাজে পূর্বকালের গ্রাম্যতা এখন নেই বললেই হয়, জাতের গণ্ডি পেরিয়ে লোকব্যবহারে পরস্পরের প্রতি একটা সাধারণ শিষ্টতার দাবি স্বীকার করবার দিন এসেছে। তা ছাড়া কাউকে বিশেষ সম্মান দেবার বেলায় আজ আমরা বিশেষ করে মানুষের জাত খুঁজি নে। মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ-বেলায় কোনো কোনো পরিবারে আজও কৌলীন্যের আদর থাকতে পারে— কিন্তু বৈঠকমজলিসে সভাসমিতিতে ইস্কুলেকলেজে আপিসেআদালতে

১ দ্রষ্টব্য, 'বিচিত্রা', শ্রাবণ ১৩৩৮

তার কোনো চিহ্ন নেই ; সে-সব জায়গায় ব্রাহ্মণের চেয়ে কুলীনের চেয়ে অনেক বড়ো মান সর্বদাই অন্য জাতের লোক পেয়ে থাকে। অতএব আজকের দিনে জনসমাজে কার কোন্ আসন সেটা জাতের দ্বারা ঘের দিয়ে সুরক্ষিত নেই, ভোজের স্থানেও পঙ্‌ক্তি-বিভাগের দাগটা কোথাও বা লুপ্ত, কোথাও বা অত্যন্ত ফিকে। মানুষের পরিচয়ে জাত-পরিচয়ের দাম এক সময়ে যত বড়ো ছিল এখন তা প্রায় নেই বলা যেতে পারে।

দাম যখন বেশি ছিল, এমন-কি, সম্মানের বাজারে সেইটেই যখন প্রায় একান্ত ছিল তখন নামের সঙ্গে পদবী বহন করাটা বাহুল্য ছিল না। কেননা আমাদের পদবী জাতের পদবী। ইংরেজিতে স্মিথ পদবী পারিবারিক, যদিও ছড়িয়ে গিয়ে এর পারিবারিক বিশেষত্ব অনেক পরিমাণে হারিয়ে গেছে। কিন্তু ঘোষ বোস চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে মূলত কোনো পরিবারকে নির্দেশ করে না, জাতবিশেষের বিভাগকে নির্দেশ করে। পরিবারের চেয়ে এই বিভাগটা অনেক ব্যাপক। এমনতর ব্যাপক সংজ্ঞার যখন বিশেষ মূল্য ছিল তখনি নামের সঙ্গে ব্যবহারে সেটার বিশেষ সার্থকতা ছিল, এখন মূল্য যতই কমে আসছে ততই পারিবারিক পরিচয় হিসাবে ওর বিশিষ্টতা থাকছে না, অন্য হিসাবেও নয়।

ভারতবর্ষে বাংলা দেশ ছাড়া প্রায় সকল প্রদেশেই পদবীহীন নাম বিনা উপদ্রবেই চলে আসছে। এতদিন তো তা নিয়ে কারো মনে কোনো খট্‌কা লাগে নি। বারাণসীর স্বনামখ্যাত ভগবানদাস তাঁর ব্যক্তিগত নামটুকু নিয়েই আছেন। তাঁর ছেলের নাম শুদ্ধমাত্র শ্রীপ্রকাশ, নামের সঙ্গে কুলপরিচয় নেই। রাষ্ট্রিক উদ্যোগে খ্যাতিলাভের দ্বারা তিনি আপন নিষ্পদবিক নামটিকেই জনাদৃত করে তুলছেন।

প্রাচীনকালের দিকে তাকালে নল-দময়ন্তী বা সাবিত্রী-সত্যবানের কোনো পদবী দেখা যায় না। একান্ত আশা করি, নলকে নলদেববর্মা বলে ডাকা হত না। কুলপদবীর সমাসযোগে যুধিষ্ঠির-পাণ্ডব বা দ্রৌপদী-পাণ্ডব নাম পুরাণ-ইতিহাসে চলে নি, সমাজে চলতি ছিল এমন প্রমাণ নেই। বিশেষ প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত নামের সঙ্গে আরো কিছু বিশেষণ যোগ করা চলত। যেমন সাধারণত ভগবান মনুকে শুদ্ধ মনু নামেই আখ্যাত করা হয়েছে, তাতে অসুবিধা ঘটে নি— তবু বিশেষ প্রয়োজনস্থলেই তাঁকে বৈবস্বত মনু বলা হয়ে থাকে, সর্বদা নয়।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে মহাভারতের দৃষ্টান্ত পুরোপুরি ব্যবহার করতে সাহস করি নে। নামের ভার যথাসম্ভব লাঘব করারই আমি সমর্থন করি, এক মানুষের বহুসংখ্যক নামকরণ দ্বাপর-ত্রেতাযুগে শোভা পেত এখন পায় না। বাপের পরিচয়ে কৃষ্ণার নাম ছিল দ্রৌপদী, জন্মস্থানের পরিচয়ে পাঞ্চালী, জন্ম-ইতিহাসের পরিচয়ে যাজ্ঞসেনী। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, শ্বশুরকুলের পরিচয়ে তাঁকে পাণ্ডবী বলা হয় নি। প্রাচীনকালে কোনো স্ত্রীর নামের সঙ্গে স্বামীর পরিচয় যুক্ত আছে এমন তো মনে পড়ে না।

আমার প্রস্তাব হচ্ছে, ব্যক্তিগত নামটাকে বজায় রেখে আর-সমস্ত বাদ দেওয়া, বিশেষ দরকার পড়লে তখন সংবাদ নিয়ে পরিচয় পূর্ণ করা। নামটাকে অত্যন্ত মোটা না করলে নামের সাহায্যেই সম্পূর্ণ ও নিঃসংশয় পরিচয় সম্ভব হয় না। আমাদের বিখ্যাত ঔপন্যাসিককে আমি বলি শরৎচন্দ্র। তাঁর কথা আলোচনা করতে গিয়ে দেখি শরৎচন্দ্র সান্যালও লেখেন উপন্যাস। তখন গ্রন্থি ছাড়াবার জন্যে বলা গেল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে আরো একজন গল্প-লিখিয়ে থাকা বিপুলা পৃথ্বীতে অসম্ভব নয় তার প্রমাণ খুঁজলে পাওয়া যায়। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা যেখানে দরকার হয় সেখানে আরো একটা বিশেষণ যোগ করতে বাধ্য হই, যেমন শ্রীকান্ত-লেখক শরৎচন্দ্র। ফুলের বৃন্ত যেমন, মানুষের ব্যক্তিগত নামটি তেমনি। এই বৃন্ত থেকে প্রশাখায়, প্রশাখা থেকে শাখায়, শাখা থেকে গাছে, গাছ হয়তো আছে টবে। কিন্তু যখন ফুলটির সঙ্গেই বিশেষ ব্যবহার করতে হয়, যেমন মালা গাঁথতে, বোতামের গর্তে গুঁজতে, হাতে নিয়ে তার শোভা দেখতে, গন্ধ শুঁকতে, বা দেবতাকে নিবেদন করতে, তখন গাছসুদ্ধ টবসুদ্ধ যদি টানি তবে বৈশল্যকরণীর প্রয়োজনে গন্ধমাদন নাড়ানোর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। অবশ্য বিশেষ দরকার হলে তখন টবসুদ্ধ নাড়াতে দেখলে সেটাকে শক্তির অপব্যয় বলব না।

পত্রলেখক বাঙালি মেয়ের পদবী সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করেছেন। মেয়েরই হোক পুরুষেরই হোক পদবী মাত্রই বর্জন করবার আমি পক্ষপাতী। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে তার নজীর আছে এই আমার ভরসা, কিন্তু বিলিতি নজীর আমার বিপক্ষ বলেই হতাশ হতে হয়।

আমার বয়স যখন ছিল অল্প, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বঙ্গসাহিত্যের রাজাসনে, তখন প্রসঙ্গক্রমে তাঁর নাম করতে হলে আমরা বলতুম বঙ্কিমবাবু, শুধু বঙ্কিমও কারো

কারো কাছে শুনেছি, কিন্তু কখনো কাউকে বঙ্কিম চাটুজ্জে বলতে শুনি নি। সম্প্রতি রুচির পরিবর্তন হয়েছে কি? এখন শরৎচন্দ্রের পাঠকদের মুখে প্রায় শুনতে পাই শরৎ চাটুজ্জে। পরোক্ষে শুনেছি আমি রবি ঠাকুর নামে আখ্যাত। রুচি নিয়ে তর্কের সীমা নেই কিন্তু শরৎচন্দ্রই আমার কানে ভদ্র শোনায়, শরৎ-বাবুতেও দোষ নেই, কিন্তু শরৎ চাটুজ্জে কেমন যেন খেলো ঠেকে। যাই হোক, এরকম প্রসঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ নিরর্থক, মোট কথা হচ্ছে এই, ব্যাঙাচি পরিণত বয়সে যেমন ল্যাজ খসিয়ে দেয় বাঙালির নামও যদি তেমনি পদবী বর্জন করে আমার মতে তাতে নামের গাম্ভীর্য বাড়ে বৈ কমে না। বস্তুত নামটা পরিচয়ের জন্যে নয় ব্যক্তিনির্দেশের জন্যে। পদ্মলোচন নাম নিয়ে আমরা কারো লোচন-সম্পর্কীয় পরিচয় খুঁজি নে একজন বিশেষ ব্যক্তিকেই খুঁজি। বস্তুত নামের মধ্যে পরিচয়কে অতিনির্দিষ্ট করার দ্বারা যদি নামমাহাত্ম্য বাড়ে তবে নিম্নলিখিত নামটাকে সেরা দাম দেওয়া যায়: রাজেন্দ্রসূনু-শশিশেখর মৈমনসৈংহিক বৈষ্ণব নিস্তারিণী-পতি চাক্‌লাদার।

সম্মানরক্ষার জন্যে পুরুষের নামের গোড়ায় বা শেষে আমরা বাবু যোগ করি। প্রশ্ন এই যে, মেয়েদের বেলা কী করা যায়। নিরলংকৃত সম্ভাষণ অশিষ্ট শোনায়। মা মাসি দিদি বউঠাকরুন ঠানদিদি প্রভৃতি পারিবারিক সম্বোধনই আমাদের দেশে মেয়েদের সম্বন্ধে চলে এসেছে। সমাজ-ব্যবহারের যে-গণ্ডির মধ্যে এটা সুসংগত ছিল তার সীমা এখন আমরা ছাড়িয়ে গেছি। আজকাল অনেকে মেয়েদের নামের সঙ্গে দেবী যোগ করাটাই ভদ্র সম্বোধন বলে গণ্য করেন। এটা নেহাত বাড়াবাড়ি। মা অথবা ভগিনীসূচক সম্বোধন গুজরাটে প্রচলিত, যেমন অনসূয়া বেন, কস্তুরী বাই। আমাদের পক্ষে আর্যা শব্দটা দেবীর চেয়ে ভালো, কিন্তু ওটা অনভ্যস্ত, অতএব প্রহসনের বাইরে চলবে না। দেবী শব্দটা যদি প্রথামত উচ্চ-বর্ণেই প্রযোজ্য তবু নামের সহযোগে ওর ব্যবহার আমাদের কানে সয়ে গেছে। তাই মনে হয় তেমনি অভ্যস্ত শ্রীমতী শব্দটা নামের সঙ্গে জড়িয়ে ব্যবহার করলে কানে অদ্ভুত শোনাবে না, যেমন শ্রীমতী সুনন্দা, শ্রীমতী শোভনা।

বিবাহিতা স্ত্রীর নামকে স্বামীর পরিচয়যুক্ত করা ভারতবর্ষে কোনো কালেই প্রচলিত ছিল না। আমাদের মেয়েদের নামের সঙ্গে তার পিতার বা স্বামীর পদবী জুড়লে প্রায়ই সেটা শ্রুতিকটু এবং অনেক স্থলেই হাস্যকর হয়। ইংরেজি নিয়মে মিসেস ভট্টাচার্য বললে তত দুঃখবোধ হয় না। কিন্তু মণিমালিনী

সর্বাধিকারী কানে সইয়ে নিতে অনেকদিন কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়। যে-রকম আবহাওয়া পড়েছে তাতে য়ুরোপে বিবাহিত নারীর পদবী পরিবর্তন বেশি-দিন টিঁকবে বলে বোধ হয় না, তখন আবার তাড়াতাড়ি আমাদেরও সহধর্মিণী-দের নামের ছাঁট-কাট করতে যদি বসি তবে নিতান্ত নির্লজ্জ না হলে অন্তত কর্ণ-মূল লাল হয়ে উঠবে। একদা পাশ্চাত্য মহাদেশে মেয়েরা যখন নিজের নাম-স্বাতন্ত্র্য অবিকৃত রাখা নিয়ে আস্ফালন করবে সেদিন যাতে আমাদের মেয়েরা গৌরব করতে পারে সেই সুযোগটুকু গায়ে পড়ে নষ্ট করা কেন?

এ-সব আলোচনায় বিশেষ কিছু লাভ আছে বলে মনে হয় না। রুচির তর্কে প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। যে কারণে 'বাধ্যতামূলক' 'গঠনমূলক' প্রভৃতি বর্বর শব্দ বাংলা অভিধানকে অধিকার করছে সেই কারণেই বাঙালির বৈঠকে মধুমালতী মজুমদার বা বনজ্যোৎস্না তলাপাত্রের প্রাদুর্ভাবকে নিরস্ত করা যাবে না, ইংরেজিতে প্রথার সঙ্গে যেমন-তেমন করে জোড় মেলানোর ঝোঁক সামলানো দুঃসাধ্য।

শ্রাবণ ১৩৩৮

...সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলার যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাক্ তবু বাংলার স্বাতন্ত্র্য যে সংস্কৃত ব্যাকরণের তলায় চাপা পড়বার নয়, আমি জানি এ মতটি শাস্ত্রী-মহাশয়ের। এ কথা শুনতে যত সহজ আসলে তা নয়। ভাষার বাইরের দিক থেকে চোখে পড়ে শব্দের উপাদান। বলা বাহুল্য বাংলা ভাষার বেশির ভাগ শব্দই সংস্কৃত থেকে পাওয়া। এই শব্দের কোনোটাকে বলি তৎসম, কোনোটাকে তদ্ভব।

ছাপার অক্ষরে বাংলা পড়ে পড়ে একটা কথা ভুলেচি যে সংস্কৃতের তৎসম শব্দ বাংলায় প্রায় নেই বললেই হয়। "অক্ষর" শব্দটাকে তৎসম বলে গণ্য করি ছাপার বইয়ে; অন্য ব্যবহারে নয়। রোমান অক্ষরে "অক্ষর" শব্দের সংস্কৃত চেহারা akshara বাংলায় okkhar। মরাঠী ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রায় সংস্কৃতেরই মতো, বাংলায় তা নয়। বাংলার নিজের উচ্চারণের ছাঁদ আছে, তার সমস্ত আমদানি শব্দ সেই ছাঁদে সে আপন করে নিয়েছে।

তেমনি তার কাঠামোটাও তার নিজের। এই কাঠামোতেই ভাষার জাত চেনা যায়। এমন উর্দু আছে যার মুখোষটা পারসিক কিন্তু ওর কাঠামোটা বিচার করে দেখলেই বোঝা যায় উর্দু ভারতীয় ভাষা। তেমনি বাংলার স্বকীয় কাঠামোটাকে কি বলব? তাকে গৌড়ীয় বলা যাক্।

কিন্তু ভাষার বিচারের মধ্যে এসে পড়ে আভিজাত্যের অভিমান, সেটা স্বাজাত্যের দরদকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। অব্রাহ্মণ যদি পৈতে নেবার দিকে অত্যন্ত জেদ করতে থাকে তবে বোঝা যায় যে, নিজের জাতের পরে তার নিজের মনেই সম্মানের অভাব আছে। বাংলা ভাষাকে প্রায় সংস্কৃত বলে চালালে তার গলায় পৈতে চড়ানো হয়। দেশজ বলে কারো কারো মনে বাংলার পরে যে অবমাননা আছে সেটাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নামাবলী দিয়ে ঢেকে দেবার চেষ্টা অনেকদিন আমাদের মনে আছে। বালক বয়সে যে ব্যাকরণ পড়েছিলুম তাতে সংস্কৃত-ব্যাকরণের পরিভাষা দিয়ে বাংলা ভাষাকে শোধন করবার প্রবল ইচ্ছা দেখা গেছে; অর্থাৎ এই কথা রটিয়ে দেবার চেষ্টা, যে, ভাষাটা পতিত যদিবা হয় তবু পতিত ব্রাহ্মণ, অতএব পতিতের লক্ষণগুলো যতটা পারা যায় চোখের আড়ালে রাখা কর্তব্য। অন্তত পুঁথিপত্রের চালচলনে বাংলাদেশে

"মস্ত ভিড়"কে কোথাও যেন কবুল করা না হয় স্বাগত বলে যেন এগিয়ে নিয়ে আসা হয় "মহতী জনতা"কে।

এমনি করে সংস্কৃত ভাষা অনেক কাল ধরে অপ্রতিহত প্রভাবে বাংলা ভাষাকে অপত্য নির্বিশেষে শাসন করবার কাজে লেগেছিলেন। সেই যুগে নর্মাল স্কুলে কোনোমতে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে পর্যন্ত আমার উন্নতি হয়েছিল। বংশে ধনমর্যাদা না থাকলে তাও বোধ হয় ঘটত না। তখন যে-ভাষাকে সাধুভাষা বলা হত অর্থাৎ যে-ভাষা ভুল করে আমাদের মাতৃভাষার পাড়ায় পা দিলে গঙ্গাস্নান না করে ঘরে ঢুকতেন না তাঁর সাধনার জন্যে লোহারাম শিরোরত্নের ব্যাকরণ এবং আভ্যানাথ পণ্ডিতমশায়ের সমাসদর্পণ আমাদের অবলম্বন ছিল। আজকের দিনে শুনে সকলের আশ্চর্য লাগবে যে, দ্বিগু সমাস কাকে বলে সুকুমারমতি বালকের তাও জানা ছিল। তখনকার কালের পাঠ্যগ্রন্থের ভূমিকা দেখলেই জানা যাবে সেকালে বালকমাত্রই সুকুমারমতি ছিল।

ভাষা সম্বন্ধে আর্য পদবীর প্রতি লুব্ধ মানুষ আজও অনেকে আছেন, শুদ্ধির দিকে তাঁদের প্রখর দৃষ্টি— তাই কান সোনা পান চুনের উপরে তাঁরা বহু যত্নে মূর্ধন্য ণ-য়ের ছিটে দিচ্ছেন তার অপভ্রংশতার পাপ যথাসাধ্য ক্ষালন করবার জন্যে। এমন-কি, ফার্সি দরুন শব্দের প্রতিও পতিতপাবনের করুণা দেখি। "গবর্নমেণ্টে"র উপর ণত্ব বিধানের জোরে তাঁরা ভগবান পাণিনির আশীর্বাদ টেনে এনেছেন। এঁদের "পরণে" "নরুণ-পেড়ে" ধুতি। ভাইপো "হরেনে"র নামটাকে কোন্ ন-এর উপর শূল চড়াবেন তা নিয়ে দো-মনা আছেন। কানে কুণ্ডলের সোনার বেলায় তাঁরা আর্য কিন্তু কানে মন্ত্র শোনার সময় তাঁরা অন্যমনস্ক। কানপুরে মূর্ধন্য ণ চড়েছে তাও চোখে পড়ল,— অথচ কানাই পাহারা এড়িয়ে গেছে। মহামারী যেমন অনেকগুলোকে মারে অথচ তারি মধ্যে দুটো একটা রক্ষা পায়, তেমনি হঠাৎ অল্পদিনের মধ্যে বাংলায় মূর্ধন্য ণ অনেকখানি সংক্রামক হয়ে উঠেছে। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় নতুন গ্র্যাজুয়েট এটার উদ্ভব তাঁদেরি থেকে, কিন্তু এর ছোঁয়াচ লাগল ছাপাখানার কম্পোজিটরকেও। দেশে শিশুদের পরে দয়া নেই তাই বানানে অনাবশ্যক জটিলতা বেড়ে চলেছে অথচ তাতে সংস্কৃত ভাষার নিয়মও পীড়িত বাংলার তো কথাই নেই।

প্রাচীন ভারতে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল। যাঁরা লিখেছিলেন

তাঁরা আমাদের চেয়ে সংস্কৃত ভাষা কম জানতেন না। তবু তাঁরা প্রাকৃতকে নিঃসংকোচে প্রাকৃত বলেই মেনে নিয়েছিলেন, লজ্জিত হয়ে থেকে থেকে তার উপরে সংস্কৃত ভাষার পলস্তারা লাগান নি। যে দেশ পাণিনির সেই দেশেই তাঁদের জন্ম, ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের মোহমুক্ত স্পষ্টদৃষ্টি ছিল। তাঁরা প্রমাণ করতে চান নি যে ইরাবতী চন্দ্রভাগা শতদ্রু গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র সমস্তই হিমালয়ের মাথার উপরে জমাট করা বিশুদ্ধ বরফেরই পিণ্ড। যাঁরা যথার্থ পণ্ডিত তাঁরা অনেক সংবাদ রাখেন বলেই যে মান পাবার যোগ্য তা নয় তাঁদের স্পষ্ট দৃষ্টি।...[১]

১ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন সংগ্রহে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' সম্পর্কে লিখিত দুইটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তন্মধ্যে একটি পূর্বে 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা' দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিপুস্তকের জন্ত' চিহ্নিত অপর পাণ্ডুলিপি হইতে শব্দতত্ত্ব-সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অংশ বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হইল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্র নৈহাটি -কর্তৃক সংকলিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক গ্রন্থে' (১৯৭৮) পাণ্ডুলিপি হইতে সম্পূর্ণ রচনা মুদ্রিত। শ্রীসত্যজিৎ চৌধুরী এই রচনাটির প্রতি সংকলয়িতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পরিশিষ্ট

১. জীবনস্মৃতির 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ সে-সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি-অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।'

জীবনস্মৃতিতে 'ভানুসিংহের কবিতা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'পূর্বেই লিখিয়াছি, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।'

এই অধ্যয়নের ফলস্বরূপ ১২৮৮ ও ১২৯০ সালের ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের যে-সকল প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলি এখানে মুদ্রিত হইল।

২. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্যসাধনকল্পে বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংগৃহীত ও পরিষদ-কর্তৃক প্রচারিত হয়।

ইহার সূচনায় পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফি যে নিবেদন প্রচার করেন তাহা গ্রন্থপরিচয়ে দ্রষ্টব্য।

৩. শব্দচয়ন ১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে যে পত্র লেখেন তাহা গ্রন্থপরিচয়ে দ্রষ্টব্য। এই শব্দচয়ন প্রধানত মনিয়ের উইলিয়ম্‌স্‌-এর Sanskrit-English Dictionary হইতে সংকলিত। রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত ও চিহ্নিত এই অভিধান শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহভুক্ত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে একটি শব্দসংগ্রহের নোট-বুক আছে; যাহার সকল শব্দ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে গৃহীত হয় নাই। যে শব্দগুলি অসংকলিত থাকিয়া গিয়াছে ওই নোটবুক হইতে 'শব্দচয়ন ২'-এ তাহা সংকলিত হইল।

উক্ত নোটবুকের একটি প্রতিলিপিতে এই শব্দ ব্যবহারের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত বাক্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছিলেন 'শব্দচয়ন ২'-এর উপসংহারে সেগুলি সংকলিত হইল।

বিভিন্ন পত্রলেখকের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল প্রতিশব্দ রচনা করিয়াছেন তাহা বাংলা শব্দতত্ত্বের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে পরিভাষা-সংগ্রহ নামে সংকলিত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে শব্দচয়ন ৩-এ পূর্ব-সংকলিত পরিভাষাগুলি চিহ্নিত করা হইল, এবং তালিকাটিকে পূর্ণতর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে— এই তালিকাও সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করা যায় না। বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট বা সংকলিত যে-সব প্রতিশব্দ আছে তাহাও বিধৃত হইল। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনা ও চিঠিপত্র হইতে যথাসাধ্য সংকলন করা হইয়াছে। প্রতি ক্ষেত্রে যথাসম্ভব উৎস উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইল।

যে-সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত কোনো উল্লেখসহ বাংলা প্রতিশব্দ প্রয়োগ করেন নাই অথচ শব্দগুলি ইংরেজির প্রতিশব্দ বলিয়া অনুমান করা

যায় তাহা 'শব্দচয়ন ৪'-এ সংকলিত হইল। এই অনুমানের ক্ষেত্রে মতান্তর থাকিতেই পারে। ভবিষ্যতে বাংলা ভাষায় শব্দসৃষ্টির বিশদ কালানুক্রমিক আলোচনা করিয়া গবেষকগণ আরো নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন আশা করা যায়।

'শব্দচয়ন ৫' পর্যায়ে ইংরেজি idioms ও phrases-এর রবীন্দ্রনাথ-কৃত বাংলা অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে।

সর্বশেষ পর্যায়ে পরিহাসছলে কৃত প্রতিশব্দ সংকলিত হইয়াছে শব্দচয়ন ৬-এ।

শব্দচয়ন ১ ও ২ ভিন্ন অন্যান্য তালিকা প্রণয়নে মুখ্যত শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রণীত 'রবীন্দ্রশব্দকোষ' গ্রন্থের সহায়তা লওয়া হইয়াছে।

‘প্রাচীন-কাব্য সংগ্রহ’

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতির ন্যায় অমন একজন লোকপ্রিয় কবির পদসমূহ একত্রে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইল,[1] তাহার টীকা, অর্থ, পাঠ-বিভেদ ও (স্থানে স্থানে) ব্যাকরণের সূত্র বাহির হইল, তথাপি তাহা লইয়া একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল না, ইহা কেবল বাংলাদেশের জলবাতাসের গুণে। সম্পাদক শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার যথাসাধ্য যে কথার যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, যে শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পাঠকেরা কি একবার মনোযোগ করিয়া দেখিবেন না, যে, তাহা ব্যাকরণ-শুদ্ধ হইল কি না, সুকল্পনা-সংগত হইল কি না? সে বিষয়ে কি একেবারে মতভেদ হইতেই পারে না? পাঠকেরা কি সম্পাদকবর্গকে একেবারে অভ্রান্ত দেবতা বলিয়া জ্ঞান করেন, অথবা তাঁহাদের স্বদেশের প্রাচীন—আদি কবিদের প্রতি তাঁহাদের এতই অনুরাগের অভাব, এতই অনাদর যে, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার দেয় স্বরূপে যৎসামান্য শ্রম স্বীকার করিতেও পারেন না? বঙ্গভাষা যাঁহাদের নিকট নিজের অস্তিত্বের জন্য ঋণী, এমন-সকল পূজনীয় প্রাচীন কবিদিগের কবিতা-সকলের প্রতি যে-সে যেরূপ ব্যবহারই করুক-না, আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া চাহিয়া থাকিব? তাহারা কি আমাদের আদরের সামগ্রী নহে? যিনি এই-সকল কবিতার সম্পাদকতা করিতে চান তিনি নিজের স্কন্ধে একটি গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রতি পদে সাধারণের নিকটে হিসাব দিবার জন্য তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে পাঠক-সাধারণ নিশ্চেষ্ট, নিরীহ-প্রকৃতি, এবং সম্পাদকবর্গও নিজের দম্ভ পাকাইয়া পাকাইয়া একটা অপরিমিত উচ্চ আসন প্রস্তুত করিয়া তুলেন; সেখান হইতে পাঠক বলিয়া যে অতি ক্ষুদ্র-কায়া একদল প্রাণী কখনো কখনো তাঁহাদের নজরে পড়ে, তাহাদের জন্য অধিক ভাবনা করা তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন

---

১ ‘প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ’, অগ্রহায়ণ ১২৮১-৮৩ [ইং ১৮৭৪-৭৬] খণ্ডশঃ প্রকাশ ১। বিদ্যাপতি ২। চণ্ডীদাস ৩। গোবিন্দদাস ৪। রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ ৫। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল।

না। কবিদিগের কাব্য যিনি সংগ্রহ করেন, তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে যদি অসাবধানতা, অবহেলা, অমনোযোগ লক্ষিত হয়, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা অত্যন্ত গুরুতর তিনটি নালিশ আনিতে পারি— প্রথমত, কবিদের প্রতি তিনি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন; দ্বিতীয়ত, সাহিত্যের সহিত তিনি যে চুক্তি করিয়াছিলেন, সে চুক্তি রীতিমত পালন করেন নাই; তৃতীয়ত, পাঠক-সাধারণকে তিনি অপমান করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অথচ যথাযোগ্য আয়োজন করেন নাই; যথারীতি সম্ভাষণ করেন নাই; এতই কি তাহারা উপেক্ষার পাত্র? "অক্ষরের ভুল হইল হইলই, তাহাতে এমনি কী আসে যায়? অর্থবোধ হইতেছে না? একটা আন্দাজ করিয়া দেও না, কে অনুসন্ধান করিয়া দেখে?" পাঠকদের প্রতি এরূপ ব্যবহার কি সাহিত্য-আচারের বিরুদ্ধ নহে?

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিদ্যাপতি-রচিত পদাবলী পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়াছেন, অপ্রচলিত শব্দের ও দুরূহ শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে এরূপ উদ্যোগ সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে; অতএব এই উদ্যোগীদের আমরা নিরুৎসাহ করিতে চাহি না; ইঁহাদের চেষ্টা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। কেবল আমরা যথাসময়ে ইঁহাদের সাবধান করিয়া দিতে চাই। আধুনিক বঙ্গীয় পাঠকগণকে নিশ্চেষ্ট জানিয়া ইঁহারা যেন নিজ কাজে শৈথিল্য না করেন। ইঁহাদের পরিশ্রম ও উদ্যমের পুরস্কার হাতে হাতে যদি-বা না পান বঙ্গ-সাহিত্যকে ইঁহারা ঋণী করিয়া রাখিবেন, ও একদিন-না-একদিন সে ঋণ পরিশোধ হইবেই।

"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি, কোঽত্র দোষ" সে কথা সত্য বটে; কিন্তু আমাদের আলোচ্য পুস্তকের সম্পাদক নিরলস হইয়া যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন কি না আমাদের সন্দেহ। রসেটি শেলীর কবিতাসমূহের যে সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রতি কমা ও সেমিকোলনের উপর মাথা ঘুরাইয়াছেন; ইহাতে কবির প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও সাধারণের সমীপে তাঁহার কর্তব্য পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এরূপ তুলনা বৃথা। কোনো বিষয়েই যাহাদের সহিত মিলে না, একটা বিশেষ বিষয়ে তাহাদের সহিত তুলনা দিতে যাওয়ার অর্থ নাই। বঙ্গদেশ ইংলণ্ড নহে, এবং সকল লোকই রসেটি নহে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রাচীন কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া তাঁহার কৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা -সমূহ লইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এরূপ না করিলে কবিতা-সকলের যথার্থ মর্ম বাহির হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক ও আলোচনা উত্থাপন করা আবশ্যক।

প্রাচীন কবিতাবলীর টীকা প্রকাশের নানাবিধ দোষ থাকিতে পারে। ১. ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ অর্থ ব্যাখ্যা; ২. স্বভাব-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা; ৩. সহজ শ্লোকের প্যাঁচালো অর্থ ব্যাখ্যা; ৪. দুরূহ শ্লোক দেখিয়া মৌন থাকা; ৫. সংশয়ের স্থলে নিঃসংশয় ভাব দেখানো; ইত্যাদি। এই-সকল দোষ যদি বর্তমান পুস্তকে থাকে, তবে তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য-কার্য। বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে, ঈষৎ হউক, বা অধিক হউক, দুরূহ শ্লোক দেখিলে পাঠকদের সুবিধার জন্য আমরা তাহার অর্থ করিতে চেষ্টা করিব।

পুস্তকে নিবিষ্ট প্রথম গীতিতে কবি রাধিকার শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

নিরজন উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরি সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ উঘারয়ে অঙ্গ॥ পৃ. ২

সম্পাদক ইহার শেষ দুই চরণের এইরূপ টীকা করিতেছেন; "প্রথম বর্ষার মতো নূতন নূতন ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল। বদরি (হিন্দি) বর্ষা। নবরঙ্গ শব্দে নারাঙ্গালেবু অভিধানে থাকিলে এই চরণের অন্যরূপ অর্থ হয়। কিন্তু বদরি শব্দের বর্ষা অর্থও সুপ্রসিদ্ধ নহে।" "বর্ষার মতো ভাবভঙ্গী প্রকাশ করা" শুনিলেই কেমন কানে লাগে যে, অর্থটা টানাবোনা। নবরঙ্গ শব্দে নারাঙ্গালেবু অভিধানে থাকিলে কিরূপ অর্থ হয় তাহাও দেখা উচিত ছিল। "প্রথম বর্ষার মতো ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল" এরূপ অর্থ করিলে পুন শব্দের সার্থকতা কী থাকে? যাহা হউক, এ স্থানের অর্থ অতিশয় সহজ, কেবল উপরে উদ্‌ধৃত চারি চরণের মধ্যে শেষের দুই চরণকে প্রথম দুই চরণের সহিত পৃথক করিয়া পড়াতেই ইহার অর্থবোধে গোল পড়ে। নিম্নলিখিত অর্থটি সহজ বলিয়া বোধ হয়। "রাধা নির্জনে কতবার আপনার উরজ দেখেন,

আপনার পয়োধর দেখিয়া হাসেন। সে পয়োধর কিরূপ? না, প্রথমে বদরির (কুল) ন্যায় ও পরে নারাঙ্গার ন্যায়।" নবরঙ্গ শব্দের অর্থ নারাঙ্গা অভিধানে নাই। 'নাগরঙ্গ' ও 'নার্য্যঙ্গ' শব্দ নারাঙ্গা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু নবরঙ্গ শব্দের অর্থ নারাঙ্গা, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির আর-একটি পদ হইতে এই একই ভাবের দুইটি চরণ উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহাতে আমাদের কথা আরো স্পষ্ট হইবে।

পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ। পৃ. ২২০

৩-সংখ্যক পদে সম্পাদক

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥ পৃ. ৩

এই দুই চরণের অর্থ করিতেছেন: "খেলার সময় হউক বা না হউক লোক দেখিলে লজ্জিত হয় ও সহচরীগণের মধ্যে থাকিয়া একবার দৃষ্টি করে ও তখনি অপর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে।" "খেলত না খেলত" এবং "হেরত না হেরত" উভয়ের একই রূপ অর্থ হওয়াই সংগত বোধ হয়; উভয়ের বিভিন্ন অর্থ মনে লয় না। "খেলত না খেলত" অর্থে সম্পাদক কহিতেছেন "খেলার সময় হউক বা না হউক" অর্থাৎ খেলে বা না খেলে; তাহা যদি হয় তবে "হেরত না হেরত" শব্দের অর্থ "দেখে বা না দেখে" হওয়াই উচিত; কিন্তু তাহা হইলে কোনো অর্থই হয় না। ইহার অর্থ নিম্নলিখিত রূপ হওয়াই উচিত; "খেলে, খেলে না; লোক দেখিয়া লজ্জা হয়। সহচরীদের মধ্যে থাকিয়া দেখে, দেখে না।" অর্থাৎ খেলিতে খেলিতে খেলে না; দেখিতে দেখিতে দেখে না; ইহাই ব্যাকরণ-সম্মত ও অর্থ-সংগত।

নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙবি ভঙ্গি-বিলাস॥ সং ৭, পৃ. ৮

সম্পাদক "ভাঙবি' শব্দের অর্থ "প্রকাশ করিতেছে" লিখিয়াছেন। তিনি কহেন "ভাঙ[১] বিভঙ্গি-বিলাস এই পাঠ সংগত বোধ হয় না।" ব্যাকরণ ধরিতে

১ ভাঙ শব্দের অর্থ ভ্রূ।

গেলে 'ভাণ্ডবি' শব্দের অর্থ 'প্রকাশ করিতেছে' কোনোমতেই হয় না। 'বি' অন্ত ধাতু কোনোমতেই বর্তমান কাল-বাচক হইতে পারে না। বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীর মধ্যে কোথাও এমনতর দেখা যায় না। 'ভাণ্ডবি' অর্থে 'তুই প্রকাশ করিবি' হয়, অথবা স্ত্রীলিঙ্গ কর্তা থাকিলে 'সে প্রকাশ করিবে'ও হয়, কিন্তু বর্তমান কাল-বাচক ক্রিয়ায় 'বি' যোগ বিদ্যাপতির কোনো পদেই দৃষ্ট হয় না। এমন স্থলে 'ভাণ্ড বিভঙ্গি বিলাস' পাঠ কী কারণে অসংগত বুঝিতে পারা যায় না। রাধিকার নয়ন-নলিনীদ্বয় অঞ্জনে রঞ্জিত, এবং তাহার ভ্রূ বিভঙ্গি-বিলাস। অর্থাৎ বিভঙ্গিতেই তাহার ভ্রূর বিলাস। এ অর্থ আমাদের নিকট বেশ সুসংগত বোধ হইতেছে।

অলখিতে মোহে হেরি বিহসিতে থোরি।
জনু বয়ান বিরাজে চান্দ উজোরি॥
কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল॥ সং ৯, পৃ. ১০

সম্পাদক শেষ দুই চরণের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন : 'কুটিল কটাক্ষের শোভায় চারি দিক এমন শোভিত হইল যেন মধুকর ডামরে (মৌমাছির ঝাঁকে) আকাশ (অম্বর) আচ্ছন্ন হইল।' 'যেন' শব্দ কোথা হইতে পাইলেন, এবং 'আচ্ছন্ন' শব্দই বা কোথা হইতে জুটিল ? আমরা ইহার এইরূপ অর্থ করি— 'অলখিত ভাবে আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করাতে তাহার মুখ উজ্জ্বল চাঁদের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। মুখ যদি চাঁদ হইল, কটাক্ষ সে চাঁদের ছটা স্বরূপ হইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং মধুকরের ঝাঁক সে চাঁদের অম্বর অর্থাৎ আকাশ হইল। রাধার মুখের গন্ধে এত মধুকর আকৃষ্ট হইয়াছিল।' এই গীতেরই মধ্যে মধুপের কথা পুনশ্চ উল্লেখ করা হইয়াছে ; যথা—

লীলাকমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললু ধনি চকিত নেহারি॥ পৃ. ১১

অর্থাৎ 'লীলাকমলের দ্বারা ভ্রমরকে কিবা নিবারণ করিয়া, চকিতে চাহিয়া চমকিয়া ধনী চলিল।' ইহাতে কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে গৌরীর বর্ণনা মনে পড়ে—

ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিশ্বাস সৌরভে
বিম্ব অধরের কাছে বেড়ায় ঘুরিয়া,

চঞ্চল নয়ন পাতে উষা প্রতিক্ষণ
লীলা-শতদল নাড়ি দিতেছেন বাধা।

আমরা 'লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি' ইত্যাদি দুই চরণের যে অর্থ করিলাম সম্পাদকের টীকার সহিত তাহার ঐক্য হয় না। তাহাতে আছে— 'লীলা-কমলে স্থিত ভ্রমর বা বারিবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া চলিল।' এ অর্থ যে অসংগত, তাহা মনোযোগ করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে—

লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললু ধনি চকিতে নেহারি॥

'লীলা-কমল' ও 'চকিতে নেহারি' এতদূর ; এবং মাঝে 'চমকি চললু ধনি' এমন একটা ব্যবধান স্বরূপে পড়িয়াছে যে উহাকে একত্র করিতে গেলে অনেক টানাটানি করিতে হয় ও 'ন্যায়' নামক একটা যোজক পদার্থ ঘর হইতে তৈরি করিয়া আনিতে হয়। আমরা যে অর্থ দিয়াছি তাহা ইহা অপেক্ষা সহজ। 'বারি' শব্দের অর্থ নিবারণ করা অপ্রচলিত নহে। যথা—

'পুর-রমণীগণ রাখল বারি।' সং ১২৩, পৃ. ১০৩

অর্থাৎ পুর-রমণীগণ নিবারণ করিয়া রাখিল।

১১-সংখ্যক গীতে সম্পাদক,

'একে তনু গোরা, কনক-কটোরা
অতনু, কাঁচলা-উপাম।' পৃ. ১৩

এই দুই চরণের অর্থ করিতে পারেন নাই। তিনি কহিয়াছেন, 'এই চরণের অর্থগ্রহ হইল না।' আমরা ইহার এইরূপ অর্থ করি— 'তনু গৌরবর্ণ ; কনক কটোরা[১] (অর্থাৎ স্তন) অতনু অর্থাৎ বৃহৎ, এবং কাঁচলা-উপাম, অর্থাৎ ঠিক কাঁচলির মাপে।'[২]

১ কনক কটোরা অর্থে সোনার বাটি বুঝায়। বিদ্যাপতির অনেক স্থলে কনক-কটোরার সহিত স্তনের তুলনা দেওয়া হইয়াছে

২ —উ মা পরিমাণ করা। প্রকৃতিবাদ।

যব গোধূলি সময় বেলি,
ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরি-রেখা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি ॥

সং ১৬, পৃ. ১৭

সম্পাদক টীকা করিতেছেন : 'বিদ্যুৎ রেখার সহিত দ্বন্দ্ব (বিবাদ) বিস্তার করিয়া গেল। অর্থাৎ তাহার সমান বা অধিক লাবণ্যময়ী হইল।' 'সহিত' শব্দটি সম্পাদক কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন ? ইহার সহজ অর্থ এই—'রাধা গোধূলির ঈষৎ অন্ধকারে মন্দিরের বাহির হইলেন ; যেন নব জলধরে বিদ্যুৎ রেখা দ্বন্দ্ব বিস্তার করিয়া গেল।' ইহাই ব্যাকরণশুদ্ধ ও স্বভাব-সংগত অর্থ।

সম্পাদক ২০-সংখ্যক গীতের কোনো অর্থ দেন নাই। আমাদের মতে তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। সে গীতটি এই—

এ সখি কি পেখমু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ ॥
কমল যুগলপর চাঁদকি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল ॥
তাপর বেড়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা ॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি ॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কির থির করু বাস ॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তাপর সাপিনী ঝাঁপল মোড় ॥ পৃ. ২১

ইহাতে কৃষ্ণের শরীরের বর্ণনা হইতেছে। 'নখ চন্দ্রমালা শোভিত-পদকমল-দ্বয়ের উপরে তরুণ তমালবৎ কৃষ্ণের শরীর উঠিয়াছে। পীতাম্বর বিদ্যুতে তাঁহাকে বেড়িয়াছে।[১] সে তমাল তরুর শাখাশিখর, অর্থাৎ মুখ, সুধাকর। লাবণ্যই বোধ

১ অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীতবসন পরা সৌদামিনী সেহ। সং ১৮, পৃ. ২০

করি অরুণ ভাতির পল্লব। ওষ্ঠাধর বিম্বফলদ্বয়। তাহার উপর কিরণ অর্থাৎ হাস্য স্থির বাস করে। নেত্র খঞ্জন। কুন্তল, সাপিনী।'

অন্ধকার রাত্রে রাধিকা অভিসার উদ্দেশে বাহির হইয়াছেন, কৃষ্ণ বিঘ্ন আশঙ্কা করিতেছেন।

গগন সঘন, মহী পঙ্কা ;
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা
দশদিশ ঘন আন্ধিয়ারা ;
চলইতে খলই, লখই নাহি পারা।
সব যোনি পালটি ভুললি
আওত মানবি ভানত লোলি।

সং ৩৪, পৃ. ৩৪

সম্পাদক শেষ দুই চরণের অর্থ নিম্নলিখিতরূপে করিতেছেন: 'শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার অনুপস্থিতিতেও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন 'লোলে, (লোলি) তুমি যদি (নিরাপদে) উপস্থিত হও (আওত) তাহা হইলে আমি মনে মনে করিব (মানবি) যে, সকল জীবকে (যোনি) দৃষ্টিপাত দ্বারা (পালটি) তোমার প্রভায় নত করিয়া (ভানত) ভুলাইয়াছে (ভুললি)।' এইরূপ অর্থ কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা অন্য কোনো সুলভ অর্থ বা পাঠ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।' সম্পাদক স্বীকার করিয়াছেন উপরি-উদ্‌ধৃত অর্থটি কষ্টসাধ্য। আমরা কহিতেছি, উহা ব্যাকরণ-সংগতও নহে। 'ভুললি' অর্থে 'ভুলাইয়াছ' হয় না, উহার অর্থ ভুলিলি, অথবা স্ত্রীলিঙ্গ কর্তার সহিত যুক্ত হইলে, ভুলিল। 'মানবি' শব্দের অর্থ 'মনে করিব' নহে, 'মনে করিবি' হইতে পারে ; বিশেষত উহার কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ নহে। আমরা উপরি-উক্ত দুই চরণের এইরূপ অর্থ করি: 'আওত মানবী, ভানত লোলি। ভানত[1] অর্থাৎ ভাবের দ্বারা লোলা, চঞ্চলা মানবী আসিতেছেন। সব যোনি পালটি ভুললি। সকল প্রাণীকে দেখিতে ভুলিলেন। এত অধীরা যে, কাহারো প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছেন না।'

১ চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল ভাণ। পৃ. ৩
অর্থাৎ চরণ চঞ্চল এবং চিত্তেরও চঞ্চল ভাব। 'ভাণ' অর্থে ভাব।

রাধিকা শ্যামকে ভর্ৎসনা করিয়া দূতী পাঠাইতেছেন। দূতীকে কহিতেছেন ;

যো পুন সহচরি, হোয় মতিমান্।
করয়ে পিশুন-বচন অবধান ॥

সং ৭০, পৃ. ৬২

সম্পাদক টীকা করিতেছেন 'কাকের কথাতেই মনঃসংযোগ করেন!' এ টীকার টীকা কে করিবে? অনেক অনেক মতিমান্ দেখিয়াছি, তাঁহারা কাকের কথায় কিছুমাত্র মনোযোগ দেন না। টীকাকার মহাশয় নিজে কী করেন? যাহা হউক, এমন মতিমান্ যদি কেহ থাকেন যিনি কেবলমাত্র কাকের কথাতেই মনঃসংযোগ না করেন, এক-আধবার আমাদের কথাও তাঁহার কানে পৌঁছায়, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া এ রহস্য কি আমাদের বুঝাইয়া দিবেন?' বলা বাহুল্য, ইহার অর্থ— 'যাঁহারা মতিমান্ তাঁহারা পিশুন-বচন অর্থাৎ নিন্দাবাক্যও অবধান করেন।'

রাধিকা অভিমানভরে কহিতেছেন ;

'কুজনক পীরিতি মরণ-অধীন।' সং ৮৫, পৃ. ৭৪

এই অতি সহজ চরণটির টীকায় সম্পাদক কহেন— 'কুজনের সহিত প্রীতি করিয়া এক্ষণে মরণের বশতাপন্ন হইলাম অথবা কুজনের প্রেম মরণাপেক্ষাও মন্দ।' এত কথা সম্পাদক কোথায় পাইলেন? ইহার অতি সহজ

'কুজনের প্রীতি মরণের অধীন, অর্থাৎ অধিক দিন বাঁচে না।'

পুস্তকের এক এক স্থান এমন দুর্বোধ যে, আমাদের সন্দেহ হয়, যে, হয় মূলের হস্তলিপিতে নয় ছাপিতে ছাপার ভুল হইয়া থাকিবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই,

হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাদ,
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ ॥

সং ৮৬, পৃ. ৭৫

সম্পাদক ইহার টীকা দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু আমরা ইহার অর্থ খুঁজিয়া পাই না। ইহার ঠিক অর্থ এই— 'হরিণী কুটুম্ব-বিবাদ উত্তম রূপ জানে তথাপি ব্যাধের গান শুনিতে তাহার সাধ।' এখানে 'কুটুম্ব-বিবাদ' কথাটার কেন ব্যবহার হইল, তাহা কি পাঠকেরা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন?

আমাদের বোধ হয় যে, উহা 'কুটিল নিষাদ' হইবে। অথবা কূট (অর্থাৎ ফাঁদ) শব্দজ একটা কিছু শব্দ ছিল, তাহাই ভ্রমক্রমে 'কুটুম্ব' শব্দে পরিণত হইয়াছে, এবং 'বিবাদ' শব্দ বোধ করি, 'নিষাদ' হইবে। আর-একটি অক্ষর-ভুলের উদাহরণ তুলিয়া দিই—

হরি যদি ফেরি পুছসি ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে নিবেদন জানাওবি সোয়॥
যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জানয়বি হৃদয়ে জনু লাগ॥

সং ৯১, পৃ. ৭৮

বিরহিণী রাধিকা কৃষ্ণের নিকট দূতী পাঠাইতেছেন। পাছে অপমান হইতে হয় এইজন্য প্রথমে ইঙ্গিতে কৃষ্ণের মনের ভাব বুঝিতে দূতীকে অনুরোধ করিতেছেন। রাধিকার ইচ্ছা, তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ লক্ষিত হইলে তবেই যেন মুখ ফুটিয়া সমস্ত নিবেদন করা হয়। সমস্ত গীতটির এই ভাব। উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকের চতুর্থ চরণটি বুঝা যায় না। কিন্তু 'জানয়বি' শব্দ যদি 'জানাওবি' হয় তবে এইরূপ অর্থ হয়— যখনি চিত্তে বড়ো অনুরাগ দেখিবি, তখনি জানাবি; হৃদয়ে যাহাতে লাগে। অর্থাৎ সেই সময় জানাইলেই হৃদয়ে লাগিবে।

রাধিকা ছল করিয়া সখীদের কহিতেছেন— কাল ঘুমাইয়াছিলাম, এমন সময় এক পুরুষ আসিলেন, তাঁহার অরুণ আঁখি ও লোহিত অধর দেখিয়া ভয়ে আমার কেশপাশ বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, কপালে কাজল ও মুখে সিন্দুর লাগিল।

এক পুরুখ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চির (চীর ?) আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল।

সং ১০৭, পৃ. ৯৩

সম্পাদক টীকা করিতেছেন 'সেই ভয়ে চিকুর (বিদ্যুৎ) চির (দীর্ঘকালের জন্য) অন্যত্র গমন করিল।' এ টীকার কি কোনো অর্থ আছে ? কোনো কথা নাই, বার্তা নাই, এমন সময় সহসা বিনামেঘে একটা বিদ্যুৎ খেলাইয়া যাইবে কেন, আমরা ভাবিয়া পাই না। চিকুর অর্থে কেশ। রাধিকা বলিতেছেন,

সেই পুরুষের ভয়ে তাঁহার চিকুর ও চীর অন্যত্র গেল ; এবং বেশভূষার বিপর্যয় হইল।[১]

হিম হিমকর-কর তাপে তাপায়লু
ভৈগেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক মুখে নাহি সম্বাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত।

সং ১২৮, পৃ. ২০৬

শীতল চন্দ্রের কিরণও আমাকে তাপিত করিল, বসন্ত আমার কাল হইল। কান্ত কাহারো মুখে সংবাদ লইলেন না, দুরন্ত মদন কী যে করিতেছে। সম্পাদক টীকা করিয়াছেন 'কান্ত কাকমুখেও সংবাদ পাঠাইলেন না, আমি এই দুরন্ত মদনে কি করিব ?' কাকের সহিত সম্পাদকের বিশেষ সখ্য দেখা যাইতেছে। তিনি কাককে প্রেমের দূত এবং মতিমান্ লোকদের মন্ত্রী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাকের বরঞ্চ বুদ্ধিমান বলিয়া একটা খ্যাতি আছে, কিন্তু প্রেমিক বলিয়া তাহার যশ আজ পর্যন্ত শুনা যায় নাই। হিন্দুস্থানীতে 'ক' বিভক্তি ষষ্ঠীতে ব্যবহার হয়, অতএব 'কাক' শব্দের অর্থ কাহার।

মাধব অবলা পেখনু মতিহীনা।
সারঙ্গ শবদে মদন স কোপিত
তেঞ দিনে দিনে অতি ক্ষীণা॥

সং ১৪৯, পৃ. ১২৪

টীকা উদ্ধৃত করি। 'সারঙ্গ শবদে—হরিণের শব্দ শুনিলে' হরিণের শব্দ শুনিলেও মদন প্রকুপিত হন মদনের এমন স্বভাব কোনো শাস্ত্রে লেখে না। সারঙ্গ শব্দের অর্থ যখন ভ্রমর হয়, কোকিল হয়, মেঘ হয়, ময়ূর হয়, তখন মদনকে রাগাইবার জন্য হরিণকে ডাকিবার আবশ্যক ?

দক্ষি পবন বহে কৈছে যুবতী সহে,
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পারাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ॥

১ মলিনচিকুর তমুটীরে। সং ১৩৯, পৃ. ১৬

সম্পাদক কহিতেছেন—'ইহার সম্যক অর্থগ্রহ হয় না।' চতুর্থ চরণটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য সন্দেহ নাই। ইহার অর্থ এমন হইতে পারে যে, 'শিবের ভূষণ ভুজঙ্গকে মদন বিশেষরূপে ডরান, এই নিমিত্ত বিরহিণী নখে ভুজঙ্গ আঁকিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া প্রাণকে আশা দিয়া রাখিতেছেন।' রাধিকার পক্ষে ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে, কারণ ইতিপূর্বে তিনি রাহু আঁকিয়া বিরহিণীর ভীতিস্বরূপ চাঁদকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া গেলে পর দূতী তাঁহার নিকটে গিয়া ব্রজ-বিরহিণীদের দুরবস্থা নিবেদন করিতেছেন।

তোহারি মুরলী সো দিগে ছোড়লি
ঝামরু ঝামরু দেহা।
জনু সে সোনারে কোষিক পাথরে
ভেজল কনক-রেহা।

সং ১৬১, পৃ ১৩

সম্পাদক প্রথম দুই চরণের অর্থ স্থির করিতে পারেন নাই। ইহার অর্থ—'তোমার মুরলী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল (ছোড়লি; স্ত্রীলিঙ্গেই) ও তাহাদের দেহ শীর্ণ মলিন হইয়া আইল।' ঝামরু শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে পরে কহিব।

বড় অপরূপ দেখিনু সজনি
নয়লি কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্রনীল মনি কেতকে জড়িত
হিয়ার উপরে সাজে।

সম্পাদক 'কেতক' শব্দের অর্থ নির্মলী বৃক্ষ স্থির করিয়া বলিয়াছেন, 'কিরূপ উপমা হইল বুঝিতে পারিলাম না।' কেতক শব্দে কেয়া ফুল বুঝিতে বাধা কি? রাধা শ্যাম একত্র রহিয়াছেন যেন কেয়াফুলে ইন্দ্রনীল মণি জড়িত রহিয়াছে।

পুস্তকের মধ্যে ছোটো ছোটো অনেকগুলি অসাবধানতা লক্ষিত হয়। তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা আবশ্যক। আমাদের মতে এরূপ প্রাচীন কবিতাসমূহ সংগ্রহ করিতে গেলে নিতান্ত সাবধানতার সহিত যথাসম্ভব নিখুঁত করিয়া তোলা উচিত, তিল পরিমাণ দোষ না থাকে যেন।

'কিয়ে' শব্দের অর্থ 'কি'। কি শব্দ বাংলায় অনেক অর্থে ব্যবহার হয়।

জিজ্ঞাসার স্থলে, আশ্চর্যের স্থলে, যেমন— কি সুন্দর! এবং কিংবা অর্থেও প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রাচীন কবিতাতেও 'কিয়ে' শব্দের ঐ কয়টি অর্থ। সম্পাদক মহাশয় স্থানে স্থানে উলটাপালটা করিয়া একটার জায়গায় আর একটা বসাইয়াছেন। দেখিলাম তিনি জিজ্ঞাসাসূচক 'কি' শব্দের উপর নিতান্ত নারাজ।

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার,
মধুমাতল কিয়ে উড়ই না পার? সং ৩, পৃ. ৪

অর্থাৎ, তাঁহার লোচন স্থিরভৃঙ্গের ন্যায়; মধুমত্ত হইয়া সে কি উড়িতে পারিতেছে না? সম্পাদক কহেন 'যেন মধুমত্ত হইয়া উড়িতে অক্ষম।'

দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর?

নিদারুণ ঈষৎ বঙ্কিম দৃষ্টি কি আমার কাল হইয়াই উৎপন্ন হইল? সম্পাদক কহেন 'কি বা আমার কালস্বরূপ হইয়া উপস্থিত হইল!' ইহা অত্যন্ত হাস্যজনক।

চিকুরে গলয়ে জলধারা
মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা?

এখানে 'মুখশশির ভয়ে আঁধার কি বা রোদন করিতেছে!' অর্থ করা অপেক্ষা 'মুখশশির ভয়ে কি আঁধার রোদন করিতেছে?' বলিলেই কানে ভালো শুনায়।

সম্পাদক 'কহসি' শব্দের এইরূপ টীকা করিয়াছেন—'কহে (সি সংস্কৃত বিভক্তি)।' এ কেমন কথা বুঝিতে পারিলাম না। 'কহে' তৃতীয় পুরুষ, কিন্তু সংস্কৃতে দ্বিতীয় পুরুষ নহিলে 'সি' বিভক্তি হয় না। সম্পাদক এত স্থলে সি-অন্ত ধাতুর ভ্রমাত্মক অর্থ দিয়াছেন যে, উদ্‌ধৃত করিতে প্রবন্ধের কলেবর বাড়িয়া যায়।

চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব॥ সং ৮, পৃ. ১০

সম্পাদক 'যাব' শব্দের অর্থ বিশেষ করিয়া 'যায়' বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহা ভবিষ্যৎকাল-বাচক-ক্রিয়া, ইহার অর্থ 'যায়' হইতে পারে না। ইহার অর্থ 'চলিতে চাহিতেছে তথাপি পা চলিবে না।'

'ঝামর' শব্দে সম্পাদক মেঘ কহিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত পুস্তকের মধ্যে কোথাও ঝামর শব্দ মেঘ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; অথচ পদাবলীর মধ্যে পঞ্চাশ জায়গায় মেঘের উল্লেখ আছে।

কহ সখি সাঙরি ঝামরি দেহা ॥ সং ৫৪, পৃ. ৫০

এবে ভেল বিপরীত, ঝামর দেহা ॥ সং ১৪৭, পৃ. ১২৩

পুনমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনু

ঝামর চম্পক দামে ॥ সং ১৪৯, পৃ. ১২৪

তোহারি মুরলী সোদিগে ছোড়লি

ঝামরু ঝামরু দেহা ॥ সং ১৬১, পৃ. ১৩৩

কুবলয়-নীল বরণ তনু সাঙরি

ঝামরি, পিউ পিউ ভাষ ॥ সং ২১৪, পৃ. ১৭৭

সর্বত্রই ঝামর অর্থ শুষ্ক মলিন শব্দে উক্ত হইয়াছে। এক স্থলে শ্যামের কেশ বর্ণনায় ঝামর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সে স্থলে তাহার অর্থ কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে। সম্পাদক যদি এই পুস্তক ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়া থাকেন যে, ঝামর অর্থে মেঘ, তাহা হইলে আমাদের আর অধিক বক্তব্য থাকে না।

'আশ নিগড় করি জীউ কত রাখব

অবহ যে করত পয়াণ !'

সম্পাদক 'নিগড়' অর্থে 'গড়বন্দী করা' লিখিয়াছেন। সকলেই জানেন নিগড় অর্থ শৃঙ্খল। যাহা হউক, এরূপ ভুল তেমন মারাত্মক নহে; যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহাদের ইহাতে হানি হইবে না।

সমস্ত পুস্তকের মধ্যে এত অসাবধানতা, এত ভ্রম লক্ষিত হয়, যে, কিয়দ্দূর পাঠ করিয়াই সম্পাদকের প্রতি বিশ্বাস চলিয়া যায়। ইহার সমস্ত ভ্রম যে কেবল সম্পাদকের অক্ষমতা বশত ঘটিয়াছে তাহা নহে, ইহার অনেকগুলি তাঁহার অসাবধানতা বশত ঘটিয়াছে। এমন-কি, স্থানে স্থানে তিনি অভিধান খুলিয়া অর্থ দেখিবার পরিশ্রমটুকুও স্বীকার করেন নাই। এত অবহেলা এত আলস্য যেখানে, সেখানে এ কাজের ভার গ্রহণ না করিলেই ভালো হইত। আমাদের দেশে পাঠকেরা তেমন কড়াক্কড় নহেন বলিয়া তাঁহাদিগকে বিপথে চালন করিয়া লইয়া যাওয়া নিতান্ত অনুচিত। সম্পাদকের প্রশংসনীয় উদ্যোগ সত্ত্বেও আমরা তাঁহাকে যে এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ বিদ্যাপতির কবিতা আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী, এবং পাঠকসাধারণকে আমরা উপেক্ষণীয় মনে করি না। আমরা এই প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহের উদ্যোগকে উৎসাহ দিই। আমাদের ইচ্ছা,

কোনো নিরলস, উৎসাহী ও কাব্যপ্রিয় সম্পাদক পুনশ্চ এই কার্যের ভার গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিদ্যাপতির উপরেই প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তাহাতে যে-সকল ভ্রম আছে তাহা অনেকটা মার্জনা করা যায়; এখন আশা করি, এ বিষয়ে তাঁহার হাত অনেকটা পাকিয়া আসিয়াছে; অতএব অধিকতর মনোযোগ সহকারে এই দেশহিতকর কার্য তিনি যেন সুচারুতর রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

শ্রাবণ ১২৮৮

উত্তর-প্রত্যুত্তর

উত্তর। বিগত শ্রাবণের ভারতীতে লিখিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ করিলাম। পাঠান্তে মনোমধ্যে হর্ষ ও বিষাদ উভয়ই উদয় হইল। হর্ষের কারণ প্রস্তাব-লেখক মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার -কর্তৃক সম্পাদিত, বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করিয়াছেন। এবং টীকাতে যে সমুদায় ভুল আছে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তিনি দুরূহ পদসমূহেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার কৃত ব্যাখ্যা অনেক স্থলে বিশদ হইয়াছে। যে জাতির যে কাব্যের যত প্রকার ব্যাখ্যা হয় সেই জাতির সেই কাব্যের তত গৌরবের কথা। এক-একখানি সংস্কৃত কাব্যের এক-একটি পদের নানা প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে— ইহা সংস্কৃত ভাষার গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। মিল্‌টনে প্যারেডাইস লস্টের অসংখ্য ব্যাখ্যা আছে— প্যারেডাইস লস্ট ইংরাজি ভাষার অমূল্য রত্ন। বিদ্যাপতির এক-একটি পদের নানা প্রকার অর্থ হওয়া আনন্দের কথা। কিন্তু তাঁহার কৃত পদাবলী পাঠ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অর্থ করেন, এরূপ পাঠক বা লেখক-সংখ্যা বঙ্গদেশে অল্প— সাধারণত বঙ্গবাসী এ প্রকার কষ্টকর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয়েন না। সেইজন্য ভারতীর প্রাচীন কাব্য সম্বন্ধীয় প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমাদের এত হর্ষ হইয়াছে। আমাদিগের বিষাদের কারণ এই, যে, প্রস্তাব-লেখক মহাশয় নিরপেক্ষভাবে প্রচীন কাব্য সংগ্রহের সমালোচনা করেন নাই। তিনি অনেক স্থানে সম্পাদকের অযথা নিন্দা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

কোনো ব্যক্তি কোনো পুস্তকের টীকা করিবার পূর্বে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন না, যে, তিনি যাহা লিখিবেন তাহাই নির্ভুল হইবে। আমরা যত দূর কাব্য-সংগ্রহ পাঠ করিয়াছি তাহার কোনো স্থানেই সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এ প্রকার প্রতিজ্ঞা করেন নাই, সুতরাং চুক্তিভঙ্গের নালিশ তাঁহার উপর চলে না। কবিদিগের প্রতি অবিচার করার দাবিও করা যাইতে পারে না। কারণ কবিদিগের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকিলে সম্পাদক এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন কি না সন্দেহ। আমাদের বোধ হয় সাধারণ পাঠকবর্গ সম্পাদক যাহা-কিছু লিখিয়াছেন, তাহাই ভুল-শূন্য এ প্রত্যাশা করিয়া প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন না; সুতরাং তাঁহারা উক্ত পুস্তকমধ্যে স্থানে স্থানে ভুল ব্যাখ্যা দেখিলে বোধ হয়, বিস্মিত হয়েন না।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার অকাতরে পরিশ্রম করিয়া, মহাজন পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন। দুরূহ শব্দের অর্থ করিয়াছেন; এমন-কি, লুপ্ত-প্রায় পদাবলী সমূহকে মনোহর বেশভূষায় ভূষিত করিয়া, সাহিত্যজগতে আনয়নপূর্বক সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। প্রবন্ধে লেখক-মহাশয় লিখিয়াছেন, যে, তিনি তজ্জন্য সম্পাদককে উৎসাহ দিলেন। কিন্তু কিরূপে যে তিনি উৎসাহ দিলেন, তাহা আমাদিগের বোধগম্য হইল না। বরং তিনি প্রকারান্তরে সম্পাদককে অলস অমনোযোগী প্রভৃতি বলিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভাবে বোধ হইল, যে, সম্পাদকের নিন্দা করিবার অভিপ্রায়েই তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।[১]

তৎকর্তৃক-সম্পাদিত পদাবলীর গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। নতুবা সম্পাদককে লজ্জিত করিবার জন্য এত চেষ্টা কেন? তাঁহার প্রতি এত তীব্র বিদ্রূপ নিক্ষেপ কেন? আমরা বলিয়াছি প্রবন্ধ-লেখক অনেক স্থানে সম্পাদকের অযথা নিন্দা করিয়াছেন, যাহা স্পষ্ট ভুল নহে তাহাকে ভুল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এক্ষণে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইব যে আমাদের কথা সত্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'অলখিতে মোহে হেরি বিহসিতে থোরি।
জনু বয়ান বিরাজে চাঁদ উজোরি।

১ সুরুচি-সম্পন্ন পাঠকদিগের নিকট এ কথাটার উত্তর দিবার আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। লেঃ—

কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল ॥'

এই শ্লোকের শেষ ছত্রে সম্পাদক 'যেন' শব্দ কোথা হইতে পাইলেন এবং 'আচ্ছন্ন' শব্দই বা কোথা হইতে জুটিল ? কোনো পদের অনুবাদ করা এক কথা, আর ব্যাখ্যা করা আর-এক কথা। অনুবাদ করিতে হইলে নিজ হইতে শব্দ দেওয়ার সকল সময়ে প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু ব্যাখ্যা করিতে হইলে অনেক সময়ে নূতন শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়; অন্যথা সকল স্থানে ব্যাখ্যা সরল হয় না। পাঠকেরাও উত্তম রূপ বুঝিতে পারেন না। উপরে উদ্ধৃত পদটিতে একটি উৎপ্রেক্ষা অলংকার আছে সুতরাং 'যেন' শব্দ প্রয়োগ করিয়া সম্পাদক কোনো দোষ করেন নাই। অনেক কৃতবিদ্য সুপণ্ডিত ব্যক্তি সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে নিজ হইতে অনেক শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন। উদাহরণ—

'বশিষ্ঠ ধেনোরনুযায়িনস্তং
আবর্তমানং বনিতা বনান্তাৎ।
পপৌ নিমেষালস পক্ষ্ম পঙ্‌ক্তি
রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্।'

রঘুবংশ। দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ, ১৯ শ্লোক

পণ্ডিত নবীনচন্দ্র ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'রাজ্ঞী সুদক্ষিণা বন হইতে প্রত্যাগত বশিষ্ঠ ধেনুর অনুযায়ী রাজাকে নির্নিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্থির নিশ্চল দৃষ্টি দেখিয়া বোধ হইল যেন, তাঁহার লোচন যুগল বহুকাল উপোষিত থাকিয়া অতি তৃষ্ণার সহিত রাজার সৌন্দর্য পান করিতেছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে 'অতি তৃষ্ণার সহিত রাজার সৌন্দর্য পান' কোথা হইতে আসিল? আর একজন পণ্ডিত ইহার টীকা করিয়াছেন, 'পতি বশিষ্ঠ ধেনুর অনুচর হইয়া বন হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন দেখিয়া রাজ্ঞী অনিমিষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন, তাঁহার নয়ন যুগল এতক্ষণ উপবাসী ছিল এখন তদীয় সৌন্দর্য সুধা পান করিতেছে।' 'সৌন্দর্য সুধা' কোথা হইতে আসিল? বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার টীকা করিতে যাইয়া দুই-একটি নিজের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া আমাদের

প্রবন্ধ লেখক তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু এ-সকল টীকা পাঠ করিয়া তিনি কি বলিবেন বলিতে পারি না।

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রত্যুত্তর— অর্থ ব্যাখ্যা করা এক, আর অর্থ তৈরি করা এক। অর্থ সহজ করিবার জন্য তাহাতে নূতন কথা যোগ করা কিছু মন্দ কাজ নহে, কিন্তু মূলে যে কথা নাই সেই কথা যোগ করিয়া অর্থ গড়িয়া তোলা দোষের নহে তো কী? লেখক আবার পাছে ভুল বুঝেন এই নিমিত্ত স্পষ্ট করিয়া উদাহরণ দিয়া বলিতে হইল। মনে করুন, 'সময় বসন্ত, কান্ত রহুঁ দূরদেশ' এই ছত্রটির অর্থ বুঝাইতে গিয়া আমি যদি বলি, 'বসন্তের ন্যায় এমন সুখের সময়ে, প্রাণের অপেক্ষা যাহাকে ভালোবাসি, সে কান্ত দূরদেশে রহিয়াছেন', তাহাতে দোষ পড়ে না; যদিও কথা বাড়াইলাম তথাপি কবির ভাবের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু আমি যদি বলি 'বসন্ত অতিক্রম করিয়া গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িল, তথাপি আমার কান্ত দূরদেশে রহিয়াছেন' তাহা হইলে অতিরিক্ত কথা ব্যবহারের জন্য আমি দোষী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রস্তাব-লেখক

উত্তর— 'লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি
চমকি চললু ধনি চকিত নেহারি।'

লেখক লিখিয়াছেন 'লীলা-কমলের দ্বারা ভ্রমরকে নিবারণ' ইত্যাদি। আমাদের বিবেচনায় সম্পাদকের অর্থই বিশদ হইয়াছে। রাধিকার হস্তে লীলা-কমল কোথা হইতে আসিল? তিনি কি ভ্রমর তাড়াইবার জন্য লীলা-কমল হস্তে করিয়া বেড়াইতেন? সম্পাদক 'ন্যায়' 'সহিত' প্রভৃতি শব্দ ঘর হইতে দেওয়ায় যে মহাপাতক সঞ্চয় করেন নাই তাহা উপরে বলিয়াছি।

শ্রীযোঃ নাঃ রাঃ

প্রত্যুত্তর— 'লীলা-কমল' কোথা হইতে আসিল? তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে তাহা আনাইতে কবির এক ফোঁটার অধিক কালি খরচ হইয়াছিল কি না সন্দেহ। চণ্ডীদাসের এক স্থানে আছে— 'চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি, পরাণ সহিতে মোর।' লেখক তো জিজ্ঞাসা করিতে

পারেন, 'নীল শাড়ি কোথা হইতে আসিল ? ঢাকা হইতে না বারাণসী হইতে ?' চণ্ডীদাসের সেটা লেখা উচিত ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বিষয়ে চণ্ডীদাসের হইয়া একটা কথা বলা যায়। এ পর্যন্ত অনেক কবি নীল শাড়ি ও লীলাকমলের অপেক্ষাও অনেক দামী দুষ্প্রাপ্য জিনিস কাব্যে আনিয়াছেন, কিন্তু কোন্ দোকান হইতে আনাইয়াছেন, পাঠকদের উপকারার্থ তাহা লিখিয়া দেন নাই। সংস্কৃত কাব্যে সহস্র স্থানে লীলা-কমলের দ্বারা ভ্রমর তাড়াইবার উল্লেখ আছে।

শ্রীর:

উত্তর—

'যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরী-রেখা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি।'

এ পদের সম্পাদকীয় টীকাই আমাদের মতে পরিষ্কার ও ভাব-ব্যঞ্জক হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক যে অর্থ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, 'রাধা গোধূলির ঈষৎ অন্ধকারে মন্দিরের বাহির হইলেন। যেন নব জলধরে বিদ্যুৎ রেখা দ্বন্দ্ব বিস্তার করিয়া গেল।' 'দ্বন্দ্ব' শব্দের এখানে অর্থ কি ? কাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া গেল ? সম্পাদক এই স্থানে 'পুন' শব্দ পরিত্যাগ করায় ও 'যেন' শব্দ নিজ গৃহ হইতে দেওয়ায় প্রবন্ধ লেখক তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে 'যেন' ঘর হইতে দিয়াছেন এবং দ্বন্দ্ব কথাটির যথোচিত সম্মান রক্ষা করেন নাই ! অন্যকে যে জন্য নিন্দা করিলাম নিজে সেই কার্যটি করিলে গভীর বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না।

শ্রীযো:

প্রত্যুত্তর— সম্পাদকীয় টীকা উদ্ধৃত করি— 'বিদ্যুৎ-রেখার সহিত দ্বন্দ্ব বিস্তার করিয়া গেল। অর্থাৎ তাহার সমান বা অধিক লাবণ্যময়ী হইল।' এখানে 'সহিত' শব্দ যোজনা করা যে নিতান্ত জোর-জবরদস্তির কাজ হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আমার অর্থ এই যে— অন্ধকারের কৃষ্ণবর্ণ ও রাধিকার গৌরবর্ণ মিলিয়া কেমন হইল, যেমন নবজলধরের সহিত বিদ্যুৎ-রেখার বিবাদ বিস্তৃত হইল। যদি বলি 'ঈশ্বরে আমি প্রীতি স্থাপন করিলাম' তাহা হইলে বুঝায়, ঈশ্বরের সহিত আমি প্রীতি করিলাম; তেমনি 'জলধরে

বিদ্যুৎ বিবাদ বিস্তার করিল' অর্থে বুঝায়, জলধরের সহিত বিদ্যুৎ বিবাদ করিল।

শ্রীরঃ

উত্তর—

'এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥
...
শাখা-শিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব পল্লবে অরুণক ভাতি॥
...
তা পর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তা পর সাপিনী ঝাঁপল মোড়॥'

২০-সংখ্যক গীত

প্রবন্ধ-লেখক ইহার মধ্যস্থ দুই চরণের এই অর্থ দিয়াছেন। 'সে তমাল তরুর শাখা শিখর অর্থাৎ মুখ, সুধাকর। লাবণ্যই বোধ করি অরুণ ভাতির পল্লবে।' পাঁতি শব্দটি কোথায় গেল? 'লাবণ্যই বোধ করি—' ইত্যাদি এই ছত্রের অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীযোঃ

প্রত্যুত্তর— 'বোধ করি' শব্দ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য এই যে, যেখানে অর্থ বোধে মনে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে সেখানে আমি অসংকুচিত ও অসন্দিগ্ধ ভাব দেখাইতে পারি না। এ অপরাধের যদি কোনো শাস্তি থাকে, তবে তাহা বহন করিতে রাজি আছি।

শ্রীরঃ

উত্তর— আর 'হাস্য স্থির বাস করে' কিরূপ বাংলা? শ্রীকৃষ্ণের কুন্তল সাপিনীর ন্যায়ই বা কি প্রকারে হইল? শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার কথাই শুনিয়াছি। আমরা যে ব্যক্তির নিকট এই গীতটির ব্যাখ্যা শুনিয়াছি তিনি ইহার আদিরস-ঘটিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সম্ভবত সেইজন্যই ইহার অর্থ করেন নাই।

শ্রীযোঃ

প্রত্যুত্তর— শ্রীকৃষ্ণের শরীর বর্ণনা করা ভিন্ন অন্য কোনো প্রকার গূঢ়-

আদিরস ঘটিত অর্থ বুঝানো কবির অভিপ্রেত ছিল, তাহা আমি কোনো মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। 'চঞ্চল খঞ্জন' 'যুগল বিম্বফল' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ দেখিয়া রূপ-বর্ণনা বলিয়াই স্পষ্ট অনুমান হইতেছে।

শ্রীর:

উত্তর—

'গগন সঘন, মহী পঙ্কা
বিঘিনি বিথারিত ইত্যাদি।'

এই পদে দুই-একটি ছাপার ভুল আছে। 'ভুললি' স্থানে 'ভুলালি' ও 'মানবি' স্থানে 'মানব' হইবে। তাহা হইলেই সম্পাদকের অর্থ থাকিয়া যাইবে। আশ্চর্যের বিষয়, যে, প্রবন্ধ-লেখক একটু চিন্তা করিয়া দেখেন নাই, সম্পাদক এ অর্থ দিলেন কেন। একেবারে সম্পাদকের অর্থকে ভুল বলিয়াছেন; ইহাতে তাঁহার কতদূর বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তাহা তিনিই বিবেচনা করুন।

শ্রীযো:

প্রত্যুত্তর— আশ্চর্যের বিষয় যে প্রবন্ধ-লেখক একটু চিন্তা করিয়া দেখেন নাই, যে, মূলে ও টীকায় উভয় স্থলেই অবিকল একই-রূপ ছাপার ভুল থাকা সম্ভব কি না? টীকার বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে যে কথাগুলি উদ্‌ধৃত আছে সেগুলির প্রতি লেখক একবার যেন দৃষ্টিপাত করেন।

শ্রীর:

উত্তর— পিশুন শব্দের টীকা না করিয়া প্রবন্ধ-লেখক যে টিপ্পনী করিয়াছেন, আমাদের চক্ষে তাহা ভালো লাগিল না। সম্পাদক-কৃত অর্থ ভালো না হওয়ায় প্রবন্ধ-লেখক যেন আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি যেন সম্পাদককে বিদ্রূপ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন এবং সেই সুযোগ পাইয়াই দুইটা কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। এপ্রকার লেখায় সাধারণ পাঠকবর্গের বা প্রাচীন-কাব্য সংগ্রহের— বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের কোনো লাভ হয় নাই— হইয়াছে, কেবল নিন্দা করিয়া লেখকের মনে সন্তোষ লাভ, আর যদি সম্পাদকের কেহ শত্রু থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মনে শান্তি লাভ।

শ্রীযো:

প্রত্যুত্তর— অসম্ভব ও অসংগত উক্তি শুনিলে আমাদের স্বভাবতই হাসি

আসে। একজনকে একটা অদ্ভুত কার্য করিতে দেখিয়া বা অদ্ভুত কথা কহিতে শুনিয়া আমরা যদি হাসিয়া উঠি, সে কি বলিতে পারে যে, তাহার প্রতি শত্রুতা-বশত আমরা বহুদিন হইতে অবসর খুঁজিতেছিলাম, কখন সে অদ্ভুত কথা বলিবে ও আমরা হাসিয়া উঠিব? হাসি সামলাইতে পারি নাই, হাসিয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে এরূপ বেয়াদবি করিবার অধিকার সকল দেশের সাহিত্য-সমালোচকদেরই আছে।

শ্রীর:

উত্তর— জানয়বি শব্দে 'য়' ভুল নহে। আমাদের বোধ হয় 'ন' তে আকার দিতে ছাপার ভুল হইয়া থাকিবে। হিন্দীতে যখন 'দেখায়ব' 'লিখায়ব' প্রভৃতি আছে, তখন জানায়ব বা জানায়বি না হইবে কেন? ছাপার ভুলের জন্য সম্পাদককে দায়ী করা যায় না। বিশেষত বঙ্গদেশে এমন পুস্তক খুব কম যাহাতে ছাপার ভুল নাই। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধেই ছাপার ভুল আছে; ছাপার ভুলের জন্য কোনো গ্রন্থকারকে কেহ দোষী করেন না। তবে নিন্দা করিবার অভিপ্রায় থাকিলে সে স্বতন্ত্র কথা।

শ্রীযো:

প্রত্যুত্তর— একে সহজেই দুর্বোধ্য ভাষা, তাহার উপরে ছাপার ভুল হইলে না কি বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা এই নিমিত্তই আমরা বলি এ-সকল বই ছাপাইতে নিতান্তই পরিশ্রম করা আবশ্যক। সচরাচর প্রকাশিত বাংলা পুস্তকে ভুল থাকিলে তেমন হানি হয় না। প্রাচীন কবিতায়, কোন্‌টা ছাপার ভুল কোন্‌টা নহে তাহা নির্ণয় করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। 'জানায়বি' এবং 'জানাওবি' উভয়ই হইতে পারে, অতএব 'য়' এবং 'ও' লইয়া আমার বিবাদ নহে— আমার কথা এই যে আকারটি না থাকাতে ছত্রটির অর্থ পাওয়া যায় না।

শ্রীর:

উত্তর—

'হিম হিমকর তাপে তাপায়লু
ভৈগেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক মুখে নাহি সম্বাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত।'

কান্ত কাকের মুখে সংবাদ পাঠাইলেন না পাঠ করিয়া প্রবন্ধ-লেখক অজ্ঞান

হইয়াছেন। কাকের মুখে সংবাদ বড়ো আশ্চর্য কথা! লেখক নিশ্চয়ই কলিকাতাবাসী হইবেন, কাকের মুখে সংবাদ দেওয়ার কথা যে বঙ্গদেশের প্রায় সমুদয় স্থানেই (কলিকাতায় আছে কিনা জানি না) প্রচলিত আছে, তাহা তিনি অবগত নহেন। কাকই যে প্রেমের দূত এরূপ নহে; কোকিলও সময়ে সময়ে প্রেমের দৌত্য কার্য করিয়া থাকে। আমরা একটি গীতে শুনিয়াছি— 'যারে কোকিল আমার বঁধু আছে যে দেশে' ইত্যাদি। হিন্দুস্থানী ভাষায় ষষ্ঠীতে 'ক' বিভক্তি হইতে কোথাও দেখি নাই; 'কা', 'কি', 'কে', 'কিস্‌কা' 'কিস্‌কী' 'কিস্‌কে' পড়িয়াছি। হিন্দী ব্যাকরণ ভাষা-চন্দ্রোদয়ে এই তিনটি বই ষষ্ঠীর বিভক্তি নাই। তবে 'তাক' হইতে তাহার 'কাক' হইতে কাহার টানিয়া বুনিয়া অর্থ করা যায়, কিন্তু তাহার সহিত ব্যাকরণের কোনো সংস্রব নাই।

শ্রীযো:

প্রত্যুত্তর— অমঙ্গল-সূচক কাক যে সংবাদ বহন করিতে পারে না এমন আমাদের কথা নহে। কিন্তু কোনো কবি এ পর্যন্ত কাককে প্রেমের ডাক-হরকরার কাজ দেন নাই। এ-সকল কাজ হংস, কোকিল, মেঘ, মাঝে মাঝে করিয়াছে। কাকের না চেহারা ভালো, না গলা ভালো, না স্বভাব ভালো; এই নিমিত্ত কবিরা কাককে প্রেমের কোমল কাজে নিযুক্ত করেন না। ব্যাকরণ-কারেরা যে ভাষার সৃষ্টি করে না, তাহা সকলেই জানেন। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিদের পদাবলীতে যদি শত শত স্থানে ষষ্ঠীতে 'ক' বিভক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে, তবে আমার ব্যাকরণ খুলিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না। 'কি কহব, রে, সখি, কানুক রূপ।' 'সুজনক প্রেম হেম সমতুল।' 'প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি।' 'যাক দরশ বিনা ঝরয়ে পরাণ, অব নাহি হেরসি তাক বয়ান।' এমন সহস্র উদাহরণ দেওয়া যায়।

শ্রীর:

উত্তর—

'দক্ষি পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পরাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ।

প্রবন্ধ-লেখক কৃত এই পদের অর্থ আমাদের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল না।

অনঙ্গ মহাদেবকেই ভয় করিতে পারে, বড়ো জোর না হয় নন্দীকে ভয় করিবে, কিন্তু সর্পকেও ভয় করিতে হইবে কেন বুঝা গেল না। সম্ভবত ইহার অন্য কোনো অর্থ আছে।

শ্রীযোঃ

প্রত্যুত্তর— আমি যে টীকা করিয়াছিলাম, তাহা উদ্ধৃত করি। 'শিবের ভূষণ ভুজঙ্গকে মদন ভয় করেন, এইজন্য বিরহিনী নখে ভুজঙ্গ আঁকিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া প্রাণকে আশা দিয়া রাখিতেছেন।' এই পদটির আরম্ভেই আছে,

'হিমকর পেখি আনত করু আনন

...

নয়ন কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ'—

ইত্যাদি।

চন্দ্রকে ভয় দেখাইবার জন্য রাধা রাহু আঁকিয়াছেন, তবে মদনকে ভয় দেখাইবার অভিপ্রায়ে সাপ আঁকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। এত দ্রব্য থাকিতে রাধা সাপ আঁকিতে গেলেন কেন? তাহার প্রধান কারণ, তিনি কখনো Art-School-এ পড়েন নাই, এই নিমিত্ত তাঁহার পক্ষে নন্দীর ছবি আঁকা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, কিন্তু মাটির উপরে অঙ্গুলি বুলাইয়া গেলেই অতি সহজে সাপ আঁকা যায়। তাহা ছাড়া, মহাদেবের সাপকে যে ভয় করিতে নাই এমন নহে।

শ্রীরঃ

পুস্তক-মধ্যে ছোটো ছোটো অসাবধানতা সম্বন্ধে লেখক যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার কতকগুলির উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত পাত্র সম্পাদক স্বয়ং। আমরা কেবল এ সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিব। 'কিয়ে' শব্দের অর্থ কি অপেক্ষা কিবা ভালো হয়। 'কিয়ে' শব্দের স্থানে কি হয় কিনা, আমাদের সন্দেহ আছে। 'কিয়া' শব্দেই হিন্দীতে কি। কিয়ে শব্দে উর্দুতে করিয়াছিল অর্থ হয়। এরূপ অবস্থায় কিয়ে শব্দের অর্থে কিবা ব্যবহার করিয়া সম্পাদক দুষ্কর্ম করেন নাই। আর হাস্যজনক কথা কোথাও দেখিলাম না।

শ্রীযোঃ

প্রত্যুত্তর—'কিয়ে' শব্দের অর্থে জিজ্ঞাসাসূচক 'কি' হয় কি না, এ বিষয়ে লেখকের সন্দেহ আছে। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যাকরণ না পড়িয়া প্রাচীন কবিতা ভালো করিয়া পড়িলে এ সন্দেহ সহজেই যাইবে। উদাহরণ দেওয়া যাক্।

'হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত,
তব্ কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত ?'
'হাম যদি জানিতুঁ কানুক রীত
তব্ কিয়ে তা সঙে বাঁধিয়ে চিত ?'

শ্রীরঃ

যাহা হউক এই প্রস্তাব লইয়া বিবাদ করা আমাদিগের অভিলাষ নহে। আমরা সম্পাদকের পক্ষে বা প্রবন্ধ-লেখকের বিপক্ষে নহি। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় স্থানে স্থানে যে-সকল ভুল বাহির করিয়াছেন তাহার মধ্যে কতকগুলি আমাদের ভুল বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। তবে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় সম্পাদকের উপর যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ; তাঁহার গুরুতর পরিশ্রমের কথা বিস্মৃত হইয়া প্রকারান্তরে তাঁহাকে অলস ও এ কার্যে অক্ষম বলিয়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন— ইহা আমাদের ভালো লাগে নাই। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনো বলিতেছি, যে, লেখার ভাব দেখিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে যে, লেখক যেন, দোষ দেখাইয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্যই কলম ধারণ করিয়াছিলেন। যেন তিনি কোনো কারণ প্রযুক্ত ইতিপূর্বে সম্পাদকের উপর চটিয়া ছিলেন, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া এই প্রস্তাবে গাত্রের জ্বালা নিবারণ করিয়াছেন। এপ্রকার লেখার প্রশ্রয় আমরা দিতে পারি না।

আর সম্পাদকের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, তিনি যেন তাঁহার কাব্য-সংগ্রহের দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দেন। তিনি গুরু পরিশ্রম করিয়া কাব্য সংগ্রহ করিয়াছেন তজ্জন্য বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছে। আর একটু পরিশ্রম করিয়া সামান্য সামান্য ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিলে আমরা তাঁহার নিকট অধিকতর কৃতজ্ঞ হইব।

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রত্যুত্তর— যৎসামান্য শ্রম-স্বীকার পূর্বক ব্যাকরণ ও অভিধান না খুলিয়া সম্পাদক মহাশয় অসংকোচে টীকা করিয়া যাওয়াতে যে-সকল ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহা যদি সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া দিই তাহা হইলে সহজেই প্রমাণ হইবে যে, আমি তাঁহাকে যে নিন্দা করিয়াছি তাহা অযথা হয় নাই। আমার প্রতি অন্যায় ও রুচি-বিগর্হিত দোষারোপ দূর করিবার নিমিত্ত ভবিষ্যতে সেইগুলি বিবৃত করিবার

মানস রহিল। আমি সাহিত্যের সেবক। সাহিত্য লইয়াই অক্ষয়বাবুর সহিত বিবাদ করিয়াছি, তাহা আমার কর্তব্য কর্ম। সাহিত্য-বহির্ভূত ব্যক্তিগত কোনো কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার আক্রোশ প্রকাশ করি নাই; এমন স্থলে যদি কেহ বলেন যে, 'লেখক কোনো কারণ প্রযুক্ত ইতিপূর্বে সম্পাদকের উপর চটিয়াছিলেন, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া এই প্রস্তাবে গাত্রের জ্বালা নিবারণ করিয়াছেন' তবে তাঁহার শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও রুচির বিকার প্রকাশ পায়। লেখক যাহাই মনে করুন, অক্ষয়বাবুর উপর আমার এতখানি বিশ্বাস আছে, যাহাতে অসংকোচে বলিতে পারি যে, তিনি এরূপ মনে করিবেন না। তিনি যে আদৌ এমন কষ্টসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এবং এই কার্যসাধনে (আমার মনের মতো না হউক তবুও) অনেকটা পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, ও পূর্ব প্রবন্ধে যদি যথেষ্ট না করিয়া থাকি তবে মার্জনা চাহিতেছি।

ভাদ্র ১২৮৮ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট

উপস্থিত-সংখ্যক ভারতীতে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমার একটি মাত্র বক্তব্য আছে। প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ সমালোচনায় আমি 'এ সখি, কি পেখনু এক অপরূপ' ইত্যাদি পদটির অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার এক স্থানে অর্থ বুঝিতে গোলযোগ ঘটায় সন্দিগ্ধভাবে একটা অনুমান-করিয়া-লওয়া ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। আর-একবার মনোযোগপূর্বক ভাবিয়া ইহার যে অর্থ পাইয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কেহ কেহ বলেন এই পদটির আদিরস-ঘটিত গূঢ় অর্থ আছে; কিন্তু তাহা কোনো মতেই বিশ্বাস করা যায় না। সহজে ইহার যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ইহার মধ্য হইতে একটা অশ্লীল আদিরস-ঘটিত অর্থ বাহির করা নিতান্ত কষ্টকল্পনা ও অরসিক-কল্পনার কাজ। শ্রীকৃষ্ণের শরীরের বর্ণনাই ইহার মর্ম। প্রথমে পদটি উদ্‌ধৃত করি।

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥

কমল-যুগল পর চাঁদকি মাল।
তা'পর উপজল তরুণ তমাল॥
তা'পর বেড়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব-পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্ব ফল যুগল বিকাশ।
তা'পর কির থির করু বাস॥
তা'পর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তা'পর সাপিনী ঝাঁপল মোড়॥

সকলেই জানেন, দেবতাদের শরীর বর্ণনায় পা হইতে প্রথমে আরম্ভ করিয়া উপরে উঠিতে হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে কবি প্রথমে নখ-চন্দ্র-মালা শোভিত চরণ-কমল-যুগলের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার উপরে তরুণ তমাল স্বরূপ কৃষ্ণের পদদ্বয় উঠিয়াছে। তাহার পর বিজুরী লতা অর্থাৎ পীত বসন সে পদদ্বয় বেষ্টন করিয়াছে; (বিদ্যুতের সহিত পীত বসনের উপমা অন্যত্র আছে, যথা— 'অভিনব জলধর সুন্দর দেহ। পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥')। পদদ্বয়ের বর্ণনা সমাপ্ত হইলে পর পদদ্বয়ের কার্যের উল্লেখ হইল— 'কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥' তাহার পরে বাহুই শাখাদ্বয় ও তাহার অগ্রভাগে নখরের সুধাকর-পঙ্‌ক্তি ও তাহাতে অরুণভাতি করপল্লব। এইবারে বর্ণনা মুখমণ্ডলে আসিয়া পৌঁছিল। প্রথমে বিম্বফল ওষ্ঠাধর যুগল তাহাতে কিরণ অর্থাৎ হাস্য স্থির রূপে বাস করে। তাহার উর্ধ্বে চঞ্চল-খঞ্জন চক্ষু। ও সকলের উর্ধ্বে সাপিনীর বেষ্টনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের চূড়া।

এখন আমি অসংকোচে ও নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতে পারি যে, উপরি-উক্ত অর্থই, ঐ পদটির যথার্থ অর্থ। ইহা ব্যতীত অন্য কোনো গূঢ় অর্থ বুঝানো কবির অভিপ্রায় ছিল না।[১]

কার্তিক ১২৮৮ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১ অপিচ দ্রষ্টব্য "জিজ্ঞাসা ও উত্তর", ভারতী, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১২৯০।

বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা

অ

অর্শে (যথা, দোষ অর্শে— দোষ বর্তে)।

আ

আউলানো (এলানো) আওড়ানো আওটানো আইসা আঁকা আঁকড়ানো আঁচানো (আচমন ; আঁচ দেওয়া) আঁচ্‌ড়ানো (আকর্ষণ) আগ্‌লানো আছ্‌ড়ানো আজ্ঞানো আঁটা আট্‌কানো আঁৎকানো (আতঙ্কন) আনা (আনয়ন) আওসানো (ভেজিয়ে দেওয়া) আম্‌লানো (টকে যাওয়া এবং নির্বীর্য ও মৃতপ্রায় হওয়া) আদ্‌রানো আঙ্‌লানো (অঙ্গুলিদ্বারা নাড়া) আব্‌জানো (ভেজিয়ে দেওয়া ।— নদীয়া কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ব্যবহৃত) আজানো আজ্‌ড়ানো (কোনো পদার্থ পাত্র হইতে পাত্রান্তরে রাখা)।

ই

ইটোনো (ইটদ্বারা আঘাত করা)।

উ

উগ্‌রোনো (উদ্গীরণ) উঁচোনো (উচ্চারণ) উঠা (উত্থান) উৎরনো (উত্তরণ) উথ্‌লনো (উচ্ছলিত) উপ্‌ড়নো (উৎপাটন) উব্‌চোনো উল্‌সনো (উল্লসন) উল্‌টনো (উল্লুণ্ঠন) উস্‌কনো উট্‌কনো উস্কোনো (ভাজিবার সময় নাড়াচাড়া করা) উলোনো (নামিয়ে দেওয়া) উথ্‌ড়ানো (উলটে পালটে দেওয়া) উজ্‌ড়ানো (নিঃশেষ করা) উজানো (নদীর স্রোতের বিপরীতে যাওয়া) উনানো (গালানো, তরল করা) উবা (উবে যাওয়া)।

এ

এগোনো এড়ানো এলানো এলা (ধান এলে দেওয়া) এলে দেওয়া।

ও

ওলা ওপ্‌ড়ানো ওড়া বা উড়া ওঠানো ওৎকানো ওল্‌টানো ওস্‌কানো ওট্‌কানো ওব্‌চানো ওথ্‌লানো ওঁচানো ওগরানো ওথ্‌ড়ানো।

ক

ককানো (কেঁদে ককানো) কমা কসা কয়া কহা কচ্‌লানো কড়্‌কানো

কটিয়ে-যাওয়া (যথা কটা, চুল কটিয়ে যাওয়া) কথ্‌চানো কব্‌লানো কাচা (কাপড় কাচা) কাটা কাড়া কাঁড়ানো (ধান কাঁড়ানো) কাঁদা (ক্রন্দন) কাঁপা (কম্পন) কাৎরানো কাম্‌ড়ানো কামানো (কর্ম) কাশা (কাশ) কিলোনো (কিল) কোঁচানো (কুঞ্চন) কোটা (কুট্টন) কুড়নো কুলনো কোপানো কোঁকড়ানো কোঁচ্‌কানো কোঁতানো (কুন্থন) কোঁদা কেনা কোড়ানো কেলানো কচানো (নূতন পত্রোদ্গম হওয়া) কলানো (অঙ্কুরিত হওয়া) কড়মড়ানো (কড়মড় শব্দ করা) কৎলানো (ধৌত করা) কন্‌কনানো (বেদনা করা) কোঁৎকানো (লাঠি ইত্যাদিদ্বারা আঘাত) কাব্‌রানো (কাবার অর্থাৎ শেষ করা) কুচোনো (কুচি কুচি করা) কাঁচানো (একবার পূর্ণতা বা পরিপকতা লাভ করিয়া পুনঃ অপক্ব অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া— পাশাখেলার ঘুঁটি কাঁচানো) কোদ্‌লানো (কোদাল দ্বারা কোপানো) কাছানো (কাছে আসা) কালানো (শীতে হাত-পা কালিয়ে যাওয়া— অবশ হওয়া)।

খ

খতানো খসা খাটা খাওয়া খাম্‌চানো খাব্‌লানো খিঁচোনো (আক্ষেপ) খিচ্‌ড়ানো খেঁকানো খোঁচানো খোঁজা খোঁটা খোঁড়া (খনন) খোদা খোলা খেদানো খেপা (ক্ষিপ্ত) খেলা খেচ্‌কানো খাপানো (কার্যে ব্যবহৃত করা) খরানো (তাপসংযোগে ঝল্‌সে যাওয়া) খিলানো (খিলান arch নির্মাণ করা) খোঁড়ানো (খঞ্জ) খোঁসড়ানো বা খুঁসড়ানো বা খোঁসা।

গ

গগানো (মুমূর্ষু অবস্থায়) গছানো (গচ্ছিত) গড়া (গঠন) গড়ানো (গলিত ; শয়ন) গতানো (গমিত) গজানো গলা (গলন), গর্জানো (গর্জন) গাওয়া (গান গাওয়া) গাদানো (ঠেসে দেওয়া) গালানো গেলা (গিলন) গোঁগানো গোংরানো (গোঁ গোঁ শব্দ করা) গোঁয়ানো গোছানো গোঁজা বা গোঁজ্‌ড়ানো গোটানো গোঁতানো গোনা (গণন) গোনানো (শুনিয়ে দেওয়া) গোলা গুম্‌রোনো গুঁতোনো গুলোনো গুছোনো গুটোনো গাঁজানো বা গেঁজানো (fermented হওয়া) গাবানো (স্পর্ধা প্রচার করা ; পুষ্করিণীর জল নষ্ট করা) গুঁড়ানো (গুঁড়া বা চূর্ণ করা)।

ঘ

ঘটা (ঘটন) ঘনানো ঘব্‌ড়ানো ঘসা (ঘর্ষণ) ঘস্‌ড়ানো বা ঘস্‌টানো ঘাঁটা

ঘেরা ঘেঁসা ঘোচা ঘোঁটা ঘোরা ঘোলানো ঘুমানো ঘুসানো ঘুস্টানো ঘুরোনো ঘাড়ানো (ঘাড়ে দায়িত্বগ্রহণ করা) ঘেঙানো (কাতরোক্তি করা) ঘেঁতানো।

চ

চর্চা চড়া চলা চরা চসা চট্‌কানো চড়ানো (চড় মারা ; উচ্চ করা বা উচ্চ স্থানে রাখা) চল্‌কানো চম্‌কানো চাখা চাগা (উত্তেজিত হওয়া) চাঁচা চাটা চাপা চারানো চালানো চাপ্‌ড়ানো চেতানো চেনা চিবোনো চেরা চিরোনো চোকানো চোথানো (তীক্ষ্ণ করা) চেঁচানো চোটানো চোবানো (নিমজ্জিত করা) চোরানো চোষা চোনা (চুনে লওয়া) চোপ্‌সানো চান্‌কানো (প্রতিমা ও পুত্তলিকা প্রভৃতির চক্ষু অঙ্কন করা, কৃষ্ণনগর অঞ্চলে গ্রাম্য চিত্রকরের মধ্যে ব্যবহৃত) চিম্‌টানো (চিম্‌টি কাটা ; রসহীন হওয়া) চেপ্‌টানো (চেপ্টা করা) চিক্‌রানো (চেঁচানো) চোপানো (অস্ত্র দ্বারা খোড়া)।

ছ

ছকা (ছক্ কাটা) ছড়ানো ছাঁকা ছাঁটা ছাড়া ছাঁদা ছানা (ছেনে লওয়া) ছাওয়া ছেঁড়া ছেঁচা ছটানো ছোঁচানো (শৌচ) ছোটা ছোঁড়া ছোলা (ছুলে দেওয়া) ছোঁয়া ছোব্‌লানে ছিটোনো ছুটোনো ছোটানো ছিট্‌কানো বা ছট্‌কানো ছাপানো (ছাপ দেওয়া ; ছাপিয়ে উঠা) ছেঁচ্‌ড়ানো (ঘর্ষণ সহকারে টানিয়া লওয়া) ছোবানো বা ছোপানো (রঞ্জিত করা)।

জ

জড়ানো জপা জমা জম্‌কানো জলা জরা জাঁকা (জাঁকিয়ে উঠা) জারা (জারণ) জানা জালা জেতা জোটা জোতা জোড়া জ্যাব্‌ড়ানো জিয়োনো জিরোনো জুতোনো জুটনো জুড়োনো জুয়োনো জল্‌শনো জবানো (জবাই করা) জাগা জাওরানো (রোমন্থন করা)।

ঝ

ঝরা ঝল্‌সানো ঝাঁকানো (অধ্যাকম্পন) ঝাঁক্‌রানো ঝাঁটানো ঝাড়া ঝাঁপা ঝাম্‌রানো (অধ্যামর্ষণ) ঝালানো (অধ্যালেপন) ঝোঁকা ঝোলা ঝিমনো ঝট্‌কানো (অস্ত্রের আঘাতে দ্বিধা করা) ঝাঁজানো (তীব্রতা উৎপাদন)।

ট

টকা (টকিয়া যাওয়া) টলা টপ্‌কানো টহলানো টস্‌কানো টানা টাঁকা টেপা টোকা টুটা টেঁকা টোয়ানো (টুইয়ে দেওয়া) টিঁকনো টোপানো (বিন্দু বিন্দু

করিয়া পড়া) টাটানো (ব্যথা করা) টাউরানো (শীতে শরীর টাউরে যাওয়া, অবশ হওয়া) টোকা (note করা)।

ঠ

ঠকা ঠাসা ঠাওরানো ঠেকা ঠেলা ঠেসা ঠেঙানো ঠোকা ঠোক্‌রানো ঠোসা।

ড

ডলা ডরানো ডাকা ডোক্‌রানো ডোবা ডিঙনো ডালানো (গাছের ডাল কাটিয়া দেওয়া)।

ঢ

ঢাকা ঢালা ঢিলোনো ঢ্যালানো ঢিপোনো ঢিকোনো ঢোকা ঢোলা ঢোঁসানো ঢুকোনো ঢ্যাকানো (ধাক্কা দেওয়া) ঢল্‌কানো (কোনো তরল পদার্থ ঢালিয়া ফেলা এবং তাহাকে কোনো এক নির্দিষ্ট দিকে লইয়া যাওয়া)।

ত

তরা (তরে যাওয়া) তলানো তড়বড়ানো তাকানো তাড়ানো তাংড়ানো তাসানো তোব্‌ড়ানো তোলা তোড়া (তুড়ে দেওয়া) তোত্‌লানো তাতানো (উত্তপ্ত করা)।

থ

থতা (থতিয়ে যাওয়া) থাকা থামা থম্‌কানো থাব্‌ড়ানো থোড়া (থুড়িয়ে দেওয়া) থিতোনো থোয়া থেঁত্‌লানো থাড়ানো (to make erect) থেব্‌ড়ানো (কোমল পদার্থে চাপ দিয়া চেপ্টা করা)।

দ

দমানো (বলপ্রয়োগে নত করা) দাঁড়ানো দাঁতানো (দাঁত বহির্গমনহ ওয়া) দাপানো (হস্তপদাদি আস্ফালন করা) দাব্‌ড়ানো দাবানো (দমানো) দোলানো দেওয়া দেখা দোষানো (দোষ প্রদর্শন) দৌড়োনো দড়বড়ানো দপ্‌দপানো দোয়ানো (দোহন করা) দোম্‌ড়ানো।

ধ

ধরা ধসা ধাওয়া ধোয়া ধোয়ানো ধোনা (তুলা ধোনা, অর্থাৎ তাহার আঁশগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা)।

ন

নড়া নাচা নাড়া নাওয়া নাবা বা নামা নাদা নেতানো (নেতিয়ে পড়া)

নেলানো নেংড়ানো নিড়োনো নিকোনো নোওয়া নিছোনো নিবোনো নেবা নেটানো (ছেঁচ্‌ড়ে লইয়া যাওয়া ; সংস্পর্শে আনা) নলানো (খেজুরগাছ হতে রসগ্রহণ জন্য গাছে নল সংযুক্ত করা)।

প

পচা পটানো পড়া পঢ়া (পাঠ-কৃ) পরা পলানো পশা পাকা পাকানো পাওয়া পাঠানো পাড়া পানানো (গোরু পানিয়ে যাওয়া) পেঁচানো পোচানো পোঁছা পোড়া পোঁতা পোওয়ানো পোয়া পোষা পেশা (পুজিয়ে বা পূরণ করিয়া পুজান দেওয়া) পেটানো পিছনো পিটোনো পিল্‌কানো পাকড়ানো পট্‌কানো পারা পাশানো (পাশ দেওয়া তাস-খেলায়) পেঁজা বা পিঁজা (তুলা প্রভৃতির আঁশ পৃথক্ করা) পিচ্‌লানো পিট্‌পিটোনো (চক্ষু পিটপিট করা)।

ফ

ফলা ফস্‌কানো ফাটা ফাড়া ফাঁদা ফাঁসা ফিরোনো ফুক্‌রোনো ফুলোনো ফুরোনো ফুটোনো ফুঁপোনো ফেলা ফেটানো ফেরা ফোঁকা ফোলা ফোটা ফোঁসানো ফোক্‌রানো ফাঁপা ফেবুকানো (হঠাৎ রাগাদি-প্রযুক্ত চলিয়া যাওয়া) ফেনানো (ফেনাযুক্ত করা) ফোঁড়া (বিদীর্ণ করা) ফুসানো : ফুস্‌লানো (কুপরামর্শ গোপনে দেওয়া)।

ব

বহা বকা বখানো (বখিয়ে দেওয়া) বধা বনা বওয়া বদ্‌লানো বলা বসা বাঁকানো বাগানো বাঁচা বাচানো (বাচিয়ে দেওয়া) বাছা বাজা বাঁধা বানানো (তৈয়ার করা) বাড়া বাওয়া বেছানো বেড়ানো বিওনো বিকোনো বিগ্‌ড়ানো বিননো বিলানো বিষানো (বিষাক্ত হওয়া) বেচা বেলা (রুটি বেলা) বুঁচোনো বুজোনো বুঝোনো বুড়োনো বুনোনো বুলোনো বোঁচানো বোজা বোঝা বোড়ানো বোনা বোলানো বেড়ানো বেতোনো (বেত দ্বারা মারা) বাত্‌লানো বিঁধোনো।

ভ

ভজা ভরা ভড়্‌কানো ভাগা ভাঙা ভাজা ভাঁড়ানো ভাঁটানো (ভাঁটিয়ে দেওয়া) ভানা ভাপানো ভাবা ভাসা ভিজোনো ভিড়োনো ভুগোনো ভুলোনো ভেঙানো বা ভেঙচানো ভেজানো (বন্ধ করা) ভেপ্‌সানো ভেজানো (আর্দ্র

করা) ভোগানো ভোলানো ভিয়ানো (মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা) ভাঁড়ানো (ভাঁড়ামি করা ; প্রতারণা করা) ভাব্‌ড়ানো (অকৃতকার্যতা-নিবন্ধন চিন্তা করা) ভ্যাকানো।

ম

মচ্‌কানো মজানো মওয়া (মন্থন করা) মরা মলা (মর্দন করা) মাখা মাঙা মাজা মাড়া মাতা মানা (মান্য করা) মাপা মারা মিটোনো মিওনো মিলোনো মিশোনো মুখোনো (মুখিয়ে থাকা) মুড়োনো মুতোনো মেটানো মেলানো মেশানো মোটানো মোড়ানো মোতা মোদা মোছা মোস্‌ড়ানো (হতাশ্বাস হওয়া) মস্‌টানো (ময়দা মস্‌টানো)।

য

যাচা যাওয়া যাঁতানো।

র

রগ্‌ড়ানো রঙানো রচা রটা রওয়া রসা রাখা রাগা রাঙানো রুচোনো রোখা রোচা রোপা রোওয়া।

ল

লড়া লতানো লওয়া লাফানো লুকোনো লুটোনো লেখা লেপা লোটা লোঠা লাঠানো (লাঠি দ্বারা প্রহার করা) লুফা বা লোফা (শূন্য হইতে পথে কোনো পদার্থকে ধরা)।

শ

শাসানো শিসনো শোষা শেখা শিখোনো শিউরোনো শোওয়া শুকোনো শোধরানো শোনা শাপানো (অভিসম্পাত করা) শিঙোনো (প্রথম শৃঙ্গোদ্গম হওয়া)।

স

সট্‌কানো সঁপা সওয়া সরা সাজা সাধা সাম্‌লানো সাঁৎরানো সাঁৎলানো সানানো সারানো সিট্‌কোনো সুধানো সেঁকা সেঁচা সেঁধানো (প্রবেশ করা) সোঁকা সোলকানো সাঁটানো সাপানো (সর্পকর্তৃক দংশিত হওয়া) সারানো।

হ

হটা হওয়া হাঁকা হাগা হাঁচা হাজা হাঁটা হাঁট্‌কানো হাতানো হাৎড়ানো

হাঁপানো হারা হাসা হেদোনো হেলা হেরা হ্যাঁচ্‌কানো (হঠাৎ জোরে টানা)।

ক্ষ

ক্ষওয়া ক্ষরা ক্ষেপানো (ক্ষিপ্ত করা) ক্ষুরোনো (প্রসবকালীন গোবৎসের প্রথম ক্ষুর নির্গমন)।

১৩০৮

শব্দ-চয়ন : ১

বাংলা ভাষায় গদ্য লিখতে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিনই ঘটে। অনেক দিন ধরে অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি সেই উপলক্ষে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হল। কিন্তু প্রায়ই মনের ভিতরে খটকা থেকে যায়। সুবিধা এই যে বারবার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে উঠে, মূলে যেটা অসংগত, অভ্যাসে সেটা সংগতি লাভ করে। তৎসত্ত্বে সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে যেন চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে। যেমন 'সহানুভূতি'। এটা sympathy শব্দের তর্জমা। 'সিম্প্যাথি'-র গোড়াকার অর্থ ছিল 'দরদ'। ওটা ভাবের আমলের কথা, বুদ্ধির আমলের নয়। কিন্তু ব্যবহারকালে ইংরেজিতে 'সিম্প্যাথি'-র মূল অর্থ আপন ধাতুগত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই কোনো একটা প্রস্তাব সম্বন্ধেও সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়। বাংলাতেও আমরা বলতে আরম্ভ করেছি 'এই প্রস্তাবে আমার সহানুভূতি আছে'। বলা উচিত 'সম্মতি আছে', বা 'আমি এর সমর্থন করি'। যা-ই হোক্— সহানুভূতি কথাটা যে বানানো কথা এবং ওটা এখনো মানান-সই হয় নি তা বেশ বোঝা যায় যখন ও শব্দটাকে বিশেষণ করবার চেষ্টা করি। 'সিম্প্যাথেটিক্'-এর কী তর্জমা হতে পারে, 'সহানুভৌতিক', বা 'সহানুভূতিশীল' বা 'সহানুভূতিমান' ভাষায় যেন খাপ খায় না— সেইজন্যেই আজ পর্যন্ত বাঙালি লেখক এর প্রয়োজনটাকেই এড়িয়ে গেছে। দরদের বেলায় 'দরদী' ব্যবহার করি, কিন্তু সহানুভূতির বেলায় লজ্জায় চুপ ক'রে যাই। অথচ সংস্কৃত ভাষায় এমন একটি শব্দ আছে, যেটা একেবারেই তথার্থক। সে হচ্ছে 'অনুকম্পা'। ধ্বনিবিজ্ঞানে ধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রের তারের মধ্যে সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়— যে সুরে বিশেষ কোনো তার বাঁধা, সেই সুর শব্দিত হলে সেই তারটি অনুকম্পিত ও অনুধ্বনিত হয়। এই তো 'অনুকম্পন'। অন্যের বেদনায় যখন আমার চিত্ত ব্যথিত হয়, তখন সেই তো ঠিক 'অনুকম্পা'। 'অনুকম্পায়ী' কথাটা সংস্কৃতে আছে। 'অনুকম্পাপ্রবণ' শব্দটাও মন্দ শোনায় না। 'অনুকম্পালু' বোধ করি ভালোই চলে। মুশকিল এই যে, দখলের দলিলটাই ভাষায় স্বত্বের দলিল হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র এই কারণেই 'কান, সোনা, চুন, পান' শব্দগুলোতে মূর্ধন্য ণ-য়ের

অনধিকার নিরোধ করা এত দুঃসাধ্য হয়েছে। ছাপাখানার অক্ষর-যোজকেরা সংশোধন মানে না। তাদের প্রশ্ন করা যেতে পারত যে, কানের এক 'সোনায়' যদি মূর্ধন্য ণ লাগল, তবে অন্য 'শোনায়' কেন দন্ত্য ন লাগে। 'শ্রবণ' শব্দের র-ফলা লোপ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্ধন্য ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ মতেই দন্ত্য ন হয়েছে। অথচ 'স্বর্ণ' শব্দ যখন রেফ বর্জন ক'রে 'সোনা' হল, তখন মূর্ধন্য ণ-য়ের বিধান কোন্ মতে হয়? হাল আমলের নতুন সংস্কৃত-পোড়োরা 'সোনা'কে শোধন ক'রে নিয়েছেন, তাঁদের স্বকল্পিত ব্যাকরণবিধির দ্বারা— এখন দখল প্রমাণ ছাড়া স্বত্বের অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য হয়ে গেল। 'শ্রবণ' শব্দের অপভ্রংশ শোনা শব্দ যখন বাংলা ভাষায় বানান-দেহ ধারণ করেছিল, তখন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিধানকর্তা ছিলেন— সেদিনকার বানানে কান সোনা প্রভৃতিরও মূর্ধন্যত্ব প্রাপ্তি হয় নি। কৃষ্ণ শব্দজাত কানাই শব্দে আজও দন্ত্য ন চলছে, বর্ণ (বর্ণ যোজন) শব্দজাত বানান শব্দে আজও মূর্ধন্য ণ-এর প্রবেশ ঘটে নি তাতে কি পাণ্ডিত্যের খর্বতা ঘটেছে?

কিছুকাল পূর্বে যখন ভারতশাসনকর্তারা 'ইণ্টার্‌ন্' শুরু করলেন, তখন খবরের কাগজে তাড়াতাড়ি একটা শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেল—'অন্তরীণ'। শব্দসাদৃশ্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো যুক্তি নেই। বিশেষণে ওটা কী হতে পারে, তাও কেউ ভাবলেন না। Externmentকে কি বলতে হবে 'বহিরীণ'? অথচ 'অন্তরায়ণ, অন্তরায়িত, বহিরায়ণ, বহিরায়িত' ব্যবহার করলে আপত্তির কারণ থাকে না, সকল দিকে সুবিধাও ঘটে।

নূতন সংঘটিত শব্দের মধ্যে কদর্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা'। প্রথমত শিক্ষার মূলের দিকে বাধ্যতা নয়, ওটা শিক্ষার পিঠের দিকে। বিদ্যাদান বা বিদ্যালাভই হচ্ছে শিক্ষার মূলে— তার প্রণালীতেই 'কম্পাল্‌শন্'। অথচ 'অবশ্য-শিক্ষা' শব্দটা বলবামাত্র বোঝা যায় জিনিসটা কী। 'দেশে অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত'— কানেও শোনায় ভালো, মনেও প্রবেশ করে সহজে। কম্পালসারি এডুকেশনের বাংলা যদি হয় 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা', 'কম্পালসারি সাবজেক্ট' কি হবে 'বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয়'? তার চেয়ে 'অবশ্য-পাঠ্য বিষয়', কি সংগত ও সহজ শোনায় না? 'ঐচ্ছিক' (optional) শব্দটা সংস্কৃতে পেয়েছি, তারি বিপরীতে 'আবশ্যিক' শব্দ ব্যবহার চলে কি না, পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি। ইংরেজিতে যে-সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্য

সময়ে বেমানান হয়ে দাঁড়ায়, অনেক সময় ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয়তো তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়। একদিন "রিপোর্ট" কথাটার বাংলা করবার প্রয়োজন হয়েছিল। লোকেরা বানাবার চেষ্টা করে গেল, কোনোটাই মনে লাগল না। হঠাৎ মনে পড়ল [illegible] আছে "প্রতিবেদন" — আর ভাবনা রইল না। প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক — যেমন করেই ব্যবহার করো কানে বা মনে কোথাও বাধে না। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি, ওভারপপুলেশন বিষয়টা আজকাল খবরের কাগজের একটা নিত্য আলোচ্য — কোমর বেঁধে ওর একটা বাংলা শব্দ বানাতে গেলে হাঁপিয়ে উঠতে হয় — সংস্কৃত শব্দকোষে তৈরি পাওয়া যায়, অতিপ্রজন। বিদ্যালয়ের ছাত্রসম্বন্ধে রেসিডেন্ট, নন্‌রেসিডেন্ট বিভাগ করা দরকার, বাংলায় নাম দেব কী? সংস্কৃত ভাষায় সন্ধান করলে পাওয়া যায় আবাসিক, অনাবাসিক। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে আমি কিছু দিন সন্ধানের কাজ করেছিলেম। যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমারের প্রবোধনায় প্রকাশ করবার জন্য তাঁর হাতে অর্পণ করলুম। অন্তত এর অনেকগুলি শব্দ বাংলা লেখকদের কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

অকর্মান্বিত unemployed.
অসমঞ্জস incongruous, incoherent.
অঙ্গারিত charred.
অতিকথিত, অতিকৃত exaggerated
অতিদিষ্ট overruled.
অধিকর্মিক superintendent.
অধিবক্তা advocate.
অধিকারবর্গ Governing body.
অনাত্ম impersonal
অনীহা apathy.

অনুজ্ঞা permission
অনুজ্ঞাত allowed ~~permitted~~.
অনুদত্ত remitted.
অনুবাদ reference to something prior.
অনুপার্শ্ব lateral
অনুযাত্র retinue
অনুলাপ repetition
অনুষঙ্গ association
অন্তম intimate
অন্তঃপাতিত inverted.

"শব্দচয়ন" প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংগ্রহভুক্ত

প্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ হয়ে দাঁড়ায়, অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয়তো তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়। একদিন 'রিপোর্ট' কথাটার বাংলা করবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেটাকে বানাবার চেষ্টা করা গেল, কোনোটাই মনে লাগল না। হঠাৎ মনে পড়ল কাদম্বরীতে আছে 'প্রতিবেদন'—আর ভাবনা রইল না। 'প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক'—যেমন ক'রেই ব্যবহার করো, কানে বা মনে কোথাও বাধে না। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি 'ওভারপপ্যুলেশন'— বিষয়টা আজকাল খবরের কাগজের একটা নিত্য আলোচ্য ; কোমর বেঁধে ওর একটা বাংলা শব্দ বানাতে গেলে হাঁপিয়ে উঠতে হয়— সংস্কৃত শব্দকোষে তৈরি পাওয়া যায়, 'অতিপ্রজন'। বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্বন্ধে 'রেসিডেন্ট', 'নন্‌রেসিডেন্ট' বিভাগ করা দরকার, বাংলায় নাম দেব কী ? সংস্কৃত ভাষায় সন্ধান করলে পাওয়া যায় 'আবাসিক', 'অনাবাসিক'। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে আমি কিছুদিন সন্ধানের কাজ করেছিলেম। যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমারের প্ররোচনায় প্রকাশ করবার জন্য তাঁর হাতে অর্পণ করলুম। অন্তত এর অনেকগুলি শব্দ বাংলা লেখকদের কাজে লাগবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

অকর্মান্বিত—unemployed
অক্ষিভিষক্—oculist
অঘটমান—incongruous, incoherent
অঙ্কূয়ৎ—moving tortuously : অঙ্কূয়তী নদী
অঙ্গারিত—charred
অতিকথিত, অতিকৃত—exaggerated
অতিজীবন - survival
অতিদিষ্ট - overruled
অতিমেমিষ চক্ষু—staring eyes
অতিপরোক্ষ—far out of sight
অতিপ্রজন—over-population

অতিভৃত—well-filled
অতিষ্ঠা—precedence
অতিষ্ঠাবান—superior in standing
অতিসর্গ—act of parting with
অতিসর্গ দান করা—to bid anyone farewell
অতিসর্পণ—to glide or creep over
অতিসারিত—made to pass through
অতিস্রুত—that which has been flowing over
অত্যন্তগত—completely pertinent, always applicable.
অত্যন্তীন—going far
অত্যূর্মি—bubbling over
অধঃখাত—undermined
অধিকর্মা—superintendent
অধিজানু—on the knees
অধিবক্তা—advocate
অধিষ্ঠায়কবর্গ—governing body
অনপক্ষেপ্য—not to be rejected
অনপেক্ষিত—unexpected
অনাত্ম্য—impersonal
অনার্তব—unseasonable
অনাপ্ত—unattained
অনাপ্য—unattainable
অনাবাসিক—non-resident
অনাবেদিত—not notified
অনায়ক—having no leader
অনায়তন—groundless
অনায়ুষ্য—fatal to long life
অনারত—without interruption
অনালম্ব—unsupported

অনাস্থান—having no basis or fulcrum
অনিকামতঃ—involuntarily
অনিজক—not one's own
অনিন—feeble, inane
অনির্বিদ—undesponding
অনিভৃত—not private, public
অনিষ্ঠা—unsteadiness
অনীহা—apathy
অনুকম্পায়ী—condoling
অনুকল্প—alternative
অনুকাঙ্ক্ষা—longing
অনুকাল—opportune
অনুকীর্ণ—crammed
অনুকীর্তন—proclaiming, publishing
অনুক্রকচ—serrated
অনুগামুক—habitually following
অনুজ্ঞা—permission
অনুজ্ঞাত—allowed
অনুতুন্ন—muffled (sound)
অনুদত্ত—remitted
অনুদেশ—reference to something prior
অনুপর্বত—promontory
অনুপার্শ্ব—lateral
অনুযাত্র—retinue
অনুরথ্যা—side-road
অনুলাপ—repetition
অনুষঙ্গ—association
অন্তশ্ছেদ—intercept
অন্তর্জাত—inborn

অন্তঃপাতিত—inserted
অন্তর্ভৌম—subterranean
অন্তম—intimate
অন্তয্য [অন্তর্য]—interior
অন্তরায়ণ—internment
অন্তরীয়—under-garment
অপক্ষেপ—reject
অপচেতা—spendthrift
অপণ্য—not for sale, unsalable
অপপাঠ—wrong reading
অপম—the most distant
অপলিখন—to scrape off
অপশব্দ—vulgur speech
অপহাস—a mocking laugh
অপাটব—awkwardness
অপ্রতিষ্ঠ—unstable
অপ্রভ—obscure
অপ্‌স্বদীক্ষা—baptism
অবঘোষণা—announcement
অবশ্চ্যুত—trickled down
অবর্জনীয়—inevitable
অবধূলন—scattering over
অবমতি—contempt
অবমন্তব্য—contemptible
অবরপুরুষ—descendant
অবরার্ধ—the least part
অবস্থাপন—exposing goods for sale
অবিতর্কিত—unforeseen
অবুদ্ধিপূর্ব—not preceded by intelligence

অবেক্ষা — observation

অভয়দক্ষিণা—promise of protection from danger

অভয়পত্র—a safe conduct

অভিজ্ঞানপত্র—certificate

অভিসমবায়—association

অভ্যাঘাত— interruption

অরত—apathetic

অর্থপদবী—path of advantage

অর্ম—ruins, rubbish

অল্পোন— slightly deficient

অশ্রি—angle, sharp side of anything

অসংপ্রতি—not according to the moment

অস্তব্যস্ত—scattered, confused

আকরিক, আখনিক—miner

আকল্প— design

আকৃত— shaped

আগামিক—incoming

আঙ্গিক —technique : আঙ্গিকভাব

আচয়— collection

আচিত— collected

আত্মকীয়, আত্মনীয়, আত্মনীন— one's own, original

আত্মতা—essence

আত্মবিবৃদ্ধি—self-aggrandisement

আত্যয়িক—urgent

আনৈপুণ্য—clumsiness

আপতিক—accidental

আপাতমাত্র—being only momentary

আবাসিক— resident

উক্তপ্রত্যুক্ত—discourse

উচ্চয় অপচয়—rise and fall
উচ্চণ্ড—very passionate
উচ্ছ্রায়, উচ্ছ্রিতি—elevation
উচ্ছিষ্ট কল্পনা—stale invention
উদ্‌গর্জিত—bursting out roaring
উদ্‌ঘোষ—loud-sounding
উত্তত—stretching oneself upwards
উত্তভিত—upheld, uplifted
উদ্ধর্ষ—courage to undertake anything
উদ্যোগসমর্থ—capable of exertion
উৎপারণ—to transport over
উদ্‌বাসিত—deported
উন্মিতি—measure of altitude
উপস্কর—apparatus
উন্মুখর—loud-sounding
উন্মুদ্র—unsealed
উন্মৃষ্ট—rubbed off
উপজ্ঞা—untaught or primitive knowledge
উপধূপন—fumigation
উপনদ্ধ—inlaid
উপনিপাত—national calamities
উপপাত—accident
উপপুর—suburb
উল্বণ নাদ—shrill sound
ঊনতা—deficiency
ঊর্মিমান, ঊর্মিল—undulating
একতৎপর—solely intent on
একায়ন—footpath
ঐকাঙ্গ—bodyguard

ঐকাত্ম্য—identity
ঐচ্ছিক—optional
ঐতিহ্য—tradition, traditional
কণাকার—granular
কম্র—loving, beautiful
কম্বুরেখা—spiral
করণতা—instrumentality
কাব্যগোষ্ঠী—a conversation on poetry
কাম্যব্রত—voluntary vow (with special aim)
কারু, কারুক—artisan
কালকরণ—appointing time
কালসম্পন্ন—bearing a date
কালাতিক্রমণ—lapse of time
কালান্তর—intermediate time
কির্বির, কির্মীর,—variegated colour, কির্মীরিত
কুটিল রেখা—curved line
কুলব্রত—family tradition
কুশলতা—cleverness
কূণিত—contracted
কৃতাভ্যাস—trained
কৃশিত—emaciated
কেলিসচিব—minister of the sports
কেবলকর্মী—performing mere works without intelligence
ক্রমভঙ্গ—interruption of order
ক্রয়লেখ্য—deed of sale
ক্ষয়িষ্ণু—perishable
ক্ষিপ্রনিশ্চয়—one who decides quickly
গণক-মহামাত্র[১]—finance minister

১ মনিয়ের উইলিয়ম্‌স্‌-এ 'গণন-মহাপাত্র'

গর্গর—whirlpool, eddy
গীতক্রম—arrangement of a song
গুম্ফন—grouping
গৃহব্রত—devoted to home
গেহেশূর—carpet-knight
গোত্রপট—genealogical table
গোপ্রতার—ox-ford (যেখানে গোরু পার করে)
গ্রন্থকুটী—library
গ্রামকূট—congregation of villages
গ্লান—tired, emaciated
চক্রচর—world-trotter
চটুলালস—desirous of flattery
চতুর্ভূমিক—four-storied
চরিষ্ণু—movable
জড়াত্মক—inanimate, unintelligent
জড়াত্মা—stupid
জনপ্রিয়—popular
জনসংসদ—assembly of men
জনাচার—popular usage
জরিষ্ণু—decaying
জ্ঞানসন্ততি—continuity of knowledge
তনিকা—string, বীণার তার
তনুবাদ—rarified atmosphere
তরঙ্গরেখা—curved line
তন্ত্রী—string, বীণার তার
তরস্থান—landing place
তরস্বতী, তরস্বিনী, তরস্বী—quick moving
তরুণিমা—juvenility
তাৎকালিক—simultaneous

তাৎকাল্য—simultaneousness
তীর্ণপ্রতিজ্ঞ—one who has fulfilled his promise
দিবাতন—diurnal
দুরভিসম্ভব—difficult to be performed
দুর্গত কর্ম—relief work, employment offered to the famine-stricken
দুর্মর—dying hard (diehard)
দৃপ্ত—arrogant
দ্রপ্স—a drop
দ্রপ্সী—falling in drops
দ্রব্যত্ব—substance, substantiality
দ্রাংক্ষণ—discordant sound
দ্রাঘিত—lengthened
দ্রোহবুদ্ধি—maliciously minded
দ্বয়বাদী—double-tongued
দ্বারকপাট—leaf of a door
ধূম্রিমা—obscurity
নঙর্থক [নঞর্থক]—negative
নভস—misty, vapoury
নাব্য—navigable
নিমিশ্ল—attached to
নির্গামিক—outgoing
নির্নিক্ত—polished
নির্বাসিক—non-resident
নিষ্কাসিত—expelled
নীরক্ত—colourless, faded
পণ্যসিদ্ধি—prosperity in trade
পতিম্বরা—a woman who chooses her husband
পরাচিত—nourished by another, parasite

পরিলিখন—outline or sketch

পরিস্রাবণ—filtering

পরুত্তন—belonging to the last year

পর্ণশিরা—vein of a leaf

পর্যায়চ্যুত—superseded, supplanted

পাদাবর্ত—a wheel worked by feet for raising water

পারণীয়—capable of being completed

পিচ্চট—pressed flat, চ্যাপ্‌টা

পুটক—pocket

পুনর্বাদ—tautology

পুরন্ধ্রী—matron

পূর্বরঙ্গ—prelude or prologue of a drama

পৃচ্ছনা, পৃচ্ছা—spirit of enquiry

পৃথগাত্মা—individual

পৃথগাত্মিকতা—individuality

প্রচয়—collection

প্রচয়ন—collecting

প্রচয়িকা[১]—[collection]

প্রচিত—collected

প্রণোদন—driving

প্রতিক্রম—reversed or inverted order

প্রতিচারিত—circulated

প্রতিজ্ঞাপত্র—promissory note

প্রতিপণ—barter

প্রতিপত্তি—a counterpart

প্রতিবাচক—answer

প্রতিভা— কারয়িত্রী—genius for action

প্রতিভা— ভাবয়িত্রী—genius for ideas, or imagination

[১] মনিয়ের উইলিয়মস্‌-এ 'প্রচায়িকা'

প্রতিমান—a model, pattern
প্রতিলিপি—a copy, transcript
প্রতীপগমন—retrograde movement
প্রত্যক্ষবাদী—one who admits of no other evidence than perception by the senses
প্রত্যক্ষসিদ্ধ—determined by evidence of the senses
প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞান—recognition
প্রত্যভিনন্দন, প্রত্যর্চন—returning a salutation
প্রত্যরণ্য—near or in a forest
প্রত্যুজ্জীবন—returning to life
প্রথম কল্প—a primary or principal rule
প্রপাঠ, প্রপাঠক—chapter of a book
প্রবাচন—proclamation
প্রলীন—dissolved
প্রসাধিত—ornamented
প্রাগ্রসর—foremost, progressive
প্রাণবৃত্তি—vital function
প্রাণাহ—cement used in building
প্রাতস্তন—matutinal
প্রাতিভজ্ঞান—intuitive knowledge
প্রেক্ষণিকা—exhibition
প্রেক্ষার্থ—for show
প্রোল্লোল—moving to and fro
প্রৌঢ়যৌবন—prime of youth
বর্তিষ্ণু—stationary
বশঙ্গম—influenced
বস্তুমাত্রা—mere outline of any subject
বাগ্‌জীবন—buffoon
বাগ্‌ডম্বর—grandiloquence

বাগ্‌ভাবক—[promoting speech, with a taste for words]

বাতপ্রাবর্তিম—irrigation by wind-power

বিচিতি—collection

বিষয়ীকৃত—realised

বৃত—elected

ভঙ্গিবিকার—distortion of features

ভবিষ্ণু—progressing

ভিন্নক্রম—out of order

ভূমিকা—বাড়ির তলা,

যথা : চতুর্ভূমিক—four storied

ভেষজালয়—dispensary

ভ্রাতৃব্য—cousin

মণ্ডল কবি—a poet for the crowd

মনোহত—disappointed

মায়াত্মক—illusory

মুদ্রালিপি—lithograph

মুমূর্ষা—desire of death

মৃদুজাতীয়—somewhat soft, weak

মৌল—aboriginal

যথাকথিত—as already mentioned

যথাচিন্তিত—as previously considered

যথাতথ—accurate

যথানুপূর্ব—according to a regular series

যথাপ্রবেশ—according as each one entered (সভাপ্রবেশ সম্বন্ধে)

যথাবিত্ত—according to one's means

যথামাত্র—according to a particular measure

যন্ত্রকর্মকার—machinist

যন্ত্রগৃহ—manufactory

যন্ত্রপেষণী, জাঁতা—a hand mill

যমল গান—duet song
রলরোল—wailing, lamenting
রোচিষ্ণু—elegant
লঘুখট্বিকা—easy chair
লোককান্ত—popular
লোকগাথা—folk verses
লোকবিরুদ্ধ—opposed to public opinion
শক্তিকুণ্ঠন—deadening of a faculty
শঙ্কাশীল—hesitating or diffident disposition
শয়নবাস—sleeping garment
শিঞ্জা, শিঞ্জান—tinkling sound
শিথির—flexible, pliant
—loose
শিল্পজীবী—an artisan
শিল্পবিধি—rules of art
শিল্পালয় - [art institute]
শ্মীল—winking, blinking
শ্লক্ষ্ণ—slippery, polished
শ্লথোত্তম—relaxing one's effort
সংকেতমিলিত—met by appointment
সংকেতকেতন স্থান—a place of assignation
সংক্রমণকা—a gallery
সংরাগ—passion, vehemence
সংলাপ—conversation
সৎকলা—a fine art
সত্তস্ক, সত্তস্তন—belonging to the present day
সময়চ্যুতি—neglect of the right time
সমাহর্তা—collector-general
সমূহকার্য—business of a community

সম্প্রতিবিদ্—knowing only the present, not what is beyond
সহজপ্রণেয়—easily led
সহধুরী—colleague
সাত্ত্বিক ভাবক—[promoting the quality of purity]
সাংকথ্য—conversation
সীতাধ্যক্ষ—the head of the agricultural department
সীমাসন্ধি—meeting of two boundaries
সুশ্লক্ষ্ণ—delicate
স্রস্ত—slipped out or into
স্রপ্র—slippery, lithesome, supple
সৌচিক—tailor
স্ত্রীদ্বেষী—misogynist
স্ত্রীময়—effiminate, womanish
স্ফায়িত—expanding
স্ফির—tremulous
স্বগোচর—one's own sphere or range
স্বচর—self-moving
স্বপ্রভুতা—arbitrary power
স্ববহিত—self-impelled
স্ববিধি—own rule or method
স্বমনীষা—own judgement or opinion
স্বয়মুক্তি—voluntary testimony
স্বয়ম্বশ—independent
স্বয়ম্বহ—self-moving
স্বয়ম্ভৃত, স্বয়ম্ভর—self-supporting
স্বসম্বেদ্য—intelligible only to one's self

৩৬৬ পৃষ্ঠায় 'অন্তর্ধ্য' ও ৩৬৭ পৃষ্ঠায় 'আনৈপুণ্য' স্থলে মনিয়ের উইলিয়ম্‌স্‌-এর অভিধানে 'অন্তর্ধ' এবং 'আনৈপুণ' আছে।

স্বসিদ্ধ—spontaneously effected

স্বাবমাননা—self-contempt

স্বৈরবর্তী—following one's own inclination

স্বস্তর, স্বস্তরা—couch, sofa

স্রোতযন্ত্রপ্রাবর্তিম— [water-power irrigation]

হস্তপ্রাবর্তিম—[hand-power motion irrigation]

হৃদয়ভাবক—[promoting the feelings and sensations moved by sentiments]

শব্দ-চয়ন : ২

অকরণ—passive
  সকরণ—active
অকারী—[passive]
  সকারী –[active]
অক্রম—disorder
অক্রিয়—[passive]
  সক্রিয় – [active]
অঙ্গ সংহৃতি—bodily symmetry, compactness of body
অঙ্গাঙ্গিতা—mutual relation
অঙ্গোঞ্ছ— গামছা [a towel]
অঞ্চিত—curved ; অঞ্চিত রেখা
অণিষ্ঠ—অণুতম [most minute]
অতথা—not saying yes, giving a negative answer
অতিম্নান্য—one who is in the condition of utter oblivion
অতিজীব – lively
অতিতর—better, higher
অতিতৃন্ন—seriously hurt
অতিতৃপ্ত—satiated
অতিত্বরিত—অতিদ্রুত [very fast]
অতিত্রস্নু—very timid
অতিদর্শী—far-sighted
অতিধাবন—to run or rush over
অতিবর্ত্তন— passing beyond
অতিমর্ত্ত্য—super human
অত্যণু—very thin
অত্যন্তিক – too close

অত্যভিসৃত—having come too close
অত্বরা—freedom from haste
অত্যাসন্ন—being too close
অধঃখনন—undermining
অধিকর্ম—superintendence
অননুকৃত্য—inimitable
অনায়ত্ত—independent
অনাশস্ত—not praised
অনিগীর্ণ—not swallowed
অনিদ্রা—languor
অনিরুপ্ত—not distributed, not shared
অনির্জিত—unconquered
অনিস্তীর্ণ—not crossed over
অনীতি—impropriety, immorality
অনুকথিত—repeated
অনুকার, অনুকারী—[imitating]
অনুগুণ—having similar qualities
অনুজন সম্মতি—popular sanction
অনুদেয়—a present
অনুপ্ত—unsown
অনুবর্তন—to follow
অনুবাক—recitation
অনৈতিহ্য—untraditional
অন্তঃশীর্ণ—withered within
অন্তঃস্মিত—inward smile
অন্তঃস্মের—smiling inwardly
অন্তর্গলগত—sticking in the throat
অন্তর্ভাব—inherent nature
অন্তিতম—very near

অন্যোন্যসাপেক্ষ—mutually relating
অপকর্ষ—decline, deterioration
অপপ্রসর—checked, restrained
অপাচী—দক্ষিণ [south] উদীচীর উল্টো
অপাচীন—situated backwards, behind
অপাত্রভৃৎ—[supporting the unworthy or worthless
অপিত্র্য—not ancestral
অপ্রতিযোগী—not incompatible with
অপ্রদুগ্ধ—not milked
অবঞ্চনতা—honesty
অবটু—the back or nape of the neck
অবডীন—flight downwards
অবতিতীর্ষু—intending to descend
অবতৃণ্ণ—split
অবদংশ—any pungent food, stimulant
অবম—undermost, inferior
অবমর্দিত—crushed
অবমতর—further down
অবরবয়স্ক—younger
অবরস্পর—having the last first, inverted
অবলীন—cowering down
অবব্রশ্চ—splinter, chip
অবশ্যা—hoar-frost
অবশ্যায়—[hoar-frost]
অবসা—liberation
অবস্কর—privy
অবস্তীর্ণ—strewn
অবস্ফূর্জ—the rolling of thunder

অবস্যন্দন—trickle down
অবুধ্ন—bottomless
অবেক্ষণিকা—observatory
অভঙ্গুর—not fragile
অমত্ত—silly
অমম—without egotism
অমর্ত্রি—immortal
অমিনা—impetuous : অমেয়া, অমিতি
অম্বিতমা—dearest mother
অরাল—curved
অর্বাকপঞ্চাশ—under fifty
অশ্নীতপিবতা—invitation to eat and to drink
অসাত্ম্য—unwholesome
অসৌম্য— [disagreeable] : অশোভন
আকাশপথিক— [sky-traveller, sun]
আত্মনীয়তা—originality
আত্মবর্গ—intimate friends
আত্ম্য—personal
আদিৎসা—wish to take
আদিৎসু—[wishing to take]
আদিকালীন—belonging to the primitive time
আনর্ত—dancing room
আনুজাবর—posthumous
আন্তরতম্য—closest relationship
আবশ্যিক—compulsory
আমিশ্ল—having a tendency to mix
আয়ত্তি—magesty, dignity
আরাল—little curved : আরালিত
আশিষ্ঠ—quickest

আশুকোপী—easily irritated
আশুক্লান্ত—quickly faded
আশুগামী—quickly moving
আসন্দ—chair
ইঞ্চাক—shrimph : ইচা মাছ
ইতাসু—one whose animal spirits have departed
ইষিরা—fresh, vigorous
ইষ্ট ব্রত—[performing desired vows]
ঈর্ষিত—envied
ঈর্ষিতব্য—enviable
ঈর্ষ্যক—envying
ঈর্ষ্যালু—envious
উচ্ছেষ—remainder
উৎকলিকা—[longing for] উৎকণ্ঠা
উত্তমতা—excellence
উত্তরপঞ্চাশ—[over fifty]
উপধূপিত—fumigated
উপনিধি—deposit
উপস্কৃত—furnished
উলুলি —an outcry indicative of prosperity : উলুধ্বনি
উর্জানী—strength personified
উস্রি, উস্রা—morning light
একান্তর—next but one
একোত্তর—greater or more by one
এতষ—dappled— having variegated colour
এষা—running
কটুকিমা—sharpness
কঠোরিত—[strengthened]
কণীচি—a kind of creeper

কনক গৌরবর্ণ—জাফরানী রঙ [saffron]
কনীনা—youthful
কথঙ্কথিত—one who is always askiug questions ; inquisitive
কপিল—brown, tawny, reddish brown
কপিল ধূসর—brownish grey
কপিশ—reddish brown
কপোত বর্ণ—lead grey
কম্রা—beautiful
করিষ্ঠ—doing most
কাব্যনিচয়—anthology
কাব্যবিবেচনা—criticism
কাম্ল—slightly acid
কারয়িতা, ভাবয়িতা—genius for action ; genius for ideas or imagination
কারী—artist ; artificer ; mechanic
কুলগরিমা—family pride
কুলচ্যুত—expelled from a family
কুলতন্তু—thread [coming down from a race]
কুলস্থিতি—custom observed in a family
কূটমান—false measure or weight
কূটযুদ্ধ—treacherous battle
কৃতকর্তব্য, কৃতকৃত্য—one who has done his duty
কৃতত্বর—hurrying
কৃশবুদ্ধি—weakminded
কৃষ্ণপিঙ্গল—dark brown
কৃষ্ণলোহিত—purple
ক্রমভ্রষ্ট—irregular order
গিরিকটক—mountain side

গিরিদ্বার—mountain pass
গিরিপ্রস্থ—plateau ; side of a hill
গীথা—a song
গুপ্তস্নেহা—having a secret affection
গেহেবিজিতী—a house hero, boaster
গৌরিমা—the being white
চিচীষা—desire to gather
চীনক (মহাভারত)—Chinese
জনপ্রবাদ, জনবাদ—rumour, report
জলনির্গম—water course
জ্ঞানদুর্বল—deficient in knowledge
ঝন্ঝনিত—tinkling
তথার্থ— real
তনুচ্ছায়—অল্পছায়াবিশিষ্ট [shading little]
তপিষ্ঠ—extremely hot
তমোমণি—[fire-fly]
তরুমণ্ডপ—bower
তলিনা—fine, slender
তুল্যনাম—having the same name
দোষদৃষ্টি—fault finding
দোষানুবাদ—tale-bearing
দ্রাঘিমা—length
দ্রাঘিষ্ঠ—longest
দ্রোহপর, দ্রোহবৃত্তি—[full of malice, malicious]
দ্রোহভাব—hostile disposition
ধূম্রবুদ্ধি—obscure intellect
নদীবক্র—the bend of a river
নদীমার্গ—course of a river
নদীমুখ—mouth of a river

নানাত্যয়—manifold
নানাত্ব—variety, manifoldness
নিক্বণ—musical sound
নিচয়—store
নিত্যযৌবনা—[perpetual youth]
নীরাগ—[colourless, faded]
নীলিনী—a species of convolvulus with blue flowers.
নেদিষ্ঠ—nearest
পরম্পরীণ—traditional
পরীবেশ—a halo round the sun or moon
পলিতম্লান—grey and withered
পর্যন্তদেশ—neighbouring district
পর্যন্তস্থিত—adjacent
পর্যাপ্তি—adequacy
পর্যায়ক্রম—order of succession
পাটল—pink
পাণ্ডর—whitish yellow cream colour
পারতন্ত্র্য—স্বাতন্ত্র্যের বিপরীত [dependence on others]
পারম্পরী—regular succession
পারম্পরীয়—traditional
পিঙ্গল—reddish brown
পিশঙ্গ—tawny
পুররোধ—sieze of a city or fortress
পুরাকথা—an old legend
পুরাবিদ্—[knowing the events of former times]
প্রজ্ঞু—bandy legged
প্রতিচিকীর্ষা—wish to require
প্রতিজীবন—resuscitation
প্রতিবারণ—warding off, preventing

প্রতিবচন
প্রতিবাক্য } —answer
প্রত্যুক্তি

প্রতিসংলয়ন—retirement into a lonely place

প্রতিসংলীন—retired

প্রত্যন্তিক—situated at the border, frontiermen

প্রপাত—precipice

প্রভব—origin

প্রসাধন—decoration

প্রসাধনবিধি—[mode of decoration]

প্রাক্‌পশ্চিমায়ত—running from east to west

প্রাতিভ—intuitive

প্রাতীতিক—subjective

বক্রবাক্য—ambiguous speech

বর্গ—species or genus : যেমন, স্তন্যপায়ীবর্গ

বিকস্বর প্রসারী—expanding

বিনীল—dark blue

বিবেচক—critic

ভাবক { আঙ্গিক ভাবক / অনুভাব ভাবক } [having a taste…]

ভাবানুষঙ্গ—[association of idea]

মাংশতু—light yellow, dun coloured

মিমির—twinkling

মুখরেখা—feature

যথাপ্রতিজ্ঞা—according to promise

যথাযথ—suitable, fit, proper

যাচিতক—a thing borrowed for use

রজিষ্ঠ—straightest, upright, honest

লীলোদ্যান—pleasure garden

লোকনায়ক—[leader of the worlds]
লোকবার্তা—world's news
লোষ্টভেদন—a harrow
শক্তিগোচর—within one's power
শিথিলশক্তি—inpaired in strength
শিরিণা (ঋগ্‌বেদ)—night
শীঘ্রকৃত্য—to be done quickly
শ্মীলিত—[winked]
শ্যাব—dark brown
শ্রমখিন্ন—distressed by fatigue
সংখ্যান—calculation
সংখ্যাবিধান—making a calculation
সংঘাধ্যক্ষ—the chief of the brotherhood
সন্তৃণ্ণ—hollowed out, perforated
সংজ্ঞু—knock-kneed
সমস্থল—level country
সমঙ্গী—complete in all parts
সময়াচার—conventional or established practice
সমূহ—association, community
সম্যক্ প্রয়োগ—right use
সম্যগ্‌দর্শন, দৃষ্টি—right perception, insight
সম্যগ্‌বোধ—right understanding
সাহিত্যগোষ্ঠী—[a conversation on literature]
সাংকথিক—excellent in conversation
সুহিত—kind : সুহিতা
সৃজতি—creation
সেরাল—pale yellow
স্কন্দপ্রাবর্তিম—[দ্র. হস্তপ্রাবর্তিম : শব্দচয়ন ১]
স্তিমিত নয়ন—having the eyes intently fixed

স্ত্রীবাক্যাঙ্কুশপ্রক্ষুণ্ণ—driven on by the goad of a woman's words

স্ফারফুল্ল—full blown

স্ফুটফেনরাজি—bright with lines of foam

স্ফুরণ—glittering, throbbing, vibration, pulsation, twinkling

স্ফুরৎ প্রভামণ্ডল—surrounded by a circle of tremulous light

স্ফুরৎ তরঙ্গজিহ্ব—having tongue like waves

স্বচ্ছন্দতঃ—spontaneously

স্বচ্ছন্দতা—independent action

স্বচ্ছন্দভাব—spontaneity

স্বদনীয়[১]—palatable

স্বয়ম্পাঠ—original text

স্বসমুত্থ—arising within self

স্বৈরাচার—[of unrestrained conduct or behaviour]

স্বৈরালাপ—[unreserved conversation]

স্বৈরাহার—[abandunt food]

রবীন্দ্রনাথ-কৃত শব্দচয়ন ১ ও ২ -সংখ্যক তালিকায় যেখানে ইংরেজি অর্থ বা প্রতিশব্দের উল্লেখ নাই সে-সব ক্ষেত্রে [ ] বন্ধনী মধ্যে মনিয়রের উইলিয়মস্-এর অভিধান হইতে ইংরেজি অর্থ সংকলন করিয়া দেওয়া হইল।

১ মনিয়রের উইলিয়মস্-এ 'স্বাদনীয়'।

উপসংহার : দৃষ্টান্তবাক্য[১]

অকরণ passive } আমাদের সমাজে যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে সে অকরণভাবে,
সকরণ active } সকরণ বুদ্ধিদ্বারা আমরা তাকে চালনা করি না।

অঙ্গসংহতি bodily symmetry, compactness of body—
গ্রামে যে জনসভা স্থাপিত হইয়াছে এখনো তাহা শিথিল-ভাবেই আছে তাহার অঙ্গসংহতি ঘটে নাই।

অঙ্গারিত charred—প্রাচীন জন্তুর কয়েকখণ্ড অঙ্গারিত অস্থিমাত্র পাওয়া গিয়াছে।

অকর্মান্বিত unemployed—আমেরিকায় অকর্মান্বিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

অঙ্গাঙ্গিতা mutual relation—আমাদের দেশে উচ্চবর্ণের লোকের সঙ্গে অন্ত্যজদের অঙ্গাঙ্গিতার অভাব।

অতিকথিত, অতিকৃত exaggerated—অতিকৃত রেখার দ্বারা তাঁহার ছবিকে ব্যঙ্গাত্মক করা হইয়াছে।

ঝিকিমিকি twinkling—এই জ্যোতিষ্কটি গ্রহ নহে নক্ষত্র তাহা তাহার ঝিকিমিকি আলোকে সপ্রমাণ হয়।

অতিদিষ্ট overruled—একদা যে বিধি কর্তৃপক্ষের আদিষ্ট ছিল বর্তমানে তাহা অতিদিষ্ট হইয়াছে।

অধিষ্ঠায়ক বর্গ governing body—অধিষ্ঠায়কবর্গের নিকট বিদ্যালয়ের প্রতি-বেদন প্রেরিত হইয়াছে।

অধিকর্মা superintendent—বিদ্যালয়ের অধিকর্মা পদে কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় নাই।

অনাত্ম্য impersonal—অনাত্ম্যভাবের রাজ্যশাসন প্রজার পক্ষে হৃদ্য নহে। বৈজ্ঞানিক সত্য অনাত্ম্য সত্য।

অননুকৃত্য inimitable—রঙ্গমঞ্চে তাঁহার প্রয়োগনৈপুণ্য অননুকৃত্য।

অনুজ্ঞাত allowed—মন্দিরে হীনবর্ণের প্রবেশাধিকার প্রাঙ্গণ পর্যন্ত অনুজ্ঞাত।

১. পাণ্ডুলিপির ক্রম-অনুযায়ী মুদ্রিত

অনুদত্ত remitted —যথাকালে তাঁহার বৃত্তি অনুদত্ত হইয়াছে
অনুদেশ reference to something prior } কিনা তাঁহার পত্রে তাহার কোনো অনুদেশ পাওয়া যায় না।

অনুপার্শ্বগতি lateral movement—বালুকারাশি অনুপার্শ্বগতিতে সরিয়া আসিয়া কূপ পূর্ণ করিয়াছে।

আত্ম্য personal—সঙ্গে একটিমাত্র তাঁহার আত্ম্য অনুচর (personal attendent) ছিল।

অনুযাত্র retinue } —তাঁহার অনুযাত্রদের মধ্যে তাঁহার
অন্তম intimate } অন্তম বন্ধু কেহই ছিল না।

অন্তঃপাতিত inserted—কালির রঙ দেখিয়া অনুমান করা যায় পুঁথির মধ্যে এই বাক্যগুলি পরে অন্তঃপাতিত।

অন্তর্ভৌম subterranean—ভূমিকম্পের পূর্বে একটি অন্তর্ভৌম ধ্বনি শুনা গেল।

অন্তরীয় undergarment—পশমের অন্তরীয় বস্ত্র ঘর্মশোষণের পক্ষে উপযোগী।

অন্তরায়ণ internment—রাষ্ট্রিক অপরাধে অন্তরায়িতের প্রতি পীড়ন বর্বরতা।

অপণ্য unsaleable, not for sale—প্রদর্শনীর বিশেষ চিহ্নিত চিত্রগুলি অপণ্য।

অপম the most distant—অন্তম ও অপম আত্মীয়দের লইয়া একান্নবর্তী পরিবার।

অপশব্দ vulgar speech—অপশব্দ অনেক সময় সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা শক্তিশালী।

অপ্রতিষ্ঠ unstable—রাষ্ট্রব্যবস্থা কিছু পরিমাণে অপ্রতিষ্ঠ থাকা প্রজাদের স্বাধীনতার পক্ষে অনুকূল।

অভিজ্ঞান পত্র certificate—তাঁহার উদার ললাটেই বিধাতার স্বহস্ত-রচিত অভিজ্ঞানপত্র।

অভ্যাঘাত interruption—উপদেশ চেষ্টা আখ্যান বিষয়ের অভ্যাঘাত।

অরাল curved—অরাল পক্ষ্ম কৃষ্ণায়ত চক্ষু।

অরত apathetic—বান্ধবদের প্রতি যাহার অরতি সর্বত্রই তাহার চিরনির্বাসন।

অর্ম ruins, rubbish—নদীগর্ভের পঞ্চাশ ফুট নিম্নে প্রাচীন অর্মস্তূপ পাওয়া গেল।

অবর্জনীয় inevitable—কোনো দুঃখকেই অবর্জনীয় বলিয়া উদাসীন হওয়া মনুষ্যোচিত নহে।

অস্তব্যস্ত scattered, confused—তাঁহার রচনায় ভাবসংহতি নাই, সবই যেন অস্তব্যস্ত।

আত্মতা essence—বীর্যের আত্মতাই ক্ষমা।

আত্মবিবৃদ্ধি self aggrandisement—আত্মবিবৃদ্ধির অসংযমেই আত্মবিনাশ।

আত্মকীয় original—তাঁহার লেখায় স্বকীয়তা [আত্মকীয়তা] নাই সমস্তই অনুকরণ।

উক্ত প্রত্যুক্ত discourse—এই গ্রন্থটি আকবরের রাজনীতি সম্বন্ধে উক্তি প্রত্যুক্তি।

উপধূপিত fumigated—রোগীর বিছানা গন্ধক বাষ্পে উপধূপিত করা হইল।

আবাসিক resident —আবাসিক ছাত্রদের বেতন কুড়িটাকা।
অনাবাসিক non-resident —অনাবাসিকদের দেয় ছয় টাকা।

আগামিক incoming—আমাদের আগামিক সভাপতি পরমাসে কাজে যোগ দিবেন।

বিষয়ীকৃত realised—মনে যে আদর্শ আছে জীবনে তাহা বিষয়ীকৃত হয় নাই।

আঙ্গিক technique
গুম্ফন grouping —এই চিত্রের গুম্ফন যেমন সুন্দর আঙ্গিক তেমন নয়।

শব্দচয়ন : ৩

বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় যে-সব প্রতিশব্দের উল্লেখ আছে প্রবন্ধের বিন্যাসক্রমে সেগুলি সংকলিত হইল :

উপসর্গ-সমালোচনা ॥

অপহরণ—abduction

দন্তহীন—edentate

অন্তরেজাত—innate

আসন্ন—adjacent

আক্ষিপ্ত—adjective

আবদ্ধ—adjunct

অভিনয়ন—adduce

অভিদেশ অভিনির্দেশ—address

অভিবর্তন—advent

বাংলা শব্দদ্বৈত ॥

পুনর্বৃত্তি—repetition

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ॥

নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোক—silent spheres

বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত ॥

একমাত্রিক—monosyllabic

বাংলা ব্যাকরণ ॥

শাব্দিক—[philologist]

বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ ॥

তির্যক্‌রূপ—oblique form

নাম সংজ্ঞা—proper names

প্রতিশব্দ ॥

* অধিজাতি—nation

* আধিজাতিক—national

* আধিজাত্য—nationalism

* প্রবংশ—race

প্রবংশ রক্ষা—race preservation

জাতি সম্প্রদায়—tribe

জাতি, বর্ণ—caste

মহাজাতি—genus

উপজাতি—species

প্রজাত—generation

নিজমূলক
স্বকীয়তা } —originality

অপূর্ব—strange

আদিম—original

দরদ—sympathy

অনন্যতন্ত্র—originality

আবেগ, হৃদয়বেগ—emotion

চিত্তোৎকর্ষ, সমুৎকর্ষ—culture

উৎকর্ষিতচিত্ত, উৎকর্ষবান—culture-minded

অপজাত—degenerate

আপজাত্য—degeneracy

প্রজননতত্ত্ব—genetics

সৌজাত্যবিদ্যা—ugenics

বংশানুগতি—heredity

বংশানুগত—inherited

বংশানুলোম্য—inheritable

অভিযোজন—adaptation

অভিযুজ্যতা—adaptability

অভিযোজ্য—adaptable

অভিযোজিত—adapted

অনুরক্তি—interest

স্বতঃস্ফূর্ত—spontaneous
প্রতিক্ষিপ্ত—reflex
প্রসমীক্ষা, প্রসমীক্ষণ, পূর্ব-বিচারণা—fore thought
সূচনা, অভিসংকেত—suggestion
সূচনাশক্তি—suggestiveness
স্বাভিসংকেত—auto-suggestion
বিসংগত সত্য, বিসংগত বাক্য—paradox
ব্যঙ্গানুকরণ—parody
শখ—amateur
পাটল—violet
পল্লবগ্রাহী—dilettante
দ্বৈমানসিকতা, দ্বৈতমানস—two mindedness
দ্বৈতমনা—two minded
মহান—sublime
মহিমা—sublimity
স্বরসংগম, স্বরসংগতি—harmony
স্বরৈক্য—concord
বিস্বর—discord
ধ্বনিমিলন—symphony
সংধ্বনিক—symphonic
রোমাঞ্চিত, তৃণাঞ্চিত—curved
বাণী, মহাবাণী—the voice
*জাত—caste
জাতি=race
*রাষ্ট্রজাতি—nation
জনসমূহ—people
*প্রজন—population
আকাশবাণী, বাক্‌প্রসার—broadcast

বুদ্ধিগত মৈত্রী, বুদ্ধিমূলক মৈত্রী, বুদ্ধিপ্রধান মৈত্রী, মৈত্রীবোধ—intellectual friendship

ভাবপ্রধান, হৃদয়প্রধান—emotional

মনঃপ্রকর্ষ, চিত্তপ্রকর্ষ—culture

প্রকৃষ্টচিত্ত, প্রকৃষ্টমনা—cultured

উৎকৃষ্টি—culture

বুদ্ধিগত সংরাগ—intellectual passion

সংরাগ—passion

বুদ্ধিগত ব্যক্তিত্ব—intellectual self

দেহপ্রকর্ষ চর্চা—physical culture

*শিলক—fossil

*শিলীকৃত—fossilized

*অবমানব—sub-man

*প্রাক্‌প্রস্তর—eolith

*প্রাক্‌মানব=eoanthropus

*প্রাগাধুনিক=eocene

*পুরাজৈবিক=proterozoic

পটভূমিকা, পশ্চাদ্‌ভূমিকা, পৃষ্ঠাশ্রয়, অনুভূমিকা, আশ্রয়, আশ্রয়বস্তু—background

সংকেত, লক্ষ্য, উদ্দেশ, উদাহরণ, অভিনির্দেশ, অভিসংকেত—allusion

পরিচয়—reference

গত মাসিক—proximo

আগামী মাসিক—ultimo

প্রতিমা—image

প্রদোষ—twilight

সাংস্কৃতিক ইতিহাস—cultural history

সংস্কৃত চিত্ত—cultured mind

সংস্কৃতবুদ্ধি—cultured intellegence

সংস্কৃতিমান—cultured
প্রৈতি—impulse
নৈসর্গিক নির্বাচন—natural selection
শিলাবিকার—fossil
শিলবিকৃত, শিলীভূত—fossilized
চারিত্র, চারিত্রশিক্ষা, চারিত্রবোধ, চারিত্রোন্নতি—ethics
তত্ত্ববিদ্যা—metaphysics
কেন্দ্রানুগ—সেন্‌ট্রিপীটাল [centrepetal]
কেন্দ্রাতিগ—সেন্‌ট্রিফ্যুগাল [centrefugal]
শিলাবিকার—metamorphosed rock
জীবশিলা—ফসিল [fossil]
নভোবিদ্যা—মিটিয়রলজি [meteorology]
প্রতিষ্ঠান—institution
অনুষ্ঠান—ceremony

অনুবাদ-চর্চা ॥

নিত্যনির্বন্ধ=persistent

বাদানুবাদ ॥

কুলসঞ্চারিতা=heredity
কুলসঞ্চারী=inherited

বানান-বিধি ॥

বৈয়াকরণিক—grammarian

চিহ্নবিভ্রাট ॥

প্রবন্ধ—essay

বাংলাভাষা ও বাঙালি চরিত্র ॥

রোখো—commonplace

অন্যান্য রচনা ও চিঠিপত্র হইতে সংকলিত

অকুশল—awkward ॥ পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ২১১, রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ

অগ্রসরতা = progress ॥ যাত্রী

অতিকৃতি—exaggeration ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত :
৬ এপ্রিল ১৯৪১

অদ্বয়বিবাহ = monogamy ॥ ছন্দ

অতিশয়পন্থা—extremism ॥ কালান্তর

অন্যোন্যস্তুতি = mutual admiration ॥ সে

অবচয়ন—selection ॥ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত : ১ আষাঢ় ১৩৩২

অবচ্ছিন্ন = abstract ॥ শান্তিনিকেতন

অবন্ধ্য = productive ॥ ইতিহাস

অবয়বহীন—amorphous ॥ সাহানাদেবীকে লিখিত : ১৬ বৈশাখ ১৩৪৫ ;
সংগীতচিন্তা

অভিশোচন—condolence ॥ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত :
৪ আষাঢ় ১৩৩২

অযথা—inaccurate ॥ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত :
২১ কার্তিক ১৩৩৫

আরামবাগ = park ॥ রাশিয়ার চিঠি

আরোগ্যালয়—sanatorium ॥ রাশিয়ার চিঠি

ইঙ্গিত, সঙ্কেত—suggestion ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত :
১৯ মার্চ ১৯৩৭

উচ্-কপালেগিরি—High browism ॥ সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে
লিখিত : "পত্রিকা", পরিচয়, কার্তিক ১৩৩৮

*একক সংগীত—solo

কালবিরোধদোষ = anachronism ॥ সাহিত্য

কিরীটিকা = Corona ॥ বিশ্বপরিচয়

কৌতুকনাট্য = burlesque ॥ জীবনস্মৃতি

ক্ষুব্ধস্তর—troposphere ॥ বিশ্বপরিচয়

গণজাতি—Race ॥ সুর ও সঙ্গতি
গার্হস্থ্যবিভাগ—household commission ॥ রাশিয়ার চিঠি
গৃহদীপ সহায়িকা—girlguide ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত
গোত্রবন্ধন, জাতিবন্ধন—clan system ॥ সমাজ
গোধিকা = Lacerta ॥ বিশ্বপরিচয়
গ্রহিকা = asteroids ॥ বিশ্বপরিচয়
ঘুমন্ত শরিক = sleeping partner ॥ চিঠিপত্র ৯
চিরজীবনরস—Elixir of Life ॥ স্বদেশ
ছদ্মবেশী নাচ—fancy ball ॥ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র
ছাঁদ, রীতি = style ॥ আধুনিক সাহিত্য
জগতত্ত্ব—cosmology ॥ সাধনা, ভাদ্র ১৩০১
*জাত = caste
দূরধ্বনিবহ—Telephone ॥ শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত : বিজয়া দশমী ১৩৩৮
দৈশিকতা = Patriotism ॥ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২ :
অরবিন্দমোহন বসুকে লিখিত : ৪ অগ্রহায়ণ ১৩১৫
দ্বয়ীশিক্ষা = co-education ॥ দ্র. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান
দ্বৈধব্য = bigamy ॥ স্বদেশ
দ্বৈরাজ্য = diarchy ॥ গল্পগুচ্ছ
ধ্রুবপদ্ধতি = classical
নাট্যখেলা = charade ॥ হাস্যকৌতুক
নিরনেক বিবাহ = monogamy ॥ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০
নির্বস্তুক = abstract ॥ বাংলাভাষা পরিচয়
নির্মিতি = construction ॥ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০
নেহাত সত্য—truism ॥ সুর ও সঙ্গতি
নৈরাশ্যগ্রস্ত—pessimist ॥ বিদ্যাসাগর চরিত
নৌবাহ—navigable ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত :
২০ জানুয়ারি ১৯৩১
পরকালতত্ত্ব = eschatology ॥ সাধনা, ভাদ্র ১৩০১
*পরশ্রমজীবী বা পরশ্রমভোগী—Bourgeois ॥ রাশিয়ার চিঠি

*পরার্থশ্রমী—proletariat ॥ রাশিয়ার চিঠি

পরাশিত—parasite ॥ সমবায়নীতি

পাঠগৃহ—reading room ॥ রাশিয়ার চিঠি

পাত্রশিল্প—Pottery ॥ চিঠিপত্র ৯

পারলৌকিক বৈষয়িকতা—other worldliness ॥ আধুনিক সাহিত্য

পীত সংকট=yellow peril ॥ কালান্তর

পুরাগত বনেদ—tradition ॥ সে

পুরোযায়ী—pioneer ॥ রাশিয়ার চিঠি

প্রতিবৃত্তিক্রিয়া—reflex action ॥ সমূহ

প্রতিরূপক—symbol ॥ সমাজ

প্রবহমানতা—enjambenment ॥ ছন্দ

প্রিয়চারী—amiable ॥ সমূহ

প্রৈতি—energy ॥ শান্তিনিকেতন

বন্ধ্য—unproductive ॥ ইতিহাস

বর্ণকল্পনা—colour scheme ॥ রাশিয়ার চিঠি

বহুগ্রন্থিল কলেবর—Complex Structure ॥ সংগীতচিন্তা

বিকলন—Analysis ॥ বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬২ : শ্রীমতী রাধারানী দেবীকে লিখিত : ১৪ ভাদ্র ১৩৩৫

বিদ্যাভবন—Home of education ॥ রাশিয়ার চিঠি

বিধি এবং ব্যবস্থা—law and order ॥ সভ্যতার সংকট

বিশ্রান্তিনিকেতন—The Home of Rest ॥ রাশিয়ার চিঠি

বিশ্বমানবিকতা—cultural fellowship with foreign countries ॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লিখিত : ১১ জানুয়ারি ১৯৩৫

বিশ্বমুসলমানী—Pan Islamism ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত :

বিশ্ববহ—Omnibus ॥ পথের সঞ্চয়

বিশ্বসাহিত্য—Comparative Literature ॥ সাহিত্য

বীরধর্ম—Chivalry ॥ রাশিয়ার চিঠি

বেগ্‌নি পারের আলো, বেগনি পারের রশ্মি, বেগ্‌নি পেরোনো আলো—ultra violet ray ॥ বিশ্বপরিচয়

বৈদ্যুত = Electricity ॥ বিশ্বপরিচয়

বৈভীষিক রাষ্ট্রউদ্যম—terroristic political movement ॥
শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত, চিঠিপত্র ১১

বৈয়ক্তিক চৌম্বকশক্তি—Personal magnetism ॥ চিঠিপত্র ৬

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য = individualism ॥ ধর্ম

ব্যঙ্গীকরণ = caricature ॥ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রস্মৃতি', পৃ ৩৮

ব্যঞ্জনা = gesture ॥ চার অধ্যায়

ব্যূহবদ্ধতা—Organisation ॥ সমূহ

ভাববাতিকতা = sentimentalism ॥ রাজাপ্রজা

ভাবানুষঙ্গ = association ॥ সাহিত্যের পথে

ভারাবর্তন, মহাকর্ষ = Gravitation ॥ বিশ্বপরিচয়

মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা = monasticism ॥ সঞ্চয়

মহাজাগতিক রশ্মি = cosmic ray ॥ বিশ্বপরিচয়

মূর্ধন্য হাসি—wit ॥ সে

*যুগ্মক সংগীত—Duet

রাষ্ট্রিকতা—Politics ॥ সংহতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ; প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ ৫০৮

*রীতি ও পদ্ধতি—cult and dogma

রূপকল্প—Pattern ॥ ছন্দ

রূপদক্ষ—artist ॥ সাহিত্যের পথে

লাল-উজানি আলো—Infra red light ॥ বিশ্বপরিচয়

লোকবাক্য—popular belief ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত :

[শব্দগত] স্পর্শদোষ—contamination of words ॥ দ্র. শ্রীবিজনবিহারী
ভট্টাচার্য, "শব্দগত স্পর্শদোষ", প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২, পৃ ৫১০

শারীরশ্রমের সম্মান—dignity of labour ॥ পথে ও পথের প্রান্তে

শাস্ত্রমত = dogma ॥ কালান্তর

শিশুরক্ষণী—Creche ॥ রাশিয়ার চিঠি

শুচিপত্র—Correction slip ॥ মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত : ২৯ শ্রাবণ ১৩১০

সংকলন, সংগ্রথন—Collection ॥ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত :
১ আষাঢ় ১৩৩২

সংস্কৃতান্বিত — Sanskritized ॥ বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১১

সংস্থান পত্র—prospectus ॥ কালিদাস নাগকে লিখিত : ১৪ নভেম্বর ১৯২২

সখ্যবিবাহ—Compassionate marriage ॥ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। দ্র. হিরণকুমার সান্যাল, "মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়", সংবদধ্বম্ Vol 8, No 1 পৃ ২৪৪

সরল—Simple ॥ সংগীতচিন্তা

সঞ্চয়িকা — Anthology ॥ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত : ১ জানুয়ারি ১৯৩৫, চিঠিপত্র ১১, পৃ ১৩০

সপ্তাহপ্রান্ত — Week-end ॥ দিলীপকুমার রায়কে লিখিত : ২২ শ্রাবণ ১৩৪৪

সভাপত্য—Presidentship ॥ কালিদাস নাগকে লিখিত : পত্র ৮, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৯, পৃ ৪৮৫

সমিতি, সংসাম্য = symmetry ॥ ছন্দ

*সম্মেলক সংগীত — Chorus

সহজ প্রবৃত্তি = instinct ॥ পঞ্চভূত, সমাজ

সহায়িকা—girl guide ॥ শান্তিনিকেতন পত্র, আশ্বিন ১৩৩০

সেবক = Steward ॥ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

স্তরান্তর—Stratosphere ॥ বিশ্বপরিচয়

স্থানিক তথ্যসন্ধান—region studies ॥ রাশিয়ার চিঠি

স্নিগ্ধ—Affectionate ॥ শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত : ৪ অক্টোবর ১৯৩৩

স্বতন্ত্রশাসিত—Autonomous ॥ রাশিয়ার চিঠি

হাঁ-ধর্মী—positive ॥ বিশ্বপরিচয়

তালিকা-ধৃত *-চিহ্নিত শব্দগুলি বাংলা শব্দতত্ত্ব দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে স্থলে ইংরেজি ও বাংলা শব্দ একই সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন সে স্থলে ইংরেজি শব্দের পূর্বে = চিহ্ন দেওয়া হইল।

শব্দচয়ন : ৪

অক্ষর-যোজক	compositor
অগত্যা-প্রেরিত খাটুনি	forced labour
অনামা চিঠি	unanimous letter
অন্তর্মনস্ক	introvert
অসিতচর্ম	coloured
আজ্ঞেয়িক	agnostic
আঁকনপট	canvas
আপিসি শাসন	burocracy
উপরাজ্য	satellite state
কত্নুৎসাহী	Zealot
কৃতকপুত্র	foster son
গঠন পত্রিকা	constitution, prospectus
গর্তগড়	dug-out
গোষ্ঠবিদ্যা	animal husbandry
চতুষ্পথ	crossing
চন্দ্রালোক গীতিকা	moonlight sonata
চরম তিরস্করণী	drop scene
চর্মপত্র	parchment
চিত্রবয়ন	embroidery
জনাদর	popularity
তড়িৎমাপক সূচী	galvanometer
তাপজনক খাদ্য	caloric food
দরখাস্ত পত্রিকা	application
ধর্মমূঢ়বুদ্ধি	bigotry
নরভুক্	cannibal
নৈহারিকতা	nebulocity

পরিণামদারুণ	tragic
পরিণামবাদ	theory of evolution
পরিপ্রেক্ষণিকা পরিপ্রেক্ষণী পরিপ্রেক্ষিত	perspective
প্রত্যক্ষরীকরণ	transliteration
ভীতধ্বনি	alarm
মনোবিকলনমূলক	psycho-analytical
মাশুলখানা	Custom House
মিতশ্রমিক যন্ত্র	labour-saving machine
রূঢ়িক	elementary
শেষমোকাম	terminus
সাদর পত্র	testimonial
স্বজাতিপূজা	Cult of Nationalism
স্বতশ্চালিত	automobile
স্বাঙ্গীকরণ	assimilation
স্বৈচ্ছিক	optional
স্বৈরশাসক	despot
হনুকরণ	aping

A Bird in hand is worth two in the bush.

দুটো পাখি ঝোপে থাকার চেয়ে একটা পাখি হাতে থাকা ভালো!

—চিঠিপত্র ৮

ঝোপের মধ্যে গণ্ডাখানেক পাখি থাকার চেয়ে মুঠোর মধ্যে একটা পাখি ঢের ভালো। —ছিন্নপত্র

Ask me not and you will be told no lie.

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না।

—গল্পগুচ্ছ ১, "অসম্ভব কথা"

Building castles in the air.

আসমানের উপর কত ঘরবাড়ি না বাঁধিয়াছিল।

—বউঠাকুরানীর হাট

Do not look a gift horse in the mouth.

দানের ঘোড়ার দাঁত পরীক্ষা করিয়া লওয়াটা শোভা পায় না।

—শিক্ষা

Enough is as good as a feast.

যা যথেষ্ট সেটাই ভূরিভোজের সমান-দরের। —মানুষের ধর্ম

Example is better than precept.

উপদেশের অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ। —ব্যঙ্গকৌতুক

From frying pan to fire.

তপ্ত কড়া থেকে পালাতে গিয়ে জলন্ত আগুনে পড়া।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬

তপ্ত কটাহ্ হতে জলন্ত চুল্লিতে পড়া। —মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্র, ১৮ কার্তিক ১৩১০

Greatest good of the greatest number.

প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন। —চতুরঙ্গ

Irony of fate.

ভাগ্যের বিদ্রূপ। —ভানুসিংহের পত্রাবলী

Mahomet must come to the mountain.

মহম্মদকে পর্বতের কাছে আসতে হবে। —বি. ভা. প. বর্ষ ১৪ পৃ ১৭১

Not the game but the goose.

শিকার পাওয়া নহে, শিকারের পশ্চাতে অনুধাবন করা। —ধর্ম

Penny wise pound foolish.

কড়ায় কড়া কাহনে কানা। —সমাজ

পয়সার বেলায় পাকা টাকার বেলায় বোকা। —পথের সঞ্চয়

Rolling stone gathers no moss.

গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না।

—শেষের কবিতা

গড়িয়ে যাওয়া পাথর শ্যাওলা জমাতে পারে না।

—শান্তাদেবীকে লিখিত পত্র, ১৭ অগস্ট ১৯২৭,

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯

Similia Similibus Curantur.

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

—"হাতে-কলমে", 'ভারতী', ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১

'সাবিত্রী', আশ্বিন ১২৯৩

Spare the rod and spoil the child.

বেত বাঁচাইলে ছেলে মাটি করা হয়। —সাহিত্যের পথে

Success brings success

সিদ্ধিই সিদ্ধিকে টানে। —কালান্তর

The best is the enemy of good.

বেশির জন্যে আকাঙ্ক্ষাটা সম্ভবপরের শত্রু।

—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত পত্র, বি. ভা. প. বর্ষ ১২, পৃ ২৫১

Survival of the fittest.

যোগ্যতমের উদ্বর্তন। —সাহিত্যের পথে

There is many a slip between the cup and the lip.

ওষ্ঠ ও পাত্রের মধ্যে অনেকগুলি ব্যাঘাত।

—চিঠিপত্র ৮

To err is human, to forgive divine.

দোষ করা মানবের ধর্ম, ক্ষমা করা দেবতার।

—প্রজাপতির নির্বন্ধ

ভুল করা মানবধর্ম, মার্জনা করা দেবধর্ম। —সমাজ

—বাংলা শব্দতত্ত্ব/বীম্‌সের বাংলাব্যাকরণ

Two is company, three is crowd.

দুয়ের সঙ্গে তিনের যোগে গোলযোগ। রয় ১৪।৮৯৩।৩

Wild goose chase.

বুনোহাঁস শিকার। —শেষের কবিতা

শব্দচয়ন : ৬

কানাকানি-বিভাগ intelligence department—চার অধ্যায়, পৃ ৭৫

ঘণ্টাকর্ণ Slave of the bell—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ', পৃ ২৪

চৌকিদারি Chairmanship—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, ২২ কার্তিক ১৩২৪

জন বৃষ John Bull—ছিন্নপত্র

তদীয় উত্তুঙ্গতা His Exalted Highness

নাট্যিfy dramatization—খাপছাড়া, ৮৮

বলবান অস্বীকৃতি/ভিগরস্ প্রোটেস্ট Vigorous protest—বাঁশরি

ব্যাগ্রপাইপ bagpipe—পূরবী

গ্রন্থপরিচয়

'শব্দতত্ত্ব' গদ্যগ্রন্থাবলীর পঞ্চদশ ভাগ রূপে প্রথম প্রকাশিত হয়— প্রকাশ তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ (১৩১৫)।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামে ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে অনেকগুলি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হয়। এই সংস্করণেই "ভাষার কথা" প্রবন্ধটি 'ভূমিকা' রূপে সংযোজিত এবং গ্রন্থটি পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়কে উৎসর্গীকৃত।

রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে শব্দতত্ত্বের প্রকাশকালে (আশ্বিন ১৩৪৯), পরিশিষ্টে, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রম স্বীকার করিয়া শব্দতত্ত্ব গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালের (১৯০৯) পূর্ববর্তী অনেকগুলি প্রবন্ধ যুক্ত করেন ; তবে শব্দতত্ত্বের প্রথম প্রকাশকালের পরবর্তী রচনাগুলি উক্ত খণ্ডে যোগ করা যায় নাই। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংকলিত 'বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা' নামে যে পুস্তিকা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩০৮ সালে প্রচার করেন তাহা এই খণ্ডের পরিশেষে অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহাকে বস্তুত শব্দতত্ত্বের তৃতীয় সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণে আখ্যাপত্রের অপর পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত প্রকাশপরিচয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে এটি তৃতীয় সংস্করণরূপে বর্ণিত হইয়াছে— উল্লিখিত পূর্ববর্তী তিনটি সংস্করণে সংগৃহীত যাবতীয় রচনা এবং ইতিপূর্বে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অন্যান্য কতকগুলি প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র এই সংস্করণে সংকলিত হইল। যে-সকল রচনা প্রথম গ্রন্থভুক্ত হইল প্রকাশসূচীতে সেগুলি অচিহ্নিত।

মূল প্রবন্ধগুলি প্রধানত প্রকাশকালক্রমানুযায়ী মুদ্রিত হইল। অন্যান্য রচনা, চিঠিপত্র, সাময়িকপত্রে প্রসঙ্গক্রমে লিখিত মন্তব্য প্রভৃতি 'আলোচনা'-শীর্ষে বিষয়ানুক্রমে সংকলিত হইল ; এই শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন শ্রেণীতে রচনার বিন্যাসে শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের উপদেশ অনুসৃত হইয়াছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের কোনো কোনো পরামর্শেও সংকলয়িতাগণ উপকৃত হইয়াছেন।

পরিশিষ্টে 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ', 'বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা' ও 'শব্দচয়ন' মুদ্রিত হইল।

প্রবন্ধগুলির সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের যথাসম্ভব উল্লেখসহ আনুপূর্বিক সূচী প্রদত্ত হইল। এই সূচীর * -চিহ্নিত রচনা প্রথম সংস্করণভুক্ত ; ∘ -চিহ্নিত রচনা দ্বিতীয় (পরিবর্ধিত) সংস্করণে সংযোজিত এবং ॰ -চিহ্নিত রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশখণ্ডে যুক্ত। বর্তমান সংস্করণে সংকলিত রচনাগুলি চিহ্নিত হইল না।

∘ভাষার কথা	সবুজ পত্র। চৈত্র ১৩২৩
*বাংলা উচ্চারণ	বালক। আশ্বিন ১২৯২
*স্বরবর্ণ অ	সাধনা। আষাঢ় ১২৯৯
*স্বরবর্ণ এ	সাধনা। কার্তিক ১২৯৯
*টা টো টে	সাধনা। অগ্রহায়ণ ১২৯৯
*বাংলা বহুবচন	ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
*সম্বন্ধে কার	ভারতী। শ্রাবণ ১৩০৫
বঙ্গভাষা	ভারতী। বৈশাখ ১৩০৫
॰ভাষাবিচ্ছেদ	ভারতী। শ্রাবণ ১৩০৫
*বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ	ভারতী। পৌষ ১৩০৫
॰উপসর্গ-সমালোচনা	ভারতী। বৈশাখ ১৩০৬
*বাংলা শব্দদ্বৈত	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। প্রথম সংখ্যা ১৩০৭
*ধ্বন্যাত্মক শব্দ	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। চতুর্থ সংখ্যা ১৩০৭
*বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত[১]	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। তৃতীয় সংখ্যা ১৩০৮
॰বাংলা ব্যাকরণ[২]	বঙ্গদর্শন। পৌষ ১৩০৮
*ভাষার ইঙ্গিত[৩]	ভারতী। আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩১১
∘বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ	প্রবাসী। আষাঢ় ১৩১৮
∘বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য	প্রবাসী। ভাদ্র ১৩১৮

---

১. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৮ সালের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (১২ আশ্বিন) পঠিত।

২. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৮ সালের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে (২৪ অগ্রহায়ণ) পঠিত।

৩. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩১১ সালের প্রথম বিশেষ অধিবেশনে (১৪ জ্যৈষ্ঠ। ২৭ মে ১৯০৪) ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে পঠিত।

•বাংলা নির্দেশক	প্রবাসী। আশ্বিন ১৩১৮
•বাংলা বহুবচন	প্রবাসী। কার্তিক ১৩১৮
•স্ত্রীলিঙ্গ	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩১৮

আ লো চ না :

১. বিবিধ ॥ প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পূর্ববর্তী রচনা; রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড হইতে গৃহীত—

•একটি প্রশ্ন	বালক। অগ্রহায়ণ ১২৯২
•সংজ্ঞাবিচার	বালক। ফাল্গুন ১২৯২
•নিছনি ১-২	সাধনা। চৈত্র ১২৯৮ বৈশাখ ১২৯৯[1]
•পহুঁ	সাধনা। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
•প্রত্যুত্তর ১-২	সাধনা। শ্রাবণ, চৈত্র ১২৯৯

২. প্রতিশব্দ[2] ॥

১-৬	শান্তিনিকেতন পত্র। আষাঢ়, ভাদ্র, ভাদ্র, আশ্বিন-কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩২৬
৭-১০	
১১	বিচিত্রা। ফাল্গুন ১৩৩৮
১২	
১৩	উত্তরা। শ্রাবণ ১৩৩৯
১৪	
১৫	শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩৫৫
১৬-২০	

১. দীনেন্দ্রকুমার রায়ের প্রশ্নের উত্তরে পাদটীকা স্বরূপ প্রকাশিত।

২. যে-ক্ষেত্রে পত্রিকায় প্রকাশের উল্লেখ নাই তাহা শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত পত্রসংগ্রহ হইতে সংকলিত। পরবর্তী রচনাগুলি সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য।

৭-২০ বিভিন্ন জনকে লিখিত পত্র হইতে কালানুক্রমে সংকলিত।

প্রত্যোষ ১-৩ — বিচিত্রা। ভাদ্র, আশ্বিন ১৩৩৯

কালচার ও সংস্কৃতি ১ — পরিচয়। মাঘ ১৩৩৯

০কালচার ও সংস্কৃতি[১] ২-৩ — প্রবাসী। ভাদ্র, কার্তিক ১৩৪২

প্রতিশব্দ-প্রসঙ্গ

১ — সাধনা। চতুর্থ বর্ষ প্রথমভাগ

২-৪ — বঙ্গদর্শন। বৈশাখ ১৩০৮

৫-৬ — বঙ্গদর্শন। আষাঢ় ১৩০৮

৭ — ভাণ্ডার। বৈশাখ ১৩১২

৩. ০অনুবাদচর্চা[২] — শান্তিনিকেতন পত্র। আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৬

৪. বাংলা কথ্যভাষা

বাংলা কথ্যভাষা — শান্তিনিকেতন পত্র। আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৬

: ২ — প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৫০

বাদানুবাদ ১-২ — শান্তিনিকেতন পত্র। অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩২৬

চল্‌তি ভাষার রূপ — বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৩৮

বিবিধ ১

বিবিধ ২ — সাহানা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

৫. সংস্কৃত-প্রাকৃত-বাংলা

০প্রাকৃত ও সংস্কৃত — বঙ্গদর্শন। আষাঢ় ১৩০৮

অভিভাষণ — বিচিত্রা। কার্তিক ১৩৩৮

০ভাষার খেয়াল[৩] — প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪২

শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক — প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৪৩

১. প্রবাসীতে ‘কালচার’ নামে প্রকাশিত। ইহার অংশবিশেষ ১৩৪২ সংস্করণে প্রবন্ধাকারে সংকলিত।

২. শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সম্পাদিত রূপ বাংলা শব্দতত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণে তাহাই মুদ্রিত হইল।

৩. প্রবাসীতে ‘কালচার’ শিরোনামে প্রকাশিত। বাংলা শব্দতত্ত্ব ১৩৪২ সংস্করণে ইহার অংশবিশেষ বর্তমান নামে স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত। অপরাংশ কালচার ও সংস্কৃতি : ২ রূপে বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত।

বিবিধ : ১-২	বঙ্গদর্শন। বৈশাখ ১৩০৮
৩-৪	
৫	কথাসাহিত্য। কার্তিক ১৩৫৮
৬. বানান ও চিহ্ন-বিধি	
বাংলা বানান	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩২৩
বাংলার বানান-সমস্যা	বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৩৯
বাংলা বানান : ২	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪৩
বাংলা বানান : ৩	প্রবাসী। পৌষ ১৩৪৩
বানান-বিধি	প্রবাসী। আষাঢ় ১৩৪৪
বানান-বিধি ১-২	প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৪৪
•চিহ্নবিভ্রাট : ভূমিকা, ১-২	পরিচয়। মাঘ ১৩৩৯
বানান-প্রসঙ্গ ১	ভারতী। অগ্রহায়ণ ১৩০৫
২	বঙ্গদর্শন। বৈশাখ ১৩০৮
৩	বঙ্গদর্শন। আষাঢ় ১৩০৮
৪	তরুণের স্বপ্ন। শারদীয়া ১৩৬৬
৫-৭	
৮	বিশ্বভারতী পত্রিকা। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮
•৯[১]	সোনার বাংলা। বৈশাখ ১৩৬০
১০-১১	বৈজয়ন্তী। কার্তিক ১৩৪৬
৭. ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা	
মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা	প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৩৯
ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা : ১	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৪১
: ২	প্রবাসী। পৌষ ১৩৪২

সংযোজন

বাঙলা ভাষা ও বাঙালি চরিত্র : ১	ভারতী। বৈশাখ ১৩১২
বাঙলা ভাষা ও বাঙালি চরিত্র : ২	

১. বাংলা শব্দতত্ত্ব দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪২) 'নিচ ও নীচ' শিরোনামে অংশত মুদ্রিত।

জাতীয় সাহিত্য সাধনা। আষাঢ় ১৩১২

নামের পদবী বিচিত্রা। শ্রাবণ ১৩৩৮

সংযোজন : ২

[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

পরিশিষ্ট

প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ ভারতী। শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক ১২৮৮

•বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা[১] ১৩০৮

•শব্দচয়ন ১[২] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ফাল্গুন ১৩৩৬

২-৬

শব্দতত্ত্বের চর্চায় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ যে যৌবনকালেই সূচিত হইয়াছিল এবং শেষজীবন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল এই সূচী হইতে তাহা পাঠকের লক্ষ্যগোচর হইবে। 'প্রাচীনকাব্য সংগ্রহ' (১২৮৮) প্রবন্ধ প্রসঙ্গে দেখা যায়, একান্ত তরুণ বয়সেই এ বিষয়ে তাঁহার আগ্রহের উন্মেষ হইয়াছিল।-- জীবনস্মৃতিতে "লোকেন পালিত" অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন যে, প্রথমবার বিলাতপ্রবাসকালেও (১৮৭৮-৮০) এ বিষয়ে তিনি চর্চা করিয়াছেন। লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সহিত অধ্যয়নকালে "আমাদের অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের একটা আলোচনা ছিল। তাহার উৎপত্তির কারণটা এই। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্মজ্ঞান আছে, পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, ইংরেজি বানাম-রীতির অসংযম নিতান্তই হাস্যকর, কেবল তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদের পরীক্ষা দিতে হয় বলিয়াই সেটা এমন শোকাবহ। কিন্তু আমার গর্ব টিকিল না। দেখিলাম, বাংলা বানানও বাঁধন মানে না; তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়ম-ব্যতিক্রমের

১. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

২. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে (২৫ মাঘ ১৩৩৬) পঠিত।

একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম।"[১]

বঙ্গভাষা॥ দীনেশচন্দ্র সেন -প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬ খ্রী.) গ্রন্থের সমালোচনারূপে ভারতী ১৩০৫ বৈশাখে প্রকাশিত। পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ডে সাহিত্যের পরিশিষ্টে মুদ্রিত। বর্তমান গ্রন্থে শব্দতত্ত্বের প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলন করা হইয়াছে। গ্রন্থসমালোচনাসূত্রে প্রারম্ভে এবং উপসংহারে বর্জিত অংশ নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল :

প্রথমাংশ

"শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন-প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এই-শ্রেণীয় বাংলা পুস্তকের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে পুস্তকখানি সাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিয়া প্রথম সংস্করণের প্রান্তশেষে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিদ্যোৎসাহী উদার-হৃদয় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজা এই গ্রন্থ-মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার বহন করেন। রোগশয্যাশায়ী লেখক মহাশয় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। আশা করি অর্থসাহায্য-অভাবে তাঁহার এই ইচ্ছা নিষ্ফল হইবে না।

এই গ্রন্থের আরম্ভভাগে বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লেখকের চিন্তাশীলতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহার দ্বারা পদে পদে পাঠকেরও চিন্তাশক্তির উদ্রেক করিয়া থাকে। সেইসঙ্গে মনে এই খেদটুকুও জন্মে যে বাঙালার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা যথোচিত বিস্তৃত হয় নাই। বিষয়টির কেবল অবতারণা হইয়াছে, তাহাকে আরও খানিকটা অগ্রসর দেখিলে মনের ক্ষোভ মিটিত।

কিন্তু বাঙালির ক্ষোভের কারণ, খেদের বিষয় বিস্তর আছে। অনেক জিনিস হওয়া উচিত ছিল যাহা হয় নাই, এবং সেজন্য আমরা প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু দায়ী। অথচ যে ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া অনিবার্য কারণে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই সমালোচকের উচ্চ আসন হইতে বিশেষ করিয়া তাঁহারই কৈফিয়ত তলব করা শক্ত নহে। কিন্তু আমাদের সে অভিপ্রায় নাই। এবং

১. অপিচ দ্রষ্টব্য "বাংলা উচ্চারণ" প্রবন্ধ

এ কথাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সমালোচ্য গ্রন্থে বঙ্গভাষা সম্বন্ধে অধ্যায় কয়েকটি পাঠ করিয়া এই বিষয়ে আমাদের কৌতূহল বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত এবং চেষ্টা নূতন পথে ধাবিত হইয়াছে। পাঠকের মনকে এইরূপে প্রবুদ্ধ করাই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

সাময়িক রাজকীয় ব্যাপার ব্যতীত আর কোনো বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত-সমাজে আলোচনা নাই। বাংলাভাষার উৎপত্তি প্রকৃতি এবং ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে দুটা কথা আন্দোলন করেন এমন দুইজন বাঙালি ভদ্রলোক আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। অতএব বাংলা ভাষাতত্ত্বের নিগূঢ় কথা যিনি সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত তাঁহাকে সাহায্য বা সংশোধন করিবার উপায় দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাকে একাকী উপক্রমণিকা হইতে উপসংহার পর্যন্ত সমস্তই স্বচেষ্টায় সমাধা করিতে হইবে। তিনিই যন্ত্র তৈরি করিবেন, তার চড়াইবেন, সুর বাঁধিবেন, বাজাইবেন এবং সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে শ্রোতার কার্যও তাঁহাকে একলাই সারিতে হইবে। এমন অবস্থায় এ কথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, তাঁহার সকল কাজ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় নাই।

কিন্তু অদৃষ্টক্রমে যেখানে আমাদের সকল আশার প্রতিষ্ঠা আমাদের মাতৃ-ভাষাতত্ত্ব-নির্ণয়ের আশাও সেই বিদেশীয়ের কাছে। আমরা যাঁহাদের নিকটে স্বায়ত্তশাসন, কৌন্সিলের আসন, যথেচ্ছ ভাষণ দাবি করি, তাঁহাদেরই নিকটে অসংকোচে বেদের ভাষ্য, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত এবং অবশেষে নিজভাষার রহস্য ব্যাখ্যার জন্ত হাতজোড় করিয়া উপস্থিত হইতে হইবে।

এক্ষণে…”

শেষাংশ

“এই-সকল গুরুতর বিঘ্নসত্বে কোনো চিন্তাশীল সন্ধান-তৎপর ব্যক্তি যদি বাংলা ভাষাতত্ত্ব-নির্ণয়ে নিযুক্ত হন তবে তাঁহার কার্য অসম্পূর্ণ হইলেও ভবিষ্যতের পথ খনন করিয়া রাখিবে। রোগের তাপ, জীবিকার চেষ্টা এবং কর্মান্তরের অনবকাশের মধ্যেও দীনেশচন্দ্রবাবু সেই দুঃসাধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া মহৎ অনুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি আমাদের সম্মান এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

দীনেশচন্দ্রবাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দ্বিতীয় সংস্করণের যে সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য গ্রন্থে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামে অন্তর্ভুক্ত।

১৩১৫ ও ১৩৪২ সংস্করণে "বাংলা বহুবচন" ও "বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত" প্রবন্ধ দুইটির মুদ্রিত পাঠের স্থলে সাময়িক পত্র হইতে পূর্ণতর পাঠ রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গৃহীত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে রচনাবলীর পাঠই অনুসৃত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সপ্তম ভাগ প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রকাশিত হইবার পর সপ্তম ভাগ তৃতীয় সংখ্যায় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাষাতত্ত্ব' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে এই শ্রেণীর আরো প্রায় দুই শত শব্দ সম্পাদক-কর্তৃক পর্যায়-বদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মহাশয় উল্লেখ করেন, "রবীন্দ্রবাবুর প্রসঙ্গে 'জল-টল' 'ঘর-টর' 'ছাতা-টাতা' প্রভৃতি যে-সকল শব্দযুগ্মের উল্লেখ আছে, বর্তমান প্রবন্ধের লেখক সেগুলিকে এই তালিকায় স্থান দেন নাই। কিন্তু দেখিতে গেলে ঐ শ্রেণীর শব্দযুগ্মের সহিত এই শ্রেণীর শব্দযুগ্মের মৌলিক প্রভেদ বড় একটা নাই।" এই জাতীয় আরো 'প্রায় চারি শত শব্দের এবং উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি প্রবচনের তালিকা' পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টম ভাগ প্রথম সংখ্যায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস -কৃত 'বাঙ্গালা শব্দ-তত্ত্ব' প্রবন্ধে সংকলিত হয়।

'বাংলা শব্দদ্বৈতে'র দৃষ্টান্তে উৎসাহিত আরো দুইটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। প্রদীপ ১৩০৭ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় 'বাঙ্গলা শব্দ-দ্বৈতে'র (পৃ. ১০৪-১০৯) সূচনায় লেখক শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন— "বর্তমান সনের প্রথম সংখ্যক 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গ-ভাষার শব্দদ্বৈত সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সাধারণতঃ এ ধরণের প্রবন্ধ একজনের চেষ্টায় নিখুঁত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তথাপি রবিবাবুর সর্বতোমুখী প্রতিভার স্পর্শে সেই অসম্ভবও সম্ভবপ্রায় হইয়াছে। প্রবন্ধের যে স্থলে সামান্য ত্রুটী আছে বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।" "এই সমালোচনা পাঠ করিয়া··· মনে যে কয়েকটি কথার উদয় হইল, তাহা" লিপিবদ্ধ করেন বিহারীলাল গোস্বামী

"বাঙ্গালা শব্দের দ্বিরুক্তি" প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধ ভারতী ১৩০৮ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (পৃ ২০৪-২০৯) প্রকাশিত হয়।

১৩০৮ আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শনের 'মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা'য় এই প্রবন্ধের সূত্রে যে-মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহা বর্তমান গ্রন্থে ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় মুদ্রিত।

১৩০৮ সালে বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কিত যে 'আন্দোলনে'র সূত্রপাত হয়[১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ তাহার অগ্রণী-স্বরূপ। "ধ্বন্যাত্মক শব্দ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাঠকদের "খাঁটি বাংলা শব্দের শ্রেণীবদ্ধ তালিকা সংকলনে"র যে-আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা অতি "শীঘ্র সার্থকতা লাভ করে"।[২] "রবিবাবুর লিখিত ও [পরিষৎ]-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে চলিত বাংলা শব্দগুলির সংগ্রহ ও আলোচনা" হয়। "এই শ্রেণীর শব্দের একটি তালিকা যাহা

১. দ্রষ্টব্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮ম ভাগ (১৩০৮) : বাংলাব্যাকরণ— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃ. ২০১-২২৯ ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য বিবরণ, পৃ. /০-৫৸০

২. দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা শব্দ-তত্ত্ব— জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮ম ভাগ ১ম সংখ্যা, পৃ. ২২-২৯

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টম ভাগ প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্য-সহ "প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য মন্দিরের প্রেরিত এই পত্রখানি··· আদরের সহিত" প্রকাশিত হয় (পৃ. ২২২-২২৯)। লেখক মহাশয় ভূমিকায় জ্ঞাপন করেন—"এবারকার সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় 'বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ'-শীর্ষক একটি অতি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। পত্রিকায় প্রকাশিত 'সভাপতির অভিভাষণ' 'ভাষাতত্ত্ব' বৈজ্ঞানিক ভৌগোলিক প্রভৃতি পরিভাষা এবং 'বাঙ্গালা শব্দদ্বৈত' প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকগণের সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী প্রবন্ধ পাঠ করিলে ভরসা হয়, এইবার বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত ও সর্বাঙ্গসুন্দর অভিধান প্রণীত হইবে। অভিধানের আবশ্যকতা এক্ষণে যত অধিক, ব্যাকরণের তত নহে।··· সুদূর প্রবাসে প্রকৃত বাঙ্গালা অভিধানের অভাব আমরা যতদূর অনুভব করি, এরূপ বোধ হয় মাতৃভাষার ও সাহিত্যের পীঠস্থানে কলিকাতায় এবং তন্নিকটবর্তী স্থানের বঙ্গসন্তানগণ করেন না। সুতরাং এরূপ অভিধান যত শীঘ্র প্রণীত হয়, আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই কারণেই সর্ববিধ অযোগ্যতা সত্ত্বেও 'বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ' শীর্ষক প্রবন্ধলেখক মহোদয়ের আহ্বানে ভরসা পাইয়া যথাজ্ঞানে একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি।"

এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -কৃত 'শব্দ-কথা' গ্রন্থে (১৯১৭) তাঁহার 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য—

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পত্রিকায় বাহির” হয়।[১] “পত্রিকাসম্পাদকও এই শ্রেণীর শব্দসংগ্রহের জন্ম পাঠকবর্গকে আহ্বান” করেন।[২]

সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে (১১ শ্রাবণ ১৩০৮) “হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুগত বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নের আবশ্যকতা অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করেন।[৩] শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া সেই অধিবেশনে যে-‘বিচার বিতর্ক’[৪] উপস্থিত হয় তাহাতে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় “ব্যাকরণের উদ্দেশ্য সুন্দররূপে বুঝাইয়া” বলেন :

আমাদের বাংলাভাষার ব্যাকরণ যাঁহারা গড়িতে যাইবেন তাঁহাদের ইহা

“শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত এবং সপ্তম বর্ষের চতুর্থ-সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনা পড়িয়া কয়েকটা কথা আমার মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তোলেন, টু ক টু কে শব্দটি নিশ্চয় ধ্বন্যাত্মক শব্দ। যাহা টু ক্‌ টু ক্‌ ধ্বনি করে, তাহাই টু কু টু কে। কিন্তু যে দ্রব্য রাঙা টুকটুকে, তাহা ত কোনরূপ টু ক টু ক শব্দ করে না;—তবে তাহাকে টু ক টু কে বিশেষণ দিই কেন? রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, “ট ক ট ক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থের শব্দ। যে লাল অত্যন্ত কড়া লাল, সে যখন চক্ষুতে আঘাত করে, তখন সেই আঘাত-ক্রিয়ার সহিত ট ক ট ক শব্দ আমাদের মনে উহ্য থাকিয়া যায়।” রবীন্দ্রনাথের এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের নিকট আমি ঋণী;— আর কাহারই বা কাছে এমন ইঙ্গিত পাইতে পারি? এই ইঙ্গিত না পাইলে বোধ করি, ধ্বনি-বিচার প্রবন্ধের উৎপত্তি হইত না। এই ইঙ্গিত লইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগুলিকে আমি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়াছি।”

রবীন্দ্রনাথ-কৃত শব্দতত্ত্ব -আলোচনা প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ‘শব্দ-কথা’ গ্রন্থে বিভিন্ন প্রবন্ধে যে উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন এই প্রসঙ্গে তাহারও তালিকা দেওয়া হইল— ধ্বনি-বিচার, বাঙ্গালা কৃৎ-তদ্ধিত, বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

১. শব্দ-সংগ্রহ : সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৮ম ভাগ : ২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৩-১৩০

২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮ম ভাগ : ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৯; ২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৩

৩. বাংলাব্যাকরণ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮ম ভাগ : ১ম সংখ্যা।

৪. এই বিচারবিতর্কে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যোগ দিয়াছিলেন : বীরেশ্বর পাঁড়ে, চারুচন্দ্র ঘোষ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা ভাষায় যাহা আছে তাহারই প্রয়োগ প্রকৃতি গঠনপ্রণালীর নিয়মাদি কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবেন মাত্র; কেহ কিছু গড়িবেন না।

.. শিক্ষার বিস্তারের জন্য রচনার ভাষা যত কথিত ভাষার নিকটবর্তী হইবে ততই সুফল ফলিবে। ভাষা অর্থে যদ্দ্বারা ভাষণ করা যায়, সুতরাং তাহা কথিত ভাষার নিকটবর্তী হওয়াই উচিত।

"তৎপরে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন, হীরেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন, প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে তদতিরিক্ত বলিবার আর কিছুই নাই; নিঃশেষ করিয়া সকল কথার উত্তর দিয়াছেন।... ভাষা যে আমরা নিজে ইচ্ছা করিলে গড়িতে পারি ভাঙিতে পারি এরূপ নহে। সংস্কৃতের সহিত বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজে বুঝা যায়, কিন্তু কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য আছে সেগুলি লক্ষ করাই এখন আবশ্যক। তবেই ইহার বর্তমান আকৃতি জানা যাইবে, তবেই ব্যাকরণ গঠনের চেষ্টা হইতে পারিবে। আমারও মনে হয় যে, বাংলাব্যাকরণ সংস্কৃতমূলক হইবে কেন। সংস্কৃতশব্দের বাহুল্য বাংলায় বেশি বলিয়াই ভাষার গঠনাদিও সংস্কৃতব্যাকরণানুসারে করিতে হইবে? বাংলাভাষার প্রকৃত কাঠামো যে সম্পূর্ণ তফাত ইহা না বুঝিলে চলিবে কেন। তবে সংস্কৃতব্যাকরণ আলোচনা করা আবশ্যক, নতুবা আমরা ঠিক পথে চলিতে পারিব না।"[১]

সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বক্তব্যে বলেন:

...আজকার প্রবন্ধের আলোচনায় দেখা গেল, মত দ্বিবিধ হইয়াছে। সংস্কৃতানুসারে ব্যাকরণ আর বাংলাভাষার প্রকৃতিগত ব্যাকরণ। উভয়ের সামঞ্জস্য আবশ্যক।... আমার নিজের মনের ঝোঁক শাস্ত্রী-মহাশয়ের মতের সঙ্গেই মিলে। লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষায় প্রভেদ যত কম থাকে ততই ভালো।

পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (১২ আশ্বিন ১৩০৮) রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধ পাঠ করেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই প্রবন্ধের

১. দ্রষ্টব্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যবিবরণ—১৩৮০ (সা. প. প.—পৃ. ১।৵০-১।৶০)।

"সংগ্রহাতিরিক্ত আরও কতকগুলি প্রত্যয়ের উদাহরণ" সভায় উপস্থিত করেন। উহা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের "পরিশিষ্টরূপে গৃহীত ও মুদ্রিত হয়"।[১]

সভার আলোচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

…বাংলাবর্ণমালা সংস্কারের পূর্বে বাংলাব্যাকরণ ভাববার সময়ই এখনও হয় নি…। আমার বোধ হয়, ব্যাকরণের চেষ্টা রেখে দিয়ে এখন পরিষৎ শব্দ সংগ্রহ করুন।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন :

…প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর এই চেষ্টার পূর্ণতা সম্পাদন করা উচিত। শাস্ত্রী মহাশয়, রবীন্দ্রবাবু এবং ইন্দ্রনাথবাবুর প্রবন্ধাবলী এবং আজকার আলোচনা দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিরা মোটামুটি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষাটা একটা স্বতন্ত্র ভাষা। ইহার প্রকৃতি অন্যরূপ।… শাস্ত্রী মহাশয় ও রবীন্দ্রবাবু বাংলাভাষার প্রকৃতিনির্ণয়ে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে বাংলাভাষার পাণিনি বলিলেই হয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন :

…একমাস পূর্বে আমি এ-বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করি, রবীন্দ্রবাবুর মতো লোকে যে এত শীঘ্র সহায়তা করিবেন সে আশা করি নাই। আরও অনেকে প্রস্তুত হইতেছেন।… যে-সকল বাংলাশব্দের উপর কাহারও কোনোদিন দৃষ্টি পড়ে নাই, রবীন্দ্রবাবুর এই প্রবন্ধের পর তাহাদের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িবে।

১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণের ভারতীতে 'নূতন বাংলাব্যাকরণ' নামক একটি প্রবন্ধে পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সুদীর্ঘ এক প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে (২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০৮) রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে তাহার উত্তর দেন। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, বলাইচাঁদ

১. বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত—ব্যোমকেশ মুস্তফী : সা. প. প. ৮ম ভাগ : ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২২৯-২৪০। দ্রষ্টব্য সম্পাদকীয় মন্তব্য, তদেব, পৃ. ২৪১।

গোস্বামী, প্রমথ চৌধুরী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বীরেশ্বর পাঁড়ে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ সভ্যগণ সেদিনের আলোচনায় ও বিতর্কে যোগদান করেন। আলোচনার শেষে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল :

এত কথার পর আমার একটা কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। আমি বলিয়াছি বাংলাব্যাকরণ বাংলানিয়মে চলিবে, সংস্কৃতনিয়মে চলিবে না, এ-কথার প্রতিবাদ কেন হয় বুঝি না। পণ্ডিতমহাশয়েরা মুখে যাহা বলিয়াই প্রতিবাদ করুন-না কেন, মনে মনে আমার কথাটা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি খাঁটি বাংলাশব্দ সংগ্রহ করিয়া আমি ইতিপূর্বে পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। আমিই ব্যাকরণ লিখিতেছি বা লিখিব এরূপ দুরভিসন্ধি আমার? আমি কতকগুলো শব্দ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, ভবিষ্যৎ বৈয়াকরণের কার্যের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি বলিয়াই কি আমার এতটা অপরাধ হইয়াছে। যাঁহারা এইসকল শব্দকে slang বলিয়া ঘৃণা করেন আর ভাষার মধ্যে আমিই এইসকল slang আমদানি করিতেছি বলিয়া আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের একটা কথা বলিবার আছে, আমি আমদানি করিতেছি এটা কী রকম কথা। পিতৃপিতামহাদি হইতে এইসকল শব্দ কি আমরা পাই নাই। আজ সবগুলাকে কুড়াইয়া একত্র করিবার চেষ্টা করিতেছি, ব্যবহার করিবেন আপনারা। তাহাদের মধ্যে যদি সংগ্রহের দোষে দু-একটা বিজাতীয় শব্দ আসিয়া পড়িয়া থাকে, তাহাতে আপনাদের ক্ষতি কী। ব্যবহারের সময়ে বিচার করিয়া লইবেন। সংগ্রহকারকের হস্তে বিচারভার দিতে নাই, তাহা হইলে অনেক আসল জিনিস বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। প্রত্যয়গুলির আমি যে-রূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছি সেইগুলিই প্রত্যয়ের প্রকৃত রূপ বলিয়া আমি আপনাদের গ্রাহ্য করিতে বলি না। আমার নিজেরও সে-বিষয়ে সন্দেহ যে নাই এমন নহে। আরও একটা কথা, আমি যতগুলা প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়াছি তাহা দেখিয়া আপনাদেরও কি ধারণা হয় না যে, বাংলাপ্রত্যয় বলিয়া কতকগুলা পদার্থ বাস্তবিকই আছে,— তা সেগুলার রূপ আমি যেরূপ নির্ণয় করিয়াছি তাহাই হউক আর আপনারা বিচার করিয়া যাহা স্থির করিতে পারেন তাহাই হউক। অনেকের মনের গূঢ় ভাব এই যে, অধিকাংশ

কথাই যখন সংস্কৃতশব্দের অপভ্রংশ, তখন সংস্কৃত-ব্যাকরণের দ্বারা বাংলা-ব্যাকরণের কাজ কেন চলিবে না। তাহা চলিবে না, চলিতে পারে না, তাহার কতকগুলা কারণ উদাহরণ দিয়া অন্যকার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। অথবা সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়ম কতটা চলিবে বা না চলিবে সেটা বিচার করা আবশ্যক। আমি তো কতকগুলা প্রশ্ন ও কতকগুলা সন্দেহ লইয়া আপনাদের সম্মুখে খাড়া করিয়াছি। সেগুলার উত্তর দেওয়া বা মীমাংসা করার ভার আপনাদের। ম্যালেরিয়া কিসে যায় জিজ্ঞাসা করিলেই যদি প্রশ্নকর্তাকে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করিতে হয় তা হইলে ম্যালেরিয়া দূর করা আর ঘটে না। সুতরাং শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যেভাবে আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে কার্য সিদ্ধ হইবে না। আমি যাহা বলিয়াছি তাহার মীমাংসা আবশ্যক। আমার গলদ যথেষ্ট আছে কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে আসল কথার কী ক্ষতি বৃদ্ধি হইল। বাংলা-ব্যাকরণে কতটা পরিমাণ সংস্কৃতনিয়মাদি চলিবে বা চলিবে না তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। আমার শব্দ সংগ্রহ দেখিয়া যাঁহারা ভাবিতেছেন যে, ভাষা হইতে সংস্কৃতশব্দগুলির চিরনির্বাসনের জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। কিছুই আত্যন্তিক রকম ভালো বলি না। সংস্কৃতশব্দের সমাস-ঘটাচ্ছন্ন ভাষাও কোনোদিন বাংলাভাষার আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে না বা কেবল হুতোমী ভাষাও সকলের নিকট গ্রাহ্য হইবে না। তা কোনো দেশেই হয় না। একসময়ে ইংলণ্ডে Anglo Saxon-দিগের মধ্যে ল্যাটিন শব্দ লওয়ার আপত্তি হইয়াছিল কিন্তু তাহা টি°কিল না। অনেক ল্যাটিন শব্দ ঢুকিয়া পড়িল। তাহার অনেক আছে, অনেক গিয়াছে। এত পাকাপাকির মধ্যেও অনেক রহিয়া গিয়াছে। বাংলাভাষায় সে অবস্থা হয় নাই। সমস্ত সংস্কৃতশব্দ হজম করিয়া ইহা চলিতে পারে না। বাংলাভাষায় অনেক বিষয়ের শব্দ নাই; সে-সকল নাই তাহার কারণ এই, ভাষায় যে-সকল কথা বলিবার আবশ্যক কোনোদিন হয় নাই সুতরাং সে-সকল বিষয় বলিতে গেলে অপর ভাষার নিকট ঋণী হইতেই হইবে। আবার বাংলাভাষায় কতকগুলি সংস্কৃতের অপভ্রষ্ট শব্দের এমন ভিন্নার্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, সেগুলির সেই অর্থ বাদ দিলে বাংলাভাষায় শব্দাভাব ঘটিবে। সংস্কৃত 'ঘৃণা' বাংলায় 'ঘেন্না' হইয়াছে কিন্তু তাহাতে 'ঘৃণা'র অর্থ বজায় নাই। 'পিরীতি' শব্দে 'প্রীতি'র অর্থ নাই। কাজেই এ-সকল শব্দের মূলানুসন্ধান না করিলে বিশেষ ফল কী হইবে। এইরূপ অর্থান্তর দেখিয়া মনে হয় অপ্রকাশিত

গ্রন্থরাশি প্রকাশিত হইলে, আমাদের বাংলাশব্দভাণ্ডার অপূর্ণ থাকিবে না। খাঁটি বাংলাশব্দ লইয়াই সকল ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। বাংলাশব্দের বানান লইয়া যে দাঁড়ি টানিবার কথা উঠিয়াছে সে-সম্বন্ধে আমি এই পর্যন্ত বলি, আমি কিছুই পাকাপাকি করিয়া দিই নাই। এ-সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা দীনেশবাবু ভালো বলিতে পারেন, কত প্রাচীন কাল হইতে কোন্ শব্দের কী বানান লেখা চলিয়া আসিতেছে। আমার মনে হয় যখন 'শ্রবণ' হইতে 'শোনা' লিখিবার সময়ে 'ন' লেখা হয়, মূর্ধন্য 'ণ' লিখিলে ভুল হয় তখন 'স্বর্ণ' হইতে 'সোনা' যদি 'ন' দিয়া লিখি তবে ভুল কেন হইবে। এই-সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বাংলাব্যাকরণের বিষয় মীমাংসা করা আবশ্যক। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যে অপরিবর্তনীয়, তাহাই যে সর্বথা গ্রাহ্য, এ-কথা যেন কেহ মনে না করেন। আমি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, আপনারা দেশের পণ্ডিতবর্গ তাহার ব্যবহার করুন, বাংলাব্যাকরণ কিরূপ হইবে তাহা স্থির করুন।

সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বক্তব্যে বলেন :

...শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ যে-শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন[১] তাহাদের ব্যবহার ও গঠনসম্বন্ধে নিয়মাদি বাংলাব্যাকরণে থাকা আবশ্যক। যাঁহারা এগুলি slang বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন তাঁহারা বাংলাভাষার একাংশ বাদ দিতে চাহেন।...

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে (২৮ পৌষ ১৩০৮) 'ব্যাকরণ ও বাংলাভাষা' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[২] আলোচনার শেষে সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :

শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বাংলাপ্রত্যয়ের উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ভুল নাই, এ-কথা তিনিও বলেন না। তাহাতে দুটা-একটা ভুল যে না আছে তাহাও নহে। সংস্কৃতঅভিধান ও ব্যাকরণের অন্তর্গত শব্দসমষ্টি ছাড়া ভাষার আর-একটি দিক যে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য।... প্রত্যয়াদির রূপ রবীন্দ্র যাহা স্থির করিয়াছেন

১. দ্রষ্টব্য ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত, বাংলাক্রিয়াপদের তালিকা।

২ ব্যাকরণ ও বাংলাভাষা, ভারতী, ১৩০৮ ফাল্গুন।

তাহাই হউক, আর অন্যরূপই হউক, তাহাতে বড়ো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তাহা আলোচনার মুখে স্থির হইবে।

১৩১১ সালে পরিষদের প্রথম বিশেষ অধিবেশনে (১৪ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধটি পাঠের পর যে-আলোচনা হয় তাহাতে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ[১], গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[২] ও

১. বাংলাভাষার গতিনির্দেশ ও লক্ষকারীদিগের দুই দল। এক দলের নেতা রবীন্দ্রবাবু। সামান্য হইতে উচ্চশ্রেণীর লোকে কথাবার্তার ভাষায় যে-সকল শব্দ ব্যবহার করে, সেগুলি লেখার ভাষায় আমরা ব্যবহার করি না। তৎপরিবর্তে অন্য শব্দ সৃষ্টি করিয়া যদি ব্যবহার করি— তাহা হইলে ভাষার জীবনীশক্তি থাকে না। কথিত ভাষার শব্দের শক্তি ও মাধুর্য রবীন্দ্রবাবু দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, তিনি তাহা অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রভৃতি প্রবন্ধ ইহারই ফল। এ-সকল চলিত কথার শব্দ প্রদেশভেদে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দ পরিবর্তনশীল। সংস্কৃতসাহিত্যেও অল্পসংখ্যক ধ্বন্যাত্মক শব্দ দেখা যায়। এইসকল ধ্বন্যাত্মক শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করা বড়ো কঠিন। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি জীবিত শব্দ। সেগুলিকে রবীন্দ্রবাবুর কথিত নিয়মাদি দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ব্যাকরণের আবরণ দিয়া পাঠ করিতে গেলে, তাহাদের মাধুর্য নষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়। এ-যুগের শব্দরহস্য সংগৃহীত হউক, কিন্তু সাহিত্যে তাহাদের বহুল ব্যবহার প্রার্থনীয় নহে।— সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

. আমিও রবীন্দ্রবাবুকে তাঁহার এই অপূর্ব গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনারা জোড়াতাড়া দিয়া লউন। ভাষার ইঙ্গিত সকল বিষয়েই আছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, এইসকল ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বিবিধ, এক দল বলেন জন্তুধ্বনি হইতে, অপর দল বলেন মনুষ্যধ্বনি হইতে উৎপন্ন। ইহাদের ইংরেজি নাম Bow-ow Theory ও Pugh-Pugh Theory। রবীন্দ্রবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি আর জগদীশবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। জগদীশবাবু বলেন, এমন অনেক রঙ আছে যাহা এ-চোখে দেখা যায় না— এ-চোখের ততটা বোধশক্তি নাই। শক্তির বৃদ্ধি হইলে আবার এই চোখেই দেখা যায়। অব্যক্ত ধ্বনির শব্দগুলির রহস্যবোধ সেইরূপ সকলের কানে হয় না। যে-কানের বোধশক্তি বর্ধিত সে কানে হয়, কবি রবীন্দ্রবাবুর তাহা হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহাদের ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মনে করেন। যদিই তাহা হয় তবে একটা-দুইটা হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের দল সমস্তই নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহাদের বহুল ব্যবহার ইচ্ছা করেন না। তিনি না করিলেও লিখিত ভাষায় উহাদের প্রয়োজন আছে। নাটকে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখা যায়। অপণ্ডিত ব্যক্তির কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিতে হইলে উহাদের প্রয়োজন। এইসকল শব্দ এত ছোটো যে, দু-একজন সহৃদয় কবি ইহাদের স্বরূপ দেখিতে চাহেন না। রবিবাবু একজন বৈজ্ঞানিক কবি। তিনি ইহাদের স্বরূপ যেভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে উহাদের আর ছোটোত্ব নাই। তবে রবীন্দ্রবাবু বড়ো নজরে উহাদিগকে যতই ছোটো দেখুন,

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত[১] (সভাপতি) যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন :

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে-সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বাংলাভাষার আকৃতি কিরূপ হইলে ভালো হয়, সে সম্বন্ধে আমার মত যে কী, তাহা আমি এ-প্রবন্ধে বলি নাই, বলিতে

আমাদের কাছে এগুলি এখন অতি বড়ো জিনিস। ভাষার প্রাকৃতত্ব এখন উহাদের উপরে নির্ভর করিতেছে। রবীন্দ্রবাবুর একটা কথার সহিত আমার মতভেদ আছে। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় যে-সম্বন্ধ তাহা দেহ-পরিচ্ছদ সম্বন্ধ নহে ; দেহের উৎকৃষ্ট অংশ বটে। দেহ-পরিচ্ছদ সম্বন্ধ হইলে বাংলাভাষাকে শবদেহ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা নহে। জীবনীশক্তি বাংলাতেও আছে— শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সব বাংলা। কোনোটা একটু বর্ধিত কোনোটা একটু কর্তিত, ইহা দ্বারা আমি যেমন বাংলাভাষাকে একটু বাড়াইলাম তেমনই একটু কমাইয়াও দিলাম। তর্কের খাতিরে কাহাকেও অপদস্থ করিতে নাই। যাহার যে নাম সেই নামে ডাকিলে শীঘ্র ডাক শোনা যায়।

—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১. প্রবন্ধপাঠকের সহিত আমার একটা বিশেষ মতভেদ আছে। তিনি বলেন এইসকল বিষয় অকিঞ্চিৎকর ও বিস্মরণযোগ্য, আমি তাহা কিছুতেই স্বীকার করি না। অন্য কোনো বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার কোনো মতভেদ নাই। তাঁহার প্রবন্ধ রচনানির্দেশের নিয়মপ্রকাশক নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় আশঙ্কিত হইয়াছেন কেন বলিতে পারি না। সংস্কৃত ছাড়িয়া বাংলাভাষা চলে না ; কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতের অনাবশ্যক প্রলেপ দিয়া বাংলাকে ভারাক্রান্ত করিবার আবশ্যক কী। রবীন্দ্রবাবু যে-সকল শব্দ সম্বন্ধে আজ নানাবিধ তথ্য প্রকাশ করিলেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহাদিগকে ভঙ্গুর বলিতেছেন কেন। কতকগুলি শব্দ কেন, সমস্ত ভাষাই তো ভঙ্গুর। সংস্কৃতসাহিত্যে বৈদিক শব্দই আর এখন কি ব্যবহার হয় না সে ভাষা চলে? সেক্সপিয়রের ভাষা, ড্রাইডেনের ভাষা এখনকার ইংরেজিসাহিত্যে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সেক্সপিয়র অপেক্ষা ড্রাইডেন আধুনিক। তাঁহার শব্দগুলা পর্যন্ত অব্যবহার্য হইয়া যাইতেছে। যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন ভাষাতত্ত্বেও খাটে। রবীন্দ্রবাবু এইসকল শব্দকে চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা পান নাই। শব্দকে স্থায়ী করিতে কেহ পারে না। মহাকবি-প্রয়োগে কতকটা হয়, সম্পূর্ণ হয় না। সেক্সপিয়র তাহার উদাহরণ। বিভক্তিও ভাষার ইঙ্গিত। ইংরেজিতে বিভক্তির preposition পূর্বনিপাত এবং বাংলায় পরনিপাত (post-position) হয়। যেমন 'to me' ও 'গাছ থেকে'। রবীন্দ্রবাবু কবির দৃষ্টিতে মাতৃভক্তের ভক্তিতে এইসকল আবিষ্কার করিয়াছেন। খুটখাট, শব্দ ফুট,নাট, হইয়া গেলে আত্মার দেহান্তর গ্রহণবৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু আমাদের চিরপরিচিত শব্দগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন। এইসকল শব্দের ভাষায় বহুল ব্যবহার হইবে কি না তাহা আর এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। নাটকে এইসকল শব্দ গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুরচিত নাটক ভাষায় বহুকাল থাকিবে। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে কিছুই নগণ্য

আসিও নাই। সংস্কৃতভাষার সাহায্য ভিন্ন বাংলাভাষা যে সুসংগতভাবে প্রকাশ করা যায়, তাহা বিশ্বাস করি না। আমার এ-প্রবন্ধ ব্যাকরণমূলক। চলিত কথাগুলির মধ্যে ব্যাকরণের যে-একটি সূক্ষ্ম সূত্র বর্তমান আছে, আমি তাহাই টানিয়া বাহির করিয়া আপনাদের দেখাইতেছি। আপনারা দেখুন, আমি যাহা বাহির করিয়াছি তাহা ঠিক কি না, তাহা টেঁকে কি না। কেহ যেন মনে না করেন, আমি এই-সকল শব্দ অবাধে যেখানে-সেখানে সাহিত্যে ব্যবহার করিতে চাই। আমি সে-পক্ষে বিধান দিবার চেষ্টা করি নাই। ভাষায় যাহা আছে, আমি তাহাই ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। লিখিত ভাষায় এ-সকল শব্দ চলিবে কি না তাহা বিচার্য। আবশ্যক হয় চলিয়া যাইবে। প্রাদেশিকতা কথিত ভাষায় আছে সত্য, কিন্তু এই প্রাদেশিকতাগুলি কি আলোচ্য নহে। আমারও চেষ্টা আছে এবং পরিষৎ-ও চেষ্টা করিতেছেন। সমস্ত প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিলে, ভাষায় অভিধানাদি কি পূর্ণাবয়ব হইবে না। আমি তো বলিয়াছি, আমি এই প্রদেশের শব্দ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি। আমার কার্য স্বতন্ত্র নহে, আমি পরিষদের চেষ্টাকেই অগ্রসর করিয়া দিতেছি। সংস্কৃত শব্দসকল বাংলায় ব্যবহারে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত আমার মতভেদ নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি পরিবর্তনশীল, কিন্তু আমার বিশ্বাস এগুলি সহজে পরিবর্তনীয় নহে। বড়ো বড়ো কথাগুলির অর্থ, ভাব ও ব্যবহারই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত অনেক শব্দ বাংলায় পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ পরিবর্তিত হইবে কেন। বাঙালি কি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিবে না, প্যান্ প্যান্ করিয়া কাঁদিবে না, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া চাহিবে না? প্রাকৃত বাংলা লিখিত ভাষায় যে আমি চালাইতে চাহি, তাহা নহে; তবে চলিবে কিনা, তাহাদের প্রয়োজন হইবে কি না বা আছে কি না, তাহার বিচারক পাঠকগণ।[১]

হইতে পারে না। সেইরূপ ভাষাতত্ত্ববিদের নিকট কোনো শব্দই উপেক্ষিত হইবার নহে। ব্যাকরণ আইননিগড় নয়। ভাষার স্বরূপ, ভাষার ইঙ্গিত, বিভক্তি প্রভৃতিকে ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখাইয়া দেয়। সিংহ বর্ণনায় কেশর বাদ দেওয়া যাহা, লাঙ্গুল বাদ দেওয়া তাহা। ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাদ দিলে ভাষাতত্ত্বালোচকের দৃষ্টি ভ্রান্ত হইবে।—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

১. সাহিত্যপরিষৎ-সংক্রান্ত এই বিবরণ প্রধানত রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত গ্রন্থপরিচয় হইতে গৃহীত।

'বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ' প্রবন্ধটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবার পর এই-প্রসঙ্গে পরবর্তী কয়েকমাসের প্রবাসীতে আলোচনা চলে। সতীশচন্দ্র বসু শ্রাবণ সংখ্যায় (পৃ. ৩৭৬-৭৭) রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সমালোচনা করেন। ভাদ্র সংখ্যায় (পৃ. ৪৫৮-৬১) যোগেশচন্দ্র রায়-এর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিচার্য্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য' প্রবন্ধের পাদটীকায় সতীশচন্দ্র বসুর সমালোচনার উল্লেখ করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (বৈশাখ ১৮৩৩ শক) 'আশ্রম সংবাদ / শান্তিনিকেতন' শিরোনামে মুদ্রিত একটি সংবাদে জানা যায় যে " 'প্রবন্ধপাঠসভা' নামে একটি সমিতি গত ফাল্গুন মাসে স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতিতে বিশেষজ্ঞদের লিখিত প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে।... এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত 'বাংলা বিশেষ্য পদের একবচন্' নামক একটি প্রবন্ধ ৪ঠা চৈত্র তারিখে পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল।" ইহাই প্রবাসী ১৩১৮ ভাদ্র সংখ্যায় মুদ্রিত 'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য' বলিয়া অনুমিত।

' "বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য" পাঠ করিয়া যে কয়টি কথা আমার মনে উদিত হইয়াছে' বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী ১৩১৮ আশ্বিন সংখ্যায় 'আলোচনা' পর্যায়ে 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' নামে 'প্রবাসীর পাঠকগণও সন্দর্ভকারের নিকট' নিবেদন করেন।

প্রবাসী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩১৮) প্রকাশিত 'বাংলা নির্দেশক' প্রবন্ধের নীচে যে 'নোট' মুদ্রিত ছিল তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল :

"বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যক্‌রূপ নামক প্রবন্ধে কর্ত্তৃকারকে একার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সে সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। নিয়মের সূত্রটাকে বাঁধিয়া তুলিতে আমার গোল ঠেকিতেছিল সে আমি নিজেই অনুভব করিয়াছি। বস্তুত বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার পদে পদেই আমার মনে দ্বিধা আছে। অতএব এ বিষয়ে বিদ্যানিধি মহাশয় আমাকে আনুকূল্যপ্রার্থী জানিয়া আমার সন্দেহভঞ্জন করিবেন।

তাঁহার মতে সূত্রটি এই :— যেখানে কর্ত্তৃপদে জাতির বা সামান্যের ধর্ম্ম-প্রকাশ উদ্দেশ্য হয় সেখানে কর্ত্তৃপদে একার আসে।

তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে "ঠেলা দিলে টেবিল উল্টে পড়ে" না বলিয়া

আমরা কি বলিতে পারি "টেবিলে উল্টে পড়ে?" "জল পাইলে ধান বাড়ে" না বলিয়া "ধানে বাড়ে" বলা যায় কি?

"গাছে ফুল ধরে" এই যে দৃষ্টান্ত তিনি দিয়াছেন—এখানে "গাছে"র এ-বিভক্তি কি সপ্তমী বিভক্তি নহে? অর্থাৎ ফুলধরা ব্যাপারটা গাছে ঘটে ইহাই কি বক্তব্য নহে? এ বাক্যে "গাছে" শব্দ কি কর্তৃপদ?

"বেদে লেখে" "ইতিহাসে বলে" প্রভৃতি দৃষ্টান্তে বেদ ও ইতিহাস নিঃসন্দেহ অচেতন পদার্থরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। এখানে বেদ ও ইতিহাসকে মানুষরূপে দেখা হইতেছে।

"ইংরেজ সৈন্যদলে ভারতবর্ষে আছে" বা "কয়েদীতে জেলে আছে" এরূপ বাক্য কি বাংলাভাষায় সম্ভব?

"বালকে ঘুমায়" অচেষ্টক ক্রিয়াবিশিষ্ট এই দৃষ্টান্তটি আমার মনে আসিয়াছিল কিন্তু এরূপ প্রয়োগ চলে কিনা সে সম্বন্ধে আমার দ্বিধা দূর হয় নাই। "ঘোড়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমায়" বা "কুমীরে চোখ চাহিয়া ঘুমায়" বা "হাঁসপাতালের এই ঘরে রোগীতে ঘুমায়" এরূপ প্রয়োগ প্রচলিত কিনা সন্দেহ হইতে লাগিল।

মুস্কিল এই যে, যে সব কথা আমরা সহজেই বলিয়া থাকি তাহাদের সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন উদয় হইলে আর দিশা পাওয়া যায় না। একবার মনে হয় বুঝি এরূপ চলে, একবার মনে হয় চলে না।

"ঘুমায়" ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহাই স্থির হউক না কেন, আমি যে লিখিয়াছিলাম সচেষ্টক ক্রিয়ার যোগেই কর্তৃপদে একার বসে—এ নিয়মটিকে গ্রাহ্য করা যায় না। "প্রেগে স্ত্রীলোকেই অধিক মরে" এস্থলে মরা ক্রিয়া অচেষ্টক সন্দেহ নাই। "বেশি আদর পেলে ভালমানুষেও বিগড়ে যায়", "অধ্যবসায়ের দ্বারা মূর্খেও পণ্ডিত হতে পারে", "অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কায় বীরপুরুষেও ভীত হয়" এসকল অচেষ্টক ক্রিয়ার দৃষ্টান্তে আমার নিয়ম খাটে না।

কিন্তু "আছে" ক্রিয়ার স্থলে কর্তৃপদে একার বসে না, এ নিয়মের ব্যতিক্রম এখনও ভাবিয়া পাই নাই।"

রবীন্দ্রনাথের আবেদনে সাড়া দিয়া যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মাঘ সংখ্যায় "বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিচার্য্য" নামে লেখেন :

"আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা বহুবচনের 'এ' বিভক্তি সম্বন্ধে আমার সূত্রের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন।

তাঁহার দৃষ্টান্ত এই, 'ঠেলা দিলে টেবিল উল্টে পড়ে', আমরা টেবিলে বলি না। এখানে 'ঠেলা দিলে' বলাতে টেবিলের সামান্য বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম পতন সিদ্ধ হইল না। 'ইংরেজ সৈন্যদল ভারতবর্ষে আছে'—এখানে সৈন্যদলে হইতে পারে না। কারণ থাকা না থাকা কেবল সৈন্যদলের সামান্য ধর্ম্ম নহে। 'গাছে ফুল ধরে' এখানে ধর ধাতুর কর্ম্ম ফুল বলিতে হইবে। ধর ধাতু অকর্ম্মকও হয়। যেমন, জল ধরিয়াছে, মেঘ ধরিয়াছে, এসব স্থলে ধর ধাতুর অর্থ বিরাম। আমার বোধ হয়, সামান্য ধর্ম্ম প্রকাশ ব্যতীত কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ উদ্দেশ্য হইলেও বহুবচনে এ লাগে। যেমন টাকায় টাকা করে, নদীতে নামিও না কুমীরে কামড়াবে। কর্ত্তা কারক ভিন্ন অন্য কারকেও সে কারক স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে হইলে বিভক্তি দিতে হয়।"

১৩১৮ কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ. ৯৫-৯৬) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ' "বাংলা নির্দেশক" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' নামে আলোচনা করেন।

বর্তমান গ্রন্থের 'আলোচনা' পর্যায়ে 'নিছনি' শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে পাদটীকায় রবীন্দ্রসংগীতে 'নিছনি' শব্দ ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে সেই গানটির পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত (মজুমদার পাণ্ডুলিপি : পৃ. ২৪)। ইহা ১২৯৯ বঙ্গাব্দের পূর্বে রচিত।

কালচার ও সংস্কৃতি

'ইংরেজি culture শব্দের বাংলা লইয়া' রবীন্দ্রনাথের ভাবনার পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় শান্তিনিকেতন পত্র ১৩২৬ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রতিশব্দ' প্রবন্ধে (বর্তমান গ্রন্থে প্রতিশব্দ ৪ : পৃ ১৯০-৯১)। সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে (৪ আষাঢ় ১৩৩৯) প্রশ্নটি আবার ওঠে 'প্রথমত culture শব্দের বাংলা একটি করতে হবে…' (বর্তমান গ্রন্থে প্রতিশব্দ ১৪ : পৃ ১৯৮-৯৯ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইতিমধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার পরবর্তী কালে লেখেন—

"…কালচার শব্দের মূলে আছে লাতীনের cultura 'কুলতুরা' শব্দ; এই

শব্দ লাতীনের col 'কোল' ধাতু থেকে হ'য়েছে, col অর্থে 'কৃষ্, চাষ করা', আবার 'যত্ন' করা', 'পূজা করা'-ও হয়। culture-এর অনুরূপ প্রতিশব্দ 'উৎকর্ষ-সাধন' বেশ হ'তে পারে, খালি 'উৎকর্ষ' শব্দও চ'লতে পারে। 'টানা' ও পরে 'লাঙল টানা' বা 'চাষ করা' অর্থে, 'কৃষ্' ধাতু থেকে জাত 'কৃষ্টি' শব্দটিকে অর্থের দিক থেকে culture-এর প্রতিরূপ শব্দ মনে ক'রে, বাঙলায় ব্যবহার করা হ'তে থাকে বোধ হয় গত তিরিশ বছরের ভিতরে। বঙ্কিমচন্দ্র culture অর্থে 'অনুশীলন' শব্দ ব্যবহার ক'রেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও 'কৃষ্টি' শব্দটি গতানুগতিকভাবে গ্রহণ ক'রে থাকবেন— যদি তিনি স্বয়ং এই শব্দটি বাঙলায় চালিয়ে না থাকেন। 'কৃষ্টি'র অর্থগত পরিবর্তন বৈদিক আর সংস্কৃত সাহিত্যে যা দেখা যায়, তা থেকে কিন্তু বাঙলায় গৃহীত এর culture-অর্থ সমর্থিত হয় না।... 'চাষ'-অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দ পরবর্তী সংস্কৃতে মেলে— culture-অর্থে নয়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' শব্দটি সম্বন্ধে একটু অস্বস্তিতে ছিলেন।

'সংস্কৃতি' শব্দ culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই খুশী হন। এই শব্দটি বাঙলায় এখন থেকে ২৪।২৫ বছর আগে কেউ ব্যবহার ক'রেছেন কিনা জানি না। 'সংস্কার' শব্দটি অবশ্য পাওয়া যায়, তা কিন্তু culture-অর্থে নয়; কতকগুলি সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান (যেমন, বিবাহ-সংস্কার), আর 'সংস্কৃতি' শব্দটি culture বা civilization অর্থে আমি পাই প্রথমে ১৯২২ সালে প্যারিসে, আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে। culture-এর বেশ ভালো প্রতিশব্দ ব'লে শব্দটি আমার মনে লাগে। আমার বন্ধু শব্দটি পেয়ে আমার আনন্দ দেখে একটু বিস্মিত হন— তিনি ব'ললেন যে তাঁরা তো বহুকাল ধ'রে মারাঠী ভাষায় এই শব্দ ব্যবহার ক'রে আস্‌ছেন।[১]

১৯২২ সালে দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করি। 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি আগে থাকতেই এই শব্দটি পেয়েছিলেন কিনা, জানি না—সম্ভবতঃ শব্দটি তাঁর অবিদিত ছিল না। তবে আমার বেশ মনে আছে, culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে

১ দ্রষ্টব্য, কালচার ও সংস্কৃতি: ২, পৃ. ২০৮

'সংস্কৃতি' শব্দ সম্বন্ধে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করেন, 'কৃষ্টি' শব্দ আর ব্যবহার করা ঠিক হয় না, একথাও বলেন।"...

—সোনার বাংলা, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৩

অপিচ 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস', ১৯৭৬, পৃ. ৭-৮

সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' সম্বন্ধে যে বিরূপতা প্রকাশ করেন তাহার প্রতিধ্বনি অন্যত্রও আছে—

...রাজা। ওহে ইস্কাবনের গোলাম!

গোলাম। কী রাজাসাহেব!

রাজা। তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম। আমি তাসদ্বীপপ্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা। কৃষ্টি! এটা কী জিনিস। মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো।

গোলাম। না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন— নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।...

গোলাম। টেক্কাকুমারী, বিবিসুন্দরী, মনে রেখো, আমার হাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভ।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, তাসদ্বীপের কৃষ্টি। বাঁচাও সেই কৃষ্টি।

গোলাম। জারি করো বাধ্যতামূলক[১] আইন।

রাজা। অর্থাৎ?

গোলাম। কান-মলা মোচড়ের আইন।

রাজা। বুঝেছি। রানীবিবি, তোমার কী মত। বাধ্যতামূলক আইন এবার তবে চালাই?

রানী। বাধ্যতামূলক আইন অন্দরমহলে আমরাও চালিয়ে থাকি— দেখব, কে দেয় কাকে নির্বাসন।

টেক্কাকুমারীরা (সকলে)। আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।

গোলাম। এ কী হল। হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি!...

—তাসের দেশ, দ্বিতীয় দৃশ্য

---

১ দ্রষ্টব্য, ভাষার খেয়াল, পাদটীকা, পৃ. ২১৪

"...আমাদের পেট ভরাবার জন্যে, জীবনযাত্রার অভাব মোচন করবার জন্যে আছে নানা বিদ্যা, নানা চেষ্টা; মানুষের শূন্য ভরাবার জন্যে, তার মনের মানুষকে নানাভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে আছে তার সাহিত্য তার শিল্প। মানুষের ইতিহাসে এর স্থান কী বৃহৎ, এর পরিমাণ কী প্রভূত। সভ্যতার কোনো প্রলয়ভূমিকম্পে যদি এর বিলোপ সম্ভব হয় তবে মানুষের ইতিহাসে কি প্রকাণ্ড শূন্যতা কালো মরুভূমির মতো ব্যাপ্ত হয়ে যাবে। তার 'কৃষ্টি'র ক্ষেত্র আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায়; তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনকেই করে তুলেছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।..."

—"সাহিত্যতত্ত্ব" (১৩৪০), 'সাহিত্যের পথে'

"...আমার এ গ্রন্থে [বাংলা ভাষা পরিচয়] ব্যাকরণের বন্ধুর পথ একেবারেই এড়াতে পারি নি, প্রতি মুহূর্তে পদস্খলনের আশঙ্কায় কম্পান্বিত আছি। ভয় আছে, পাছে আমার স্পর্ধা দেখে তাত্ত্বিকেরা 'হায় কৃষ্টি' 'হায় কৃষ্টি' বলে বক্ষে করাঘাত করতে থাকেন।"...

—'বাংলা ভাষা পরিচয়' (১৯৩৮) গ্রন্থে উদ্‌ধৃত পত্র

"...অবকাশের ভূমিকায় মানুষ সর্বত্রই আপন অমরাবতী রচনায় ব্যস্ত, সেখানে তার আকাশ-কুসুমের কুঞ্জবন। এই-সব কাজে সে এত গৌরব বোধ করে যে, চাষের কাজে তার অবজ্ঞা। আধুনিক বাংলা ভাষায় সে যাকে একটা কুশ্রাব্য নাম দিয়েছে 'কৃষ্টি', হাল লাঙলের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই, এবং গোরুকে তার বাহন বললে ব্যঙ্গ করা হয়।..."

—'মানুষের ধর্ম' (১৩৪০)

"যে সুনিবিড় সুনিয়মিত ছন্দ আমাদের স্মৃতির সহায়তা করে তার অত্যাবশ্যকতা এখন আর নেই। একদিন খনার বচনে চাষবাসের পরামর্শ লেখা হয়েছিল ছন্দে। আজকালকার বাংলায় যে 'কৃষ্টি' শব্দের উদ্ভব হয়েছে, খনার এই সমস্ত কৃষ্টির ছড়ায় তাকে নিশ্চিত এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের কৃষ্টি প্রচারের ভার আজকাল গদ্য নিয়েছে।..."

—"গদ্যছন্দ" (বৈশাখ ১৩৪১), 'ছন্দ'

প্রতিশব্দ-প্রসঙ্গ ৪॥ সেনট্রিপীটাল ও সেনট্রিফ্যুগাল ফোর্সের প্রতিশব্দ হিসাবে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিক শব্দের ব্যবহার ভারতী ১২৮৪ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বঙ্গে সমাজ বিপ্লব' প্রবন্ধে দৃষ্ট হয়। এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে।

উক্ত শব্দ দুইটির ব্যবহার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধেও আছে।

বাংলা কথ্যভাষা [১]॥ এই প্রসঙ্গে বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০) লেখেন—

আমাদের 'শান্তিনিকেতন' নামক ছোট একটি পত্রে 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বাংলা শব্দ উচ্চারণ লইয়া দুই-একটা কথা বলিয়াছিলাম এবং সেইসঙ্গে ব্যাকরণ ঘটিত মন্তব্যও কিছু ছিল। আপনি তাহা লইয়া 'প্রবাসী'তে যে মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার প্রতিলিপিখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। বাংলা ভাষার সোদরা ভাষাগুলির সহিত পরিচয় না থাকাতে এ সকল বিষয়ে অনেক কথাই আন্দাজে বলিয়া থাকি। কিন্তু আন্দাজে বলারও একটা গুণ এই যে তাহাতে আলোচনার ও সংশোধনের অবকাশ দেওয়া হয়। চাণক্যের উপদেশ (যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে) যদি শিরোধার্য করিয়া লইতাম তবে তাহা শোভন হইত কিন্তু কল্যাণকর হইত না— আমার তরফে এইমাত্র কৈফিয়ৎ। দুই অক্ষরের বিশেষণ বাংলা ভাষায় স্বরান্ত হইয়া থাকে এই নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের কোনো পাঠকের নিকট হইতে প্রতিবাদ পাইয়াছি এবং এবারকার 'শন্তিনিকেতন' পত্রে এই নিয়মের কচিৎ অন্তথা সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এই সম্ভাবনা আমার পূর্বেও জানা ছিল কিন্তু উক্ত নিয়মের উল্লেখ নিতান্ত প্রসঙ্গক্রমে ঘটাতে ভাষাপ্রয়োগে সতর্ক হইতে ভুলিয়াছিলাম। যাহা হউক আপনার মন্তব্য সম্বন্ধে আমার যাহা প্রশ্ন আছে তাহা পৌষের শান্তিনিকেতনে প্রকাশ করিব এবং আপনাকে পাঠাইয়া দিব। বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয়— কারণ ইহাতে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য আছে কিন্তু আমার সম্বল বেশি নাই, তাই আন্দাজ লইয়া আমার কারবার। আমার মত ইস্কুলপলাতক ছেলের এই দুর্গতি।··· ৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

এই পত্রে উল্লিখিত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' যাহা পৌষের শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত হয় তাহা বর্তমান গ্রন্থে

'বাদানুবাদ ২' নামে গ্রথিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'বাদানুবাদ ২'-এ রবীন্দ্রনাথ 'কবিরাজ মহাশয়ের নির্দেশমত' সে সংশোধনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, বর্তমান গ্রন্থে 'বাংলা কথ্যভাষা [১]' প্রবন্ধটিতে তাহা সন্নিবিষ্ট করা হয় নাই। সাময়িক পত্রে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই মুদ্রিত হইয়াছে।

শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক॥ প্রবাসীতে প্রকাশিত এই প্রবন্ধের সূত্রে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ও শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য যে মন্তব্য করেন তাহা প্রবাসীর ফাল্গুন-সংখ্যায় (পৃ. ৭১১-১৩) প্রকাশিত হয়।

বাংলার বানান সমস্যা॥ চলিত ভাষার বানান সম্বন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যে-প্রসঙ্গ আছে তাহার উল্লেখ শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষকে লিখিত এই পত্রেও দেখা যায়—

চলতি বাংলার বানান সম্বন্ধে প্রশান্ত বিধান নিয়েছিলেন সুনীতির কাছ থেকে। নিয়মগুলো মনে রাখতে পারি নে, অন্যমনস্ক হয়ে হাজারবার লঙ্ঘন করি। সেইজন্যে অসঙ্গতি সর্ব্বদাই দেখা যায়।

যে হেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সর্ব্বদাই লিখতে হচ্চে সেইজন্যে অনেক নূতন ধ্বনির জন্যে নূতন অক্ষর রচনা করা আবশ্যক— আমাদের মনটা অত্যন্ত সাবেক কেলে বলে শীঘ্র এর কোনো কিনারা হবে বলে বোধ হয় না।

প্রাকৃত বাংলার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বেড়ে চলেচে কিন্তু ভাষার এই যুগান্তরের সময় হাওয়াটা এলোমেলো ভাবেই বইচে। এ সময়কার কর্ণধারের কাজ সুনীতির নেওয়া উচিত— আমার বয়স হয়ে গেছে।

প্রাকৃত বানানের বিধিবিধান মনে রেখে প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব বলেই অন্যদের হাতে সে ভার পড়েচে— সেই অন্যরাও নানাবিধ মানুষের মধ্যে বিভক্ত সেই কারণেই উচ্ছৃঙ্খলতার অন্ত নেই। ইতি ১৯ ভাদ্র ১৩৩৮।

'কেবল প্রাকৃত বাংলার অভিধান'ই নয়, 'নূতন অক্ষর রচনা সম্বন্ধে'ও তিনি সুনীতিকুমারের মত 'প্রত্যাশা' করিয়াছিলেন।— ১৩৩৪ সালের ৯ অগ্রহায়ণ তারিখে তিনি সুনীতিকুমারকে লেখেন :

"নূতন অক্ষর রচনা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল সেটাকে কাজে খাটাবার সময় এল। বিচিত্রা সম্পাদক তোমার নির্দ্দেশ অনুসারে অক্ষর ঢালাই করতে রাজি আছেন এবং তুমি সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করে যদি কিছু লেখ তাঁরা সেটাকে

প্রকাশ করতে চান— এ সম্বন্ধে এ দেশে তোমার মতই সব চেয়ে প্রামাণ্য এই কারণে বাংলা বর্ণমালায় নূতন অক্ষর যোজন তোমার মত ধ্বনিতত্ত্ববিশারদের কাছেই প্রত্যাশা করি।…”

বাংলা বানান ২ ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক নিযুক্ত বাংলা বানান-সংস্কার সমিতি যে ‘বাংলা বানানের নিয়ম’ (মে ১৯৩৬) প্রকাশ করেন তাহার ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লেখেন :

“কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। গত নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম-সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতিকে ভার দেওয়া হয়— যে সকল বানানের মধ্যে ঐক্য নাই সে সকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধা না থাকে তবে কোনো কোনো স্থলে প্রচলিত বানান সংস্কার করা। প্রায় দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন।”

এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণের (অক্টোবর ১৯৩৬) সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মতির পাণ্ডুলিপিচিত্র বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল :

“বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১লা আশ্বিন ১৩৪৩”

বানান-বিধি ১-২ ॥ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষের যে পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি পত্র লেখেন সেই পত্র এবং রবীন্দ্রনাথের পত্রের পূর্ণতর পাঠ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ -প্রণীত ‘বাংলা ভাষা ও বাণান’ (১৩৪৬) গ্রন্থভুক্ত।

‘রোচনা’ পত্রিকায় বাংলা বানান সংস্কার বিষয় অসিতকুমার হালদার যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ১১ জুলাই ১৯৩৫এ লিখেছিলেন :

“বানান সংস্কার পড়লুম। তিন সয়ের মধ্যে মূর্ধন্য ষ কে রক্ষা করার অর্থ বুঝিনে। শ বাংলা উচ্চারণে ব্যবহার হয়, বাকি দুটো হয় না। জ-এর

বদলে য ব্যবহার করাও ভ্রমাত্মক। বাংলায় অন্তঃস্থ য কে আমরা বর্গীয় জ-এর মতোই উচ্চারণ করি। অন্তঃস্থ য-এর উচ্চারণ বাংলায় নেই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে বাংলা দেশে কামাল পাশার আবির্ভাব যদি হয় তবেই বর্তমান প্রচলিত বানানের পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে, যুক্তিতর্কের দ্বারা হবে না।"

—"চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ",
উত্তরা, কার্তিক ১৩৫৭, পৃ. ২১০

চিহ্নবিভ্রাট প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত যে পত্রটি ভূমিকাস্বরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাতে প্রতিশব্দ প্রসঙ্গ রহিয়াছে—সেই বিচারে এই ভূমিকাটি 'প্রতিশব্দ'-প্রসঙ্গেও বিবেচ্য।

বাংলা ভাষা ও বাঙালি চরিত্র ১-২। দুইটি প্রবন্ধই শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত 'পারিবারিক খাতা' পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী প্রথম প্রবন্ধটির রচনা-তারিখ ২২ কার্তিক ১২৮৮, সেই বিচারে ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম শব্দতত্ত্ব-বিষয়ক লিখিত রচনা। প্রবন্ধটি ভারতী ১৩২৪ বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বর্তমান গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত হইল।

পারিবারিক খাতায় নানা সূত্রে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে শব্দতত্ত্ব-বিষয়ক মন্তব্য পাওয়া যায়: যথা—

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নলিখিত মন্তব্যের—

> "Citizen ও নাগর এ উভয়েরই অর্থ নগরবাসী কিন্তু উহাদের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। ই জ্যো ঠা ১৬।১১ ১৮৮৮"

সূত্রে R. T. অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"রসিক কথাটার বাঙ্গলা মানে ভাবুক অথবা বিশুদ্ধ Humorous নহে। রসিক কথাটার মধ্যে নাগর শব্দের মত একটা মলিন ভাব আছে। R. T. ১৭।১১।৮৮"

পরিশিষ্ট

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ। রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যায়ক্রমে বৈষ্ণবপদাবলী প্রকাশের কাজে যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন, আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময়নির্ণয় সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা তখনো ছিল, এখনো আছে। সেই কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে যাঁরা ঐতিহাসিক বলে ধরে নেন তাঁরা প্রায়ই ঠকেন। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাল অনুমান করা অনেকটা সহজ। বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স যোলোর কাছাকাছি, বিলাতে যখন গিয়েছি তখন আমার বয়স সতেরো। নূতন-প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়ি করছি, সে আরো কিছুকাল পূর্বের কথা। ধরে নেওয়া যাক, তখন আমি চোদ্দয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড পদাবলীগুলি প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না।...

"পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হোত আমার কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিই নি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরি করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি।..."

জীবনস্মৃতিতে "ভানুসিংহের কবিতা" অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় -কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম।"

এই 'অধ্যবসায়ে'র অন্যতম নিদর্শন ১২৮৮ সালের ভারতীপত্রে প্রকাশিত 'প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ (বিদ্যাপতি)', 'প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ/উত্তর-প্রত্যুত্তর', 'বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট' প্রবন্ধ। শ্রাবণ ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যায় এই আলোচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল ; সূচীপত্রে বা প্রথম প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই ; দ্বিতীয় সংখ্যায় আলোচনা-প্রসঙ্গে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রস্তাব-লেখক।' এইরূপ উল্লেখ আছে। 'বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট' স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ ; এই প্রবন্ধেও প্রথম প্রবন্ধটি যে তাঁহার রচনা সে কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'জিজ্ঞাসা ও উত্তর', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ১২৯০, বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ-সংক্রান্ত আলোচনার পাঁচ বৎসর পরে ১২৯৩ সালে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত' 'বিদ্যাপতির পদাবলী' প্রকাশের বিজ্ঞাপন বাহির হয় :

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যাপতির পদাবলী।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত

ও

শ্রীগোবিন্দ লাল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রায় দশ বৎসরকাল রবীন্দ্র বাবু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই সম্পাদকীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলী যথাসম্ভব নির্দ্দোষ ও নির্ভুল হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত কয়েকটী সংস্করণে পদের বা টীকার যত ভুল আছে, এই গ্রন্থে প্রায় সে সমস্ত সংশোধিত হইল। ফল কথা, সেই প্রাচীন, শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে—এবং যাবতীয় বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর ভাষা বুঝিতে হইলে— রবীন্দ্র বাবু কর্তৃক সম্পাদিত এই সুন্দর, মনোহর পদাবলী সকলেরই ক্রয় করা উচিত।

১৫০ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত।

মূল্য আট আনা মাত্র।

অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

পিপেল্‌স্ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

—সাবিত্রী, আশ্বিন ১২৯৩

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতি-চর্চায় নিদর্শন প্রসঙ্গে অপিচ দ্রষ্টব্য 'রূপান্তর' গ্রন্থ (১৩৭২)।

বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা॥ ইহা পুস্তিকাকারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একটি নিবেদনসহ প্রচারিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত একখণ্ড পুস্তিকা হইতে উহা মুদ্রিত হইল :

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ সংকলন। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরিষৎ সর্বপ্রথমে বাংলাভাষার যাবতীয় শব্দ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্বে পরিষৎ পত্রিকায় বিদ্যাপতির শব্দসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। মধ্যে দু-একজন মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তি স্ব স্ব ইচ্ছামতো শব্দসংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একটা প্রণালী অনুসারে সংগ্রহকার্য চলিতে না থাকিলে কোনোদিন কার্যের উন্নতি এবং সমাপ্তি ঘটিবে না, এই বিবেচনায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংগৃহীত 'বাংলা ক্রিয়াপদের' তালিকা প্রকাশ করিয়া আপনাদের নিকট পাঠাইতেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের একান্ত অনুরোধ, আপনি বা আপনার-বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে এই তালিকার অতিরিক্ত বাংলাক্রিয়াপদের সংগ্রহ করিয়া দিলে পরিষদের বিশেষ সাহায্য হইবে। সংগ্রহ বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি—

১। শব্দটির চলিত উচ্চারণ অর্থাৎ কথোপকথনে যে উচ্চারণ ব্যবহৃত হয়, তাহাই লিখিবেন; তাহাকে শুদ্ধ করিয়া বা লিখিত ভাষায় কিরূপে ব্যবহার করিলে ভালো হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া তদনুসারে তাহার উচ্চারণ পরিবর্তন করিবেন না।

২। আপনি যে-জেলার অধিবাসী সেই জেলার উচ্চারণ অনুসারে লিখিবেন। যদি আপনি প্রবাসী অর্থাৎ এখন যে-জেলায় বাস করেন সে-জেলার অধিবাসী না হন, তবে আপনার স্বদেশী উচ্চারণ অনুসারে লিখিবেন, এবং সুবিধা হইলে প্রবাসের উচ্চারণও দিবেন।

৩। বাংলাভাষায় শব্দসংগ্রহ সকল জেলা হইতেই হওয়া আবশ্যক; এমন অনেক কথা আছে যাহা এক স্থানে প্রচলিত, কিন্তু অন্য স্থানে নাই বা অন্য স্থানে তৎপরিবর্তে অন্য শব্দ চলিত আছে। এ-সকল শব্দও সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। হয়তো এমন শব্দও আছে, যাহার উচ্চারণ নানা স্থানে এক কিন্তু অনেক স্থলে অর্থভেদ আছে। সেগুলির অর্থ পর্যন্তও সংগৃহীত হওয়া উচিত।

৪। স্বতন্ত্র কাগজে বা এই পুস্তিকার মধ্যে বর্ণানুক্রমে শব্দ সংগৃহীত হইলেই ভালো হয়।

৫। কেবল যে ক্রিয়াপদই সংগ্রহ করিতে হইবে এরূপ নহে; অবসর সুবিধা এবং ইচ্ছাক্রমে এইরূপে অন্যান্য শ্রেণীর শব্দ এবং কৃষিদ্রব্য, গৃহজাত দ্রব্য, গৃহসজ্জার দ্রব্য, মৎস্য, বৃক্ষ, লতা, শিল্পদ্রব্য প্রভৃতির নামাদি সংগ্রহ করিলে পরিষদের বিশেষ উপকার হইবে।

শব্দচয়ন॥ এই সংকলন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পাঠ ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরণকালে রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে যে-পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অংশত উদ্ধৃত হইল—

"প্রতিশ্রুতি পালন করা গেল।... জিনিষটা যে পাঠালুম তার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে এই প্রণালীতে আরো অনেক উৎসাহী লোক সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে বাংলার ভাণ্ডারে শব্দ আহরণ করবেন। তোমাদের পত্রিকায় চারদিকে ডাক পৌঁছবে কিনা জানি না। যাই হোক আমার উৎসাহ আছে পাণ্ডিত্য নেই, সেইজন্যে দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি বেশি দূর এগিয়ে দিতে পারিনে। এই কাজের জন্যে আমি ঘেঁটেচি অমরকোষ, মনিয়ার বিলিয়মস্, আপ্তে এবং বিল্‌সনের অভিধান। ভুলচুক থাকতেও পারে, যাঁদের বিচার করবার অধিকার তাঁরা বিচার করবেন।... এই উপলক্ষ্যে প্রশ্ন এই যে সংকলন synthesis এবং বিকলন analysis অর্থে ব্যবহার করা চলে কি না? কলা শব্দের অর্থ খণ্ড, কলাগুলিকে একত্র করাই সংকলন, বিযুক্ত করাই বিকলন। ব্যবকলন কথাটা গণিতে চলেচে অতএব কাজে লাগবে না।..."

সংযোজন : শব্দচয়ন ৩

নন্দনবিদ্যা—aesthetics

সৌজাত্যতত্ত্ব—Eugenics

—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে

যথাক্রমে ২৪ জুলাই ১৯৩৩ ও ২১ ভাদ্র ১৩৩৮ তারিখে লিখিত পত্র।

শব্দতত্ত্ব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক
ব্যবহৃত গ্রন্থের বিবরণ

বর্তমান গ্রন্থে "বাংলা শব্দদ্বৈত" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্রুগ্‌মানের 'ইণ্ডো-জর্মানীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ'-এর উল্লেখ করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে কার্ল ব্রুগ্‌মানের *Elements of the Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages* গ্রন্থের যে-কপিটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। এই কপির অনেক পৃষ্ঠায় পেন্সিলে তাঁহার মার্জিন-নোট দৃষ্ট হয়।

কেবল এই গ্রন্থই নয়, রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অন্তত নয়টি গ্রন্থে শব্দতত্ত্ব-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহারের নিদর্শন আছে। যেমন, কৃত্তিবাস-বিরচিত রামায়ণের একটি সংস্করণে দুই মলাটে গ্রন্থখানি পাঠ-কালে বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ ও বিভক্তির প্রয়োগ যাহা পাইয়াছেন সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠাসংখ্যা-উল্লেখসহ কালিতে নোট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া সমগ্র গ্রন্থটির ক্রিয়াপদ সর্বনাম ও বিভক্তির বিশিষ্ট প্রয়োগক্ষেত্রে শব্দগুলির নীচে চিহ্নিত করিয়াছেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-রচিত *Tne Origin and Development of the Bengali Language*-এর একটি পৃষ্ঠায় স্ত্রীলিঙ্গে নী প্রয়োগসূত্রে মার্জিনে পেন্সিলে নোট করা আছে:

'উকীলনী কেন হল না?' 'ব্যারিষ্টারনী হতে আটক নেই।'

চন্দ্রমোহন ঘোষ-সম্পাদিত 'প্রাকৃতপৈঙ্গলম্' গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বিভিন্ন প্রাকৃত শব্দের পাশে মার্জিনে আনুষঙ্গিক বাংলা শব্দ নোট করা হইয়াছে। যেমন, 'ণিব্বুড্ডং' শব্দের পাশে নোট আছে: 'বুড়ে যাওয়া' 'ডুবে যাওয়া'; 'হুল্লসি' শব্দের পাশে: 'জল ঘোলানো'; 'ওগ্‌গর' শব্দের পাশে: 'ওকড়া—খিচুড়ি ঈষৎ গলিত'।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মনিয়ের মনিয়ের উইলিয়ম্‌সের *Sanskrit-English Dictionary*। এই অভিধানটির উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে করিয়াছেন, ব্যবহৃত অভিধানটির বহু শব্দ চিহ্নিত। মার্জিনে পেন্সিলে নোট-এ কোথাও বাংলা শব্দ, কোথাও ইংরেজির সহিত বাংলা শব্দ উদ্‌ধৃত।

রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব-বিষয়ক আগ্রহ ও অধ্যবসায় সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ আলোচনা করিবেন তাঁহাদের নিকট এই ব্যবহৃত গ্রন্থগুলি বিশেষ সহায়স্বরূপ। বর্তমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কৃত নোট-এর বিস্তারিত আলোচনা বাহুল্য। আমাদের দৃষ্ট গ্রন্থগুলির আখ্যাপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :

১. THE/PRAKRITA-PRAKASA :/or,/the Prakrit Grammar/of/Vararuchi,/with the commentary (Manorama) of Bhamaha./The First Complete Edition/of the Original Text···/···/by/E. B. Cowell, M. A.,/···/London :/Trubner & Co., 60, Patern Oster Row./1868.

২. চণ্ডীদাস/কৃত/পদাবলি।/শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার কর্তৃক/সম্পাদিত।/চুঁচুড়া।/ সাধারণী যন্ত্রে শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক/মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/১২৮৫/···

৩. HANDBOOK OF PALI/Being/An Elementary Grammar,/a Chrestomathy, and a Glossary./Compiled by/O. Frankfurter. Ph. D./···/ Williams and Norgate,/14, Henrietta Street, Covent Garden, London ;/and 20, South Frederick Street, Edinburgh./1883.

৪. ELEMENTS/OF THE/COMPARATIVE GRAMMAR/OF THE/ INDO-GERMANIC LANGUAGES./a concise exposition/of the history/of Sanskrit, old Iranian (Avestic and old Persian), old Armenian,/old Greek, Latin, Umbrian-Samnitic, old Irish, Gothic, old High/German, Lithuanian and old Bulgarian/by/Karl Brugmann, /···/London/Trubner & Co., Ludgate Hill/Strassburg,/Karl J. Trubner./1888.

৫. A/SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY/Etymologically and Philologically arranged/with special reference to/Cognate Indo-European languages/by/Sir Monier Monier-Williams.../.../new edition, greatly enlarged and improved/.../Oxford/at the Clarendon Press/1899.

৬. PRAKRITA-PAINGALAM/···/Edited and Supplemented/with a complete Index and Glossary of all Prakrita words in the text/By /Chandramohan Ghosha, M.B., B.A.,/.../Calcutta :/Printed at the Baptist Mission Press,/1902.

৭. সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী -সং ৫৮/শ্রীকৃষ্ণকীর্তন/মহাকবি চণ্ডীদাস-

বিরচিত/শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত/…কলিকাতা/২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে/… প্রকাশিত।/ ১৩২৩/…

৮. THE/ORIGIN AND DEVELOPMENT OF / THE BENGALI LANGUAGE / by / Suniti Kumar Chatterji /… Part II / Calcutta University Press/1926.

৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাচ্যগ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক ৪ / মহাকবি কৃত্তিবাস-বিরচিত/রামায়ণ/আদিকাণ্ড/…/শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী…/সম্পাদিত।/ University of Dacca./ 1936/…

মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত

রামায়ণ

আদিকাণ্ড

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ, পিএইচ-ডি

সম্পাদিত

কৃত্তিবাস-বিরচিত রামায়ণের একটি সংস্করণ ব্যবহারকালে মলাটে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ, বিভক্তি ও সর্বনামের উল্লেখ

lateral movement

अनुपरे *anu-paré* (*-parā-*√i), (Imper. 2. sg. *-párehi*; impf. *-párait*) to follow in walking off, RV. x, 18, 1; TS.

अनुपर्यागा *anu-pary-ā-*√1. *gā* (aor. 3. pl. *-āgur*) to revolve, return to, AitBr.

अनुपर्याधा *anu-pary-ā-*√*dhā* (Pot. *-dadhyāt*) to place round in order, AitBr.

अनुपर्यावृत् *anu-pary-ā-*√*vṛit*, to follow in going off, to follow, TS.; ŚBr.; AitBr.

अनुपर्युक्ष् *anu-pary-*√1. *ukah*, to sprinkle round, Gobh.; Gaut.

अनुपर्ये *anu-pary-é* (*-ā-*√i), *-pary-éti*, to make the whole round of, ŚBr. &c.

अनुपलक्षित *an-upalakshita*, mfn. untraced, unperceived, unmarked, indiscriminated.

An-upalakshya, mfn. not to be traced, imperceptible. **-vartman**, mfn. having ways that cannot be traced.

अनुपलब्ध *an-upalabdha*, mfn. unobtained, unperceived, unascertained.

An-upalabdhi, *is*, f. non-perception, non-recognition. **-sama**, *as*, *ā*, m. f. trying to establish a fact (e.g. the reality and eternity of sound) from the impossibility of perceiving the non-perception of it, sophistical argument, Nyāyad.

An-upalabhyamāna, mfn. not being perceived, Pāṇ. vi, 3, 80, Sch.

An-upalambha, *as*, m. non-perception.

An-upalambhana, *am*, n. want of apprehension or knowledge.

An-upalābha, *as*, m. not catching, TS.

अनुपलाल *anupalāla*, *as*, m., N. of a demon dangerous to children, AV. viii, 6, 2.

अनुपवीतिन् *an-upavītin*, *ī*, m. one uninvested with the sacred thread.

अनुपश् *anu-*√*paś*, P. Ā. *-paśyati*, °*te*, to look at, perceive, notice, discover, RV. &c.; to consider, reflect upon (acc.), MBh. &c.; to look upon as, take as, ib.; (perf. Ā. p. *-paspaśāná*) to show (to the path), RV. x, 14, 1; AV. vi, 28, 3; (Nir. x, 20.)

Anu-paśya, mfn. perceiving, seeing, Yogas.

Ánu-spashṭa, mfn. noticed, RV. x, 160, 4.

अनुपशय *an-upaśaya*, *as*, m. any aggravating circumstance (in a disease).

अनुपशान्त *an-upaśānta*, mfn. not calm; (*as*), m., N. of a Buddhist mendicant.

अनुपसर्ग *an-upasarga*, *as*, m. a word that is not an Upasarga, q.v., or destitute of one; that which needs no additions (as a divine being).

अनुपसेचन *an-upasecaná*, mfn. having nothing that moistens (e.g. no sauce), AV. xi, 3, 24.

अनुपस्कृत *an-upaskṛita*, mfn. unfinished, unpolished; not cooked; genuine; blameless; unrequited.

अनुपस्थान *an-upasthāna*, *am*, n. not coming near, Lāṭy.; not being at hand, absence.

An-upasthāpana, *am*, n. not placing near, not producing, not offering; not having ready or at hand.

An-upasthāpayat, mfn. not presenting, not having at hand.

An-upasthāpita, mfn. not placed near, not ready, not at hand, not offered or produced.

An-upasthāyin, mfn. absent, distant.

Án-upasthita, mfn. not come near, not present, not at hand; not complete, ŚBr.; (*am*), n. a word not *upasthita*, q.v.

Án-upasthiti, *is*, f. absence, not being at hand; incompleteness, ŚBr.

अनुपहत *an-upahata*, mfn. unimpaired, unafflicted; not ...

Anu-pāna, *am*, n. a fluid vehicle in medicine; drink taken with or after medicine; drink after eating; drink to be had near at hand, (Comm. on) ChUp. i, 10, 3.

Anu-pānīya, *am*, n. drink to be had near at hand, Comm. on ChUp. i, 10, 3; (mfn.), fit to be drunk after; serving as a liquid vehicle of medicine.

अनुपा 2. *anu-*√2. *pā*, Caus. P. Ā. *-pālayati*, °*te*, to preserve, keep, cherish; to wait for, expect.

Anu-pālana, *am*, n. preserving, keeping up.

Anu-pālayat, mfn. keeping, maintaining.

Anu-pālin, mfn. preserving, keeping up.

Anu-pālu, n., N. of a plant, wild Caladium (?).

अनुपाकृत *an-upākṛita*, mfn. not rendered fit for sacrificial purposes, Mn. v, 7; Yājñ. **-māṃsa**, n. flesh of an animal not prepared for sacrifice.

अनुपाख्य *an-upākhya*, mfn. not clearly discernible, Pāṇ. vi, 3, 80.

अनुपात *anu-pāta*, *as*, m. falling subsequently upon, alighting or descending upon in succession; following; going, proceeding in order, or as a consequence; a degree of latitude opposite to one given, the Antæci (?); proportion (in arithm.); arithmetical progression, rule of three.

Anu-pātaka, *am*, n. a crime similar to a *mahāpātaka*, q.v. (falsehood, fraud, theft, adultery, &c.)

Anu-pātam, ind. in regular succession.

Anu-pātin, mfn. following as a consequence or result.

अनुपान *anu-pāna*. See 1. *anu-*√1. *pā*.

अनुपानत्क *an-upānatka*, mfn. shoeless, KātyŚr.

अनुपायिन् *an-upāyin*, mfn. not using means or expedients.

अनुपार्श्व *anu-pārśva*, mfn. along or by the side; lateral.

अनुपाल् *anu-*√*pāl*. See 2. *anu-*√2. *pā*.

अनुपावृत्त *an-upāvṛitta*, *ās*, m. pl., N. of a people, MBh.

अनुपासन *an-upāsana*, *am*, n. want of attention to.

An-upāsita, mfn. not attended to, neglected.

अनुपिश् *anu-*√*piś* (perf. *-pipeśa*) to fasten along, AV.

अनुपिष् *anu-*√*pish* (ind. p. *-pishya*) to strike against, to touch, KātyŚr.

अनुपुरुष *anu-purusha*, *as*, m. the before-mentioned man, Pāṇ. vi, 2, 190; a follower, ib. Sch.

अनुपुष् *anu-*√*push*, to go on prospering, VS.; to prosper after another (acc.), ShaḍvBr.

Anu-pushpa, *as*, m. a kind of reed (Saccharum Sara Roxb.)

अनुपू *anu-*√*pū*, Ā. (*ánu-pavate*) to purify in passing along, ŚBr.

अनुपूर्व *anu-pūrva*, mf(*ā*)n. regular, orderly, in successive order from the preceding; (*am*), ind. in regular order, from the first, RV. &c.; (*eṇa*), ind. in regular order or succession, from the first, from the beginning, from above downwards. **-keśa**, **-gātra**, **-daṃshṭra**, **-nābhi**, **-pāṇi-lekha**, mfn. having regular hair, regularly shaped limbs, regular teeth, a regularly shaped navel, regular lines in the hands (all these are epithets given to Buddha, some of them also to Mahāvīra), Buddh. & Jain. **-ja**, mfn. descended in a regular line, KātyŚr. **-vatsā** (*anupūrvá-*), f. a cow which calves regularly, AV. ix, 5, 29. **-śas**, ind. = *anu-pūrvam*.

Ānupūrvya, mfn. regular, orderly, KātyŚr.

अनुपृक्त *anu-pṛikta*, mfn. mixed with, MBh.

अनुपृष्ठ्य *anu-pṛishṭhya*, mf(*ā*)n. (held or ...

अनुप्त *an-upta*, mfn. (√2. *vap*), unsown (as seed). **-sasya**, mfn. fallow, meadow (ground, &c.), L.

An-uptrima, mfn. grown without being sown, L.

अनुप्रकम्प् *anu-pra-*√*kamp*, Caus. (Pot. *-kampayet*, 3. pl. °*yeyur*) to follow in shaking or agitating, AitBr.; ĀpŚr.

अनुप्रच्छ् *anu-*√*prach* (with acc. of the person and thing), to ask, to inquire after.

Anuprashṭavya. See s.v.

अनुप्रजन् *anu-pra-*√*jan*, to be born after; (with *prajām*) to propagate again and again, BhP.; Caus. *-janayati*, to cause to be born subsequently.

अनुप्रज्ञा *anu-pra-*√*jñā* (pr. p. *-jānát*) to track, trace, discover, RV. iii, 26, 8, &c.

Anu-prajñāna, *am*, n. tracking, tracing.

अनुप्रणुद् *anu-pra-ṇud* (√*nud*), to push away from one's self; to frighten away, put to flight.

अनुप्रतिक्रामम् *anu-prati-krāmam*, ind. (√*kram*), returning, TS. v.

अनुप्रतिधा *anu-prati-*√*dhā*, to offer after another (acc.), AitBr. (Pass. *-dhīyate*).

अनुप्रतिष्ठा *anu-prati-shṭhā* (√*sthā*), to follow in getting a firm footing or in prospering, TS; ChUp: Desid. *-tishṭhāsati*, to wish to get a firm footing after, Gobh.

अनुप्रथ् *anu-*√*prath*, Ā. *-prathate*, to extend or spread along (acc.), TS.; to praise, (Comm. on) VS. viii, 30.

अनुप्रदा *anu-pra-*√1. *dā*, to surrender, make over, Buddh.; to add.

Anu-pradāna, *am*, n. a gift, donation, Buddh; addition, increase, Prāt.

अनुप्रधाव् *anu-pra-*√1. *dhāv*, to rush after, RV. x, 145, 6, &c.; Caus. (perf. *-dhāvayām cakāra*) to drive after, ŚBr.

Anu-pradhāvita, mfn. hurried, eager, Daś.

अनुप्रपत् *anu-pra-*√*pat* (aor. 3. pl. *-paptan*) to fly towards, RV. vi, 63, 6.

Anu-prapātam, ind. going in succession, Pāṇ. iv, 3, 56, Sch.

अनुप्रपद् *anu-pra-*√*pad*, to enter or approach or arrive after; to follow, act in conformance to.

Anu-prapanna, mfn. following after, conformed to.

Anu-prapādam, ind. going in succession, Pāṇ. iv, 3, 56, Sch.

अनुप्रपा *anu-pra-*√1. *pā*, P. (3. pl. *-pibanti*) to drink one after the other, AitBr.; Ā. (3. pl. *-pipate* [*sic*] & *-pibate*) to drink after another (acc.), TS.; Kāṭh.

अनुप्रभा *anu-pra-*√*bhā*, to shine upon, TBr.

अनुप्रभूत *anu-pra-bhūta*, mfn. passing through, penetrating, (*ánu prá-bhūta*) RV. viii, 58, 2; penetrated, ChUp.

अनुप्रभूष् *anu-pra-*√*bhūsh* (p. *-bhūshat*) to serve, attend, offer, RV. ix, 29, 1.

अनुप्रमाण *anu-pramāṇa*, mfn. having a suitable size or length.

अनुप्रमुच् *anu-pra-*√*muc*, to let loose or go successively, RV. iv, 22, 7.

अनुप्रमुद् *anu-pra-*√*mud*, Caus. *-modayati*, to consent, MārkP.

अनुप्रयम् *anu-pra-*√*yam*, to offer, TS.

अनुप्रया *anu-pra-*√*yā*, to follow after, TBr.; to start after, accompany.

अनुप्रयुज् *anu-pra-*√*yuj*, to employ after, ...

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত মনিয়ের উইলিয়ম্‌স-এর সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের একটি পৃষ্ঠা

শব্দচয়ন : ইংরেজি বর্ণানুক্রমিক তালিকা

বাংলা শব্দতত্ত্বের বর্তমান সংস্করণে গ্রথিত প্রতিশব্দের ইংরেজি বর্ণানুক্রমিক তালিকা ; বাংলা শব্দের সহিত শব্দচয়ন বিভাগ-সংখ্যা মুদ্রিত।

[abandunt food]—স্বৈরাহার ২

abduction—অপহরণ ৩

aboriginal—মৌল ১

abstract—অবচ্ছিন্ন, নির্বস্তুক ৩

accident—উপপাত ১

accidental—আপতিক ১

according to a particular measure—যথামাত্র ১

according to a regular series—যথানুপূর্ব ১

according to each one entered—(সভাপ্রবেশ সম্বন্ধে) যথাপ্রবেশ ১

according to one's means—যথাবিত্ত ১

according to promise—যথাপ্রতিজ্ঞ ২

accurate—যথাতথ ১

act of parting with—অতিসর্গ ১

acting—সকরণ, সকারী, সক্রিয় ২

adaptable—অভিযোজ্য ৩

adaptability—অভিযুজ্যতা ৩

adaptation—অভিযোজন ৩

adapted—অভিযোজিত ৩

address—অভিদেশ, অভিনির্দেশ ৩

adduce—অভিনয়ন ৩

adequacy—পর্যাপ্তি ২

adjacent—পর্যন্তস্থিত ২ ; আসন্ন ৩

adjective—আক্ষিপ্ত ৩

adjunct—আবদ্ধ ৩

advent—অভিবর্তন ৩
advocate—অধিবক্তা ১
aesthetics—নন্দনবিদ্যা ৩ পৃ ৪১১
affectionate—স্নিগ্ধ ৩
agnostic—আজ্ঞেয়িক ৪
alarm—ভীতধ্বনি ৪
allowed—অনুজ্ঞাত ১
allusion—সংকেত, লক্ষ্য, উদ্দেশ, উদাহরণ, অভিনির্দেশ, অভিসংকেত ৩
alternative—অনুকল্প ১
amateur—শখ ৩
ambiguous speech—বক্রবাক্য ২
amiable—প্রিয়চারী ৩
amorphous—অবয়বহীন ৩
anachronism—কালবিরোধদোষ ৩
analysis—বিকলন ৩
angle, sharp side of anything—অশ্রি ১
animal husbandry—গোষ্ঠবিদ্যা ৪
announcement—অবঘোষণা ১
answer—প্রতিবাচক ১ ; প্রতিবচন, প্রতিবাক্য, প্রত্যুক্তি ২
anthology—কাব্যনিচয় ২ ; সঞ্চয়িকা ৩
any pungent food, stimulent—অবদংশ ২
apathetic—অরত ১
apathy—অনীহা ১
aping—হনুকরণ ৪
apparatus—উপস্কর ১
application—দরখাস্ত পত্রিকা ৪
appointing time—কালকরণ ১
arbitrary power—স্বপ্রভুতা ১

arising within self—স্বসমুত্থ ২
arrangement of a song—গীতক্রম ১
arrogant—দৃপ্ত ১
art institute—শিল্পালয় ১
article—নির্দেশক ৪
artisan—কারু, কারুক, শিল্পজীবী ১
artist, artificier, mechanic—কারী ২
artist—রূপদক্ষ ৩
as already mentioned—যথাকথিত ১
as previously considered—যথাচিন্তিত ১
assembly of man—জনসংসদ ১
assimilation—স্বাঙ্গীকরণ ৪
association—অনুষঙ্গ, অভিসমবায় ১ ; ভাবানুষঙ্গ ৩
association, Community—সমূহ ২
[association of idea]—ভাবানুষঙ্গ ২
asteroids—গ্রহিকা ৩
attached to—নিমিশ্র ১
automobile—স্বতশ্চালিত ৪
auto-suggestion—স্বাভিসংকেত ৩
autonomons—স্বতন্ত্রশাসিত ৩
awkward—অকুশল ৩
awkwardness—অপাটব ১
background—পটভূমিকা, পশ্চাদ্ভূমিকা, পৃষ্ঠাশ্রয়, অনুভূমিকা, আশ্রয় বা আশ্রয়বস্তু ৩
back or nape of the neck—অবটু ২
bagpipe—ব্যাগ্রপাইপ ৬
bandy legged—প্রজ্ঞু ২
baptism—অপ্দীক্ষা ১
barter—প্রতিপণ ১

bearing a date—কালসম্পন্ন ১
beautiful—কম্র ২
being only momentary—আপাতমাত্র ১
being two close—অত্যাসন্ন ২
being white—গৌরিমা ২
belonging to the last year—পরুত্তন ১
belonging to the present day—সত্তস্ক, সত্যস্তন ১
belonging to the primitve time—আদিকালীন ২
bend of a river—নদীবঙ্ক ২
better, higher—অতিতর ২
bigamy—দ্বৈধব্য
bigotry—ধর্মমূঢ়বুদ্ধি ৪
blank verse—নেড়া ছন্দ ৩
bodily symmetry, Compactness of body—অঙ্গসংহতি ২
bodyguard—ঐকাঙ্গ ১
bottomless—অবধ্ন ২
bourgeois—পরশ্রমজীবী, পরশ্রমভোগী ৩
bower—তরুমণ্ডপ ২
broadcast—আকাশবাণী, বাক্‌প্রসার ৩
brown, tawny, reddish brown—কপিল ২
brownish grey—কপিল ধূসর ২
bubbling over—অত্যূর্মি ১
buffoon—বাগ্‌জীবন ১
bureaucracy—আপিসি শাসন ৪
burlesque—কৌতুকনাট্য ৩
bursting out roaring—উদ্‌গর্জিত ১
business of a community—সমূহকার্য ১
calculation—সংখ্যান ২
caloric food—তাপজনক খাদ্য ৪

cannibal—নরভুক্ ৪
canvas—আঁকনপট ৪
capable of being completed—পারণীয় ১
capable of exertion—উদ্যোগসমর্থ ১
caricature—ব্যঙ্গীকরণ ৩
carpet-knight—গেহেশূর ১
caste—জাত জাতি, বর্ণ ৩
cement used in building—প্রাগাহ ১
centrefugal—কেন্দ্রাতিগ ৩
centrepetal—কেন্দ্রানুগ ৩
ceremony—অনুষ্ঠান ৩
certificate—অভিজ্ঞানপত্র ১
chair—আসন্দ ২
chairmanship—চৌকিদারি ৬
chapter of a book—প্রপাঠ, প্রপাঠক ১
charade—নাট্যখেলা ৩
charred—অঙ্গারিত ১
checked, restrained—অপপ্রসর ২
chief of the brotherhood—সংঘাধ্যক্ষ ২
chinese—চীনক (মহাভারত) ২
chivalry—বীরধর্ম ৩
chorus—সম্মেলক সংগীত
circulated—প্রতিচারিত ১
clan system—গোত্রবন্ধন, জাতিবন্ধন ৩
classical—ধ্রুবপদ্ধতি ৩
cleverness—কুশলতা ১
closest relationship—আন্তরতম্য ২
clumsiness—অনৈপুণ্য ১
co-education—সহশিক্ষা ৩

colleague—সহধুরী ১

collected—আচিত, প্রচিত ১

collecting—প্রচয়ন ১

collection—আচয়, প্রচয়, প্রচয়িকা, বিচিতি ১; সংকলন, সংগ্রথন ৩

collector-general—সমাহর্তা ১

coloured—অসিতচর্ম ৪

colourless, faded—নীরক্ত ১; নীরাগ ২

colour scheme—বর্ণকল্পনা ৩

commonplace—রোখো ৩

compationate marriage—সখ্যবিবাহ ৩

comparative literature—বিশ্বসাহিত্য ৩

completely pertinent, always applicable—অত্যন্তগত ১

complete in all parts—সমঙ্গী ২

complex structure—বহুগ্রন্থিল কলেবর ৩

compositor—অক্ষর যোজক ৪

compulsory—আবশ্যিক ২

concord—স্বৈক্য ৩

condolence—অভিশোচন ৩

condoling—অনুকম্পায়ী ১

congregation of villages—গ্রামকূট ১

constitution—গঠনপত্রিকা ৪

construction—নির্মিতি ৩

contamination of words—[শব্দগত] স্পর্শদোষ ৩

contempt—অবমিতি ১

contemptible—অবমন্তব্য ১

continuity of knowledge—জ্ঞানসন্ততি ১

contracted—কূণিত ১

conventional or established practice—সময়াচার ২

conversation—সংলাপ, সাংকথ্য ১
conversation on literature—সাহিত্যগোষ্ঠী ২
conversation on poetry—কাব্যগোষ্ঠী ১
copy transcript—প্রতিলিপি ১
corona—কিরীটিকা ৩
correction slip—শুচিপত্র ৩
cosmic ray—মহাজাগতিক রশ্মি ৩
cosmology—জগতত্ত্ব ৩
couch, sofa—প্রস্তর, প্রস্তরা ১
counterpart—প্রতিপত্তি ১
courage to undertake anything—উর্ধ্ব ১
course of a river—নদীমার্গ ২
cousin—ভ্রাতৃব্য ১
cowering down—অবলীন ২
crammed—অনুকীর্ণ ১
creation—সৃজতি ২
creche—শিশুরক্ষণী ৩
critic—বিবেচক ২
criticism—কাব্যবিবেচনা ২
crossing—চতুষ্পথ ৪
crushed—অবমর্দিত ২
cult and dogma—রীতি ও পদ্ধতি ৩
cult of nationalism—স্বজাতিপূজা ৪
cultural fellowship with
 foreign countries—বিশ্বমানবিকতা ৩
cultural history—সাংস্কৃতিক ইতিহাস ৩
culture—উৎকৃষ্টি, চিত্তোৎকর্ষ, সমুৎকর্ষ, মনঃপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষ ৩
cultured—প্রকৃষ্টচিত্ত বা প্রকৃষ্টমনা, সংস্কৃতিমান ৩
cultured intellegence—সংস্কৃতবুদ্ধি ৩

cultured mind—সংস্কৃতচিত্ত ৩

culture-minded—প্রাপ্তোৎকর্ষ-চিত্ত, উৎকর্ষিত চিত্ত, উৎকর্ষ-বান ৩

curved—অরাল, অঙ্কিত, অঙ্কিত রেখা ২ ;
রোমাঙ্কিত, তৃণাঙ্কিত ৩

curved line—কুটিল রেখা, তরঙ্গ রেখা ১

custom house—মাশুলখানা ৪

custom observed in a family—কুলস্থিতি ২

dancing room—আনর্ত ২

dappled—having variegated colour—এতব ২

dark blue—বিনীল ২

dark brown—কৃষ্ণপিঙ্গল, শ্যাব ২

deadening of a faculty—শক্তিকুণ্ঠন ১

dearest mother—অম্বিতমা ২

decaying—জরিষ্ণু ১

decline, deterioration—অপকর্ষ ২

decoration—প্রসাধন ২

deed of sale—ক্রয়লেখ্য ১

deficiency—ঊনতা ১

deficient in knowledge—জ্ঞানদুর্বল ২

degeneracy—আপজাত্য ৩

degenerate—অপজাত ৩

delicate—শ্লক্ষ্ণ ১

[dependence on others]—পারতন্ত্র্য—স্বাতন্ত্র্যের বিপরীত ২

deported—উদ্‌বাসিত ১

deposit—উপনিধি ২

descendant—অবরপুরুষ ১

design—আকল্প ১

desire of death—মুমূর্ষা ১

desire to gather—চিচীষা ২

desirous of flattery—চটুলালস ১
despot—স্বৈর শাসক ৪
determined by evidence of the senses—প্রত্যক্ষসিদ্ধ ১
devoted to home—গৃহব্রত ১
diarchy—দ্বৈরাজ্য ৩
difficult to be performed—দুরভিসম্ভব ১
dignity of labour—শরীরশ্রমের সম্মান ৩
dilettante—পল্লবগ্রাহী
[disagreeable]—অসৌম্য : অশোভন ২
disappointed—মনোহত ১
discord—বিস্বর ৩
discordant sound—ঝাংক্ষণ ১
discourse—উক্তপ্রত্যুক্ত ১
dispensary—ভেষজালয় ১
dissolved—প্রলীন ১
distortion of features—ভঙ্গীবিকার ১
distressed by fatigne—শ্রমখিন্ন ২
diurnal—দিবাতন ১
dogma—শাস্ত্রমত ৩
doing most—করিষ্ঠ ২
double-tongued—দ্বয়বাদী ১
driven on by the goad of woman's words—
স্ত্রীবাক্যাঙ্কুশ প্রক্ষুণ্ণ ২
driving—প্রণোদন ১
drop—দ্রপ্স ১
drop scene—চরম তিরস্করণী ৪
duet—যুগ্মক সংগীত
duet song—যমল গান ১
dug-out—গর্তগড় ৪

dying hard (diehard)—দুর্মর ১
easily irritated—আশুকোপী ২
easily led—সহজপ্রণেয় ১
easy chair—লঘুখট্টিকা ১
edentate—দন্তহীন ৩
effiminate, womanish—স্ত্রীময় ১
elected—বৃত ১
electricity—বৈদ্যুত ৩
elegant—রোচিষ্ণু ১
elementary—রূঢ়িক ৪
elevation—উচ্ছ্রায়, উচ্ছ্রিতি ১
elixir of life—চিরজীবনরস ৩
emaciated—কৃশিত ১
embroidery—চিত্রবয়ন ৪
emotion—আবেগ, হৃদয়াবেগ ৩
emotional—ভাবপ্রধান, হৃদয়প্রধান ৩
energy—প্রৈতি ৩
emjambenment—প্রবহমানতা ৩
enviable—ঈর্ষিতব্য ২
envied—ঈর্ষিত ২
envious—ঈর্ষ্যালু ২
envying—ঈর্ষ্যক ২
eoanthropus—প্রাক্‌মানব ৩
eocene—প্রাগাধুনিক ৩
eolith—প্রাক্‌প্রস্তর ৩
eschatology—পরকালতত্ত্ব ৩
essay—প্রবন্ধ ৩
essence—আত্মতা ১
ethics—চারিত্র, চারিত্রশিক্ষা, চারিত্রবোধ, চারিত্রোন্নতি ৩

eugenics—সৌজাত্যবিদ্যা, সৌজাত্যতত্ত্ব ৩
exaggerated—অতিকথিত, অতিকৃত ১
exaggeration—অতিকৃতি ৩
excellence—উত্তমতা ২
excellent in conversation—সাংকথিক ২
exhibition—প্রেক্ষণিকা ১
expanding—স্ফারিত ১
expanding—বিকস্বর প্রসারী ২
expelled—নিষ্কাসিত ১
expelled from a family—কুলচ্যুত ২
exposing goods for sale—অবস্থাপন ১
extremely hot—তপিষ্ঠ ২
extremism—অতিশয় পন্থা ৩
falling in drops—স্রুপ্সী ১
false measure or weight—কূটমান ২
family pride—কুলগরিমা ২
family tradition—কুলব্রত ১
fancy dress ball—ছদ্মবেশী নাচ ৩
far out of sight—অতিপরোক্ষ ১
far-sighted—অতিদর্শী ২
fatal to long life—অনায়ুষ্য ১
fault finding—দোষদৃষ্টি ২
feature—মুখরেখা ২
feeble, inane—অনিন ১
filtering—পরিস্রাবণ ১
finance minister—গণক-মহামাত্র ১
fine, slender—তলিনা ২
fine art—সৎকলা ১
[fire-fly]—তমোমণি ২

flexible, pliant, loose—শিথির ১
flight downwards—অবডীন ২
footpath—একায়ন ১
folk-verses—লোকগাথা ১
following one's own inclination—স্বৈরবর্তী ১
for show—প্রেক্ষার্থ ১
forced labour—অগত্যা-প্রেরিত খাটুনি ৪
fore thought—প্রসমীক্ষা, প্রসমীক্ষণ, পূর্ব-বিচারণা ৩
foremost, progressive—প্রাগ্রসর ১
fossil—জীবশিলা, শিলক, শিলাবিকার, ৩
fossilised—শিলবিকৃত, শিলীভূত, শিলীকৃত ৩
foster son—কৃতকপুত্র ৪
four-storied—চতুর্ভূমিক ১
freedom from haste—অত্বরা ২
fresh, vigorons—ইষিরা ২
full blown—স্ফারফুল্ল ২
[full of malice, malicious]—দ্রোহপর, দ্রোহবৃত্তি ২
fumigated—উপধূপিত ২
fumigation—উপধূপন ১
furnished—উপস্কৃত ২
farther down—অবরতর ২
gallery—সংক্রমণকা ১
galvanometer—তড়িৎমাপকসূচী ৪
genealogical table—গোত্রপট ১
generation—প্রজাত ৩
genetics—প্রজনতত্ত্ব ৩
genius for action—প্রতিভা কারয়িত্রী ১ ; কারয়িতা ২
genius for ideas or imagination—ভাবয়িতা ২
প্রতিভা—ভাবয়িত্রী ১

genus—মহাজাতি ৩
gesture—ব্যঞ্জনা ৩
girl guide—সহায়িকা ৩
glittering, throbbing, vibration,
pulsation, twinkling—স্ফুরণ ২
going far—অত্যন্তীন ১
governing body—অধিষ্ঠায়কবর্গ ১
grammarian—বৈয়াকরণিক ৩
grandiloquence—বাগ্‌ডম্বর ১
granular—কণাকার ১
gravitation—ভারাবর্তন, মহাকর্ষ ৩
greater or more by one—একোত্তর ২
grey and withered—পলিতম্লান ২
groundless—অনায়তন ১
grouping—গুম্ফন ১
habitually following—অনুগামক ১
halo round the sun or moon—পরীবেশ ২
handmill—যন্ত্রপেষণী, জাঁতা ১
hand power motion irrigarion—হস্তপ্রাবর্তিম ১
harmony—স্বরসংগম, স্বরসংগতি ৩
harrow—লোষ্টভেদন ২
having a secret affection—গুপ্তস্নেহা ২
having a taste—ভাবক, আঙ্গিক ভাবক, অনুভাব ভাবক ২
having a tendency to mix—অমিশ্র ২
having come too close—অভ্যভিস্হত ২
having no basis or falcrum—অমাস্থান ১
having no leader—অনায়ক ১
having similar qualities—অনুগুণ ২
having the eyes intently fixed—স্তিমিত নয়ন ২

having the last first, inverted—অবরস্পর ২
having the same name—তুল্যনাম ২
'having tongue like waves—স্ফুরৎতরঙ্গজিহ্ব ২
heredity—কুলসঞ্চারিতা, বংশানুগতি ৩
head of the agricultural department—সীতাধ্যক্ষ ১
hesitating or diffident disposition—শঙ্কাশীল ১
high browism—উঁচ্-কপালেগিরি ৩
his exalted highness—তদীয় উত্তুঙ্গতা ৬
hoar-frost—অবশ্যা, অবশ্যায় ২
hollowed out, perforated—সন্তুগ্ন ২
home of education—বিদ্যাভবন ৩
home of rest—বিশ্রান্তিনিকেতন ৩
honesty—অবঞ্চনতা ২
hostile disposition—দ্রোহভাব ২
house hero, boster—গেহেবিজিতী ২
household commission—গার্হস্থ্য বিভাগ ৩
hurrying—কৃতত্বর ২
identity—ঐকাত্ম্য ১
illusory—মায়াত্মক ১
image—প্রতিমা ৩
imitating—অনুকার, অনুকারী ২
immortal—অমর্ত্রি ২
impersonal—অনাত্ম্য ১
impetuous—অমিনা : অমেয়া, অমিতি ২
impropriety, immorality—অনীতি ২
impulse—প্রৈতি ৩
inaccurate—অযথা ৩
inanimate, unintelligent—জড়াত্মক ১
inborn—অন্তর্জাত ১

incoherent—অঘটমান ১
incoming—আগামিক ১
incongruons—অঘটমান ১
independent—স্বয়ংবশ ১ ; অনায়ত্ত ২
independent action—স্বচ্ছন্দতা ২
individual—পৃথগাত্মা ১
individualism—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ৩
individuality—পৃথগাত্মিকতা ১
inevitable—অবর্জনীয় ১
influenced—বশগত ১
infra red light—লাল-উজানি আলো ৩
inherent nature—অন্তর্ভাব ২
inheritable—বংশানুলোম্য ৩
inherited—কুলসঞ্চারী, বংশানুগত ৩
inimitable—অননুকৃত্য ২
inlaid—উপনদ্ধ ১
innate—অন্তরেজাত ৩
inpaired in strength—শিথিলশক্তি ২
inscription—প্রাচীনলিপি ৩
insensate—নিশ্চেতন ৩
inserted—অন্তঃপাতিত ১
instinct—সহজ প্রবৃত্তি ৩
institution—প্রতিষ্ঠান ৩
instrumentality—করণতা ১
intellectual friendship—বুদ্ধিগত বুদ্ধিমূলক বুদ্ধিপ্রধান মৈত্রী, মৈত্রীবোধ ৩
intellectual passion—বুদ্ধিগত সংরাগ ৩
intellectual self—বুদ্ধিগত ব্যক্তিত্ব ৩
intelligence department—কানাকানি বিভাগ ৬

intelligible only to one's self—স্বসংবেদ্য ১
intending to descend—অবিততীর্ষু ২
intercept—অন্তশ্ছেদ ১
interest—অনুরক্তি ৩
interior—অন্তর্ব ১
intermediate time—কালান্তর ১
internment—অন্তরায়ণ ১
interruption—অভ্যাঘাত ১
interruption of order—ক্রমভঙ্গ ১
intimate—অন্তম ১
intimate friends—আত্মবর্গ ২
introvert—অন্তর্মনস্ক ৪
intuitive—প্রাতিভ ২
intuitive knowledge—প্রাতিভজ্ঞান ১
invitation to eat and to drink—অশ্নীতপিবতা ২
involuntarily—অনিকামতঃ ১
inward smile—অন্তঃস্মিত ২
irregnlar order—ক্রমভ্রষ্ট ২
irrigation by wind-power—বাতপ্রাবর্তিম ১
juvenility—তরুণিমা ১
kind—সুহিত : সুহিতা ২
kind of creeper—কনীচি ২
knock-kneel—সংজ্ঞু ২
knowing only the present,
not what is beyond—সম্প্রতিবিদ্ ১
knowing the events of former times—পুরাবিদ্ ২
labour-saving machine—মিতশ্রমিক যন্ত্র ৪
lacerta—গোধিকা ৩
landing place—তরস্থান ১

languor—অনিমা ২
lapse of time—কালাতিক্রমণ ১
lateral—অনুপার্শ ১
law and order—বিধি এবং ব্যবস্থা ৩
leader of the worlds—লোকনায়ক ২
leaf of a door—দ্বারকপাট ১
lead grey—কপিশ বর্ণ ২
least part—অবরার্ধ ১
length—দ্রাঘিমা ২
lengthened—দ্রাঘিত ১
level conntry—সমস্থল ২
liberation—অবসা ২
library—গ্রন্থকুটী ১
light yellow, dun coloured—মাংশতু ২
lithograph—মুদ্রালিপি ১
little curved—অরাল ২
lively—অতিজীব ২
longest—দ্রাঘিষ্ঠ ২
longing—অনুকাঙ্ক্ষা ১
longing for—উৎকলিকা : উৎকণ্ঠা ২
loud sounding—উদ্‌ঘোষ, উন্মুখর ১
loving, beautiful—কম্র ১
machinist—যন্ত্রকর্মকার ১
made to pass through—অতিসারিত ১
majesty, dignity—আয়তি ২
making a calculation—সংখ্যাবিধান ২
maliciously minded—দ্রোহবুদ্ধি ১
manifold—নানাত্যয় ২
manufactory—যন্ত্রগৃহ ১

materialistic—বস্তু উপাসক ৪
matron—পুরন্ধ্রী ১
matutinal—প্রাতস্তন ১
measure of altitude—উন্মিতি ১
meeting of the two boundaries—সীমাসন্ধি ১
mental relation—অন্বয়িতা ২
mere outline of a subject—বস্তুমাত্রা ১
met by appointment—সংকেতমিলিত ১
metamorphosed rock—শিলাবিকার ৩
metaphysics—তত্ত্ববিদ্যা ৩
meteorology—নভোবিদ্যা ৩
miner—আকরিক, আখনিক ১
minister of the sports—কেলিসচিব ১
misogynist—স্ত্রীদ্বেষী ১
misty, vapoury—নভস ১
mocking laugh—অপহাস ১
mode of decoration—প্রসাধনবিধি ২
model, pattern—প্রতিমান ১
monasticism—মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা ৩
monogamy—অদ্বয় বিবাহ, নিরনেক বিবাহ ৩
monosyllabic—একমাত্রিক ৩
moonlight sonata—চন্দ্রালোকগীতিকা ৪
morning light—উস্রি, উস্রা ২
most distant—অপম ১
most minute—অনিষ্ঠ—অণুতম ২
mountain pass—গিরিদ্বার ২
mountain side—গিরিকটক ২
mouth of a river—নদীমুখ ২
movable—চরিষ্ণু ১

moving to and fro—প্রোল্লোল ১
moving tortuously—অহ্রুৎ ১
muffled (sound)—অস্ফুর ১
musical sound—নিকণ ২
mutual admiration—অন্যোন্যস্তুতি ৩
mutually relating—অন্যোন্যসাপেক্ষ ২
nation—অধিজাতি, রাষ্ট্রজাতি ৩
national—আধিজাতিক ৩
nationalism—আধিজাত্য ৩
national calamities—উপনিপাত ১
natural selection—নৈসর্গিক নির্বাচন ৩
navigable—নাব্য ১ ; নৌবাহ্য ৩
near or in a forest—প্রত্যরণ্য ১
nearest—নেদিষ্ঠ ২
nebulocity—নৈহারিকতা ৪
negative—নঞর্থক ১
neglect of the right time—সময়চ্যুতি
neighbouring district—পর্যন্তদেশ ২
next but one—একান্তর ২
night—শিরিণা (ঋগ্‌বেদ) ২
non-resident—অনাবাসিক, নির্বাসিক ১
not according to the moment—অসংপ্রাপ্তি ১
not ancestral—অপিত্র্য ২
not crossed over—অনিস্তীর্ণ ২
not distributed, not shared—অনিরুপ্ত ২
not fragile—অভঙ্গুর ২
not incompatible with—অপ্রতিযোগী ২
not milked—অপ্রদুগ্ধ ২
not praised—অনাশস্ত ২

not preceded by intelligence—অবুদ্ধিপূর্ব ১
not for sale—অপণ্য ১
not notified—অনাবেদিত ১
not one's own—অনিজক ১
not private, public—অনিভৃত ১
not saying yes, giving a negative answer—অতথা ২
not swallowed—অনিগীর্ণ ২
not to be rejected—অনপক্ষেপ্য ১
nourished by another, parasite—পরাচিত ১
oblique form—তির্যকরূপ ৩
obscure—অপ্রভ ১
obscurity—ধূম্রিমা ১
obscure intellect—ধূম্রবুদ্ধি ২
observation—অবেক্ষা ১
observatory—অবেক্ষণিকা ২
oculist—অক্ষিভিষক্‌ ১
of unrestrained conduct or behaviour—স্বৈরাচার ২
old legend—পুরাকথা ২
ombnibus—বিশ্বহ ৩
on the knees—অধিজানু ১
one who admits of no other evidence than
perception by the senses—প্রত্যক্ষবাদী ১
one who decides quickly—ক্ষিপ্রনিশ্চয় ১
one who had fulfilled his promise—তীর্ণপ্রতিজ্ঞ ১
one who is always asking questions ;
inquisitive—কথঙ্কথিক ২
one who is in the conditions
of utter oblivion—অতিস্ম ২
one who has done his duty—কৃতকর্তব্য, কৃতকৃত্য ২

one whose animal spirits have departed—ইতাসু ২
one's own, original—আত্মকীয়, আত্মনীয়, আত্মনীন ১
one's own sphere or range—স্বগোচর ১
opportune—অনুকাল ১
opposed to public opinion—লোকবিরুদ্ধ ১
optional—ঐচ্ছিক ১ ; স্বৈচ্ছিক ৪
order of succession—পর্যায়ক্রম ২
organisation—ব্যূহবদ্ধতা ৩
origin—প্রভব ২
original—আদিম ৩
original text—স্বয়ম্পাঠ ২
originality—আত্মনীয়তা ২ ; নিজমূলক, স্বকীয়তা ৩
ornamental—প্রসাধিত ১
other worldliness—পারলৌকিক বৈষয়িকতা ৩
out of order—ভিন্নক্রম ১
outcry indicating of prosperity—উলুলি, উলুধ্বনি ২
outgoing—নির্গামিক ১
outline of sketch—পরিলিখন ১
over fifty—উত্তর পঞ্চাশ ২
over-population—অতিপ্রজন ১
overrulled—অতিদিষ্ট ১
own judgement or opinion—স্বমনীষা ১
own rule or method—স্ববিধি ১
oxford—গোপ্রতার (যেখানে গোরু পার করে) ১
palatable—স্বদনীয় (স্বাদনীয়) ২
pale yellow—সেয়াল ২
Pan Islamism—বিশ্বমুসলমানী ৩
paradox—বিসংগত সত্য বা বিসংগত বাক্য ৩
parasite—পরাশিত ৩

park—আরামবাগ ৩
parody—ব্যঙ্গানুকরণ ৩
passing beyond—অতিবর্তন ২
passion, vehemence—সংরাগ ১, ৩
passive—অকরণ, অকারী, অক্রিয় ২
path of advantage—অর্থপদবী ১
patriotism—দৈশিকতা ৩
pattern—রূপকল্প ৩
people—জনসমূহ ৩
perchment—চর্মপত্র ৪
performing desired vows—ইষ্টব্রত ২
performing mere works withont intelligence
—কেবলকর্মী ১
perishable—ক্ষয়িষ্ণু ১
permission—অনুজ্ঞা ১
perpetual youth—নিত্যযৌবনা ২
persistent—নিত্যনির্বন্ধ ৩
personal—আত্ম্য ২
personal magnetism—বৈয়ক্তিক চৌম্বকশক্তি ৩
perspective—পরিপ্রেক্ষণিকা, পরিপ্রেক্ষণী, পরিপ্রেক্ষিত ৪
pessimist—নৈরাশ্যগ্রস্ত ৩
philologist—শাব্দিক ৪
physical culture—দেহপ্রকর্ষচর্চা ৩
pink—পাটল ২
pioneer—পুরোযায়ী ৩
place of assignation—সংকেতকেতন-স্থান ১
plateau ; side of a hill—গিরিপ্রস্থ ২
pleasure garden—ক্রীড়োদ্যান ২
pocket—পুটক ১

poet for the crowd—মণ্ডলকবি ১
politics—রাষ্ট্রিকতা ৩
polished—নির্ণিক্ত ১
popular—জনপ্রিয়, লোককান্ত ১
popular belief—লোকবাক্য ৩
popular sanction—অনুজনসম্মতি ২
popular usage—জনাচার ১
popularity—জনাদর ৪
population—প্রজন, প্রজাত ৩
positive—হাঁ-ধর্মী ৩
posthumous—আনুজাবর ২
pottery—পাত্রশিল্প
precedence—অতিষ্ঠা ১
prelude or prologne of a drama—পূর্বরঙ্গ ১
present—অনুদেয় ২
presidentship—সভাপত্য ৩
pressed flat—পিচ্চট ১
primary or principal rule—প্রথম কল্প ১
prime of youth—প্রৌঢ়যৌবন ১
privy—অবস্কর ২
proclaiming, publishing—অনুকীর্তন ১
proclamation—প্রবাচন ১
productive—অবন্ধ্য ৩
progress—অগ্রসরতা ৩
progressing—ভবিষ্ণু ১
proletariat—পরার্থশ্রমী ৩
promise of protection from danger—অভয়দক্ষিণা ১
promissory note—প্রতিজ্ঞাপত্র ১
promoting speech with a taste for words—বাগ্‌ভাবক ১

promoting the feelings and sensations moved by sentiments—হৃদয়ভাবক ১
promoting the quality of puriy—সাত্ত্বিকভাবক ১
promontory—অন্তুপর্বত ১
proper names—নামসংজ্ঞা ৩
prospectus—সংস্থানপত্র ৩ ; গঠনপত্রিকা ৪
prosperity in trade—পণ্যসিদ্ধি ১
proterozoic—পুরাজৈবিক ৩
proximo—গতমাসিক ৩
psychoanalytical—মনোবিকলনমূলক ৪
purple—কৃষ্ণলোহিত ২
quick moving—তরস্বতী, তরস্বিনী, তরসী ১
quickest—আশিষ্ঠ ২
quickly faded—আশুক্লান্ত
quickly moving—আশুগামী ২
race—গণজাতি, জাত, জাতি, প্রবংশ ৩
race preservation—প্রবংশ রক্ষা ৩
rarified atmosphere—তন্নুবাত ১
reading room—পাঠগহ ৩
real—তথার্থ ২
realised—বিষয়ীকৃত ১
recitation—অনুবাক
recognition—প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞান ১
reddish brown—কপিশ, পিঙ্গল ২
reference—পরিচয় ৩
reference to something prior—অনুদেশ ১
reflex—প্রতিক্ষিপ্ত ৩
reflex action—প্রতিবৃত্তিক্রিয়া ৩
region studies—স্থানিক তথ্যসন্ধান ৩

regular succession—পারম্পর্য ২
reject—অপক্ষেপ ১
relaxing one's effort—শ্লথোদ্যম ১
relief work, employment offered
to the famine-stricken—দুর্গত কর্ম ১
remainder—উচ্ছেষ ২
remitted—অনুদত্ত ১
repeated—অনুকথিত ২
repetition—অনুলাপ ১; পুনর্বৃত্তি ৩
resident—আবাসিক ১
resignation—দুঃখস্বীকার ৩
resuscitation—প্রতিজীবন ২
retinue—অনুযাত্র ১
retirement into a lonely place—প্রতিসংলয়ন ২
retired—প্রতিসংলীন ২
retrograde movement—প্রতীপগমন ১
returning a salutation—প্রত্যভিনন্দন, প্রত্যর্চন ১
returning to life—প্রত্যুজ্জীবন ১
reversed or inverted order—প্রতিক্রম ১
righteons indignation—ঘৃণামিশ্রিত আক্রোশ ৩
right perception, insight—সম্যগ্‌দর্শন দৃষ্টি ২
right understanding—সম্যগ্‌বোধ ২
right use—সম্যক্‌প্রয়োগ ২
rise and fall—উচ্চয় অপচয় ১
rolling of thunder—অবস্ফূর্জ ২
rubbed off—উন্মৃষ্ট ১
ruins, rubbish—অর্ম ১
rules of art—শিল্পবিধি ১
rumour, report—জনপ্রবাদ, জনবাদ ২

running—এষা ২
running from east to west—প্রাক্‌পশ্চিমায়ত ২
safe conduct—অভয়পত্র ১
saffron—কনক গৌরবর্ণ—জাফরানী রঙ ২
sanatorium—আরোগ্যালয় ৩
sanskritized—সংস্কৃতায়িত ৩
satellite state—উপরাজ্য ৪
satiated—অতিতৃপ্ত ২
scattered, confused—অস্তব্যস্ত ১
scattering over—অবধূলন ১
selection—অবচয়ন ৩
self-aggrandisement—আত্মবিবৃদ্ধি ১
self-contempt—স্বাবমাননা ১
self-impelled—স্ববহিত ১
self-moving—স্বচর, স্বয়ম্বহ ১
self-supporting—স্বয়ম্ভৃত, স্বয়ম্ভর ১
sentimentalism—ভাবগতিকতা ৩
seriously hurt—অতিতৃণ্ণ ২
serrated—অনুক্রকচ ১
shading little—অনুচ্ছায়, অল্পচ্ছায়াবিশিষ্ট ২
shaped—আকৃত ১
sharpness—কটুকিমা ২
hrill sonnd—উল্বণ নাদ ১
shrimph—ইঞ্চাক্ক ইচা মাছ ২
side-road—অনুরথ্যা ১
sieze of a city for fortress—পুররোধ ২
silly—অমস্ত ২
simple—সকল
simultaneous—তাৎকালিক ১

simultaneousness—তাৎকাল্য ১
situated at the border, frontierman—প্রত্যন্তিক ২
situated backward, behind—অপাচীন ২
sky-traveller, sun—আকাশপথিক ২
slave of the bell—ঘণ্টাকর্ণ ৬
sleeping garment—শয়নবাস ১
sleeping partner—ঘুমন্ত শরিক ৩
slightly acid—কাম্ল ২
slightly deficient—অম্লোন ১
slipped out or into—স্রস্ত ১
slippery, lithesome, supple—স্রপ্র ১
slippery, polished—শ্লক্ষ্ণ ১
smiling inwardly—অন্তঃস্মের ২
solely intent on—একতৎপর ১
solo—একক সংগীত ৩
somewhat soft, weak—মৃদুজাতীয় ১
song—গীথা ২
south—অপাচী—দক্ষিণ উদীচীর উল্টো ২
species of convolvulous with blue flowers—নীলিনী ২
species or genus—বর্গ : যেমন স্তন্যপায়ীবর্গ ২
species—উপজাতি ৩
spendthrift—অপচেতা ১
spiral—কম্বুরেখা ১
spirit of enquiry—পৃচ্ছনা, পৃচ্ছা ১
splinter, chip—অবব্রশ্চ ২
split—অবভুগ্ন ২
spontaneity—স্বচ্ছন্দভাব ২
spontaneous—স্বতঃস্ফূর্ত ৩
spontaneonsly—স্বচ্ছন্দতঃ ২

spontaneously effected—স্বসিদ্ধ ১
stale invention—উচ্ছিষ্ট কল্পনা ১
staring eyes—অতিমেমিষ চক্ষু ১
stationary—বর্তিষ্ণু ১
steward—সেবক ৩
sticking in the throat—অন্তর্গলগত ২
stimulous—তাড়না ৩
store—নিচয় ২
straightest, upright, honest—রজিষ্ঠ ২
strange—অপূর্ব ৩
stratosphere—স্তব্ধস্তর ৩
strength personified—উর্জানী ২
strengthened—কঠোরিত ২
stretching oneself upwards—উত্তত ১
strewn—অবস্তীর্ণ ২
string—তন্ত্রী, বীণার তার, তণিকা ১
stupid—জড়াত্মা ১
style—ছাঁদ, রীতি ৩
superb—উপপুর ১
subjsctive—প্রাতীতিক ২
sublime—মহান ৩
sublimity—মহিমা ৩
sub-man—অবমানব ৩
substance, substantiality—দ্রব্যত্ব ১
subterranean—অন্তর্ভৌম ১
suggestion—অভিসংকেত, ইঙ্গিত সংকেত, সূচনা ৩
suggestiveness—সূচনাশক্তি ৩
suitable, fit, proper—যথাযথ ২
super human—অতিমর্ত্য ২

superintendence—অধিকর্ম ২
superintendent—অধিকর্মা ১
superior in standing—অভিষ্ঠাবান ১
superseded, supplanted—পর্যায়চ্যুত ১
supporting the unworthy or worthless—অপাত্রভৃৎ ২
survival—অভিজীবন ১
surrounding by a circle of tremulous light
—স্ফুরৎ প্রভামণ্ডল ২
symbol—প্রতিরূপক ৩
symmetry—সম্মিতি, সংসাম্য ৩
sympathy—দরদ ৩
symphony—ধ্বনিমিলন ৩
symphonic—সংধ্বনিক ৩
tailor—সৌচিক ১
tale-bearing—দোষানুবাদ ২
tautology—পুনর্বাদ ১
tawny—পিশঙ্গ ২
technique—আঙ্গিক ১
telephone—দূরধ্বনিবহ ৩
terminus—শেষ মোকাম ৪
terroristic political movement—বৈভীষিক রাষ্ট্রউত্তম ৩
testimonial—সাদরপত্র ৪
that which has been flowing over—অতিস্রুত ১
theory of evolution—পরিমাণবাদ ৪
thing borrowed for use—যাচিতক ২
thread coming down from a race—কুলতন্তু ২
tinkling sound—শিঞ্জা, শিঞ্জান ১
tinkling—ঝনৎকৃত ২
tired, emaciated—ম্লান ১

to be done quickly—শীঘ্রকৃত্য ২
to bid any one farewell—অতিসর্গ দান করা ১
to follow—অনুবর্তন ২
to glide or creep over—অতিসর্পণ ১
to run or rush over—অতিধাবন ২
to scrape off—অপলিখন ১
to transport over—উৎপারণ ১
too close—অত্যন্তিক ২
towel—অঙ্গোঞ্ছ— গামছা ২
tradition, traditional—ঐতিহ্য ১ ; পুরাগত বনেদ ৩
traditional—পরম্পরাগ, পারম্পরীয় ২
tragic—পরিণামদারুণ ৪
trained—কৃতাভ্যাস ১
transliteration—প্রত্যক্ষরীকরণ ৪
treacherous battle—কূটযুদ্ধ ২
tremulous—স্ফির ১
tribe—জাতি সম্প্রদায় ৩
trickled down—অবশ্চ্যুত ১ ; অবস্কন্দন ২
troposphere—ক্ষুব্ধস্তর ৩
truism—নেহাত সত্য ৩
twilight—প্রদোষ ৩
twinkling—ঝিঁঝির ২
two minded—দ্বৈতমনা ৩
two mindedness—দ্বৌমানসিকতা, দ্বৈতমানস ৩
ultimo—আগামী মাসিক ৩
ultra violet ray—বেগনি পারের আলো, বেগনি পারের রশ্মি,
বেগ্‌নি পেরোনো আলো ৩
unanemous letter—অনামা চিঠি ৪
unattainable—অনাপ্য ১

unattained—অনাপ্ত ১
unconquered—অনির্জিত ২
under fifty—অর্বাকপঞ্চাশ ২
under-garmenr—অন্তরীয় ১
undermined—অধঃখাত ১
undermining—অধঃখনন ২
undermost, inferior—অবম ২
undesponding—অনির্বিন্ন ১
undulating—ঊর্মিমান, ঊর্মিল ১
unexpected—অনপেক্ষিত ১
unemployed—অকর্মান্বিত ১
unforeseen—অবিতর্কিত ১
unproductive—অবন্ধ্য ৩
unreserved conversation—বৈরালাপ ২
unsealed—উন্মুদ্র ১
unseasonable—অনার্তব ১
unsown—অনুপ্ত ২
unstable—অপ্রতিষ্ঠ ১
unsteadiness—অনিষ্ঠা ১
unsupported—অনালম্ব ১
untaught or primitive knowledge—উপজ্ঞা ১
untraditional—অনৈতিহ্য ২
unwholesome—অসাত্ম্য ২
upheld, uplifted—উত্তভিত ১
urgent—আত্যয়িক ১
variagated colour—কির্বির, কির্মীর—কির্মীরিত ১
variety, manifoldness—নানাত্ব ২
vein of a leaf—পর্ণশিরা ১
very near—অন্তিতম ২

very passionate—উচ্চণ্ড ১
very thin—অত্যণু ২
very timid—অতিত্রস্নু ২
vigorous protest—বলবান অস্বীকৃতি ৬
violet—পাটল ৩
vital function—প্রাণবৃত্তি ১
voice—বাণী, মহাবাণী ৩
voluntary testimony—স্বয়মুক্তি ১
voluntary vow—কাম্যব্রত ১
vulger speech—অপশব্দ ১
wailing, lamenting—রলরোল ১
warding off, preventing—প্রতিবারণ ২
water course—জলনির্গম ২
water-power irrigation—স্রোতযন্ত্রপ্রাবর্তিম ১
weak-minded—কৃশবুদ্ধি ২
week-end—সপ্তাহপ্রান্ত ৩
well-filled—অতিভৃত ১
wheel worked by feet for raising water—পাদাবর্ত ১
whirlpool, eddy—গর্গর ১
whitish yellow cream colour—পাণ্ডর ২
winked—শ্মীলিত ২
winking, blinking—শ্মীল ১
wish to require—প্রতিচিকীর্ষা ২
wishing to take—আদিৎসা ২
wit—মূর্খন্ত হাসি ৩
withered within—অন্তঃশীর্ণ ২
within one's power—শক্তিগোচর ২
without egotism—অমম ২
without interruption—অনারত ১

woman who chooses her husband—পতিম্বরা ১
world-trotter—চক্রচর ১
world's news—লোকবার্তা ২
wrong reading—অপাঠব ১
yellow peril—পীতসংকট ৩
younger—অবরবয়স্ক ২
zealot—কট্টুৎসাহী ৪

নির্দেশিকা

—

সংশোধন

পৃষ্ঠা/ছত্র	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৬৭।৬	Sate	State
১৭৪।৯	গোন্দবিদাসের	গোবিন্দদাসের

১৮৩ পৃষ্ঠা হইতে 'প্রতিশব্দ' বিভাগ শুরু বুঝিতে হইবে

পৃষ্ঠা/ছত্র	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৯৯.২৩	পরাজৈবিক	পুরাজৈবিক

২০৮ রচনা-শেষে 'ভাদ্র ১৩৪২' তারিখ বসিবে

পৃষ্ঠা/ছত্র	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২৩৭।১৮	পারে।	পারে।[১]

৩১৫-র পর ৩২০ স্থলে ৩১৬ পড়িতে হইবে

পৃষ্ঠা/ছত্র	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৩৪১।২৬	প্রচীন	প্রাচীন
৪০৯।১০	হয়	যায়